স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে (নির্বাচিত) লোকশিল্পের প্রতিগ্রহণ: একটি তুলনামূলক আলোচনা

পিএইচ. ডি (কলা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক: বিদিশা বসু

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

রেজি নং- A00CL1501118 (09.10.2018)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

তত্ত্বাবধায়ক: ড. সুমিতকুমার বড়ুয়া

সহযোগী অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৩

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে (নির্বাচিত) লোকশিল্পের প্রতিগ্রহণ: একটি তুলনামূলক আলোচনা

CERTIFIED THAT THE THESIS ENTITLED

‘স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে (নির্বাচিত) লোকশিল্পের প্রতিগ্রহণ: একটি তুলনামূলক আলোচনা’ submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Dr. Sumit Kumar Barua.

And That Neither this thesis nor any part it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Counter signed by the Supervisor | Candidate
Dated | Dated

প্রস্তাবনা

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের আলোচ্য বিষয় *স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে (নির্বাচিত) লোকশিল্পের প্রতিগ্রহণ: একটি তুলনামূলক আলোচনা* । তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রান্তিকের লোকজীবন ও তাঁদের লোকশিল্পের বাস্তব চিত্র এবং উপন্যাসে তার শিল্পময় পরিবেশন এই আলোচনার প্রতিপাদ্য। ছোটবেলা থেকে গ্রামে বড়ো হওয়ার সুবাদে গ্রামীণ লোকশিল্পগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। তৈরি হয়েছে লোকশিল্পের প্রতি আগ্রহ। তবে এই বিষয়টির প্রতি আমার মূল আকর্ষণ পারফরমেন্স স্টাডিস চর্চার সূত্রে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক সুজিতকুমার মন্ডল ও ঈপ্সিতা হালদারের পারফরমেন্স স্টাডিসের ক্লাসগুলি এ ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহ তৈরি করে। আর এই বিষয়টি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করেছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. সুমিতকুমার বড়ুয়া। সবসময় তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, সুচিন্তিত মতামত ও সুপরামর্শ পেয়েছি। তাঁর প্রতি আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। বিভিন্ন সময়ে সুচিন্তিত মতামত, প্রয়োজনীয় মূল্যবান গ্রন্থের অনুসন্ধান, এছাড়াও নানা ধরনের সুপরামর্শ দিয়ে ভাবতে শিখিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বরেন্দু মন্ডল। তাঁকে জানাই আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. উদয়কুমার চক্রবর্তীর কাছ থেকে ভাষার তাত্ত্বিক দিক, উপন্যাসের গঠন সম্পর্কে অনেক ধারণা ও অনেক বইয়ের খোঁজ পেয়েছি। তাঁর প্রতি রইল আমার অন্তরের শ্রদ্ধা। আলকাপ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা পেতে মুর্শিদাবাদের আলকাপ শিল্পী ওস্তাদ করুণাকান্ত হাজরা, ছোকরা টিটো ঘোষের কাছ থেকে অনেক তথ্যে সমৃদ্ধ হয়েছি। তাঁরা তাদের বেশ খানিকটা মূল্যবান সময় আমার জন্য ব্যয় করেছেন। তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। গবেষণার কাজে সাহায্য পেয়েছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষক বন্ধু প্রদীপ রায়কে। তার

কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগীয় গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচারের গোলপার্ক লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সোনামুখী কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে আমি প্রয়োজন মতো বই সংগ্রহ করেছি। এই সকল গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

কলকাতা- ৭০০১৫৩ বিদিশা বসু

সূচিপত্র

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায়: লোকশিল্পের ধারণা ও লোকশিল্পনির্ভর উপন্যাসগুলির পূর্বসূত্র

১.০ ভূমিকা ৩

১.১ ‘লোক’ ও ‘সংস্কৃতি’-র ধারণা ৫

১.২ লোকসংস্কৃতির স্বরূপ ৬

১.৩ শিষ্ট সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি ৭

১.৪ লোকসংস্কৃতির উপর নাগরিক শিল্প সংস্কৃতির প্রভাব ৯

১.৫ লোকশিল্পীদের জীবন ও নিম্নবর্গচর্চা ১০

১.৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় লোকশিল্প নির্ভর উপন্যাসের পূর্বসূত্র ১৭

১.৭ উপসংহার ৩৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: পারফরমেন্স লোকশিল্প ও উপন্যাস শিল্প: তুলনামূলক সম্পর্ক বিচার

২.০ ভূমিকা ৪৩

২.১ পারফরমেন্স লোকশিল্প ও উপন্যাসশিল্প: তাত্ত্বিক পটভূমি ৪৪

২.২ *মায়ামৃদঙ্গ:* আলকাপ শিল্প ৫২

২.৩ *রহু চণ্ডালের হাড়* : বাজিকরি শিল্প ৬৯

২.৪ *রসিক* : ঝুমুর শিল্প ৮১

২.৫ *আড়কাঠি* : লোকশিল্পের পরিবেশন ৯৬

২.৬ *কলাবতী কথা* : পটশিল্পের পরিবেশন ১০১

২.৭ উপসংহার ১১২

তৃতীয় অধ্যায়: নির্বাচিত উপন্যাসগুলির শিল্প আঙ্গিকগত প্রতিতুলনা

৩.০ ভূমিকা ১২২

৩.১ গ্রহণ-প্রতিগ্রহণ তত্ত্বের নিরিখে লোকশিল্প নির্ভর উপন্যাস ১২২

৩.১.১ *মায়ামৃদঙ্গ* ১২৬

৩.১.২ *রহু চণ্ডালের হাড়* ১২৮

৩.১.৩ *রসিক* ১৩৬

৩.১.৪ *আড়কাঠি* ১৪০

৩.১.৫ *কলাবতী কথা* ১৪৩

৩.২ আখ্যানতাত্ত্বিক গঠন ১৫১

৩.২.১ *মায়ামৃদঙ্গ* ১৫৫

৩.২.২ *রহু চণ্ডালের হাড়* ১৬৩

৩.২.৩ *রসিক* ১৭৫

৩.২.৪ *আড়কাঠি* ১৮৪

৩.২.৫ *কলাবতী কথা* ২০০

৩.৩ উপসংহার ২০৭

চতুর্থ অধ্যায়: লোকশিল্পনির্ভর উপন্যাসগুলিতে লোকভাষা ব্যবহার

৪.০ ভূমিকা ২১০

৪.১ কেন্দ্রীয় ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষা ব্যবহার ২১২

৪.১.১ *মায়ামৃদঙ্গ* ২১৩

৪.১.২ *রহু চণ্ডালের হাড়* ২১৭

৪.১.৩ *রসিক* ২২২

৪.১.৪ *আড়কাঠি* ২২৫

৪.২ সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে ভাষাবৈচিত্র্য ২২৯

৪.৩ শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ: উপন্যাসগুলির ভাষা ব্যবহার ২৪৩

৪.৩.১ বিচ্যুতিবাদ (Deviation theory) ২৪৪

৪.৩.২ প্রমুখন (Foregrounding) ২৪৬

৪.৩.৩ সমান্তরালতা (Parallelism) ২৪৮

৪.৪ উপসংহার ২৫২

পঞ্চম অধ্যায়: উপন্যাসে লোকশিল্পের প্রতিগ্রহণ: লিঙ্গগত বৈষম্য ও শিল্পীদের অবস্থান

৫.০ ভূমিকা ২৫৭

৫.১ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নারীদের অধিকার আদায়ের ইতিহাস ও প্রান্তিক নারীদের অবস্থান ২৫৯

৫.২ *মায়ামৃদঙ্গ* ২৬৮

৫.৩ *রহু চণ্ডালের হাড়* ২৮১

৫.৪ *রসিক* ২৯২

৫.৫ *আড়কাঠি* ৩০৭

৫.৬ *কলাবতী কথা* ৩১৪

৫.৭ উপসংহার ৩১৯

ষষ্ঠ অধ্যায়: তুলনামূলক আলোচনায় শিল্পীমনের জীবনশিল্প

৬.০ ভূমিকা ৩২৪

৬.১ *মায়ামৃদঙ্গ* ৩২৬

৬.২ *রহু চণ্ডালের হাড়* ৩৩৭

৬.৩ *রসিক* ৩৪৬

৬.৪ *আড়কাঠি* ৩৫৫

৬.৫ *কলাবতী কথা* ৩৬৪

৬.৬ উপসংহার ৩৬৭

উপসংহার ৩৭০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ৩৭৬

ভূমিকা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীন পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভ এটি। বিষয়– 'স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে (নির্বাচিত) লোকশিল্পের প্রতিগ্রহণ: একটি তুলনামূলক আলোচনা'। আমার আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে নির্বাচিত পাঁচটি উপন্যাস। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *মায়ামৃদঙ্গ* (১৯৬৬), ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের *কলাবতী কথা* (২০১৫), সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক* (১৯৯১), অভিজিৎ সেনের *রহু চণ্ডালের হাড়* (১৯৮৫) ও ভগীরথ মিশ্রের *আড়কাঠি* (১৯৯৩)। প্রত্যেকটি উপন্যাসের মূল অবলম্বন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের লোকশিল্প। আলকাপ শিল্প ও শিল্পীদের শিল্পময় জীবনকে ধরেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসে। পুরুলিয়ার পাথুরে পথ চলার ছন্দে ঝুমুরের মেঠো সুরে বেজে উঠেছে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক*। বাজিকরের বাজিকরি খেলা রহু চণ্ডালের হাড়ের ভেলকিবাজিতে আজও বিস্মিত হয় সাধারণ মানুষ। বাজিকরি শিল্পকে গ্রহণ করে অভিজিৎ সেন আঁর *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসে যাযাবর বাজিকর জনজাতির সার্বিক জীবনকে উদ্ভাসিত করেছেন তাদের অবিরত পথচলার কাহিনিতে। আড়কাঠিরা কীভাবে বাণিজ্যিক স্বার্থে লোকশিল্প ও শিল্পীদের পণ্য করে তাদেরকে নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত করেছে, লোকশিল্পের সেই কুরুচিকর বাণিজ্যিক দিকটি সম্পর্কে পাঠককে পরিচিত করিয়েছেন ভগীরথ মিশ্র তাঁর *আড়কাঠি* উপন্যাসে। পটশিল্পকে কেন্দ্র করে পটশিল্পীদের জীবন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যচক্রের শিকার হয়ে শিল্পীদের বিক্রি হয়ে যাওয়ার কাহিনি ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের *কলাবতী কথা*। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রচিত এই পাঁচটি উপন্যাসে লোকশিল্পকে প্রতিগ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রান্তিক জনজাতির শৈল্পিক জীবনের নানা বিভঙ্গকে অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেছি। এই ক্ষেত্রটিতে লিখিত উপন্যাস শিল্প আশ্রয় করেছে প্রান্তিকের পারফরমেন্স শিল্পকে। বাস্তব এবং এই পাঁচ উপন্যাসের

পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিকের জীবন ও তাদের অস্তিত্বের স্বরূপকে খুঁজতে চেষ্টা করেছি। বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিবর্তনের পথে লোকশিল্পনির্ভর উপন্যাসের ধারায় আমার নির্বাচিত উপন্যাসগুলির অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। লোকশিল্প নির্ভর উপন্যাসগুলিতে পারফরমেন্স শিল্প ও সেই পারফরমেন্স নির্ভর উপন্যাস শিল্পের তুলনামূলক আলোচনায় প্রত্যেক ঔপন্যাসিকের লোকশিল্পকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রহণ-বর্জনের রাজনীতির কৌশলটি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। স্বতন্ত্র লোকশিল্পের ব্যবহার কীভাবে এই পাঁচটি উপন্যাসের স্বতন্ত্র গঠনকে নির্মাণ করেছে তা খুঁজতে চেয়েছি। লোকশিল্পনির্ভর প্রত্যেক উপন্যাসের স্বতন্ত্র আঙ্গিকগত কৌশলটি এই আলোচনায় এসেছে উপন্যাসগুলির তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে। স্বতন্ত্র উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন লোকভাষার ব্যবহার ও উপন্যাসগুলির স্বতন্ত্র ভাষাশৈলী ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাত্ত্বিক দিক থেকে উপন্যাসের ভাষাগত বিশ্লেষণ করেছি। স্বাভাবিকভাবেই দেখাতে চেষ্টা করেছি, উপন্যাসে বর্ণিত নির্দিষ্ট লোকশিল্প ও সেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট লোকশিল্প কেন্দ্রিক নির্দিষ্ট লোকভাষার ব্যবহার লোকশিল্পীদের জীবনকে কতটা জীবন্ত ও বাস্তব সম্মত করেছে। আমার নির্বাচিত স্বাধীনতা উত্তর লোকশিল্প নির্ভর নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে বর্ণিত নারীদের জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা লিঙ্গগত বৈষম্য মূলক সামাজিক, সাংস্কৃতিক অত্যাচারের স্বরূপটিকে বুঝে আজকের দিনের সাপেক্ষে আমাদের সমাজে প্রান্তিক নারী লোকশিল্পীদের প্রকৃত অবস্থানটি কোথায় তা অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেছি। অন্ত্যেবাসী মানুষের অন্ত্যেবাসী হওয়ার ক্ষেত্রে সংস্কারগত, জাতিগত, লিঙ্গগত স্বেচ্ছাচারের টানাপোড়েনই বা কতটা- এই দিকগুলি আলোচনায় স্থান পেয়েছে। দেখাতে চেষ্টা করেছি, ঔপন্যাসিকের শৈল্পিক চোখে প্রান্তিক লোকশিল্পীদের শিল্প-জীবন ও জীবন-শিল্প আদৌ সহমর্মীর নাকি পুরোটাই বিনোদনের।

প্রথম অধ্যায়

লোকশিল্পের ধারণা ও লোকশিল্পনির্ভর উপন্যাসগুলির পূর্বসূত্র

১.০ ভূমিকা:

বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে তার নিজস্ব লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্প। সেগুলো আজও বিজ্ঞাপনের অপেক্ষা করে না। মনের টানে, শিল্পগুলির সঙ্গে আত্মিক যোগ অনুভব করে ভিড় জমান অনেকেই। এগুলির সঙ্গে তাদের কোথাও বা প্রাণের প্রত্যক্ষ যোগ। তবে এই লোকশিল্পগুলিকে গ্রহণ করে লিখিত শিল্প তার প্রকরণগত দিক থেকে নবরূপে গড়ে ওঠে। বাস্তবের এই শিল্পগুলিকে আশ্রয় করে পরিবেশিত হয় নতুন এক শিল্প আঙ্গিক। নাগরিক শিক্ষিত 'শিষ্ট' শিল্পের আয়নায় পল্লীনির্ভর 'গ্রামীণ' লোকশিল্পগুলি ধরা দেয়। অনভিজাতের শিল্পগুলি হয়ে ওঠে অভিজাত শিল্পের উপাদান। আলকাপ, ঝুমুর, মারফতি গান, মৃৎশিল্প, পটগান, বাজিকরের ভেলকি বা ভানুমতীর খেলা– এই ধরনের লোকশিল্পগুলিকে আশ্রয় করে তৈরি হয়েছে লিখিত শিল্প উপন্যাস। গুণময় মান্নার (১৯২৫-২০১০) *কটাভানারি* (১৯৬০) উপন্যাসে কটা ভানা করে উপার্জনের কথা বলা হয়েছে। ধান সিদ্ধ করা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লাভের দিকে তাকিয়ে লোকশিল্পকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করছে একশ্রেণি। বাজার ও প্রচারের আন্তর্জাতিক ফাঁদে লোকশিল্পকে ফেলে নিজেদের লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে ক্রমশ ফুলে ফেঁপে ওঠে একদল স্বার্থান্বেষী মানুষ। লোকসংস্কৃতির এই সংকটকে দেখালেন ভগীরথ মিশ্র তাঁর এই উপন্যাসে। ধান শুকনো করা একধরনের পেশা। এটি একটি লোকপ্রযুক্তি। উপন্যাসে এই লোকপ্রযুক্তির উল্লেখ আছে। লোকপ্রযুক্তি বলতে বোঝায়, একধরনের গ্রামীণ 'জীবন-কর্ম'। এটি একধরনের ব্যবহারিক কাজের পদ্ধতি। যাঁতা বা ঢেঁকি দিয়ে চাল ডালের খোসা ছাড়ানো হয় এই ধরনের ক্রিয়াপদ্ধতি ব্যবহার করে। কিন্তু

এই লোকপ্রযুক্তি শিল্পের শিল্প আঙ্গিক সম্পর্কে কোনো বর্ণনা উপন্যাসটিতে আমরা পাই না। এই উপন্যাসে লোকমানুষের জীবন ও জীবিকার সূত্রে এই লোকপ্রযুক্তি শিল্পের উল্লেখ আছে। আলকাপ শিল্পকে নিয়ে রচিত সৈয়দ মুজতবা সিরাজের (১৯৩০-২০১২) *মায়ামৃদঙ্গ* (১৯৬৬)। আলকাপ ও মারফতি গানকে নিয়ে লেখা সৈয়দ মুজতবা সিরাজের *নিলয় না জানি* (১৯৭৬)। বাজিকরের ভেলকি বা ভানুমতীর খেলাকে ব্যবহার করেছেন অভিজিৎ সেন (১৯৪৫) তাঁর *রহু চণ্ডালের হাড়* (১৯৮৫) উপন্যাসে। ঝুমুর শিল্পকে নিয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায় (১৯৫০-২০২০) লিখেছেন *রসিক* (১৯৯১)উপন্যাস। বাঁকুড়া জেলা গজাশিমুল গ্রামের বসু-শবরজাতির লোকসংস্কৃতিকে পুঁজি করে তাদের বিশ্বাস, রীতি, প্রথা, সংস্কৃতি সর্বোপরি তাদের জীবনকে পণ্য করে কীভাবে এক শহুরে বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক লোকসংস্কৃতিপ্রেমের ছদ্মবেশে লোভী ব্যবসায়িক খেলায় মেতে ওঠে তার করুণ কাহিনি ভগীরথ মিশ্রের (জন্ম-১৯৪৭) *আড়কাঠি* (১৯৯৩) উপন্যাসটি। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লাভের দিকে তাকিয়ে লোকশিল্পকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করছে একশ্রেণি। লোকশিল্পকে বাজার ও প্রচারের আন্তর্জাতিক ফাঁদে ফেলে নিজেদের লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে ক্রমশ ফুলে ফেঁপে ওঠে একদল স্বার্থান্বেষী মানুষ। লোকসংস্কৃতির এই সংকটকে দেখালেন ভগীরথ মিশ্র তাঁর এই উপন্যাসে। পটশিল্পকে নিয়ে ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় লিখেছেন *কলাবতী কথা* (২০১৫)। মৃৎশিল্পকে নিয়ে রচিত নলিনী বেরার (১৯৫২) *মাটির মৃদঙ্গ* (২০১৭)। এভাবে লোকশিল্পকে আশ্রয় করে লিখিত উপন্যাস শিল্প ও সেই উপন্যাস শিল্পের গ্রহণ-বর্জনের রাজনীতির স্বরূপ সন্ধানই এই গবেষণার মুখ্য আলোচ্য বিষয়। স্বাভাবিকভাবে এখানে অভিজাত উপন্যাস শিল্প ও সেই উপন্যাস শিল্পের অবলম্বন লোকশিল্পগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে। প্রাসঙ্গিক হয়েছে বাংলার প্রাণের পল্লীজীবন নির্ভর আলকাপ, ঝুমুর, মারফতি গান, মৃৎশিল্প, পটগান, বাজিকরের ভেলকি বা ভানুমতীর খেলার মতো লোকশিল্পগুলি। আঞ্চলিক প্রয়োজনে বা

পরিবেশগত কারণে সৃষ্ট এই লোকশিল্পগুলির নন্দনতাত্ত্বিক আবেদন আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিস্তৃত। ভৌগোলিক বিস্তৃতি থাকলেও লোকশিল্পগুলির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে প্রচলিত অঞ্চলকে নির্ভর করে। স্বাভাবিকভাবে লোক অনুযায়ী এর চেহারায় দেখা দিয়েছে বহু রকমফের। রকম বৈচিত্র্য অনুযায়ী লোকশিল্পগুলি হয়েছে বহুমুখী। বহুমুখী এই লোকশিল্পের সংস্কৃতি একারণে খুব গভীর। আমাদের প্রথমেই লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে তাই সম্যক ধারণা প্রয়োজন।

১.১ 'লোক' ও 'সংস্কৃতি'-র ধারণা:

১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম জন্ থমস্ (১৮০৩-১৮৮৫) 'লোকসংস্কৃতি'র প্রতিশব্দ হিসাবে 'ফোকলোর' শব্দটির প্রবর্তন করেছিলেন।[১] তিনি *লেটার্স টু দ্য অ্যাথেনিয়াম*-এ (১৮৪৬) 'ফোকলোর'-এর উল্লেখ করেন। 'ফোক' শব্দের অর্থ হল 'লোক' বা 'জন'। 'লোর' শব্দের অর্থ ইংরেজিতে 'জনজীবনে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান' বলা যেতে পারে। এককথায় সুনির্দিষ্ট একটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে এর অর্থের ব্যাপ্তি বোঝানো বেশ কঠিন। তবে 'লোক' অর্থে যে মানুষজনকে বোঝায় তারা কোনো এক সংহত কৌম সমাজের প্রাচীন জনগোষ্ঠী। তারা একই ভূখণ্ডে বসবাস করে, তাদের আর্থিক কাঠামো একরকম, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সকলে একই ধরনের বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, প্রথা, রীতি-নীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। তারা একই ধরনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বংশপরম্পরায় পালন করে চলে। তাদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মকে বলা যেতে পারে 'লোর'। 'ফোকলোর' শব্দটির বাংলা পরিভাষা ব্যবহার নিয়ে পণ্ডিতমহলে নানা মত। কেউ বলেন 'লোকচর্যা', কেউ 'লোককৃতি', কেউ কেউ 'লোকশ্রুতি' কিংবা 'লোকায়ন' অথবা 'লোকবৃত্ত' বলেন। অনেকে মনে করেন 'লোকবিজ্ঞান'। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) শব্দটির বাংলা পরিভাষা

করেন 'লোকযান'। 'লোকযান' শব্দটি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্মিত। তিনি এর অর্থ করেছেন 'যা প্রবহমান', 'গতিশীল'। 'ফোকলোর' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'জনশিক্ষা'। ফোকলোর সম্পর্কে জোনাস বেলির বক্তব্যকে লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ও গবেষক সুধীর কুমার করণ অনুবাদ করেছেন যার বিষয়বস্তু হল, আমাদের বর্তমান লোকসমাজে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা প্রথাসর্বস্ব ও গতানুগতিক বিষয়গুলি যেমন ধর্ম, আচার, আচরণ, বিশ্বাস এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলির কোনো পরিবর্তন নেই, এমনকি তার অস্তিত্বও কোনোভাবে মুছে যায় না। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাচীনকালেও যেমন প্রকটভাবে ছিল, সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেও সেগুলি বেঁচে থাকে।

১.২ লোকসংস্কৃতির স্বরূপ:

উপরের ধারণাগুলি থেকে অনুধাবন করা যেতে পারে, লোকসংস্কৃতি বা লোকশিল্পের উদ্ভবের মূলে রয়েছে কোনো সংহত সমাজ ও তাদের শিল্পীগোষ্ঠী। লোকসংস্কৃতির ধারণা একটি গতিশীল ধারণা। এ প্রসঙ্গে চার্লস ফ্রান্সিস পটারের একটি বক্তব্যকে গ্রহণ করা যেতে পারে। যার বিষয় হল, লোকসংস্কৃতি এক জীবন্ত জীবাশ্ম, যা মৃত্যুকে অস্বীকার করে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ- এই তিন কালকে স্পর্শ করে লোকসংস্কৃতি অনন্তকাল বিস্তৃত। এ চিরন্তনের। স্থানিক, কালিক, লৌকিক, দেশজ হয়েও এর আবেদন বিশ্বগত, সর্বমানসের, সর্বকালের। এ সংস্কৃতি লোককে আশ্রয় করে বিকশিত হলেও এর গতি সর্বত্র বিস্তৃত। এ সংস্কৃতি ও শিল্প অলিখিত, মৌখিক ঐতিহ্যনির্ভর। সভ্যতার প্রাক্কালে আদিম মানব সমাজ নিরন্তর নানা ধরনের ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে হতে ক্রমশ বিবর্তিত হয়েছে। গোষ্ঠীবদ্ধ যাযাবর মানুষ শিখেছে আগুনের ব্যবহার। ক্রমশ চাকার আবিষ্কার করেছে সে। প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে শিখেছে। কৃষিসভ্যতার ব্যবহার শিখেছে। তারই সূত্রে এসেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ

লোকাচার, লোকউৎসব, লোকদেবতা ইত্যাদির ধারণাগুলি। কালক্রমে সে পাথরের ফলক ব্যবহার করে গুহার গায়ে বা পাথর খণ্ডে এঁকেছে রেখাচিত্র। এই সূত্র ধরে লিপিমালার ব্যবহার করেছিল কিছু মানুষ। তবে লিপির আবিষ্কার একদল মানুষকে করলো লিপিকুশলী আর আরেক দলকে করলো নিরক্ষর। বৃহৎ সমাজে সকলেরই অবস্থান। আধুনিক সভ্যতায় বিজ্ঞানের ব্যবহার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে ক্রমেই সারা বিশ্ব এসেছে মানুষের হাতের মুঠোয়। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংঘাতের ও সমন্বয়ের পাশাপাশি চলেছে সাংস্কৃতিক সংঘাত ও সমন্বয়। ক্রমেই গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের সম্প্রসারণ ঘটে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের উদ্ভব হয়। সামাজিক কাঠামো জটিল থেকে জটিলতর হতে শুরু করে। তৈরি হয় সমাজ কাঠামো, ক্ষমতায়নের রাজনীতি। মানব সভ্যতা ক্রমেই সরল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। এরই প্রেক্ষাপটে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলির বদল ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। পরিবর্তনশীল সভ্যতা ও সমাজে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকধর্ম, লোকবিশ্বাস, লোকশিল্প, লোকভাষা, লোকউৎসব ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিও পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশেষ দেশের জাতিগত, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক ঐতিহ্যকে সাঙ্গীকৃত করে লোকসংস্কৃতি তার প্রাণশক্তিকে উজ্জীবিত রেখেছে। আর তাই সমাজবদ্ধ মানুষের এই লৌকিক শিল্প ও লৌকিক সংস্কৃতি এই পরিবর্তমান সমাজের প্রাণশক্তি। সঙ্গত কারণেই বলা যায় লোকসংস্কৃতির আবেদন দেশ, কাল, সমাজকে অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে বৈশ্বিক ও সার্বজনীন।

১.৩ শিষ্ট সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি:

‘সংস্কৃতি’ শব্দটির পরিভাষা নির্মাণ করেছেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭)। সুনীতিকুমার চটোপাধ্যায় তাঁর *জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য* এবং *ইতিহাস* ও *সংস্কৃতি*

ইতিহাস গ্রন্থ দুটিতে সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ‘সংস্কৃতি’ শব্দটির পরিধি বেশ ব্যাপক। এর আওতায় যেমন একদিকে আসে শিষ্ট জনের সংস্কৃতি, তেমনি আসে লোকসংস্কৃতি। রেমণ্ড উইলিয়াম (১৯২১-১৯৮৮) তাঁর *Keywords* গ্রন্থটিতে ‘কালচার’ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, সোসাল, আইডিয়াল এবং ডকুমেন্টারি- এই তিন ধরনের কালচারের কথা বলেছেন।[২] গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩) ‘সংস্কৃতি’র অর্থ করেছেন ‘সমুদয় কৃতি’, আর ফোকলোরের প্রতিশব্দরূপে জানিয়েছেন ‘সম্যক্ কৃতিই সংস্কৃতি’। সংস্কৃতি শব্দটিকে আমরা শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, নৃত্য, অভিনয়, নাটক প্রভৃতির ক্ষেত্রেই ব্যবহার করি। একই সঙ্গে লোকশিল্প, লোকনাট্য, পটচিত্র, আলপনা, মৃৎশিল্প ইত্যাদিকেও বোঝায়। একদিকে শিষ্টসংস্কৃতির মধ্যেকার নান্দনিক দিক যেমন মানুষের মনোগত আনন্দের সন্ধান দেয়, ঠিক তেমনটাই করে পল্লীসংস্কৃতি ও গ্রামীণ লোকশিল্পগুলি।

আধুনিককালে সংস্কৃতির ধারণাটি ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। পরিগ্রহণ, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতি এগিয়ে চলছে। একদিকে শিক্ষাদীক্ষা বর্জিত পল্লীবাসী দরিদ্র মানুষের আচার-বিচার, রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, সঙ্গীত, শিল্পকলা, নৃত্য, নাটক ইত্যাদির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে শিক্ষিত, নাগরিক, মধ্যবিত্ত অথবা বুদ্ধিজীবী মানব সমাজের চিন্তন। গ্রাম আর নগরের সংযোগ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হয়ে যাওয়ায় সাংস্কৃতিক আদান প্রদান হচ্ছে সহজেই। তাই অনেক ক্ষেত্রেই লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতিকে তার যথাযথ প্রকৃত চেহারায় অথবা অবিকৃত রূপে দেখা যায় না। তবে লোকশিল্পকে একেবারেই চেনা যাবে না, এমন দিন এখনও আসেনি। লোকসংস্কৃতির পরিবর্তন শিষ্ট সংস্কৃতির তুলনায় অপেক্ষাকৃত ধীর। গতানুগতিকতা, একঘেয়েমি, সমষ্টিগতচেতনা, স্বতঃস্ফূর্ততা, গ্রামীণ জীবনের প্রথাগত রক্ষণশীলতা লোকশিল্পগুলির বৈশিষ্ট্য। সুধীরকুমার করণ মনে করেন গ্রাম জীবনের উৎপাদন ব্যবস্থা ও ভৌগোলিক পরিবেশের উপর ভিত্তি

করেই লোকসংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা। তিনি এ প্রসঙ্গে জানান, আমরা যদি ভিত্তি হিসাবে লোকযানকে গ্রহণ করি, আর সেই ভিত্তির ওপরে নির্মিত কক্ষের নিচের অংশের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির তুলনা করি, তবে এই কক্ষের একেবারে উপরের তল বা উপরিসৌধের সঙ্গে শিষ্ট সংস্কৃতির তুলনা করা যায়।

আলকাপ, ঝুমুর, মারফতি গান, পটশিল্প, মৃৎশিল্প– এইসকল লোকশিল্প ব্যক্তি ও সমষ্টির নান্দনিক পরিতৃপ্তির কারণে সৃষ্টি। এছাড়াও এর আরেকটি যে প্রয়োজন রয়েছে তা হল- সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করা। তবে এর উদ্ভব যে কারণেই হোক না কেন তা রসিকজনের রস উপলব্ধির কারণ হয়। এই লোকশিল্পগুলির ক্ষেত্রেও শিল্পী তাঁর ব্যক্তিগত আনন্দ থেকে তার সৃষ্টিকে সম্ভব করে তাকে সার্বিক আনন্দের বিষয় করেন। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে আদি ও অকৃত্রিম লোকশিল্পগুলির বিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে যেমন তার নিজের তালিকা থেকে অনেক কিছু বাদ দিয়েছে, তেমনি গ্রহণও করেছে অনেক কিছু। নাগরিক সভ্যতার হাত থেকে নিজেকে আড়াল করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে মেটাচ্ছে। কখনো বা নাগরিক সভ্যতা তাদেরকে নবদিগন্তের সন্ধান দিচ্ছে। আবার কখনও নাগরিক সভ্যতার একদল লোভী স্বার্থপর মানুষের কবলে পড়ে বিপর্যস্ত হচ্ছে লোকশিল্পগুলি।

১.৪ লোকসংস্কৃতির উপর নাগরিক শিল্প সংস্কৃতির প্রভাব:

আমাদের আলোচনায় আসবে নাগরিক মনের দ্বারা লোকসংস্কৃতি ও শিল্পের বিপর্যস্ত হওয়া আবার নাগরিক শিল্পের দ্বারা লোকশিল্পের সংবেদনশীলতার দিকটিও। লোকশিল্পকে নিয়ে যখন নাগরিক শিক্ষিত শিল্পীরা আরেক শিল্পচর্চা শুরু করেন তখন তা সত্যিই আরেক মাত্রা পায়। আমরা জানি, সাহিত্য তৈরির ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপাদান হিসাবে আসে বাস্তব জগৎ।

যিনি স্রষ্টা, তিনি তাঁর বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ের সংযোগে বাস্তব জগতের বিষয়কে প্রত্যক্ষ করেন। স্রষ্টার পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন তার পছন্দ মতো বিষয় চয়ন করে। বাস্তব জগতের উপাদান স্রষ্টার মনের কল্পনার রঙে জারিত হয়ে নতুনভাবে ধরা দেয়। স্রষ্টার প্রকাশ করার সুনিপুণ কারিগরিতে তা হয়ে ওঠে সাহিত্য। স্রষ্টার মুনশিয়ানায় তা তখন হয়ে যায় অনবদ্য এক শিল্প। এদিক থেকে সাহিত্যিকদের তুলনা চলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সঙ্গে। তিনি এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা। এই নির্মাণের দিক থেকে সাহিত্যিকরা তাই দ্বিতীয় প্রজাপতি। এই দ্বিতীয় প্রজাপতি বা স্রষ্টা যখন লোকসংস্কৃতি বা লোকশিল্পকে সাহিত্যের উপাদান হিসাবে চয়ন করেন তখন এক শিল্পের আশ্রয়ে তিনি নির্মাণ করেন আরেক শিল্প। লোকশিল্পকে নিয়ে যখন উপন্যাস সমৃদ্ধ হয় তখন তা অনবদ্য রূপ পায়। লোকশিল্পকে কেন্দ্র করে এই অভিজাত উপন্যাস শিল্পে আসে সেই লোকশিল্পীর শিল্পীগোষ্ঠীর কথা, তাদের জীবন, সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক অবস্থা, তাদের আচার, বিশ্বাস, সংস্কার, প্রথা, ধর্ম, রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয়গুলিও। বাস্তব জীবন কখনো হুবহ বর্ণিত হয়, কখনো তার সঙ্গে যুক্ত হয় লেখকের কল্পনা, দৃষ্টিভঙ্গী। সেখানে কল্পনা যাই থাক না কেন লেখকের কলমে প্রায় অবিকৃতভাবে ধরা পড়ে লোকশিল্প ও লোকশিল্পীদের শিল্পময় জীবন।

১.৫ লোকশিল্পীদের জীবন ও নিম্নবর্গ চর্চা:

এ জীবন সাধারণের, বলা যায় একেবারে লোকের। আপাত অর্থে যারা অন্ত্যজ। যার অবস্থান খুব সম্মানজনক এমন নয়। এই প্রসঙ্গে এই ‘লোক’-এর অবস্থানটি সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া দরকার। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে এই ‘লোক’ এর অবস্থান সমাজ বিবর্তনের উল্লম্ব প্রক্রিয়ার একেবারে নিচের স্তরে। তথাকথিত এলিট শ্রেণি বা অভিজাত শ্রেণির বিপরীতে এদের অবস্থান। বিত্ত, প্রতিপত্তি, পেশা, বুদ্ধি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির নিরিখে এদের এই

বিভাজন। শিক্ষিত, অভিজাত, পরিশীলিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদেরই নির্মিত এই বিভাজন। সাধারণভাবে আমাদের মনে হয় প্রান্তে যাদের অবস্থান তারাই হয়তো প্রান্তিক। ইতালির কমিউনিস্ট নেতা আন্তোনিও গ্রামসির (১৮৯১-১৯৩৭) *Prisons Note Book* (১৯৪৮) গ্রন্থে আমরা 'সাবলটার্ন' শব্দটিকে পাই 'প্রলেটারিয়াট'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে।[৩] এর বাংলা করা যায় প্রান্তিক বা নিম্নবর্গ। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় এরা শ্রমিক শ্রেণি। মূলত তারা সমাজের এক বিশেষ ধরনের বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে অবস্থান করে। এই ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান করে তারা শোষিত ও শাসিত হয়। গ্রামসির মতে, 'হেগেমনিক শ্রেণি' 'সাবলটার্ন শ্রেণি'র উপর আধিপত্য বিস্তার করে। সুকৌশলে তারা সাবলটার্ন শ্রেণির সাংস্কৃতিক ও ভাবগত জগতে কর্তৃত্ব করে। গ্রামসি শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ক্ষমতাবিন্যাসের ক্ষেত্রে দুটি শ্রেণির কথা বলেছেন। এক আধিপত্য বিস্তারকারি শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ যারা 'ডমিন্যান্ট শ্রেণি'। আর দুই 'সাবলটার্ন শ্রেণি'। এই দুই শ্রেণির অবস্থান বিপরীত মেরুতে। গ্রামসি তাঁর নিম্নবর্গের ধারণাটি শুধুমাত্র পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং গ্রামসির ধারণাটি ব্যাপক পরিসর তৈরি করে। উত্তর ঔপনিবেশিককালে সাবলটার্ন চর্চার বিষয়টি দেশ, কাল এর সীমাকে অতিক্রম করেছে। গ্রামসির ধারণা অনুযায়ী বলা যায়, শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় ক্ষমতা বিন্যাসের আধিপত্য স্থাপনকারীর বিপরীতে অবস্থান করে সাবলটার্ন শ্রেণি। উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদে ডমিন্যান্ট শ্রেণির সাবলর্টান শ্রেণির উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত হয় সুকৌশলে। চিরকালই সমাজের তথাকথিত নিচুতে থাকা ব্যক্তিরা বা গোষ্ঠীরা অত্যাচারিত, অবহেলিত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। তবে তাদের নিয়ে চর্চার বিষয়টি খুব বেশিদিন আগেকার ঘটনা নয়। নিম্নবর্গ সম্পর্কিত চর্চার বিষয়টি উত্তর ঔপনিবেশিক কালের বিষয়। ১৯৮২ সালে সাবলটার্ন স্টাডিস নিয়ে প্রথম বই প্রকাশিত হয়। এই সম্পর্কিত সম্মিলনের সূত্রপাত হয়েছিল তারও একবছর আগে। 'Subaltern' শব্দটির

দ্বারা সামরিক সংগঠনের অধস্তন অফিসারকে বোঝানো হত। আপাতভাবে সাবলটার্ন বলতে বোঝাত সামরিক দিক থেকে যারা নিম্নস্থিত তাদেরকে। পরবর্তীকালে শব্দটি সম্প্রসারিত হয়। সামাজিক দিক থেকে যারা অধস্তন তাদেরও বোঝাতে শুরু করে। আর সামাজিক দিক থেকে এই অধস্তনদের নিয়েই 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' চর্চা শুরু হয় ১৯৮২ সালের পর থেকে ভারতবর্ষে। সাবলটার্ন স্টাডিস নিয়ে গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *নিম্নবর্গের ইতিহাস* (১৯৯৮) প্রকাশিত হয়। রণজিৎ গুহ (জন্ম ১৯২২), শাহিদ আমিন (১৯২২-১৯৯২), পার্থ চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৪৭), ডেভিড আর্নল্ড (জন্ম ১৯৬২), নিম্নবর্গ নিয়ে যে ধরনের আন্দোলন সৃষ্টি করলেন, ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ল ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে দক্ষিণ এশিয়া এমনকি লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে। যদিও ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের পথ ধরেই নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার প্রথম কর্মসূচির সূচনা। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল উচ্চবর্গের জাতীয়তাবাদ ও নিম্নবর্গের জাতীয়তাবাদের মধ্যে অনেক ফারাক। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে ঔপনিবেশিক এলিট ও উচ্চবর্গ জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের হেগেমনি (Hegemony) বা আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। ডমিন্যাণ্ট শ্রেণি এ ব্যাপারে নিজেরাই উদ্যোগ নেয়। তাই নিম্নবর্গের নিজেদের রচিত ইতিহাসের মধ্যে উচ্চবর্গের আধিপত্য দেখা যায়। ফলত সে ইতিহাস কখনো গোটা সমাজের হয়ে কথা বলতে পারে না। অনিবার্যভাবেই তা হয়ে যায় আংশিক, অসম্পূর্ণ ও অসংলগ্ন।

কিছুদিন পরে ইউরোপে সত্তর-আশির দশকে এক ধরনের র‍্যাডিক্যাল ইতিহাস রচনার তাগিদে ইংলিশ মার্কসিট, ঐতিহাসিক ও একাডেমিক ক্রিস্টেফার হিল (১৯১২-২০০৩), এডোয়ার্ড টমসন (১৯২৪-১৯৯৩), এরিক হব্‌সবম (১৯১৭-২০১২) প্রমুখ ঐতিহাসিক পুঁজিবাদী আর যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির চাপে স্পৃষ্ট অবহেলিত, নিপীড়িত জনজাতির কথা লিখেছিলেন। এই ধরনের ইতিহাস চর্চা আদতে 'হিসট্রি ফ্রম বিলো'[৪] তল

থেকে দেখা ইতিহাস। ঐতিহাসিকেরা এক্ষেত্রে অনেক বাদ পড়ে যাওয়া ঘটনা, মতাদর্শ, স্মৃতি খুঁজে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ট্রাজেডির সুরে বাঁধা হত এই ‘তল থেকে দেখা’ ইতিহাসের কাহিনি। সেখানে দেখানো হত মানুষের অবহেলা, বঞ্চনা আর নিপীড়নের মর্মান্তিক গল্প। গল্পের শেষে নিম্নবর্গ পরাজিত হবে- এমনটাই দেখানো হত। কাহিনিগুলিতে নিম্নবর্গকে দেখানো হয়েছে নানান চেহারায়। কখনো এসেছে নিজের ভিতরকার বিজাতীয় অবস্থায়। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের (জন্ম ১৯৪২) মতে, ঐতিহাসিকের লেখায় নিম্নবর্গ তাদের নিজেদের কথা বলবে এ তো আদতে গল্পকথাই। নিম্নবর্গের নিজের কণ্ঠস্বরকে বের করে আনা আদতে পণ্ডশ্রম। ইতিহাসের দলিলে আমরা যে নিম্নবর্গের পরিচয় পাই তা আসলে অন্যের নির্মাণ, নিম্নবর্গের নিজস্ব কথা নয়।[৫]

সাবলর্টান স্টাডিস চর্চার প্রায় গোড়া থেকেই দেখা গেল ‘উচ্চবর্গের অপর’ হিসাবে এই নিম্নবর্গের নির্মাণ। উচ্চবর্গের খোলসটা খসে যাবে আর নিম্নবর্গের প্রকৃত স্বরূপ চোখের সামনে ভেসে উঠবে। এই নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনায় রোমান্টিকতার মোহজাল ছিন্ন হবে। ঐতিহাসিকের ভূমিকা হবে নিরপেক্ষ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু গবেষকদের মধ্যে এই উদ্যোগ দেখা যায়। এইভাবেই গবেষক ও তাত্ত্বিকেরা সাবলর্টান স্টাডিজের নতুন ডিসকোর্স নির্মাণ করলেন। এরপর থেকে সমগ্র সমাজ-প্রতিষ্ঠান-ভাবাদর্শের জগৎকে দেখানো হল নিম্নবর্গের ইতিহাসে। আলাদাভাবে শুধুমাত্র নিম্নবর্গের ক্রিয়াকলাপের বিবরণের মধ্যে আর তাদের কাহিনি সীমাবদ্ধ থাকলো না। ধনতন্ত্রের শেষস্তর সাম্রাজ্যবাদ– লেলিনের সেই উক্তিটিকে স্মরণে রেখে ঘানার রাষ্ট্রপতি কোয়ামি নক্রমা (১৯০৯-১৯৭২) *নিও কলোনিয়ালিজম: দ্য লাস্ট স্টেজ অফ ইম্পিরিয়ালিজম* (১৯৬৫) নামে একটি বই লেখেন।[৬] উত্তর ঔপনিবেশিক দেশগুলির ক্ষেত্রে তাঁর এই বইটির বক্তব্য কোথাও বা বেশিভাবে, কোথাও কম প্রযোজ্য। আপাতভাবে যে দেশগুলিকে আমাদের স্বাধীন বলে মনে হচ্ছে, তারা

আসলে বেশি ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রের অধীন। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর রাজনৈতিক দিক থেকে মুক্ত দেশগুলি অর্থনৈতিক দিক থেকে আজও পরাধীন হয়ে আছে উন্নত দেশগুলির কাছে। এই পরাধীনতা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পরাধীনতা নয়, সামাজিক সাংস্কৃতিক দিক থেকেও উন্নত দেশগুলি ঔপনিবেশিক দেশগুলির উপর থাবা বসায়। অবশ্য সরাসরি নয়- সুকৌশলে। ঔপনিবেশিক শক্তি শোষিত মানুষের উপর সরাসরি বলপ্রয়োগ করে তাদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে। আর উত্তর ঔপনিবেশিককালে শাসক গোষ্ঠী ডোমিনেণ্ট শ্রেণির উপর সরাসরি বল প্রয়োগ করে না। উপনিবেশ পরবর্তীকালে আপাত মুক্ত মানুষজন উপনিবেশ শক্তির প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারে না। ঔপনিবেশিক শক্তি শোষিত মানুষের নিজস্ব ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি এককথায় নিজস্বতাকে নস্যাৎ করে দিয়ে দেশীয় ধারাকে ঘৃণা করতে শেখায়। উপরন্তু শোষিত শ্রেণির সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, মানুষের চেতনা, রুচি, মূল্যবোধ প্রায় সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে মানষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্ষমতাশীল ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী উত্তর ঔপনিবেশিক কালে তাদের সুকৌশলী বহুমাত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে। উত্তর উপনিবেশিক কালে উচ্চবর্গ, ক্ষমতাশালী, আধিপত্য বিস্তারকারী শ্রেণি ও প্রান্তিক শ্রেণির ধারণাগুলি প্রযুক্ত হয়। প্রান্তে যারা অবস্থান করে তারাই প্রান্তিক। আর এই প্রান্তিক সম্পর্কে আপাতভাবে এই ধারণাটি প্রচলিত। জ্যামিতিতে কেন্দ্র পরিধির ধারণাটিও আমাদের জানা। উত্তর-উপনিবেশ পর্বে আধিপত্য বিস্তারকারী কেন্দ্রশক্তি এক জটিল 'রাইজোমেটিক পদ্ধতি'তে[৭] পরিধিতে থাকা ডোমিন্যাণ্ট শ্রেণিকে শোষণ করে। শিম্বীজ জাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রধান শিকড়ের পাশাপাশি যেমন অসংখ্য রাইজোম থাকে এবং সেগুলি থেকে উদ্ভিদ রস শোষণ করে, তেমনি আধিপত্য বিস্তারকারী শক্তির বহু ক্ষমতাকেন্দ্র থাকায় মূল ক্ষমতাকেন্দ্রটিকে আড়াল করে বহু ক্ষমতাকেন্দ্রগুলিকে সক্রিয় রাখা হয়। ঠিক সেইরকমভাবে শাসকগোষ্ঠীর শোষণ পদ্ধতির মূল চরিত্রটিকে আড়াল করে অস্পষ্ট রাখা হয়। ঠিক সক্রিয় অত্যাচারের মাধ্যমে নয়

শোষিত শ্রেণির উপরিসৌধ অর্থাৎ শিক্ষা, সংস্কৃতি, মানুষের চেতনা, মনন ইত্যাদির উপর প্রভুত্বশক্তি কৌশলে ক্ষমতা বিস্তার করে। এইভাবে উপনিবেশ-উত্তর কালে দেখা হয় প্রান্তিক ও উচ্চবর্গকে। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ সব দিক থেকে সমৃদ্ধ একটি দেশ। ভারতের নিজস্ব সম্পদ, ভাষা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, মেধা, সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ঘুরে ঘুরে দেখে ও বিষয়গুলি অনুধাবন করে লর্ড মেকলে বুঝেছিলেন যদি ভারতবর্ষের মেরুদণ্ডকে ভিতর দিক থেকে ভেঙে না দেওয়া হলে ভারতবাসীকে তথা ভারতবর্ষকে প্রকৃত অর্থে জয় করা যাবে না। তাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল পুরোনো শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতিকে সরিয়ে দিয়ে ইংরেজি ও বিদেশী ভাষা চালু করা। আর এই বিদেশী ভাষা ও সংস্কৃতি যে দেশীয় ধারা থেকে ঢের বেশি ভালো তা ভারতবাসীকে বোঝানো। নিজেদেরকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করলে ভারতবাসীর আত্মসম্মান নষ্ট করে দিলে তারা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। ফলত তারা হয়ে উঠবে আত্মশক্তিহীন, দুর্বল, পরাধীন জাতি। তাই স্বাধীনতা পরবর্তী কালে রাজনৈতিক দিক থেকে আমরা স্বাধীন হয়েছি বটে, কিন্তু 'মেকলের মিনিট'-এর[৮] (১৮৩৫) সুদূরপ্রসারী উপনিবেশবাদের কুফলগুলি আমাদের চিন্তায়, মননে, বুদ্ধিবৃত্তিতে, সংস্কৃতিতে রয়ে গেছে বহাল তবিয়তে। তাই আমাদের মননে, বিশ্বাসে, বুদ্ধিবৃত্তিতে ও চিন্তায় রয়ে গেছে ঔপনিবেশিকতা। আর ঔপনিবেশিক চিন্তায় আজও আমরা নিজেরা নিজেদের কাছে পরাধীন। এই চিন্তায় কেউ আমরা এলিট কেউবা লোক অর্থাৎ প্রান্তিক। আমার আলোচ্য উপন্যাসগুলি লোকশিল্পের যে শ্রেণিকে নিয়েছে তা এই প্রান্তিকের বা লোক এরই প্রতিনিধি।

এ প্রসঙ্গে সমাজ, সভ্যতা, ইতিহাস, রাজনীতির পটভূমিকায় প্রান্তিকদের শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার বিষয়টি অনুধাবন করা প্রয়োজন। শিল্প ও সংস্কৃতি মানুষের আত্মার উন্নতিসাধন করে। সংস্কৃতির ধারণাটি নৃতত্ত্বের কেন্দ্রীয় ধারণা যা জ্ঞান, প্রযুক্তি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, প্রথা এবং সাধারণ মানুষের প্রতি ব্যবহারকে বোঝায়। শিল্প ও সংস্কৃতির উপাদান

আদতে সংগৃহীত হয় বাস্তব জীবন থেকে। সামগ্রিকভাবে তাই মানুষের হয়ে ওঠার ইতিহাস হয়ে যায় তার সংস্কৃতি। তাই ব্যাপক অর্থে একদিকে যেমন তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় নাচ, গান, ছবি আঁকা, অভিনয় ইত্যাদি, ঠিক তেমনি সামাজিক মানুষের বিশ্বাস, সংস্কার, শিক্ষা, রুচি, ধর্ম, আচার-বিচার এককথায় সবকিছু। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে সমাজের সকলকে সামগ্রিক বৃহত্তর পরিসর থেকে দেখা হয়। সমাজ, সভ্যতা বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি নানাভাবে ধরা দেয়। একদিকে সমাজের কেন্দ্রে রয়েছে উন্নত ক্ষমতাশীল অগ্রবর্তী সামাজিক সংস্কৃতি আর অপর প্রান্তে রয়েছে প্রান্তিক জনসমাজের প্রান্তিক সংস্কৃতি। সমাজ বিবর্তনের ক্রমপর্যায় অনুযায়ী স্তরভেদ অনুযায়ী সংস্কৃতির এই বিবর্তনকে দেখা যায়। একদিকে অগ্রবর্তী সমাজের সংস্কৃতি আর তার ঠিক বিপরীতে রয়েছে আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতিকে তিনটি ধারায় বিভক্ত করেছেন। যথা- ক) আদিম সংস্কৃতি খ) উচ্চ বা শিষ্ট সংস্কৃতি এবং গ) লৌকিক বা লোকসংস্কৃতি। সাধারণত উচ্চসংস্কৃতির বিপরীতে লোকসংস্কৃতির স্থান। সাধারণত এই দুই সংস্কৃতির স্বরূপগত বিশ্লেষণের জন্য তুলনামূলক আলোচনা করা হয় । সাধারণত কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে লোকসংস্কৃতির উদ্ভব। আর মূলত উচ্চ সংস্কৃতির পরিবেশ তৈরি হয় শিল্পভিত্তিক সমাজ থেকে। লোকসংস্কৃতির শিল্পীদের জীবন মূলত পল্লীনির্ভর। আর উচ্চসংস্কৃতির শিল্পীদের জীবন মূলত নগরকেন্দ্রিক। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের এই সৃষ্টি মূলত সমষ্টির মৌখিক ধারায় অলিখিত প্রকাশ। আর উচ্চসংস্কৃতি মূলত ব্যক্তিনির্ভর। ব্যক্তিমানসের ব্যক্তিপ্রতিভা লিখিত বা মুদ্রিত রূপে প্রকাশ পায়। লোকশিল্পীরা তথাকথিত নিরক্ষর, লোকশিল্প তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি। উচ্চসংস্কৃতি তথাকথিত সাক্ষর জনের প্রচেষ্টার প্রয়াস। লোকসংস্কৃতি মূলত ঐতিহ্যনির্ভর, নমনীয় ও পরিবর্তনশীল। আর উচ্চসংস্কৃতি

বস্তুতপক্ষে সমকালনির্ভর, অনমনীয় ও অপরিবর্তনীয়। লোকসংস্কৃতি পরিবর্তনকে গ্রহণ করে নতুন নতুন রূপ লাভ করে। আর উচ্চসংস্কৃতির আবেদন চিরকালীন। লোকসংস্কৃতির প্রকাশ সমষ্টিমুখী আর তা সামাজিকের রসতৃষ্ণাকে মেটায়। আর ব্যক্তির আত্মগত প্রকাশ ব্যক্তিক রসতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করে। লোকসংস্কৃতি ও উচ্চসংস্কৃতির মধ্যে এই আপাত পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ধারা চোরাস্রোতে প্রবাহিত। একে অন্যকে সমৃদ্ধ করে। আদিম, লোক ও উচ্চসংস্কৃতির মধ্যে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা এই সম্পর্কের প্রবাহ ট্রাইবাল-ফোক এবং ফোক-এলিট কনটিনুয়াম নামে পরিচিত। এদের মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব, সমন্বয়, সংস্কার, পরিমার্জন, পরিবর্ধন সঙ্গতিসাধনের প্রক্রিয়াগুলি চলতে থাকে। আর এভাবেই জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিময় ও বৈচিত্র্যময় বিকাশ ঘটতে থাকে। জাতীয় সংস্কৃতির এই বিকাশের পর্যায়ে যেমন উপন্যাস শিল্প বিকশিত হয় তেমনি লোকশিল্পও তাকে আশ্রয় করে নিজেদের প্রচার পায়। এই প্রচারে তারা কতটা পণ্য হয় এছাড়া লিখিত রূপের মাধ্যমে থেমে গিয়ে স্থায়িত্ব পায় নাকি স্বধর্ম বজায় রাখে সে বিচার আমার জরুরি। এর কারণে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট লোকশিল্প নির্ভর উপন্যাসগুলির পুনর্মূল্যায়ন।

১.৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় লোকশিল্প নির্ভর উপন্যাসের পূর্বসূত্র:

এই লোকশিল্পনির্ভর উপন্যাসগুলির আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে এর পূর্বসূত্র হিসাবে বাংলা উপন্যাসের উদ্ভবকাল, প্রেক্ষাপট, গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। সেই ধারায় লোকশিল্পনির্ভর উপন্যাসগুলি কোনো সময়ে এল, কেমনভাবে এল, তার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে জানা দরকার। লোকশিল্প নির্ভর উপন্যাসের প্রকৃত স্বরূপ আলোচনা করতে হলে প্রথমেই জানা প্রয়োজন উপন্যাস সম্পর্কে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায়, উপন্যাস নামক সাহিত্য প্রকরণটি আদতে আধুনিক কালের ফসল। বাংলা সাহিত্যের

আসরে এ একেবারেই নবীন অতিথি। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের দিকে তাকালে দেখা যাবে সে যুগের সাহিত্য মূলত পদ্যনির্ভর সাহিত্য। মোটামুটিভাবে ভারতচন্দ্র পরবর্তী সময় বা ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ ধরা হয়। এই আধুনিক যুগেই গদ্যসাহিত্যের সূচনা। উপন্যাস মূলত গদ্যনির্ভর সাহিত্য। গদ্যনির্ভর উপন্যাস এমন এক ধরনের সাহিত্য প্রকরণ যা নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও কবিতার থেকে অন্যরকম সংরূপের ছাঁচে ঢালা। মানব জীবনের পথ চলার সঙ্গে এর গভীর মিল আছে। জীবন যেমন শুধু কবিতা নয়, নাটক নয়, কাহিনি নয়, জীবনের মতো উপন্যাসের পরিধির ব্যাপ্তিও তাই অনেকখানি বিশাল। শিল্পী অর্থাৎ ঔপন্যাসিক আর পাঠক এই পরিব্যাপ্ত পরিসরে উপস্থিত। সাহিত্যের যতগুলি ধারা আছে যেমন, কাব্য, নাটক, কাহিনি সবকিছুর উত্তরাধিকারকে বহন করছে উপন্যাস। উপন্যাস তাই সাহিত্যের একটি বেশ শক্তিশালী ধারা।

উপন্যাস বলতে বোঝায় বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জীবন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক আখ্যান। উপন্যাস কিন্তু বানানো গল্প নয়। এর মধ্যে রয়েছে আধুনিক জীবন দর্শন যার সঙ্গে মিশে আছে বাস্তবতাবোধ ও জীবননিষ্ঠা। ঔপন্যাসিক তাঁর জীবন বাস্তব থেকে বিচিত্র ঘটনা ও অনুভূতি চয়ন করেন, একই সঙ্গে বিস্মিত ও উদ্বুদ্ধ হন, পাশাপাশি বিস্ময়ের বোধকে নিজের মৌলিক কল্পনার মাধুরীতে মিশিয়ে প্রকাশ করেন। মানুষের জীবন সম্পর্কে আগ্রহকে সাহিত্যের বিষয় হিসাবে দেখানোর চেষ্টা উপন্যাসের মধ্যেই দেখা যায়। উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের জীবনবোধ সম্পর্কে থাকে এক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি। উপন্যাস জীবনের সমগ্রতার কথা বলে। জীবন সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব ব্যাখ্যা থাকে। ব্যাপ্ত পরিসরে জীবন জগৎকে ও ব্যাপক অর্থে জীবনসত্যকে দেখায় উপন্যাস।

শুরুর কাল থেকেই গল্প শোনার চাহিদা মানুষের অসীম। গল্পের কাহিনির টানে মানুষের এই আগ্রহ। ই.এম.ফরস্‌টার–এর (১৮৭৯-১৯৭০) বক্তব্যটি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যার মূল বিষয় 'তারপর কি হল?' মনের এই স্বভাবগত কৌতূহল ও বিস্ময়ের বোধ থেকেই কথাসাহিত্যের সূচনা। কথাসাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্যটি সর্বকালের, সর্বদেশের। সূচনাপর্ব থেকেই উপন্যাস সংরূপটি পরিণতি পায়নি। মহীরূহ প্রথমেই মহীরূহ হয় না। বীজ থেকেই চারাগাছের জন্ম। তারপর নানা নিরীক্ষা কাটিয়ে তাকে বেড়ে বনস্পতি হতে হয়। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের উন্মেষ পর্বেও এসেছিল নানান পালাবদল। আধুনিক যুগের ফসল বাংলা উপন্যাসে মধ্যযুগের দেবনির্ভরতার বদলে এল মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ইহলৌকিক বা জাগতিক বিষয়ের প্রতি আগ্রহ।

পাশ্চাত্যে নভেলের উদ্ভবের সময়েও অনেকটা এক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল। ষোড়শ সপ্তদশ শতকে ইউরোপে এক নতুন অর্থনৈতিক শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল। সেখানে সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামো ভেঙে তৈরি হচ্ছে নতুন বুর্জোয়া সভ্যতা, সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অন্য মাত্রা নিচ্ছে, নতুন এই সমাজের প্রভাব পড়ছে সাহিত্যেও। মানবতাবাদের ছোঁয়া লাগছে লেখায়, বুদ্ধি ও হৃদয়ের মধ্যে তৈরি হচ্ছে আত্মিক বন্ধন। র‍্যাবলে (আনু. ১৪৯৪-১৫৫৩), স্যারভ্যানটিস (১৫৮৭-১৬১৬) সেযুগের অন্যতম লেখক। স্যারভানটিসের *ডন কুইকজোট* (১ম খণ্ড-১৬০৫, দ্বিতীয় খণ্ড- ১৬৫২) নামক একটি গ্রন্থের মধ্য দেখা যাচ্ছে সমাজের সকল স্তরের মানুষের খণ্ড খণ্ড জীবনের কথা। সেখানে রয়েছেন সমাজের নিচু তলার দাগী আসামী, ক্ষৌরকার, চাষি থেকে শুরু করে সমাজের উঁচুতলার নোবল, কবি, নাইট, পুরোহিত বণিক শ্রেণির মানুষ। স্যারভানটিসের লেখায় এক নতুন মাধ্যমে নতুন সমাজের মানুষকে তিনি দেখাচ্ছেন। নিয়ে এলেন এক নতুন ধরনের সংরূপ উপন্যাসকে। এইভাবে ইউরোপে ফিউডাল সমাজ বদলে গিয়ে এল বুর্জোয়া সমাজ। এই

সমাজ পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাসের উদ্ভব। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার এই কাজের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করে। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারে খুব কম সময়ে অনেক বেশি লেখাপত্র ছাপা হওয়ায় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটল। অল্প সময়ে অনেক বেশি পরিমাণ লেখা অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে গেল। মুদ্রাযন্ত্রের এই অভাবনীয় প্রগতি ও উন্নতির ফলে এই যে নতুন নতুন পত্র পত্রিকা, পুস্তিকা, গ্রন্থ, সংবাদপত্র মুদ্রিত হতে থাকল। গুটিকয়েক পাঠক সীমার পরিবর্তে তৈরি হল নাগরিক শিক্ষিত অগণিত পাঠক সমাজ। আগে সাধারণ মানুষের পক্ষে পত্রপত্রিকার লেখা পাঠ ছিল খুবই দুর্লভ বিষয় এবং একই সঙ্গে ব্যয়বহুল। মুদ্রাযন্ত্র সেই বাধাকে অতিক্রম করল ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষ নানা ধরনের বিচিত্র খবরের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করল। আগে যেখানে শুধুমাত্র উচ্চবিত্তরাই সাহিত্য পাঠের সুযোগ পেত, এখন আর তা নেই। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সকলেই সুযোগ পেল সাহিত্যপাঠের। এভাবে কালের প্রয়োজনে ও অনুকূল পরিবেশে সহায়তায় উপন্যাসের মতো সংরূপ জন্ম হল। এসময় যেন অন্যান্য সংরূপের বদলে উপন্যাসেরই প্রয়োজন হল। আগেকার সাহিত্য প্রকরণগুলি আর উপন্যাসের লক্ষণগুলির দাবী মেটাতে পারল না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যে উপন্যাসের উদ্ভবের অনেক পরে বাংলা সাহিত্যও উপন্যাসের ধারাটিকে নিজের করে নিল। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব হল ইউরোপীয় নবজাগরণের ও শিল্পবিপ্লবের প্রভাবকে সাঙ্গীকৃত করে। তবে ইউরোপে আর বাংলায় নবজাগরণের আর মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের সময় ও স্থান আলাদা। বাংলায় নবজাগরণের সময়কাল অনেক পরে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা শিক্ষা, সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে নবজাগরণের জোয়ার এসেছিল। বাংলা সাহিত্যে গদ্যের সূচনাও হয়েছিল মূলত এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এই গদ্যচর্চা উপন্যাসকে কিছুটা সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই। সুতরাং ইউরোপীয় প্রভাব বাংলা উপন্যাসের পথপ্রদর্শক ও মুদ্রাযন্ত্র তার অনুঘটক ঠিকই তবে একমাত্র কারণ বলা যাবে না।

প্রত্যেকে শুরুরও শুরু থাকে। প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকাতে হয়। বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি নিজেও প্রস্তুতি নিচ্ছিল তার পূর্বজ সাহিত্য সম্ভারগুলির মাধ্যমে। প্রাক্ উপন্যাসপর্বে উপন্যাসের ইঙ্গিত মিলছিল ধীরে ধীরেই। এই প্রসঙ্গে বাংলা গদ্যের সূচনাপর্বের ধারায় আমরা সংস্কৃত কথা আখ্যায়িকার ধারাটিকেও অস্বীকার করতে পারি না। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম আখ্যানকার বাণভট্ট (আনু. ৬০৬-৬৪৭) তাঁর *কাদম্বরী-* কে বলেছেন কথা আর তাঁর *হর্ষচরিত*-কে বলেছেন আখ্যায়িকা। এছাড়াও পৈশাচী প্রাকৃতে লিখিত গুণাঢ্যের *বৃহৎকথা,* সোমদেবের *কথাসরিৎসাগর,* ক্ষেমেন্দ্রের *বৃহৎকথামঞ্জরী* এইধরনের রূপকথা আত্মকথার মধ্যে ছিল আখ্যানধর্মিতার বৈশিষ্ট্য। নীতিকথামূলক গল্প হিসাবে পাওয়া যায় বিষ্ণুশর্মা রচিত উপদেশমূলক গল্পমালা *পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বেতালপঞ্চবিংশতি* ইত্যাদি। মানবজীবনের দ্বন্দ্ব, বাস্তব-সংঘাত, ঘাত-প্রতিঘাতের বিষয়গুলি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে না থাকলেও মধ্যযুগের কাহিনিতে আমরা পেয়েছি। মুকুন্দ চক্রবর্তীর (আনু. ১৫০০-১৫৫১) *চণ্ডীমঙ্গল*-এর (১৫৪৪) মধ্যে পাওয়া যায় উপন্যাসের বেশ কিছু লক্ষণ। চরিত্র নির্মাণে ও কাহিনির বাস্তবতায় তা অনবদ্য। তাঁর ভাঁড়ুদত্ত একটি টাইপ চরিত্র। এই চরিত্রটি উপন্যাসের লক্ষণযুক্ত। পালিভাষায় লেখা জাতক কাহিনির মধ্যেও পাওয়া যায় আখ্যানধর্মিতার বীজ।

বাংলা গদ্যের উদ্ভবের সময়কালে এই সম্ভাবনা আরও পল্লবিত হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল। বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যাবে ফরাসী বিপ্লব তখন ঘটে গেছে। বাংলা দেশেও তার প্রভাব পড়েছে। বাংলা দেশের মানুষ গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবতাবাদ, জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। বাংলাতেও দেখা যায় নবজাগরণের অভিঘাত। সার্বিকভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি সর্বত্রই দেখা গেল নবজাগরণের জোয়ার। বাংলাদেশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, শ্রীরামপুর মিশনকে কেন্দ্র করে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন হয়। মুদ্রাযন্ত্রের এই

ব্যাপক প্রসারতা গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনে। মূলত রাষ্ট্রশাসনের জন্য শুরু করলো জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। নিজেরা প্রশাসনিক দিক থেকে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বাংলা শিখতে চাইল। তাদের নিজেদের কথাবার্তার সুবিধার্থে তারা বাংলা গদ্যকে গ্রহণ করল। কারণ গদ্যই তাদের মুখের ভাষার কাছাকাছি। এর আগে আমরা গদ্য সংরূপটিকে পাইনি। আধুনিক কালে এই পর্বে আমরা গদ্যকে পেলাম। গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩) তাঁর *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*-য় আমাদের জানিয়েছেন, সব সাহিত্যের ক্ষেত্রেই তিনি আগে পদ্য তারপরে গদ্যের আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করছেন। লেখার কথাকে ছন্দ ও মিল দিয়ে বলা হত পদ্যে। তাঁর অনুমান নাকি বাংলা পয়ারের নমনীয়তা, সহজ প্রকাশ ক্ষমতার কারণেই বাংলাগদ্যের বিলম্বে আবির্ভাব। তাঁর অভিমত, সাগরপারের পাশ্চাত্যরা না এলে এবং বাংলা মায়ের মাতৃজঠর থেকে চতুর ধাত্রীর মতো তাকে মুক্তি না দিলে বাংলা গদ্যের জন্ম হত না। আধুনিক যুগের সূচনা ও পাশ্চাত্য জাতির আগমন এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের সময় গদ্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা গেল। আধুনিক যুগের সূচনায় কাল ও বাস্তব সময়, জটিল জীবনযাত্রার দাবীকে পদ্যের মাধ্যমে মেটানো আর সম্ভব হল না, প্রয়োজন হল গদ্যের। অনুবাদধর্মী বিচিত্র বিষয়ে গদ্য লেখা হল। সংস্কৃত পণ্ডিতদের সামনেই ছিল *উপনিষদ*, বিচিত্র ধরনের টীকাভাষ্য জাতীয় গ্রন্থ। বাংলা উপন্যাসের উৎপত্তির পিছনে রয়েছে মূলত ইংরেজি উপন্যাসের প্রভাব। তবে মধ্যযুগের মূলত ধর্মনির্ভর সাহিত্যের পিছনেও আছে মানবজীবননির্ভর আখ্যানের ভূমিকা। তারা সংস্কৃত সাহিত্য *কাদম্বরী*[৯], *দশকুমারচরিত*[১০], *হিতোপদেশ*[১১], *পঞ্চতন্ত্র*[১২] প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আরবী, ফারসী ও আরও অন্যান্য ভাষার সঙ্গে তাদের বেশ পরিচিতি ছিল। সেই যুগে প্রাপ্ত দলিল, দস্তাবেজ, চিঠিপত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়াও নাকি বৈষ্ণবদের গদ্যে ভাঙা নিবন্ধ, পর্তুগীজ পাদ্রীদের খ্রিস্টধর্ম প্রচারের বাণী ও কথাবার্তাতেও আমরা বাংলা গদ্যের

লক্ষণ দেখতে পাই। ইংরেজের আগমন ও গোড়াপত্তনেই মূলত বাঙলা গদ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। অনুবাদধর্মী বাংলা গদ্য গ্রন্থগুলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতে শুরু করল। যদিও কোম্পানির নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করাই ছিল সূচনা পর্বের বাংলা গদ্যের একমাত্র উদ্দেশ্য, ক্রমে সেই উদ্দেশ্যকে পাশ কাটিয়ে বাংলা গদ্য স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম পর্বে, হাঁটতে না শেখা ছোট শিশুর মতো টলোমলো পায়ে চললেও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সে নিজের পায়ে ভর দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হল। গোপাল হালদারের মত অনুযায়ী মোটামুটি ইংরেজি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব। তারপর তার নিজের পথে প্রস্তুতি ও ক্রমবিকাশ ১৮১৫ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল। আত্মপরিচিতি লাভ করল ইংরাজি ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে *বঙ্গদর্শন* - এর কাল থেকে।

সূচনাপর্বের বাংলা গদ্যকে উইলিয়াম কেরী রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩), চণ্ডীচরণ মুন্সী (১৭৬০-১৮০৮), (১৭৬১-১৮৩৪), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬৩-১৮১৯), গোলকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মিত্র (১৭৭২-১৮৩৭), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ রায় প্রমুখেরা আরও বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এর পরবর্তীকালে যে যে বিশিষ্ট জনেরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছে রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) প্রমুখ। এছাড়াও রয়েছেন বিশিষ্ট গদ্যকার অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) প্রমুখ। এর পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যলগ্নে দেখা গেল বাংলায় নভেল রচনার প্রয়াস। একদিকে পাওয়া যাচ্ছে হানা ক্যাথারিন মলেন্সের (১৮২৬-১৮৬৩) *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* (১৮৫২), অন্যদিকে লেখা হচ্ছে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) *নববাবু বিলাস* (১৮২৫), প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৩৩) *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮), অজ্ঞাতনামা লেখকের

নববিবি বিলাস (১৮৩০), কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪১-১৮৭০) *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (১৮৬১) জাতীয় গ্রন্থগুলি। খ্রিস্ট ধর্মান্দোলনের ফলে বাঙালি সমাজের মধ্যে যে আলোড়ন উঠেছিল ছোট ছোট পরিবারকে কেন্দ্র করে তারই বর্ণনা পাওয়া যায় *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ*-এ। এখানে ধর্মের সংকীর্ণতাকে কাটিয়ে উঠে কোনো উদারনৈতিক মনোভাবের পরিচয় দিতে পারেননি লেখক। সুন্দরী, রানি, করুণা ও ফুলমণির কাহিনি ঘটনার ঐক্যের দিক থেকে খুব একটা উন্নত মাপের নয়। বাংলা উপন্যাসের সূচনাপর্বে ১৮৫৮ সালে প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলাল*-এ পাওয়া গেল শহুরে জীবন, বাস্তবতা, ইংরেজ শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তনশীল জীবনপ্রবাহ ইত্যাদি বিষয়। বাবুরামবাবু, গৃহিণী, ঠকচাচা, মতিলাল, বেণী, বেচারাম ইত্যাদি চরিত্রগুলি নিজ নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। ব্যক্তিক চরিত্রের এই প্রবণতাগুলি উপন্যাস শিল্পের আদলকে ধরতে চাইছে। এই সময়ে ইংরেজের আগমন, ধর্মীয়, সামাজিক আন্দোলন, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা, স্বাধীন চিন্তাচেতনার বিকাশ, সভা সমিতি, যুক্তিবাদী মনন ইত্যাদি বিষয়গুলি সমাজকে নানাভাবে আলোড়িত করেছে। ইংরেজের সঙ্গে হাত মেলানো একদল ব্যবসায়ী বা ইংরেজের দেওয়া উচ্চপদের কর্মচারী ক্রমেই লাভের অঙ্ক বাড়াতে থাকে। তারা ক্রমশই ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। হঠাৎ এই বিপুল অর্থের আসক্তিতে তাদের অনেকেরই নৈতিক চরিত্রের অবনতি হতে শুরু করে। বিত্তশালী ধনী ব্যক্তিরা বিলাসব্যসনে কালাতিপাত করে। এই হঠাৎ বাবুদের মধ্যে দেখা যায় অত্যধিক মদ্যাসক্তি, পতিতালয় বৃত্তি, পত্নী থাকা সত্ত্বেও উপপত্নী রাখার প্রবণতা। প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীলদের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ইংরেজি পড়া বুদ্ধিজীবী বাবুদের সঙ্গে মতবিরোধ হয়। সমসাময়িক ব্যঙ্গ রচনাগুলির মধ্যে আমরা এদের কথা পাই। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নববাবুবিলাস*-এ, কালীপ্রসন্ন সিংহের *হুতোম প্যাঁচার নকশা*-য় এই হঠাৎ বাবু বা নব্যবাবুদের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপকেই পাওয়া যায়। বাস্তব পরিবেশ, সমাজ, স্থূল

পরিহাস, ইত্যাদি যে বিষয়গুলি পাওয়া যায় সেগুলি প্রাক্-বঙ্কিম যুগে উপন্যাসে পূর্ব লক্ষণ। তবে যথার্থ উপন্যাস রচনা হতে শুরু করে মোটামুটি প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯৯৪) লেখা *Rajmohan's Wife* যেন বাঙালির উপন্যাস রচনার হাতে খড়ির কাজ করে। *Rajmohan's Wife* ১৮৬৪ সালে *Indian Field* নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। মূলত এর কাহিনি রোমান্স, ঐতিহাসিক ঘটনানির্ভর ও কল্পনাধর্মী। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনী*-কেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম পরিপূর্ণ সার্থক উপন্যাস বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলা উপন্যাস পূর্ণাঙ্গভাবে শিল্পসম্মত রূপে প্রকাশ পায়। এরপর প্রকাশিত হয় তার *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *মৃণালিনী* (১৮৬৯), *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩), *রজনী* (১৮৭৭), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮), *যুগলাঙ্গুরীয়* (১৮৭৪), *চন্দ্রশেখর* (১৮৭৫), *রাজসিংহ* (১৮৮২), *আনন্দমঠ* (১৮৮২), *সীতারাম* (১৮৮৭)-র মতো একের পর এক উপন্যাস। প্রকাশ পায় বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক শিল্পীসত্তা। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *ঐতিহাসিক উপন্যাসে* (১৮৫৭) বাংলা উপন্যাসের অঙ্কুর অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে আছে দুটি আখ্যান। যথা- প্রথমটি *সফল স্বপ্ন* ও দ্বিতীয়টি *অঙ্গুরীয়-বিনিময়*। তৎসম শব্দের বাহুল্য, সংস্কৃত বাক্যের গঠন অনুযায়ী বাংলা বাক্যের ব্যবহার, তৎসম আড়ম্বরপূর্ণ সমাস-বদ্ধ পদের ব্যবহার বঙ্কিমী গদ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুকুমার সেনের (১৯০৯-১৯৯২) মতে, প্রতাপচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৫-১৯২১) *বঙ্গাধিপ পরাজয়* (১৯৬৯) আকারে সেই যুগে ইংরেজি উপন্যাসের সমকক্ষতার দাবি করে। প্রণয়মূলক রোমান্টিক কাহিনির বাইরে সমাজ সংসারের প্রাত্যহিক সুখ দুঃখের কথা, পারিবারিক সমস্যার কাহিনি নিয়ে রচিত তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের *স্বর্ণলতা*। সুকুমার সেনের মতে, এটিই নাকি বাংলার 'পুরাপুরি বাস্তবদৃষ্টি লইয়া উপন্যাস-রচনা বাঙ্গালায় এই প্রথম'।[১৩] এরপরে আমরা পাই রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাস- *বঙ্গবিজেতা* (১৮৭৪),

মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭), *রাজপুত জীবনপ্রভাত* (১৮৭৮) *রাজপুত জীবনসন্ধ্যা* (১৮৭৯)। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-১৮৮৯) *জালপ্রতাপচাঁদ, পালামৌ* (১৯৫১) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। *পালামৌ* মূলত ভ্রমণকাহিনি হলেও এর মধ্যে পাওয়া যায় ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিম পাথুরে প্রকৃতি, অরণ্য প্রকৃতি ও সেখানকার আরণ্যক অধিবাসীর জীবনকে। সঞ্জীবচন্দ্র সেই সব বিষয়কে আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে দেখিয়েছেন। মৌখিক ভাষায় সরস গদ্যে সামাজিক ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কৌতুককে উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯)। বঙ্কিম পরবর্তীতে আমরা ঔপন্যাসিক হিসাবে পেলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে (১৮৭৬-১৯৩৮)। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮) তাঁর *ফুলজানি* উপন্যাসে পল্লীজীবনাশ্রিত রোমাঞ্চকর কাহিনির কথা বলেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর ফ্যান্টাসি সমৃদ্ধ *কঙ্কাবতী* (১৮৯২), *ফোকলা দিগম্বর* (১৯০০), *মুক্তামালা*-তে (১৯০১) তীক্ষ্ণ সামাজিক ব্যঙ্গ বিদ্রূপকে প্রকাশ করেছেন এবং মানবিকতার দিক থেকে তাদের বিচার করেছেন। কথ্যভাষায় গদ্যভাষাকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষত চলিত গদ্য প্রচলনে বিশিষ্ট রীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) অবদান অভূতপূর্ব।

কোনো জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির বাস্তব জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয় উপন্যাস। জগদীশ গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) *অসাধু সিদ্ধার্থ* (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩-১৯৭৬) *বেদে* (১৯২৮), প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) *মিছিল* (১৯২৮) উপন্যাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালে আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে বাঙালি মধ্যবিত্তের সংকটকে দেখানো হল। এরই পাশাপাশি এসেছিল কল্লোলের সময়। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) মাটির কাছাকাছি মানুষের বাস্তব জীবনকথাকে দেখালেন তাঁদের উপন্যাসে। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে চাকুরিপ্রিয়

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবসান ঘটল, আর একদিকে নানা ধরনের বিপ্লব, তৎকালীন বিশ্বে বিভিন্ন রূপান্তর, ফ্রয়েডিয়ান মনোসমীক্ষণ তত্ত্বের আবিষ্কার ও মার্ক্স এঙ্গেলসের (১৮২০-১৮৯৫) 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' এর জ্ঞান পরিবেশনের দায় ছিল ঔপন্যাসিকদের। এই দায় থেকেই সেই যুগের মানুষ বেশি করে পড়েছে আন্তর্জাতিক সাহিত্য। গোকুলচন্দ্র নাগের (১৮৯৪-১৯২৫) *পথিক* (১৯২৫), প্রেমেন্দ্র মিত্রের *পাঁক* (১৯২৬) *মিছিল*, অচিন্ত্যকুমারের *বেদে*, যুবনাশ্বের (১৯০২-১৯৭৯) *পটলডাঙার পাঁচালি*-তে (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) যুগগত নৈতিক অবক্ষয়, বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের চূড়ান্ত বাস্তব জীবনকে দেখাচ্ছেন ঔপন্যাসিকেরা। আবার তিরিশের দশকে বুদ্ধিপ্রধান ও হৃদয়প্রধান ঔপন্যাসিকেরা সৃষ্টি করলেন তাঁদের সৃজনশীল সাহিত্য। বুদ্ধিপ্রধান ঔপন্যাসিকদের মধ্যে রয়েছেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২), গোপাল হালদার। এছাড়া এই পর্বের ঔপন্যাসিকেরা হলেন বাংলা সাহিত্যের বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৪-১৯৫৬)। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, গণ বিক্ষোভ ও দেশবিভাগজাত স্বাধীনতা এই সময়টা পেরিয়ে চতুর্থ দশক, পঞ্চম দশকের শেষ অবধি বাংলা উপন্যাস কখনো ধীর গতিতে, কখনো তা ক্লান্তভাবে, কখনো এলোমেলো গতিতে কখনো লক্ষ্যহীনভাবে সে এগিয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫), সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১), নবেন্দু ঘোষ (১৯১৭-২০০৭), বিমল মিত্র (১৯২১-২০০৩), রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮), সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) প্রমুখের লেখা উপন্যাসে কখনো এসেছে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, যুদ্ধপরবর্তী গণবিক্ষোভ, ভৌগোলিক পরিসরকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিকতা, সমকালীন অবক্ষয় ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মতো বিষয়গুলি।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে বাংলা উপন্যাসে। কালের ধারাবাহিকতায় সংরূপগত পালাবদলও ঘটে গেছে। প্রেম, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি, ইতিহাস, কখনো অঞ্চল কোনো না কোনো বিষয় উপন্যাসের বিষয় হিসাবে প্রধান হয়ে উঠেছে। বাংলা উপন্যাস মূলত ইউরোপীয় মডেলকে পাথেয় করে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু বাংলা উপন্যাসের নিজস্ব ঘরানা তারা বাংলা সাহিত্যের পুরাণ-কীর্তন এমনকি পালাগানের মধ্যে মানুষ সন্ধান করেননি। দেশকালের পটভূমিতে মাটির সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তৈরি হয় তাকে উপন্যাসে হাজির করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজের এলিট শ্রেণির মানুষের পাশাপাশি নিম্নবর্গের সমষ্টিগত চেহারা, তাদের প্রতিনিধিদের ব্যক্তিক চরিত্র এসেছে কোনো উপন্যাসে। আঞ্চলিক আখ্যানে এসেছে চাষির ধূলোমাখা পা, বাউরিদের পাথর খননের কথা ইত্যাদি প্রসঙ্গ। আমার আলোচ্য উপন্যাসগুলি যেহেতু লোকের কথা বলে ও সেই লোকের সংস্কৃতি নিয়ে সমৃদ্ধ তাই এখানে অঞ্চল বা আঞ্চলিকতা বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আঞ্চলিকতায় আলোচ্য উপন্যাসগুলি মাত্রা পেয়েছে অন্য আরেক চেহারায়। রূপ পেয়েছে আঞ্চলিক সমৃদ্ধ উপন্যাসে। সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিকের গন্ডী টপকে নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষকে নিয়ে সমৃদ্ধ এই আলোচনার উপন্যাসগুলি। স্বাভাবিকভাবে অঞ্চল বা আঞ্চলিকের বিষয়টি এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট হওয়া জরুরি। বাংলাদেশের মানুষের কাছে অঞ্চল ও স্থান–এই দুটি শব্দ কখনো এক নয়। অঞ্চল এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসাবে ‘Region’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। আর ‘Locality’ শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে ‘স্থান’ বা ‘স্থানিক’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। কল্লোল গোষ্ঠীর পূর্ববর্তী উপন্যাসে সাধারণ আটপৌরে জনজীবনের প্রসঙ্গ আগে আসেনি। এরপর যখন থেকে এই আটপৌরে জীবনযাপন নিয়ে লেখা হল তখন তকমা লাগিয়ে দেওয়া হল আঞ্চলিকতার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তরুণ লেখকদের মধ্যে সমাজের নিচুতলার মানুষগুলির প্রতি চোখ ফেরানোর মানসিকতা তৈরি হল। দেখা যায়

কলকারখানার শ্রমিক, কৃষক, আরণ্যক মানুষের গোষ্ঠীজীবনের বাস্তব চিত্র। বাংলা সাহিত্যের আসরে বাংলা উপন্যাস হাজির হল নিত্যনতুন বিষয় নিয়ে। স্থানিক উপন্যাসের সূচনা হল সেই সময়। এই উপন্যাসের এগিয়ে চলা শুরু হয়েছিল বিশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে। এভাবেই তখন তৈরি হচ্ছিল বাংলা উপন্যাসের নিজস্বতা। তৈরি হল বিষয়গত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যে মাত্রা পেল আঞ্চলিক উপন্যাসগুলি। এই প্রসঙ্গে দেখে নেওয়া দরকার উপন্যাসের আঞ্চলিকতা বিষয়টি ঠিক কেমন তার স্বরূপ।

উপন্যাসে আঞ্চলিকতা বা আঞ্চলিক উপন্যাস বিষয়টি দেখতে হলে আমাদের দেখে নিতে হবে প্রথমে নিম্নবর্গের হালহকিকত। বুঝে নিতে হবে সাহিত্যে তাদের সংস্কৃতি কবে থেকে এল, কখন এল ওই বিষয়গুলি। দেখতে হবে বাংলা উপন্যাসের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত যে যে সাহিত্য প্রকরণগুলি ছিল তাদের মধ্যে লোকজীবন, নিম্নবর্গ, তাদের সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্প, বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়গুলি কবে থেকে ও ঠিক কেমনভাবে এসেছে তার ধারাবাহিক ক্রমপরম্পরাটি। প্রাচীনযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান নিদর্শন ‘চর্যাপদ’-এ আমরা প্রচলিত সমাজের বাইরে অন্ত্যজ জীবনের কথা পাই। সেইসময়ের চর্যার কবিরা উল্লেখ করেছেন শ্রেণি-বর্ণ-বর্গে বিভক্ত সমাজের। এই সমাজে একদল ছিল বেদাশ্রিত অভিজাত জনসমাজ, যারা মূলত বেদাচার মানতো। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে অন্ত্যজ অনভিজাত মানুষেরা বেদাচারের বাইরের জনগোষ্ঠী। তাঁরা মূলত বেদ বহির্ভূত তান্ত্রিক বৌদ্ধ। চর্যাগীতির রচয়িতারা এই কারণে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ। চর্যাগীতির রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখ পাওয়া গেছে ডোম্বী, কামলি, শবর ইত্যাদি শ্রেণির। চর্যাপদে যে সমস্ত মানুষের কথা পাওয়া যায় তারা কেউ বা ডোমনী, কেউ চণ্ডালী, কেউ বা শুণ্ডিনী। ডোম-চণ্ডাল-শবরদের স্থান নগরের মূল জনপদের থেকে বাইরে অনেক দূরে টিলার উপরে। কিম্বা জঙ্গলের মধ্যে। কখনো বা পাহাড়ের গুহায়। দিনের বেলা ব্রাহ্মণেরা তাদের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলে। ময়ূরপুচ্ছ

পরিহিতা শবর কন্যারা যাদের গলায় গুঞ্জার ফুলের মালা তারা উঁচু উঁচু পর্বতে বাস করে। ডমরু, ঢেঁড়ি অর্থাৎ ডুগডুগি, ঝুমঝুমি বা ঘুঙুর, হেরুকবীণা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। হেরুকবীণা যন্ত্রটি লাউয়ের খোল, তন্ত্রি আর দণ্ড দিয়ে তৈরি। এ যেন অনেকটা একতারার মতো যন্ত্র বিশেষ। পাশাপাশি আমরা *বুদ্ধনাটকের* কথা পাই। এ সব কিছুর মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজে নাচ, গান, নাটক বা নাটগীত, পালা ইত্যাদি পরিবেশনের কথা আমরা পাই। চীনা ধান পাকায় শবর শবরীর উৎসবে মেতে ওঠার কথা বলেছেন চর্যাকারেরা। কাপালিক যোগী, ডোমনী, চণ্ডালের কথা পাওয়া যায়।

তুর্কী আক্রমণের অনেকগুলি ফলাফলের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হল এই যে, উচ্চ ও নিম্নবর্গের সংযোগ সাধনের প্রক্রিয়াটি সহজ হল। তুর্কি আক্রমণের সময় পর্যন্ত যারা ছিলেন শাসক, তারা নেমে এলেন শোষিতের পর্যায়ে। তারা অনেকে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী। মনে করা হয় তুর্কী আক্রমণে ব্রাহ্মণদের উপর মুসলমানদের অত্যাচারের ফলে তারা ধর্মান্তরিত হয়ে বর্গ সমন্বয় হচ্ছে। আর্যেতর লৌকিক দেবদেবী, লৌকিক আখ্যান পরিবর্তিত হচ্ছে। বেহুলা-লখিন্দর, কালকেতু-ফুল্লরা, ধনপতি-খুল্লনা, রঞ্জাবতী-লাউসেন ইত্যাদি কাহিনির মূল নিহিত আছে লোক সমাজের ধর্ম ও কথায়। বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ গোপজাতি, কুমার, তেলি, নাপিত ভারদণ্ড প্রস্তুতকারক ইত্যাদি শ্রেণির বিভিন্ন বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই দর্শনের ছত্রছায়ায় বাংলার প্রান্তবাসী মানুষেরা দলে দলে এসে যোগ দিয়েছে। চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) অনেক পরেও লোকায়ত ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। আধিপত্যবাদী ভাব ও আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করে সেখানে মানবমুখীনতার কথা বলা হয়েছে। বাংলার পৌরাণিক ও অপৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের গাথায় লোকায়ত দেবদেবী ও লোকায়ত

মানুষের জীবনকথা ছড়িয়ে রয়েছে। বিশিষ্ট গবেষক গোপাল হালদার অনুমান করেছেন, ‘মঙ্গল’ শব্দটি এসেছে অন্-আর্য ভাষা থেকে।[১৪] ষোড়শ শতাব্দীর আগে থেকেই আমরা লক্ষ করতে পেরেছি সমাজের উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের সমন্বয়ের ফলে বাংলায় পৌরাণিক ও লৌকিক ধারার মধ্যে মিশেল ঘটেছিল। লৌকিক ও পৌরাণিক ধারার দেবদেবীদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল ঘনিষ্ঠ সমন্বয়। পৌরাণিক শিবের মহিমাময় চরিত্রের সঙ্গে এসে মিশলেন লৌকিক শিব। চৈতন্যদেবের পরবর্তী সময়ে দাস্যরসের বিনয়, স্নেহ, প্রীতি, মমতা ইত্যাদির প্রকাশে দেবতাদের প্রতি মানুষের আতঙ্ক মিশ্রিত ভক্তির পরিবর্তে মানবী রূপের এক কোমল স্পর্শের প্রকাশ দেখা যায়। কুপিতা স্বভাব বিশিষ্ট দেবীও অনেকটা কোমল হন। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু চরিত্রটির আত্মপ্রতিষ্ঠা অন্ত্যেবাসী মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠাকেই ঘোষণা করে। তিনি ব্যাধদম্পতি কালকেতু ও ফুল্লরার অভাব ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবস্থাকে দেখিয়েছেন। কোথাও বা তাদের জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে হর-গৌরীর সাংসারিক জীবনের দারিদ্র্য। এই গাথা কাহিনির ভিতরে রয়েছে নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনা। এখানে চণ্ডী হলেন শিকারী ও পশুদের দেবী। আবার যদি ধর্মমঙ্গলের প্রসঙ্গে আসা যায় সেখানে দেখা যাবে ধর্মপূজা মূলত নিচুজাতির পূজা। কালুডোম, তার পত্নী, হরিহর বাইতি নিম্নবর্গের প্রতিনিধিত্ব করছে। আবার মৈমনসিংহ গীতিকায় আমরা লোকায়ত জনমানসকে পাই। সেখানে বেদে, বংশীবাদক, মৎস্যজীবী, গণক, কুটুনি, গোয়ালিনী ইত্যাদির মত শরীর ব্যবসায়ী, পাল্কিবাহক, ডাকাত, দস্যু প্রভৃতি শ্রেণির মানুষের কথা আমরা সেখানে পাই। ভারতচন্দ্রের (১৭১২-১৭৬০) *অন্নদামঙ্গল* (১৭৫২) কাব্যে সরল নিরক্ষর দরিদ্র মাঝি ঈশ্বরী পাটনীর কথা পাই যার বেঁচে থাকার চাহিদা খুবই যৎসামান্য। তার দেবী অন্নপূর্ণার কাছে প্রার্থনা তার সন্তান পরিজনেরা যেন ন্যূনতম খাদ্য খেয়েই বেঁচে থাকে। সেটুকুর অভাব যেন

তাদের না হয়। আমরা মোটামুটিভাবে দেখলাম বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কবিরা জাত-ধর্ম-বর্গ চিন্তায় প্রগতিশীল। এই কবিরা নিম্নবর্গের বিজয়ী স্বরকেই দেখিয়েছেন।

তবে মোটামুটিভাবে মধ্যযুগ পর্যন্ত নিম্নবর্গের চিন্তা চেতনা ও সংস্কৃতির ছাপ অব্যাহত থাকলেও বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রথম পর্বে এ ধারায় ভাটা পড়তে দেখা গেল। নবজাগরণের কালে হলেও বাংলা সাহিত্য উনিশ শতকের শুরুর দিকটাতে পাশ্চাত্যের তথাকথিত 'আধুনিকতা'র বিষয়টিকে ধর্মীয় প্রয়োজনে ও রাষ্ট্রিক সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে বিনা প্রশ্নে স্বীকার করছিল অল্প সময় হলেও। যদিও এই তথাকথিত 'আধুনিকতা'। স্বাভাবিকভাবে সেখানে বর্ণিত হয়েছে অমৌলিক, অনুবাদচর্চা, রাজাবাদশার কাহিনি। সেই কাহিনিগুলির পূর্ণতা দেওয়ার স্বার্থে নিম্নবর্গ এসেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ইতিবাচক প্রভাব বা নবজাগরণের আলোক বাংলা সাহিত্যে নভেলে বা উপন্যাসের জন্ম দেয়। এ সংরূপে আধুনিক মানুষের কথাই উঠে আসে। সেখানে সাধারণের বাস্তব জগতের ঘটনা স্থান পায়। কিন্তু এ মর্যাদা একদিনে হয়নি। শুরুর দিকে এ ছিল উচ্চবংশোদ্ভূত চরিত্রদের মহান কীর্তিগাথা। বহু পরে উচ্চবংশের বাইরে সাধারণ চোখে দেখা চরিত্র তাতে স্থান পেলেও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তখনও উপজীব্য হয়ে ওঠেনি। তবে উপন্যাস ছাড়াও সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপে যেমন প্রবন্ধ, নাটকে আমরা সাধারণ মানুষের কথা, সমাজের খেটে খাওয়া মানুষের কথা পাই। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের উপন্যসে আমরা কখনো কখনো নিম্নবর্গের মানুষের কথা পেয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *বঙ্গদেশের কৃষক* প্রবন্ধে আমরা রামা কৈবর্ত, হাসিম শেখ, পরাণ মণ্ডলের কথা পাই। তবে প্রবন্ধ ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *সীতারাম* উপন্যাসে রামচাঁদ শ্যামচাঁদের মতো নিম্নশ্রেণির পরিবারের চরিত্রদেরও দেখা মেলে। এই প্রসঙ্গে এসে যায় প্রমথ চৌধুরীর *রায়তের কথা*। সেখানেও এসেছে নীচুতলার মানুষের জীবন কথা। রবীন্দ্রনাথের *গোরা* (১৯১০) উপন্যাসে বৃদ্ধ নাপিত ও তার স্ত্রীর একটি

মুসলমান ছেলেকে পালনের কথা আছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পল্লীসমাজ*-এ (১৯১৬) আমরা আকবর লেঠেলদের মতো নিম্নবিত্তের চরিত্রদের পাই। এ নিম্নবিত্ত চরিত্রগুলি কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের জীবন সংস্কৃতি, তাদের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সমাজ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, প্রাকৃতিক ও স্থানিক পরিবেশ থেকে উঠে আসা। আমার আলোচ্য আঞ্চলিক উপন্যাস ঠিক এমনই নির্দিষ্ট পরিসর থেকে উঠে এলেও উপন্যাসের জীবন পরিসর তথাকথিত সভ্যতার থেকে অনেক যোজন পিছিয়ে।

সাধারণত নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে সেই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর কথা এই ধরনের উপন্যাসে দেখা যায়। ঔপন্যাসিকেরও এই ধরনের নির্দিষ্ট আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর প্রতি, তাদের জীবন, সংস্কৃতি, আচার-আচরণের প্রতি বিশেষ মমত্ববোধ থাকে। লেখক সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতি নিরপেক্ষ, নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত থাকেন। এই ধরনের উপন্যাসের পটভূমি হয় সাধারণত কোনো গ্রামাঞ্চল বা নদী, পাহাড়, সমুদ্র তীরবর্তী কোনো অঞ্চল বা কোনো দুর্গম অঞ্চল। সেই পটভূমিতে যে জনসমাজকে দেখানো হয় তা আঞ্চলিক জীবননির্ভর। এ আঞ্চলিক উপন্যাস আদতে নিম্নশ্রেণির মানুষের কথাই। এরা সমাজের প্রান্তিক, লোকমানস। বাংলা সাহিত্যের আঞ্চলিক ধারার উপন্যাস হিসাবে প্রথম দিকে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০১-১৯৭৬) *কয়লাকুঠির দেশ*-এর (১৯৫৮) নাম করা যায়। যদিও অনেকে একে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে নারাজ। বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য পত্রিকা *কল্লোল*-এ প্রকাশিত দুজন সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের যথাক্রমে *পাঁক* ও *বেদে* উপন্যাস দুটি স্বতন্ত্র ধারার উপন্যাস। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক* (১৯৩৯), *ইছামতী* (১৯৫০), *অশনি সংকেত* (১৯৫৯), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ধাত্রীদেবতা* (১৯৩৯) উপন্যাসগুলিতেও নিম্নশ্রেণির প্রান্তিক মানুষের জীবন চিত্র এসেছে। আঞ্চলিক উপন্যাস ধারায় রয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*

(১৯৪৭), *নাগিনী কন্যার কাহিনী* (১৯৫২), *কবি* (১৯৪৪), *কালিন্দী* ; সরোজ রায়চৌধুরীর (১৯০১-১৯৭২) *ময়ূরাক্ষী* (১৯৩৬), *গৃহকপোতী* (১৯৩৭), *সোমলতা* (১৯৩৮); মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬); সুবোধ ঘোষের (১৯০৯-১৯৮০) *শতকিয়া* (১৯৫৮); অমিয়ভূষণ মজুমদারের (১৯১৮-২০০১) *মহিষকুড়ার উপকথা* (১৯৮১); সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮) *বিটি রোডের ধারে* (১৯৫২), *গঙ্গা* (১৯৫৭), প্রফুল্ল রায়ের (জন্ম-১৯৩৪) *পূর্বপার্বতী* (১৯৫৭), *কেয়াপাতার নৌকা* (২০০৩); সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬৫) *ঢোঁড়াই চরিত মানস* (১৯৪৯); দেবেশ রায়ের (১৯৩৬-২০২০) *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* (১৯৮৮) ইত্যাদি। বিশ শতকে আমরা যাঁদের লেখায় নিম্নবর্গীয়দের কথা পাই তাঁরা হলেন কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯), ননী ভৌমিক (১৯২১-১৯৯৬), গুণময় মান্না (১৯২৫-২০১০), মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২), আব্দুল জব্বার (জন্ম ১৯৩৪), সুবিমল মিশ্র (জন্ম ১৯৪৩), সাধন চটোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৪৪), অভিজিৎ সেন (জন্ম ১৯৪৫), ভগীরথ মিশ্র (জন্ম ১৯৪৭), সুব্রত মুখোপাধ্যায় (১৯৫০-২০২০), স্বপ্নময় চক্রবর্তী (জন্ম ১৯৫১), আবুল বাশার (জন্ম ১৯৫১), নলিনী বেরা (জন্ম ১৯৫২) সৈকত রক্ষিত (জন্ম ১৯৫৪), কিন্নর রায় (জন্ম ১৯৫৩), অনিল ঘড়াই (১৯৫৭-২০১৪), সোহারাব হোসেন (১৯৬৬-২০১৮) প্রমুখ।

বিশ শতকে নিম্নবর্গদের নিয়ে লেখা অনেক বাংলা উপন্যাস আমরা পেয়েছি। সেখানে আলাদা আলাদা অঞ্চলের Local colour নিয়ে লোকজীবনের বর্ণময় রূপ প্রত্যক্ষ করেছি। তাদের শিল্প-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, আঞ্চলিক পরিচিতি, জীবিকা, সামাজিক পরিসর, প্রথা, রীতি-নীতি ইত্যাদি দিকগুলির পরিচয় পাই। তবে আমার আলোচ্য বিষয় মূলত লোকশিল্প নির্ভর উপন্যাস। এই ধরনের উপন্যাসগুলির কেন্দ্রে রয়েছে লোকশিল্প নির্ভর কোনো লোকজীবন। লোকশিল্পকে মাঝে রেখে তাদের জীবন, আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিত,

ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, তাদের জীবিকা, বিশ্বাস, প্রথা, রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয়গুলি একের পর এক এসে পড়ে। সার্বিকভাবে লোকশিল্পকে কেন্দ্র করে তাদের জীবন বাস্তবকে দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পরবর্তী নির্বাচিত কয়েকটি উপন্যাসে লোকশিল্পের প্রতিগ্রহণকে দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। তবে বাংলা উপন্যাসে লোকশিল্পের প্রতিগ্রহণের বিষয়টি স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকালেও ঘটেছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে আমরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কবি, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাস দুটি পাই। *কবি* উপন্যাসে আমরা নিতাই কবিয়ালকে পেয়েছি যে ডোম সমাজের থেকে এসেছে। কবিগান গাইয়ে সে। বড়োমাপের কবিয়াল হওয়া তার স্বপ্ন। কবিগান, ঝুমুর লোকসংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছেন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিগান সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে প্রান্তিক ডোম সমাজ থেকে তারাশঙ্কর নিতাই ডোমকে নিয়ে এসে কবিয়াল করে তুললেন। ঝুমুর সংস্কৃতিকে উপজীব্য করে ঝুমুর গাইয়েদের জীবনকথাকে সেখানে উপস্থাপন করলেন। *ধাত্রীদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসে রায়বেঁশে নাচের[১৫] কথা আছে। *পঞ্চগ্রাম*-এ ভল্লা ডাকাতদের লুঠতরাজের প্রসঙ্গ যেমন আছে, তেমনি আছে তাদেরই কখনো কখনো মেয়েদের মতো ঘাগরা কাঁচুলি পরে নাচ দেখানোর মতো বিষয়গুলি। *ধাত্রীদেবতা*-য় পাওয়া যায় সমাজের বাগদীশ্রেণির মানুষের রায়বেঁশে পরিবেশনের কথা। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসেও এই রায়বেঁশে নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে কাহার সম্প্রদায়ের মানুষের পাল্কিবাহকদের গানের উল্লেখ আছে। উপন্যাসের ঘটনাপ্রসঙ্গে আমরা জানতে পারি, কাহারদের এই পাল্কিবাহনের পেশাও ক্রমে অবলুপ্ত হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হতে থাকে কাহার পালকি বাহকদের এই গান।[১৬] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'আরণ্যক'* উপন্যাসে সমাজের নিম্নশ্রেণির নারীবেশী পুরুষ ছোকরার

ছক্করবাজী নাচের[১৭] উল্লেখ করেছেন বিভূতিভূষণ। সতীনাথ ভাদুড়ীর *ঢোঁড়াই চরিত মানস*-এ তাৎমাটুলির প্রান্তিক মানুষের সুর করে রামায়ণ গানের প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে।

আঞ্চলিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য Local colour কে ফুটিয়ে তোলা। অদ্বৈত মল্লবর্মনের *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে মালো সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর নিজস্ব জীবন সংস্কৃতির সঙ্গে আমরা পরিচিত হই, যার সঙ্গে ঐ জনগোষ্ঠীর নাড়ির যোগ। ঐ সংস্কৃতির শিল্পই তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে একতার বন্ধন। মালো সমাজে বিয়ের সময় মেয়েদের মঙ্গলগীত[১৮], ভাটিয়ালী গান[১৯], কীর্তন গান[২০] প্রভৃতি মালোদের নিজস্ব গোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি। মালোদের এই নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য মোহন ও বাসন্তীর প্রয়াসকে আমরা দেখেছি। শহর থেকে আসা চাকচিক্যময় যাত্রাগান মালোদের নিজেদের এতদিন ধরে লালন করা সংস্কৃতির উপর থাবা বসাতে শুরু করে। মালো সমাজের গোষ্ঠীগত একতাকে ক্রমেই ভেঙে দিতে থাকে। নতুন সংস্কৃতির চটুলতায় আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে মালোদের ছেলে মেয়েরা যাত্রায় যোগ দিতে থাকে। বাসন্তী মোহনদের চোখের সামনে তাদের এই সাংস্কৃতিক ভাঙনকে দেখা সম্ভব হয় না তাদের। ঔপন্যাসিক মালোদের জীবনের এই শিল্প-সংস্কৃতির ভাঙনকে, তাদের জীবনের এই বাস্তব সংকটকে দেখিয়েছেন। এই ধারায় স্বাধীনতা পরবর্তী কালের অনেক উপন্যাসই রয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮-১৯৭০) *বৈতালিক* (১৯৪৮) উপন্যাসটি আলকাপ শিল্পকে কেন্দ্রে রেখে রচিত। বইটির ঘটনাকাল ১৯৩৪, যদিও প্রকাশ সাল স্বাধীনতা পরবর্তী। যখন বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের সমাপ্তি যুগ আর গণ আন্দোলন আসার ঠিক পূর্বমুহূর্ত, সেইসময় আলকাপ শিল্পকে কেন্দ্র করে শিল্পী যোগেনদের জীবন সংগ্রামই *বৈতালিক*-এর বিষয়। লোকশিল্পকে নির্ভর করে দেখানো হয়েছে কোনো বিশেষ অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথাকে। ঝুমুর শিল্পকে সঙ্গত করে সুব্রত মুখোপাধ্যায় লিখছেন *রসিক*। নিমাই ভট্টাচার্যের *নাচনী* উপন্যাসে এক শহুরে

শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে এক নাচনির পরিচয় ও শিক্ষিত যুবকটির সঙ্গে জড়িয়ে তাদের কথা সম্পূর্ণতই আলাদা। সমাজের প্রান্তিক হিসাবে একজন নাচনির শিল্পময় বাস্তব জীবনের চিত্র আমরা সেখানে পাব। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজও এই ধারার একজন সার্থক শিল্পী। তাঁর *মায়ামৃদঙ্গ, নিলয় না জানি* উপন্যাস দুটিতে পাওয়া যায় আলকাপ, ঝুমুর, মারফতি গানের মতো লোকশিল্পকে। *নিলয় না জানি*-তে সমাজের প্রান্তিক আউল বাউলদের গানকে একজন আলকাপ শিল্পী যেভাবে গ্রহণ করেছেন তার পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসটিতে। অভিজিৎ সেনের *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসটিতে সমাজের প্রান্তিক বাজিকর সম্প্রদায়কে দেখা যায়। সেখানে তাদের বাজিকরী শিল্প, ভানুমতীর খেলা তাদের জীবন জীবিকা সংস্কৃতি সম্পর্কে জানান দেয়। পটচিত্র এঁকে পটগান গেয়ে জীবন অতিবাহিত করেন এক শ্রেণির মানুষ। তাদের শিল্পকেন্দ্রিক জীবনকে নিয়ে ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় রচনা করলেন *কলাবতী কথা*। বিমল লামার (জন্ম ১৯৬৮) *রুশিকা* (২০১৬) উপন্যাসটি আদিবাসী মানুষের জীবন আলেখ্য। প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকা মানুষগুলির জীবনে ছৌ, ঝুমুর কেমনভাবে এসেছে- সেই কথাই বলেছেন লেখক। মৃৎশিল্পকে নিয়ে লেখা শওকত আলীর (১৯৩৬-২০১৮) *প্রদোষে প্রাকৃতজন* (১৯৮৪) আর নলিনী বেরার *মাটির মৃদঙ্গ* (২০১৭) উপন্যাসটি লোকশিল্পকেন্দ্রিক উপন্যাস। ভগীরথ মিশ্রের *আড়কাঠি* উপন্যাসে লোকশিল্পকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়ার গজাশিমুল গাঁয়ের মানুষের জীবন, জীবিকা, সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে উপন্যাসটিতে তাদের বাণিজ্যিক দিক অর্থাৎ সমাজের একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী অর্থলোভী মানুষের কবলে গজাশিমুল গ্রামের আদিম ও অকৃত্রিম সংস্কৃতি তথা প্রান্তিক মানুষের জীবন সংকট কতটা তা দেখানো হয়েছে ।

১.৭ উপসংহার

স্বাধীনতা পরবর্তী নির্বাচিত বাংলা লোকশিল্প নির্ভর উপন্যাসগুলিতে লোকজীবন অর্থাৎ প্রান্তিকজন বা নিম্নবর্গের সংস্কৃতিকে উপন্যাসে প্রতিগ্রহণ করেছে বিভিন্ন সময়ে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন নির্বাচিত কয়েকটি বাংলা উপন্যাস যেমন সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক*, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *মায়ামৃদঙ্গ*, অভিজিৎ সেনের *রহু চণ্ডালের হাড়*, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের *কলাবতী কথা* ও ভগীরথ মিশ্রের *আড়কাঠি* উপন্যাসে এই বিচিত্র প্রতিগ্রহণ বর্তমান গবেষণার আলোচ্য বিষয়। গুণময় মান্নার *কটাভানারি* উপন্যাসেও আছে সেই প্রান্তজনের কথা। আমার আলোচ্য উপন্যাসগুলির তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে এই উপন্যাসটির প্রসঙ্গ এসেছে। সেখানে ধরা পড়েছে অভিজাতের আয়নায় অনভিজাতের কথা। প্রাসঙ্গিক হয়েছে তার ইতি ও নেতির দিকটিও।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১. Thoms, William J. *Letters To The ATHENEUM(1846).* Miller, Stephen (2021). *The Notes and Queries Folklore Column 1849-1947.* UK: Cambridge Scholars Publishing. Pg. xv

২. রেমন্ড উইলিয়মসের 'কালচার' সম্পর্কিত ধারণা হল–

> ...culture as to how ideas and meanings are expressed in ordinary behaviour, Learning, and art. He said that Culture could be categorized in three ways: social, ideal, and documentary. Social described a specific form of life, ideal referred to values, work, and lives, while documentary. Social described a specific form of life, ideal referred to values, work, and lives, while documentary referred to the intellectual creation. William argued that culture is not elite but ordinary.

দ্র: Williams, Raymond (1976). *Keywords A Vocabulary of Culture and Society.* New York: Oxford University Press. Pg.76

৩. Hoare, Quintin and Smith, Nowell Geoffrey (Edited and translated, 1971). *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci.* New York: International Publishers. Pg.52

৪. ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (১৯৯৮)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস* । কলকাতা: আনন্দ।পৃ. ১৫

৫. পূর্বোক্ত। ১৭

৬. Nkrumah, Kwame (1963). *Neo-Colonialism the Last Stage of imperialism.* London: International Publishers.

৭. মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচরিতা (সম্পাদিত, ২০১১)। *সাহিত্যতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব, শৈলীতত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষায় নানা বিদ্যাচর্চা* । কলকাতা: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ.২০১

৮. লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে টমাস ব্যাবিংটন মেকলে নামে এক পণ্ডিত তাঁর সচিব হয়ে ভারতে এসে কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি প্রাচ্যশিক্ষার পরিবর্তে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষয়ে যে বিখ্যাত প্রস্তাব পেশ করেন (১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২ রা ফেব্রুয়ারী) তা 'মেকলে মিনিটস' বা 'মেকলে মিনিট' নামে পরিচিত। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষিত হলে তা ক্রমনিম্ন পরিশ্রুত নীতি অনুযায়ী ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। এভাবে ভারতবাসীর মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার ফলে নবজাগৃতি আসবে।

দ্র: মুখোপাধ্যায়, জীবন (২০০৫)। আধুনিক ভারত। কলকাতা: ছায়া প্রকাশনী। পৃ. ১৮

৯. বাণভট্ট রচিত অন্যতম সংস্কৃত কথাকাব্য *কাদম্বরী*। গুণাঢ্যের *বৃহৎকথা*-য় বর্ণিত আছে *কথাসরিৎসাগর*-এ ৫৯ তরঙ্গে রাজা সুমনসেনের কাহিনি নিয়ে *কাদম্বরীর* আখ্যান বিন্যস্ত। নায়িকা কাদম্বরীর তিন জন্মের বৃত্তান্ত অবলম্বনে আগের কাহিনিকে নিয়ে নতুনরূপে পরিকল্পিত এই কাহিনি। বাণভট্ট এই কাহিনিকে সমাপ্ত দ্র: বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ (১৯৮৮)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* । কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ৪০৮

১০. *দশকুমারচরিত* খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের বিখ্যাত কবি দণ্ডী রচিত একটি সংস্কৃত গদ্য-আখ্যায়িকা।

দ্র: বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ (১৯৮৮)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* । কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ৪৬৩

১১. রাজা ধবলচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন নারায়ণ শর্মা। তিনি পাটলিপুত্রের রাজা সুদর্শনের পুত্রদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য *হিতোপদেশ* গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থটি *পঞ্চতন্ত্রের* অনুকরণে রচিত।

দ্র: Keith, A. Berriedale (1993). *A History of Sanskrit Literature.* Delhi : Motilal Banarsidass Publishers . Pg. 263

১২.*পঞ্চতন্ত্র* সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম কথাগ্রন্থ যার রচয়িতা কবি বিষ্ণু শর্মা। লেখক জানিয়েছেন, দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির মূর্খ পুত্রদের নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী করে তোলার জন্য সভাপণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হলে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পঞ্চতন্ত্র রচনা করা হয়। এগুলি শিশুপাঠ্য নীতিগ্রন্থ। পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি পরিচ্ছেদ- মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, সন্ধিবিগ্রহ, লব্ধপ্রণাশ ও অপরীক্ষিতকারক।

দ্র: বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ (১৯৮৮)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* । কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ৪৬১

১৩. সেন, সুকুমার (১৩৫০ বঙ্গাব্দ)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড)*।কলকাতা: আনন্দ।পৃ.২০১

১৪. গোপাল হালদার জানান-

> লৌকিক ধারাই প্রথম ও প্রধান, এমন কি 'মঙ্গল' কথাটাও হয়তো মূলত অন্-আর্য ভাষা থেকে আগত।

দ্র: হালদার, গোপাল (১৪০০)। *বাঙ্লা সাহিত্যের রূপ-রেখা* ।কলকাতা: অরুণা। পৃ. ১০৫

১৫. 'ডোম-বাউরী জাতীয় নিম্নশ্রেণীর একদল লোক একধরনের নাচ করে, ইহাকে রাইবেশে নৃত্য বলে'।

দ্র: দত্ত, গুরুসদয় (২০০০)। *বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য* । কলকাতা: ছাতিম বুকস। পৃ. ২৩১

১৬. ধাতুরিয়া নটদলের কিশোর। ছোকরা সাজে। অভাবে গৃহত্যাগী। অন্যসময়ে ক্ষেতের কাজ করে। বাকি অন্য সময়ে নাচ-গান করে। লোকনৃত্যের কলাকুশল তার জানা। ছট পরবের মেয়েদের জটিল নাচের বিন্যাসের রূপ ও রীতিও তারা অজানা নয়। নারীবেশী পুরুষদের বিশিষ্ট এক নাচ 'ছক্করবাজী' যাতে ওস্তাদ ধাতুরিয়া নিজেই। যদিও এই শিল্পে অর্থ এবং মর্যাদার বড়ো একটা কদর নেই তেমন। শেষে কিশোর ধাতুরিয়াকে আত্মহত্যা করতে দেখা যায়।

দ্র: বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ (১৩৯২ বঙ্গাব্দ)। *আরণ্যক*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।

১৭. পাল্কী বাহকেরা চলার সঙ্গে সঙ্গে মুখে গান রচনা করে। প্রথম জন গানের কথা বলে। বাকিরা 'হেই...আ' শব্দটি উচ্চারণ করে। পথ চলতে চলতে দেখা ক্ষণিক দৃশ্য, প্রকৃতি, মানুষ, নিসর্গ তাদের গানের বিষয়বস্তু।

দ্র: চৌধুরী, অমিতা। পাল্কী। চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত, ২০১৬)। *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ* । কলকাতা: দে বুক স্টোর। পৃ. ৩০৯

১৮. মঙ্গল শব্দটি মাহাত্ম্য প্রচারমূলক যে কোনো রচনা বোঝাতে ব্যবহৃত হল।

দ্র: মজুমদার, শ্রী রমেশচন্দ্র, চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার (১৯৭৩) । *ভারতকোষ* পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।পৃ. ২৬৫

দ্র: https://অভিধান ভারত/বাংলা/শব্দ/মঙ্গলগীত 14.01.2019

১৯. লোকগীতি শিল্পী অমর পাল ভাটিয়ালী গান সম্পর্কে জানিয়েছেন –

> ‘ভাটি’ শব্দটিকে কেন্দ্র করে ভাটিয়ালী গানের উৎপত্তি হয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভাটির চলমান স্রোতের উপর নৌকার পালে বাতাস লাগিয়ে মাঝিরা যে গান গায় তাইই ভাটিয়ালী গান নামে পরিচিত।

দ্র: পাল, অমর। ভাটিয়ালী ২। চক্রবর্তী, বরুণকুমার। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪১৫

২০. হীতেশরঞ্জন সান্যাল জানান-

> কথা ও সুরের মিলনে কীর্তন বাঙালির এক দিব্য অবদান। ‘কৃৎ’ ধাতুর অর্থ প্রশংসা। কীর্তি ও কীর্তন এই দুই শব্দই কৃৎ ধাতু হেকে এসেছে। রূপে, জ্ঞানে, শৌর্যে ও কর্মে যিনি শ্রেষ্ঠ তার নাম স্মরণ, গুণ বর্ণন যশোসূচক গানের নাম কীর্তন।

দ্র: সান্যাল, হীতেশরঞ্জন (১৯৮৯)। *বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী। পৃ. ১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

পারফরমেন্স লোকশিল্প ও উপন্যাস শিল্প: তুলনামূলক সম্পর্ক বিচার

২.০ ভূমিকা

সংস্কৃতি বলতে আমরা সাধারণত বুঝি পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলের মানুষের সুমার্জিত জীবনের শোভনীয় পালনীয় সম্যক জীবনচর্যা যার সঙ্গে তাদের জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াকর্ম, চিন্তাভাবনা নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। আমরা আজকে বিশ্বায়নের অগ্রগতির এক চরম পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছি প্রত্যেকেই। এই সময়ে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে চলেছে মানুষ। সংস্কৃতির নানাধরনের বৈচিত্র্যকে জানতে হলে তার খুঁটিনাটি সব কিছু জানা প্রয়োজন। আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান ও তার অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণই খুবই কঠিন বিষয়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক রূপ বৈচিত্র্যই তো অফুরান। সেই বৈচিত্র্যের খুঁটিনাটি সংগ্রহে গবেষকরাও তৎপর। তাছাড়া কালের সাপেক্ষে সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল। আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগের সাহিত্য ও মধ্যযুগের সাহিত্যের যেকোনো দুটি সাহিত্যিক নিদর্শন হাজির করলে বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে। ধরা যাক চর্যাপদের সংস্কৃতি, ধর্ম, সামাজ, মানব জীবনের রীতিনীতি, আচার যেমন আলাদা তেমনি আলাদা মধ্যযুগের কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের *মনসামঙ্গল*-এ উল্লিখিত জনজীবনের আচার, রীতি-নীতি, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রথা, সংস্কৃতি ইত্যাদি। আবার শুধু কাল নয় অঞ্চলের বদলেও সংস্কৃতির এই বদল সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার মানভূম অঞ্চলের আঞ্চলিক সংস্কৃতি আর আসামের কোনো এক পার্বত্য প্রজাতির সংস্কৃতি কখনোই হুবহু একরকম নয়। তবে যেকোনো সংস্কৃতির আদি, অকৃত্রিম ও অবিকৃত রূপ খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। আমার আলোচিত বিষয় স্বাধীনতা পরবর্তী নির্বাচিত লোকশিল্পনির্ভর উপন্যাস। সংস্কৃতির প্রসঙ্গ এখানেও এসেছে।

২.১ পারফরমেন্স লোকশিল্প ও উপন্যাসশিল্প: তাত্ত্বিক পটভূমি

শিল্প সংস্কৃতির নন্দনতত্ত্বের ধারণায় লোকসংস্কৃতি এবং উচ্চসংস্কৃতি বা ভদ্রজনের শিষ্ট সংস্কৃতির ধারণাটি আলাদা। লোকসংস্কৃতি বেশিরভাগ সময় ভদ্রজনোচিত শিল্প সংস্কৃতির মান্যতার থেকে বেশ দূরে অবস্থান করে। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ভদ্রজনের অভিজাত শিল্প সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে লোকসংস্কৃতির দ্বারা। আমার আলোচ্য নির্বাচিত উপন্যাসের ঔপন্যাসিকেরা তাদের রচনার কেন্দ্রে রেখেছেন বেশ কয়েকটি লোকশিল্পকে। লোকশিল্পকে তাঁরা প্রতিগ্রহণ করেছেন তাঁদের উপন্যাসে। সেগুলি বাজিকরী শিল্প, আলকাপ, ঝুমুর, পটশিল্প ইত্যাদি। এই লোকশিল্পের প্রত্যেকটি আসলে পারফরমেন্স। আর পারফরমেন্স হিসাবে এই লোকশিল্পগুলির প্রত্যেকটাই এক-একটা পরিবেশন। এই পরিবেশনার ধারণাটিই হল পারফরমেন্স। স্বাভাবিক সূত্রেই আলোচ্য উপন্যাস ও উপন্যাসে গৃহীত লোকশিল্পের আলোচনার শুরুতেই এসে পড়ে এই পারফরমেন্স বিষয়টি। বর্তমান পৃথিবীতে শিক্ষিত মহলে পারফরমেন্স স্টাডিস চর্চা বেশ আলোড়ন তুলেছে। সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির এই তাত্ত্বিক শাখার সূচনার ক্ষেত্রে যাঁদের নাম সর্বাগ্রে তাঁরা হলেন রিচার্ড শেখনার (জন্ম ১৯৩৪) ও ভিক্টর টার্নার (১৯২০- ১৯৮৩)। রিচার্ড শেখনার *Performance Studies- An Introduction* [১] গ্রন্থে মূলত থিয়েটারের দিক থেকে এই বিষয়ের কথা বলেছেন। ভিক্টর টার্নার নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে এবং ক্ষেত্রসমীক্ষার বিষয়টিকে মনে রেখে এর ধারণা দিয়েছেন। পারফরমেন্স স্টাডিসের পরিসরটি বৃহৎ। এর পরিধি পরিব্যাপ্ত ও সুবিন্যস্ত।

বাঙলা আকাদেমি অভিধান গ্রন্থে এর বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে, ‘মঞ্চাভিনয়’, ‘প্রদর্শনী’ এবং ‘কনসার্ট’।[২] এখানে ‘Performance’-কে একটি বিশেষ্য পদ হিসাবে দেখানো হয়েছে। এর অনেক বাংলা প্রতিশব্দ রয়েছে। তবে লক্ষ করব বিশেষ বিশেষ

কতগুলি শব্দ। যেমন- 'অভিনয়', 'ক্রিয়া', 'ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন', 'প্রদর্শিত ক্রীড়াকৌশলাদি', 'প্রমোদানুষ্ঠান' ইত্যাদি শব্দগুলি।[৩] পারফরমেন্স শব্দটির সঙ্গে যুক্ত এই অর্থগুলি যেন পারফরমেন্স শব্দটির তাত্ত্বিক ব্যাপ্তিরই ইঙ্গিতসূচক। এটি একইসঙ্গে সাংস্কৃতিক, নান্দনিক ও শৈল্পিক চেতনার মিশেল। এর বিরাট ক্ষেত্রটি আবার একাধারে নাটক, খেলা, নৃত্য, সংগীত, বাদ্যযন্ত্র, শিল্পকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সংরূপের সঙ্গে যুক্ত। এর সামগ্রিকতার কথা বলতে গিয়ে যদি পারফরমেন্সকে একটা বড়ো ছাতা হিসাবে কল্পনা করা যায়, তবে সেখানে নাচ, গান, সাহিত্যের পাঠ ও পঠন রীতি, মৌখিক উপস্থাপন ও পরিবেশনা- নানা বিষয়ের বা দিকের সম্মিলনে বিস্তৃত পরিসরটি উঠে আসে। অনেকগুলি শাখার সুসমন্বিত সমাবেশে পারফরমেন্স আন্তঃসম্পর্কযুক্ত হওয়ায় একে তাই ইন্টার-ডিসিপ্লিন বলা যেতে পারে।

তবে পারফরমেন্স স্টাডিসের পরিসরকে নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য বা উপাদানের বৈচিত্র্যকে আমরা লক্ষ করতে পারি। পারফরমেন্স স্টাডিসের মধ্যে আমরা এথ্নোগ্রাফি বিষয়ক আবহকে পাব, যার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটি। সামাজিক সংগঠন, একটা সংরূপ থেকে অন্য সংরূপে সচল আসা যাওয়া, রিচ্যুয়ালিস্টিক বিষয়, সাধারণ বস্তুর সামাজিক ও মহাজাগতিক ধারণা, পারফরমারদের দেহভঙ্গিমা বা শারীরিক বিভঙ্গ, সামাজিক বিনোদন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তন এরকম- একাধিক বিষয়ের ডায়ালেক্টিক্যাল ও ডায়নামিক দিক এখানে উঠে আসে। জন ম্যাকেঞ্জি যিনি নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচ.ডি করেছেন, তিনি এ বিষয়ে যা বলেছিলেন তার সারকথা এই যে, পারফরমেন্স বিংশ এবং একবিংশ শতকের হলেও আঠারো ও উনিশ শতকে ক্ষমতা ও জ্ঞানের উৎপাদন ইতিহাসের অগ্রগতির পথকেই দেখায়। যেমন- পারফরমেন্স আলাদাভাবে এক নতুন ধরনের জ্ঞানের উন্মোচন করে। এর মধ্যে কোনো

শাসনের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকে না। পারফরমিটিভ বিষয়গুলি সমগ্রতার বদলে খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ে গঠিত হয়, কেন্দ্রীভূত হওয়ার বদলে বিকেন্দ্রীকৃত বা অপসৃত হয়, এছাড়াও পার্থিব ও যথার্থভাবে পরিবেশিত হয়। তারা জ্ঞানের যথার্থ ও একক স্থান দখল করে না এবং এখানে কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিষয় নেই। বরং সমাজ-প্রযুক্তির পদ্ধতির বৈচিত্র্য, অগণিত নতুন ধরনের জ্ঞানের অভ্যাসের চর্চা ও বহুবাচনের একত্রীকরণের দ্বারা এই পারফরমেন্সের বিষয়বস্তু উৎপাদিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। পারফরমেন্সের বিষয়গুলোকে শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী সময়ে এবং উত্তর ঔপনিবেশিক পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। আগে যেগুলো মৌখিকভাবে অর্থাৎ মানুষের মুখে মুখে সম্পাদিত হত শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী সময়ে এবং উত্তর ঔপনিবেশিক পৃথিবীতে সেগুলোকে অক্ষরে, মুদ্রিত বই আকারে, ফ্যাক্টরিতে সংরক্ষণ করা হয়। ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক পরিস্থিতি থেকে যেগুলি একসঙ্গে সংযুক্ত ও সংস্কার করা হয়, তাদের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রেখে প্রাথমিক উপাদান হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়।

পরবর্তীকালে পারফরমেন্স চর্চা মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। বিংশ শতাব্দীর শেষ তিন বছরে প্রতিনিয়ত বৌদ্ধিক ও শৈল্পিক পরিস্থিতির সঙ্গে এটি বিপুলভাবে সমান তালে পরিবর্তিত হয়েছে। একবিংশ শতকে এই চর্চা যেভাবে শুরু হয়েছে অনেকে সেই চর্চা সম্পর্কে অসন্তুষ্ট। তথ্যের অনুসন্ধান ও প্রচারের ফলে ভালোই সমৃদ্ধ হচ্ছে এই চর্চা। ইন্টারনেট, সেল ফোন, সফিস্টিকেটেড কম্পিউটারের ব্যবহারের মাধ্যমে এই চর্চা সহজসাধ্য ও সহজলভ্য হয়েছে। এতদিন মানুষ যে শুধুমাত্র একটা বইতে পৃথিবীকে দেখতো এখন তেমনটা নয়, বরং এ পৃথিবীই যেন মানুষের কাছে অংশগ্রহণ করার জন্য একটা পারফরমেন্স। বর্তমান পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ‘Glocal’ শব্দটির ব্যবহার শোনা যাচ্ছে। এটি তো Local ও Global শব্দদুটির এক শক্তিশালী সমাহার। স্বভাবতই পারফরমেন্স স্টাডিস

পাণ্ডিত্যপূর্ণ ডিসিপ্লিনের থেকে অনেক বেশি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত, পাঠ্য-অতিরিক্ত কোনো অপার্থিব ও নমনীয় একটি বিষয়।

পারফরমেন্স চর্চার বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতাকে সীমায়িত করা কঠিন। রিচার্ড শেখনারের নিজের শিক্ষা, গবেষণা, পারফরমেন্সের অনুশীলন করে জীবন থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে পারফরমেন্সের সূত্রগুলি তৈরি করেছেন। তাঁর মতে পারফরমেন্স হল একটা ডিসিপ্লিন। সেটি বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে। এই পারফরমেন্স চর্চার গবেষকরা বই, চিত্র, প্রত্নতাত্ত্বিক রেকর্ড, ঐতিহাসিক তথ্য ইত্যাদির মাধ্যমে আরকাইভ তৈরি করেন। মানুষের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম থেকে নির্ঘণ্ট তৈরি করা হয়। পারফরমেন্স চর্চার আরেকটি বড়ো বিষয় হল এর শৈল্পিক অভ্যেস। গোষ্ঠীভিত্তিক পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে পারফরমেন্সের একদল গবেষক সেইসব শিল্পীদের কাজ নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের অনুশীলন করেছেন। অনেকে আবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর দক্ষ। পারফরমেন্স পাঠ ও পারফরমেন্সের চর্চার মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। নৃতত্ত্ব থেকে গৃহীত ক্ষেত্রসমীক্ষা-পদ্ধতি যেটি একটি পারিতোষিক পদ্ধতি সেটি নতুন নতুন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সংগৃহীত হয়। এই অংশগ্রহণকারীর পর্যবেক্ষণ আদতে সংস্কৃতি পাঠের নতুন এক পদ্ধতি।

নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা যায় সাধারণত অধিকাংশ গৃহসংস্কৃতি আদতে ‘অন্য’ বা ‘অপরের’ যা পাশ্চাত্য নয়। কিন্তু পারফরমেন্স চর্চার ক্ষেত্রে এই ‘অন্য’ বা ‘অপর’ তিনি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য যেখানকারই হোন না কেন, তার আচরণের মধ্যে বোঝা যাবে যে সে নিজেই আদতে তার সংস্কৃতির অংশ। পারফরমেন্স স্টাডিসের ক্ষেত্রসমীক্ষা করেন যে সমস্ত গবেষক তাদের মধ্যে ব্রেকটিয়ান সমালোচনার মানসিকতা লক্ষ করা যায়। স্বীকৃত সমাজ

থেকে যে যে বিষয়গুলি পাওয়া যায় সেগুলিই পর্যাপ্ত নয়, এছাড়াও যে বিষয়গুলি এই স্বীকৃত সমাজের বাইরে সেগুলোকেও জ্ঞান ও অনুশীলনের মাধ্যমে বারংবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পুনর্বিবেচনা করে দেখা হয়।

পারফরমেন্স চর্চা সামাজিক অভ্যেসের মধ্যে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ও একেই সমর্থন করে। এক্ষেত্রে এই চর্চায় যুক্ত তাত্ত্বিকেরা আদর্শগত দিক থেকে নিরপেক্ষ নয়। এক্ষেত্রটিতে এমন কোনো বিষয় নেই যেটি একেবারেই পক্ষপাতশূন্য। অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন, যতটা সম্ভব সতর্কভাবে তা জেনে একজনের নিজের অবস্থান ও তার সেই অবস্থানকে পরিবর্তন করা দরকার কিনা তা বোঝা যায়। পারফরমেন্স চর্চায় নানা ধরনের উদাহরণ পাওয়া যায়। এটি নিজেই একটি বড়ো পরিসর তৈরি করে যার মধ্যে ধারাবাহিকভাবে মানুষের নিরবিচ্ছিন্ন চর্চার বিষয়গুলো থাকে। এই বিষয়গুলি হল নাটক, খেলা, জনপ্রিয় কোনো বিনোদন বা পারফর্মিং আর্ট যেমন- থিয়েটার, নৃত্য, সংগীত এবং দৈনন্দিন জীবনের সামাজিক ও পেশাগত, লিঙ্গ ও জাতিগত এবং শ্রেণিগত ভূমিকা এছাড়া মিডিয়া ও ইন্টারনেটের বিষয়গুলি থাকবে। ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পারফরমেন্স কী ছিল আর কী ছিল না, পারফরমেন্স স্টাডিস চর্চার আগে পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের মধ্যে তা নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা ছিল না। পারফরমেন্স বা যদি এর বাংলা পরিভাষা করা হয় ‘প্রয়োগশিল্প’ তবে এর মধ্যে আসবে কোনো একটি ক্রিয়া গঠন করা, উপস্থাপন করা, সেটিকে প্রদর্শন করা ইত্যাদি বিষয়গুলো। পারফর্মেন্স অনেকগুলি কনটিনিউয়াম বা উপাদানকে সাঙ্গীকৃত করে। একটি নতুন ডিসিপ্লিন হিসাবে পারফরমেন্স স্টাডিস চর্চা এখনও এর গঠনমূলক স্তরে রয়েছে। পারফর্মিং আর্ট, সমাজ বিজ্ঞান, মানবীবিদ্যা, জেন্ডার স্টাডিস বা লিঙ্গ বিদ্যা, ইতিহাস, মনোসমীক্ষণবাদ, উদ্ভটতত্ত্ব বা অদ্ভুত তত্ত্ব এবং কালচারাল স্টাডিসের মতো এইসকল বৈচিত্র্যময় ডিসিপ্লিনগুলির অভিমুখগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বয়

করে পারফরমেন্স স্টাডিস। সব ডিসিপ্লিনের সীমায়িত এলাকাগুলি যেখানে শেষ হয়, সেখান থেকেই পারফরমেন্স স্টাডিস চর্চার শুরু।

একজন পারফরমেন্স স্টাডিসের গবেষক পাঠ, স্থাপত্য, ভিসুয়্যাল আর্টস, শিল্প ও সংস্কৃতির অন্যান্য অঙ্গ নিয়ে কাজ করেন। এছাড়াও বাদক, খেলোয়াড়দের খেলা এবং বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত বিষয়গুলি পারফরমেন্স হিসাবে পরিগণিত হয়। সাধারণত এগুলো পড়া বা অভ্যেস করা হয়। আবার কখনো কখনো এগুলো ঘটনা বা আচরণ হিসাবে পরিগণিত হয়। এর একটি প্রধান গুণ এর সজীবতা। তবে এর যেসব বস্তুগত নজির যেগুলি মিডিয়ায় বা আরকাইভে রাখা হয় সেই সকল বিষয়গুলিই পারফরমেন্স স্টাডিসের প্রাণ। তাই এই চর্চা শুধুমাত্র পাঠের মাধ্যমেই সম্পাদন হয় না, বরং অভিনয়ের মতো ক্রিয়া হিসাবে দেখানো হয়। যদি একটি চিত্রের উদাহরণ দেওয়া যায়, তবে একজন গবেষক অনুসন্ধান করবেন, সেই চিত্রটি কখন, কীভাবে, কার দ্বারা তৈরি, সেটি কীভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার কী কী পরিবর্তন ঘটে। একজন শিল্পীকে খুব কাছ থেকে প্রতিদিনের রিচ্যুয়াল, তার সম্পর্কিত আরও অন্যান্য তথ্য নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। ঐ শিল্পী কেমনভাবে নিজের কাজ নিয়ে ভাবছেন তার কাছে জানতে চাওয়া হয়। পারফরমেন্স স্টাডিসের তাত্ত্বিকেরা কীভাবে ঐতিহ্যের দিক থেকে থিয়েটারকে এবং পারফর্মিং আর্টকে দেখছেন এই বিষয়গুলি তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়। রিচার্ড সেকনার তাঁর বইয়ের প্রত্যেক অধ্যায়ে এই সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেছেন।

পারফরমেন্স স্টাডিস তল বা নিচ থেকে কাজ করে। ইন্টারনেট, ওয়াইফাই, ইমেল, সেল ফোন, ব্লগ, সরাসরি মেসেজ পাঠানো– এই বিষয়গুলির অর্থ হল সাক্ষরতা। বিভিন্ন ভাবে ধারণার পরিসর, অনুভব, অনুরোধ ও ইচ্ছার দ্বারা বিভিন্ন ভাবে এগুলোকে সংযুক্ত

করা হয়। মানুষ একইসঙ্গে একদিকে যেমন পাঠক, তেমনি অন্যদিকে লেখক। এটি চারপাশের সম্ভাবনার প্রত্যেক খবরের চলমানতাকে বোঝাতে এবং পরিচালনা করতে, সেইসঙ্গে প্রেরকদের এবং গ্রাহকদের কল্পনাকে ব্যবহার করতে উৎসাহ দেয়। ডিসিপ্লিন হিসাবে পারফরমেন্স স্টাডিস চর্চা বেশ গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব অর্জন করেছে। নানাভাবে ডিসিপ্লিনটিকে প্রাতিষ্ঠানিক করা হয়। বৃহত্তর দৃষ্টিতে বর্তমানে দেখা যায় সেখানে দুটি শাখা রয়েছে। দুটি প্রধান শাখা রয়েছে নিউইয়র্ক ও নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে। নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে পারফরমেন্স স্টাডিস রোপিত হয়। এর শিকড় ছড়িয়ে পড়ে থিয়েটার, সমাজ বিজ্ঞান, নারীবাদ, উদ্ভট তত্ত্ব, স্বাধীনতা উত্তর পাঠচর্চা, স্বাধীনতা পরবর্তী অবয়ববাদ ও পরীক্ষামূলক পারফরমেন্সের মধ্যে। মৌখিক ব্যাখ্যান, কমিউনিকেশন, স্পিচ আর্ট থিয়োরি এবং এথ্‌নোগ্রাফি[4] বা পুরাতত্ত্ব নিয়ে চর্চার মূল সূত্রপাত নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দুটি শাখার প্রত্যেকটিই নিজেকে বদলে নিতে নিতে এগিয়েছে পারফরমেন্সের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপ্তির প্রতি একটা সাধারণ প্রতিশ্রুতি রেখে। চিনে এই পারফরমেন্সের পরিচিত ছিল ‘সোসাল পারফরমেন্স স্টাডিস’ নামে। বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও এই পারফরমেন্স স্টাডিস ছিল। রিচার্ড সেকনার এই সমস্ত ধরনের বৈচিত্র্যকেই স্বাগত জানান।

কিন্তু পারফরমেন্স স্টাডিস কি সত্যিকারের একটি স্বাধীন ক্ষেত্র? একে কি থিয়েটার স্টাডিস, কালচারাল স্টাডিসের থেকে ও অন্যান্য সম্মিলিত ক্ষেত্রগুলি থেকে আলাদা করা যেতে পারে? বুদ্ধিজীবীরা ইতিহাসের ব্যাখার গঠন করে বহুধরনের পারফরমেন্স স্টাডিসের প্রস্থানগুলি নিয়ে চর্চা করেন। পারফরমেন্স স্টাডিসের আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলাদা আলাদা প্রস্থানগুলি চর্চা করেন। আখ্যানগত রূপরেখা কীভাবে পারফরমেন্স স্টাডিসকে এগিয়ে নিয়ে গেছে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে সেই বিষয়গুলি জানানো হয়। যেগুলো

পাশ্চাত্য এবং এশিয়ান দর্শনের মধ্যে যেমন- নৃতত্ত্বের, জেন্ডার স্টাডিসের, ফেমিনিজমের, প্রতিদিনের নন্দনতত্ত্বের, রেস থিয়োরি, এরিয়া স্টাডিস, জনপ্রিয় বিনোদন, উদ্ভটতত্ত্ব এবং উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদ চর্চার দিক থেকে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া রয়েছে। একটা চলমান যোগাযোগের দ্বারা প্রগতির পুরোধার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়া খুব বেশি করে প্রভাব ফেলেছে।

বিকাশ চক্রবর্তী পারফরমেন্সের প্রতিশব্দ হিসাবে 'অভিকরণ প্রক্রিয়া' বা 'প্রয়োগশিল্প' শব্দদুটির কথা বলেন।[৫] তিনি আমাদের জানিয়েছেন- লোকসংস্কৃতির সঙ্গে এই প্রয়োগশিল্প বা অভিকরণ ক্রিয়াটির নিবিড় বন্ধনে মিলে মিশে গেছে। লোককথা, ছড়া, প্রবাদ, কথকতা, পাঁচালি এই সকল লোকসংস্কৃতির বিষয়গুলি এই পারফরমেন্সের মধ্যে দিয়ে নাকি জারিত হয়। শুধুমাত্র অ-বস্তুনির্ভর উপাদান নয়, বস্তুনির্ভর উপাদানও যেমন পরম্পরাগতভাবে পাওয়া কলাকৌশল, তার আচার আচরণ, ব্রত, উৎসব প্রভৃতিকে ছন্দময় করে সর্বাঙ্গিকভাবে সুন্দরভাবে পরিবেশন করে। এর মধ্যে দিয়ে যেমন একদিকে গোষ্ঠীর পরিচয়ের প্রকাশ দেখা যায়, তেমনি অন্যদিকে ব্যক্তির সৃজনশীল শৈল্পিক প্রতিভার পরিচয় মেলে। এই পরিচয় আমার আলোচ্য নির্বাচিত উপন্যাসগুলিতে অনেকটাই স্পষ্ট। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক,* সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *মায়ামৃদঙ্গ,* অভিজিৎ সেনের *রহু চণ্ডালের হাড়,* ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের *কলাবতী কথা,* এবং ভগীরথ মিশ্রের *আড়কাঠি-* প্রত্যেকটি উপন্যাসের আন্তরিক মিল দেখা যায়। প্রত্যেকটি উপন্যাসেরই কেন্দ্রীয় বিষয় লোকশিল্প। এই শিল্পগুলি হল ঝুমুর, আলকাপ, বাজিকরী শিল্প, ভানুমতির খেলা, টুসু, ভাদু, ঝুমুর, পাতানাচ, কাঠিনাচ, জলকেলি নৃত্য ও পটশিল্প। প্রত্যেক শিল্পগুলি আসলে এক একটি পারফরমেন্স। যদিও এই পারফরমেন্স বা লোকশিল্পগুলি প্রত্যেকটি আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। যেটুকু ছিঁটেফোঁটা টিকে আছে সেগুলি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মুষ্টিমেয়র জীবনে আজও বড়ো প্রাণের। সংখ্যায় অল্প

হলেও কোনো কোনো শিল্পীদের ভালোবাসার তাগিদ থেকে আজও পরিবেশিত হয় এই সব শিল্প। চুড়ান্ত দারিদ্র্য, বেঁচে থাকার বদলে কোনোরকমে টিকে থাকা, সামাজিক শোষণ ও অবজ্ঞাকে পাথেয় করে যারা প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন এই সাংস্কৃতিক চর্চাকে, তাদের বাস্তব জীবনকে দেখালেন ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের উপন্যাস শিল্পে। পাঠককেও পরিচিত করালেন এই সমস্ত পারফরমেন্স নির্ভর লোকশিল্প ও শিল্পীদের জীবন সংগ্রামের সঙ্গে। এক শিল্পের আয়নায় ধরা পড়ল আরেক শিল্প।

আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে পাওয়া এই সমস্ত লোকশিল্পগুলির বাস্তব পরিসর ও নানান মাত্রাকে বিচার করে তাকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গীর বদল ঘটেছে। পারফরমেন্স নির্ভর শিল্পগুলি অভিজাতের কলমে যেভাবে পরিবেশিত হল সেখানে সেগুলি পেল আরেক মাত্রা। পারফরমেন্স হিসাবে বাস্তবিক এই লোকশিল্পের স্বরূপ ও অভিজাতের কলমে তার পরিবর্তিত চেহারার আদলটির আসল গতিপ্রকৃতি আমরা খুঁজতে চেষ্টা করেছি।

২.২ *মায়ামৃদঙ্গ:* আলকাপ শিল্প

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় আলকাপ শিল্প। আলোচনার শুরুতেই আমাদের জেনে নেওয়া দরকার 'আলকাপ' শিল্পের স্বরূপ ও তার গতিপ্রকৃতি। আলকাপের অর্থ নিয়ে রয়েছে নানা মত। আলকাপের আগের নাম ছিল 'আলকাটাকাপ'। পরবর্তীকালে মধ্যপদ লুপ্ত হয়ে হল শুধু 'আলকাপ'। 'আল' শব্দের অর্থ 'রঙ্গরস', আর 'কাপ'-এর অর্থ 'কৌতুক নাটিকা'।[৬] ঔপন্যাসিক জানান আলকাপ লোকনাট্যের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী ওস্তাদ ঝাঁকসু[৭] ওরফে ধনঞ্জয় সরকার এর অভিমত ছিল 'আল মানে মৌমাছির বিষাক্ত হুল'। যে কাপে হাসির সঙ্গে হুলের বিষ মেশানো থাকে তাই আলকাপ।[৮]

আভিধানিক অর্থে ‘আল’ মানে কীটপতঙ্গাদির হুল। ‘আল’ বলতে বিদ্ধ করবার প্রবৃত্তিকেও বোঝায়। যেমন– ‘কথার আল’। আর ‘কাপ’-এর আভিধানিক অর্থ ছলনা, কৌতুক, তামাশা, ঠাট্টা, সঙ।[৯] আভিধানিক অর্থের বিচারে হুল ফুটানোর মত তীব্র বেদনাদায়ক ও ক্রিয়াশীল কৌতুক বা ঠাট্টা-তামাশাকে ‘আলকাপ’ বলা যেতে পারে। মুর্শিদাবাদে একটি কথা প্রচলিত আছে ‘আল মারছে’ অর্থাৎ হুল ফুটিয়েছে। এ সূত্র ধরে বলা যায় আলকাপের মাধ্যমে এমন এক কৌতুক বা রঙ্গরস পরিবেশিত হয়, যার মাধ্যমে আদতে তুলে ধরা হয় সামাজিক অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য। মানস মজুমদার ‘লোকনাট্যের শৈলী: আলকাপ’ প্রবন্ধে আলকাপকে ‘আলকাটাকাপ’ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সেক্ষেত্রে ‘ছড়া কাটা’ অর্থে ‘কাটা’ শব্দটি প্রযোজ্য বলে তার অনুমান। আর ‘কাপ’ শব্দের যুক্ত ‘সঙাল’ বা ‘সঙদার’ বা ‘কপ্যা’র ভূমিকাই প্রধান। তাই তার বক্তব্য অনুযায়ী আলকাপ হল ‘সঙালের কাপ’।[১০] রামকমল ভট্টাচার্য বিদ্যালংকার কাপ শব্দে কৌতুককারী ও ছদ্মবেশ– দুই অর্থই দিয়েছেন। কাপট্য ও সং (কল্প) থেকে উদ্ভব হয়েছে ‘কাপ’-এর।[১১] মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতে- কল্প থেকে জাত কাপ শব্দের অর্থ তামাশা, ছদ্মবেশ।[১২] তবে যে অর্থে এটি বহুল প্রচলিত, তা হল ‘রঙ্গরসাত্মক নাটিকা’। আলকাপ শিল্পীরা সাধারণ মানুষকে হুল বিধানোর মতো কৌতুকের মোড়কে নানারকমের সামাজিক অসংগতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখান ।

বর্তমানে শহরাঞ্চলের কোনো কোনো মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলেও, আগে অঞ্চল নির্বিশেষে আলকাপ পরিবেশিত হতে দেখা যেত সাধারণত প্রত্যন্ত পাড়াগাঁয়ের খোলা মাঠে। আর এই প্রত্যন্ত গ্রামের জনসাধারণই আলকাপের শ্রোতা। এই প্রান্তীয় মানুষগুলির খেটে খাওয়া একঘেয়েমির জীবনে আলকাপের মতো গ্রামীণ নাটক ছিল তাদের বিনোদনের এক মাধ্যম। পরিবেশকরাও ছিলেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিরক্ষর। এরা অধিকাংশই ছিলেন নিম্নবর্গের হিন্দু, মুসলমান ও চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষ। লেটো, ঝুমুর, কবিয়ালি সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক

রসানুকূল্যে আলকাপের পরিপুষ্টি। আলকাপের দলে জনা দশেক লোক থাকে। তাদের মধ্যে রয়েছেন ওস্তাদ বা মাস্টার, কমেডিয়ান বা সঙাল, সঙদার বা কপে, একজন বা দুজন নাচিয়ে 'ছোকরা'। এই 'ছোকরা' নাচ-গান করে এবং অন্যদিকে স্ত্রীলোকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এছাড়াও বাজনদারদের মধ্যে রয়েছেন হারমোনিয়াম-বাদক, তবলা-বাদক, আর চারজন দোহারকি। আলকাপে হারমোনিয়াম বাদক, তবলচি এবং দোহারকিদেরও অভিনেতা হতে হয়। প্রয়োজনে সকলকে দোহারকিগিরিও করতে হয়।

প্রচলিত আলকাপ শুরু হয় সমবেত বন্দনা দিয়ে। এরপর থাকে ছোকরাদের গান ও নাচ। তারপর পরিবেশিত হয় কপে এবং ছোকরার দ্বৈত সংগীত ও রঙ্গরসিকতা। এরপরে ছড়া বলা। একেবারে শেষে থাকে কাপ-কৌতুক কাহিনি ও ছোকরাদের গান।

চারপাশে দর্শক বেষ্টিত হয়ে মধ্যস্থলে আলকাপের আসর বসে। যাত্রার মত এতে প্রবেশ প্রস্থান পথ থাকে না। আলকাপ আগে দুদলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার রীতিতে পরিবেশিত হত। খোলা মাঠে মঞ্চে আসরের দুধার ঘেঁসে দুটি দল বসতো, মাঝখানে থাকতো উন্মুক্ত স্থান। সব শেষে চলতো দুই দলের মধ্যে 'বোল-কাটাকাটি'। আলকাপের নবরূপকার ওস্তাদ ঝাঁকসু পঞ্চরস আলকাপের স্রষ্টা। এই নতুন ধরনের আলকাপের পরিবেশনায় থাকে একটিই মাত্র দল। পুরোনো রীতির আলকাপের বোল-কাটাকাটির পর্যায়টি এখানে অনুপস্থিত। তবে নতুন ধরনের আলকাপে চলে 'পালা' নামক যাত্রা জাতীয় অলিখিত পালা অনুষ্ঠান। 'কাপ'-এর কোনো লিখিত রূপ থাকে না। ওস্তাদের পরিকল্পিত একটা আবছা কাঠামো আলকাপ শিল্পীদের মনে থাকে। আসরের চাহিদা ও পরিপুষ্টি অনুযায়ী তা পূর্ণরূপ লাভ করে। যদিও আলকাপের উদ্ভবের পিছনে ছিল ধর্মীয় গাজনের প্রসঙ্গ, পরবর্তীতে সেই ধর্মীয় অনুষঙ্গকে পিছনে ফেলে তা এগিয়ে গেছে বহুদূর। বরং তা

এখন সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। এটি পূজা উৎসব নিরপেক্ষ লোকনাট্য। তাই এর অভিনয়েরও নির্দিষ্ট কাল নেই। প্রাকৃতিক দিক থেকে অনুকূল সময় বিশেষত বর্ষাকালের পর বা দুর্গাপুজোর পর আসর বসানো হয়। আর চলতে থাকে গ্রীষ্মকাল অবধি। কোনো কোনো জায়গায় মাসাধিক কাল ধরে চলতে থাকে এই নাটক। এর সময়সীমার দৈর্ঘ্য আধ ঘন্টা থেকে বড়োজোর আড়াই ঘণ্টা। আলকাপের দর্শক বা শ্রোতারা আর্থসামাজিক দিক থেকে দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণিভুক্ত। আলকাপের আসর একসময় জুয়ার আসরের উপর নির্ভরশীল ছিল। আসর বসত লোকালয় থেকে অনেক দূরে। এই নাটক সম্পর্কে শিক্ষিত বা একটু উঁচু তলার মানুষের মনে বিরূপ ধারণা ছিল। তাই এই সংস্কৃতিকে তারা ব্রাত্য সংস্কৃতির পর্যায়ে ফেলে রেখেছেন। তাদের কাছে এ অনেকটা ‘ছোট লোকের সংস্কৃতি’। আর এই তথাকথিত ‘ব্রাত্য সংস্কৃতির’ বাহকও সমাজের ব্রাত্যজন। তারা বেশিরভাগই নিম্নবর্গের হিন্দু বা মুসলমান। অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণির। দুই ধরনের পেশাকে অবলম্বন করে তাদের বেঁচে থাকা। কারণ যে সময়ে গান হয় না- নাটক হয় না, সেই সময় তাদের অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। ফেরিওয়ালা, ক্ষেতমজুর আর রিক্সাচালক তাদের তখন একমাত্র পরিচয়।

আলকাপ শিল্পীরা এই কৌতুক নাট্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সামাজিক নানান অস্বাস্থ্যকর দিক তুলে ধরতেন। আলকাপ শিল্পীরা এভাবেই দর্শক মনোরঞ্জন করে আনন্দদান করেন। সাধারণ মানুষও তা উপভোগ করেন। কিন্তু তারা একে মর্যাদা দেয় না। দেয় না উপযুক্ত পারিশ্রমিকও। আলকাপ দলে একজন ওস্তাদ বা ছড়াদার থাকেন। ইনি ছড়া কাটেন ও কাপ বা পালা রচনা করেন। তিনি অনেক জায়গায় ‘খলিফা’ নামেও পরিচিত হন। সাধারণত তার নাম অনুসারেই দলটির নামকরণ করা হয়ে থাকে। দুই দলের প্রতিযোগিতার আসরে ইনিই দলের প্রধান কাণ্ডারী।

আলকাপে গানে যিনি মুখ্য ভুমিকায় থাকেন, তিনি কপ্যা। মালদহে আনেকে কপ্যাকে 'লাব্বাড়'' বলে থাকেন। খোট্টাই ভাষায় এর অর্থ 'ঠাট্টাকারী' বা 'কৌতুককারী'। এই কপ্যা দৈহিক অঙ্গভঙ্গি, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ, মজার গান ইত্যাদির মাধ্যমে দর্শক সাধারণকে কৌতুকরস পরিবেশন করেন।

আলকাপের মূল আকর্ষণ দলের ছোকরা। নারীবেশী পুরুষ অভিনেতা বা গায়ক এরা। মেয়েদের হৃদয়, মুখমণ্ডল, সাজ-পোশাক বিশিষ্ট এই তরুণ পুরুষ বেশ আকর্ষণীয়। এদেরকে নাচিয়েও বলা হয়। 'ছক্করবাজী' নাচের কথা বিভূতিভূষণ *আরণ্যক* -এ উল্লেখ করেছেন। এ নাচও অনেকটা সেইরকম। 'খেমটা নাচ' অংশে ছোকরারা অংশগ্রহণ করে বলে তাদের নাম 'খেমটি'। তাদের মেয়েদের মতো চলন-বলন অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করতে হয়। তাদের কণ্ঠস্বরও সুরেলা ও সুমিষ্ট হয়। তবে নির্দিষ্ট বয়সের পর আর তারা ছোকরা থাকে না। তাদের গলা কর্কশ হয়ে যায়। সিরাজের কথায় তাদের 'মৃন্ময়ী প্রতিমার রুক্ষ কাঠামো বেরিয়ে আসে'।[১৩] এদের মনস্তাত্ত্বিক ও দৈহিক সংকটকে নিয়ে চলে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা। যা প্রচলিত সমাজের চোখে নিষিদ্ধ। আর এই জন্যই এই সংস্কৃতিকে অনেকে মনে করেন 'অসংস্কৃত', 'ব্রাত্য'। এছাড়াও আলকাপ দলের অন্যান্য শিল্পীরা হলেন বাজনদার, দোহারকি, সাধারণ অভিনেতা প্রমুখ। আলকাপ দলের বাজনদাররা কেবল বাজনাই বাজান না, অন্যান্য ভূমিকায়ও মাঝে মধ্যে অবতীর্ণ হন। অন্য শিল্পীরাও প্রয়োজনে বাজান বা দোহারকির কাজ করেন।

আসলে এ এক ধরনের গ্রামীণ লোকনাটক। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ এমনকি সীমান্তবর্তী বিহারের বেশ কিছু অঞ্চলে আজও এটি প্রচলিত। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, বীরভূম, নদীয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বিহারের পূর্ব সীমান্তের

সাহেবগঞ্জ, পূর্ণিয়া, দুমকা আর বর্তমান বাংলাদেশের শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ ও রাজশাহী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের বিনোদনের মাধ্যম এই লোকনাট্যধারা। জনগণের বোঝার উপযোগী করার জন্য আলকাপে স্থানীয় কথ্য ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। বাংলার উপভাষা- বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, ঝাড়খণ্ডী, কামরূপীর নানা আঞ্চলিক রূপের ব্যবহার রয়েছে তাতে। তবে আলকাপের মতো এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতি আজ প্রায় অবলুপ্তিরই পথে। তাও আজও বীরভূমের মাড়গ্রামের শেখ মান্নান, দিনাজপুরের সুরেন মাঝি, মুর্শিদাবাদের মহম্মদ রফিক মণ্ডল, নদীয়ার ইব্রাহিম শেখ, রাজশাহীর চন্দ্রনাথ প্রামাণিকের মতো বহু পঞ্চরস অপেরার দল বাঁচিয়ে রেখেছেন এই বিলুপ্তপ্রায় শিল্পটিকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীকালে এরকম অনেক আলকাপ দলের আবির্ভাব ঘটেছিল। যদিও এর সূচনা তার বহু আগে।

বাংলাদেশের মুক্তি ঘোষণার পর, তারা চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে এসেছে। সন্তর্পণে লালন করে গেছে তাদের প্রাণের সংস্কৃতিকে। অন্যদিকে পশ্চিমবাংলার মানুষও মনে প্রাণে অনুভব করেছে বাংলামায়ের সেই একই নাড়ির টান ও তাগিদটিকে। দুই বাংলার ঐতিহ্য আলকাপের মতো এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতিটির চর্চাকে তারা অব্যাহত রেখেছেন। এই প্রবহমানতার ধারা যেন দুই বাংলার উপর দিয়ে বয়ে চলা ভাগীরথী পদ্মার একই জলধারা। দুই অঞ্চলের নিরক্ষর মানুষগুলি বিশ্বাস করে তারা হিন্দু-মুসলমান একই মায়ের সন্তান। নদীর মতোই তারা দেশভাগের রাষ্ট্রীয় বেড়াকে তোয়াক্কা করে না। এই বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন আলকাপ শিল্পী ওস্তাদ ঝাঁকসু ও অন্যান্য আলকাপ দল। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আলকাপকে বলেছেন ‘হিন্দু- মুসলিমের সাংস্কৃতিক মিলন মঞ্চ’।[১৪] মানিক সরকারের রচিত একটি আলকাপ গান থেকে আলকাপের রচয়িতাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রয়াস লক্ষ করা যায় –

গান্ধীর ফন্দি খাটবেনা

তিনার হুজুরে

হিন্দু- মুসলমান হাকো সুখেরে।[১৫]

আলকাপে এসেছে একাধারে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ও বাস্তব জীবন। আজও বাংলাদেশের অনেক জায়গায় এই আলকাপ নাটক ও গান মঞ্চস্থ হয়। এর মধ্যে কাহিনির বিষয় হিসাবে আসে বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক নানা অসঙ্গতি। যেমন গ্রামীণ জীবনে প্রচলিত নারীদের দুরবস্থা, পুরুষের ভন্ডামো, অকর্মণ্য মদ্যপ পুরুষের পুরুষাধিপত্যের চাপে নারী জীবনে নেমে আসা নানারকমের অত্যাচারের কাহিনি। মানবজীবনের অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা নরনারীর প্রেম ভালোবাসা। ভালোবাসার মানুষটিকে নিয়ে সংসার গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে প্রত্যেক হৃদয়। তবে, এ হৃদয়েরও ভাঙাগড়া আছে। আছে নানারকম পারিবারিক ও সামাজিক বিপত্তি। এক্ষেত্রে তাদের পারিবারিক সুখ ও সামাজিক সংস্কার, পণপ্রথার মতো নানা দুঃখময় দিককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় এই মাধ্যম।

পশ্চিমবঙ্গের প্রচলিত আলকাপেও আমরা দেখি ধর্মের নামে প্রচলিত নানা ভন্ডামোকে। অন্ধ সেজে নারীদের সহানুভূতির কাঙাল হয়ে শ্লীলতাহানির মতো নানান বিষয় সেখানে ধরা দিয়েছে। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য অসঙ্গতিপূর্ণ সমাজ চরিত্রের প্রতি মোক্ষম আক্রমণ। আলকাপের আদিস্রষ্টা বোনাকানার[১৬] জন্ম অবিভক্ত বাংলার মালদহ জেলার মনকষা গ্রামে। বর্তমানে এই গ্রামটি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত। শোনা যায়, বনমালী নামে এক অন্ধ নাপিত প্রতিবেশী এক মোড়লের দুই স্ত্রীর কোন্দল শুনে নাকি আলকাপের বীজ রোপণ করেন। ইনিই নাকি বোনাকানা। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী ধনঞ্জয় সরকার যিনি বোনাকানার শিষ্য। ওস্তাদ ঝাঁকসু আলকাপকে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে নিয়ে

যান। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি বোধ জাগাতে তিনি ছড়া বাঁধলেন- 'হিন্দু-মুসলমান, এক মায়ের সন্তান'।[১৭]

হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতিবোধের স্বার্থে আনন্দ বিনোদনের প্রাণকেন্দ্র আলকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ এই সংস্কৃতি আজ সমাজ থেকে প্রায় হারিয়েই যেতে বসেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সংরূপটির ঘটেছে নানা পরিবর্তন। বর্তমানে আলকাপের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে নতুনত্ব এসেছে। ক্লারিওনেট, ফ্লুট, সাইডড্রাম প্রভৃতি দেখা যাচ্ছে। নাচ, গান, ছড়া, কাপ, পালা–এই নিয়ে 'পঞ্চরস'।[১৮] 'কাপ'-এর চাইতে এখন 'পালা'র প্রাধান্য বেশি। 'কাপ'-এর নাম হয়েছে 'কমিক'। থিয়েট্রিক্যাল যাত্রার প্রভাবে অন্যান্য লোকনাট্যের মতো আলকাপও তার স্বাতন্ত্র্য হারাচ্ছে। আলকাপের আসরের সময়গত পরিবর্তন ঘটছে। আগে যেখানে সারারাত এমনকি পরেরদিন দুপুর পর্যন্ত আলকাপ চলতো, সেখানে এখন অনুষ্ঠানের সময়সীমাকে পাঁচ–ছয় ঘণ্টার মধ্যে সীমায়িত করা হয়। আগে যেখানে নারীদের কোনো স্থান ছিল না। এখন তারাও যোগদান করছে। মানুষের রুচিরও পরিবর্তন ঘটছে ধীরে ধীরে। শিক্ষিত বেকাররাও পেটের দায়ে আলকাপ দলে যোগদান করছেন। আগে আলকাপে স্থানীয় মানুষের বোঝার স্বার্থে আঞ্চলিক ভাষার বহুল ব্যবহার দেখা যেত। এখন মান্য কথ্যভাষার প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে তাই অনেক জায়গার মানুষ একে সহজেই অনুধাবন করতে পারছেন। উৎসবে, রাজনীতি সচেতন সাংস্কৃতিক মঞ্চে, স্বাস্থ্য সচেতনতায়, সর্বশিক্ষা অভিযানে আলকাপের ব্যবহার লক্ষ্ করা যাচ্ছে আজকাল। যদিও এ উদাহরণ বিরল। কিন্তু এই বিরলতা যদি ক্রমে নিশ্চিহ্নের দিকে যায় সেখানেই সমস্যা। তবে 'বাঙালি আত্মঘাতী', এই তকমা আরও বহুদিন হয়তো থেকে যাবে। আমরা ভুলব আমাদেরই ঐতিহ্যকে। যা কখনোই কাম্য নয়। বয়সের আগ্রাসনে আজ যে কর্মঠ কাল সে থেমে যাবেই। তাই বলে বয়স্কদের আমাদের মানবিক মন তো ফেলে দিতে পারে না। কারণ তারাই আমাদের উৎস।

তাছাড়া পারিবারিক ক্ষমতা হারিয়ে অনেকের মানসিক শক্তি ভবিষ্যৎকে পথ দেখায়। এই ক্ষেত্রে তাই, লোক ঐতিহ্য আলকাপ যুগের নিরিখে যতই প্রাচীন হোক না কেন, এর মধ্যেই ছিল বাংলা নাটকের বীজ। সুতরাং, ভবিষ্যৎ নির্মাণের ব্যাপারে একে অস্বীকার করি কী করে? আমরা যদি ব্যাপারটা তলিয়ে দেখি, দৈহিক বয়স্করা যেমন ভাবী প্রজন্মকে মানসিক ভরসা যোগায়, আলকাপ শিল্পী যে আজ তা করে চলেছেন তার প্রমাণ আমরা বর্তমান নাট্যাকাশে ভুরি ভুরি পাই। অসঙ্গতিপূর্ণ সমাজ চরিত্রের প্রতি তীব্র আক্রমণের শানিত বাংলা নাটক, প্রহসনগুলির মূল বীজ অন্যান্য লোকনাট্যের মতো আলকাপেও। তাছাড়া বিরল এই 'আলকাপ' দলের মধ্যে যে ক'টি টিকে আছে, তাদের টিকে থাকার মূল চাবি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে। বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো সার্বজনীন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছে। মানুষ তাদের গ্রহণ করছেও বেশি। গ্রাম্য মানুষের প্রয়োজন অপ্রয়োজন একজন শহুরে শিক্ষিত মানুষ বা সম্প্রদায় যতটা না বোঝাতে সক্ষম হবে, তার চেয়েও বেশি সফল হবে গ্রামেরই কেউ যদি এই দায়িত্ব নেয়। স্বাভাবিকভাবে তাদের ভাষায়, তাদের জন, তাদের মতো করে যখন এটি উপস্থাপন করছে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে বেশি সচেতন হচ্ছে। সেই সঙ্গে ফিরে আসছে আলকাপের জনপ্রিয়তা। সুতরাং প্রয়োজনের নিরিখে সংখ্যা গরিষ্ঠের প্রতিনিধি হিসাবে আলকাপ যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি শিল্প মাধ্যম তা অস্বীকার করি কী করে? এতে আলকাপও থাকে। আমাদের সচেতনতাও বৃদ্ধি পায়।

সবশেষে আমাদের এটা ভুললে চলবে না, আলকাপ একটি 'শিল্প'। আর শিল্পের প্রতি মানুষের তো ভালোবাসা থাকবেই। থাকা উচিত। কারণ শিল্পের বিলুপ্তি প্রকারান্তরে তার সত্ত্বগুণের ধ্বংসসাধন। অতএব 'আলকাপ'কে তো আমরা টিকিয়ে রাখতে পারি প্রয়োজনের বাইরে। শুধুমাত্র ভালবাসায়। কিন্তু সে প্রচেষ্টায় আজ বিস্তর ঘাটতি। আজ

বিশ্বায়নের কবলে অখন্ড বঙ্গের এই গ্রামীণ সংস্কৃতি আজ অবলুপ্তিরই পথে। কিন্তু এদেরকে খুঁজে বের করে বাঁচিয়ে রাখার দায় আমাদের সকলের। কারণ এ আমাদের আত্মতা। আমাদেরই স্বাতন্ত্র্য। এই আলকাপকেই উপন্যাসের বিষয় হিসাবে নির্বাচন করেছেন আলকাপ শিল্পী সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। ক্ষয়িষ্ণু এই শিল্পকে তিনি নিজের আরেক শিল্পী সত্তার গুণে অভিজাতের কাছে ধরতে চেয়ে লিখলেন *মায়ামৃদঙ্গ*। এক শিল্পের বুননে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন আরেক শিল্পের। লোকনাট্য আলকাপকে উপন্যাস শিল্পের মুনশিয়ানায় উপস্থাপন করলেন পাঠকের সামনে। সাধারণের চোখে ধরা পড়ল আলকাপ শিল্পের অলিগলি। এ অভিজাতের চোখে অনভিজাতের পরিচিতি নয়। স্বয়ং আলকাপ শিল্পীর স্ব-নির্মিত আয়না। যেন তাদের কথাই তাদের মাধ্যমে প্রকাশ পেল। সিরাজ গ্রামীণ নাটক আলকাপের বহুস্বর ও বিচিত্র দিককে ধরেছেন। আলকাপের ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে একসূত্রে গ্রন্থন করেছেন নিজের ঔপন্যাসিক মুনশিয়ানায়। পরিবেশনার সূত্রে এনেছেন অনেক আলকাপ দলের প্রসঙ্গ। বাস্তবের হুবহু বর্ণনা নয়, কল্পনার রসে জারিত করে তাকে রূপ দিয়েছেন- সত্য অথচ চাপা পড়া কাহিনির নির্মেদ উপাখ্যানে।

আলকাপের প্রথিতযশা স্বনামধন্য শিল্পী ধনঞ্জয় সরকার ওরফে ঝাঁকসার আলকাপ দল ও তার জীবনকে দিয়েই কাহিনির সূচনা। এরপরে আরেকটি মার্জিত শিক্ষিত আলকাপ দলের কাহিনিকেও পরিবেশন করেছেন। পাশাপাশি এসেছে অন্যান্য আলকাপ দলের প্রসঙ্গও। সিরাজের *মায়ামৃদঙ্গ* পড়লে আলকাপ নাটক সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে পাওয়া যায় আলকাপের সমাজকে। আলকাপের নানান বিচিত্র দিককে লেখক তাঁর নিখুঁত পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। লেখক নিজেও একজন আলকাপ শিল্পী হওয়ার সুবাদে আলকাপ সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়তো তাকে এই

উপন্যাসটির রূপায়ণে সাহায্য করেছিল। তবে অবশ্যই এর সঙ্গে মিশে ছিল তার কল্পনা। তার গুণেই একে 'সাহিত্যশিল্পে'র রঙে রঞ্জিত করলেন। লেখক প্রত্যন্ত বাংলার লোকসংস্কৃতিকে খুঁজে বের করে প্রান্তিকের এ শিল্পকে সাহিত্যরূপ দিয়ে তার মতো করে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন। বিলুপ্তপ্রায় এই শিল্প সম্পর্কে সাহিত্য রসিকের দরবারে অবহিত করেছেন।

সিরাজ আলকাপের এলাকা সম্পর্কে উপন্যাসে জানিয়েছেন, যে আলকাপ গান দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে গেছে মাত্র তিন মাসে। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বীরভূম থেকে দুমকা, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণায়– এমনকি এই উপন্যাসের একটি চরিত্র গঙ্গামণির দেশ কালুপাহাড়িতে অঞ্চলেও। আলকাপের দলের যে প্রধান ওস্তাদ, তার ভূমিকা অনেকটা 'হেড মাস্টারের মত'। ঝাঁকসার দলে ঝাঁকসাই আলকাপের দুনিয়ায় সাক্ষাৎ সূর্য। সে যেন 'রাজার রাজা'। 'ছোকরা' আলকাপ দলের অন্যতম এক আকর্ষণীয় চরিত্র। তরুণ পুরুষ এই ছোকরারা। নারী সেজে আলকাপের অভিনয়ে অবতীর্ণ হয় তারা। সিরাজের বর্ণনায়, রাতের শোভা চাঁদ, আর চন্দ্রালোকিত রাতের মতোই আলকাপের সৌন্দর্য বর্ধন করে এই ছোকরা। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এদের জীবনের এই না-নারী না-পুরুষ সত্তাটির মনস্তত্ত্বকে ধরেছেন। তাদের দৈহিক ও মানসিক সংকটকে জীবন্ত রূপদান করেছেন। 'ছোকরা' চরিত্রকে নিয়ে সমাজের বিদ্রূপবাণী লক্ষ করা যায় 'হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার' ননীবাবুর মন্তব্যে। তার কথায়, জ্বলে পুড়ে মরবে এই ছোকরারা। তারা নিজেরা মরবে, অন্যকেও মারবে। এই উপন্যাসে বর্ণিত এক ছোকরা যার নাম শান্তি, অথচ এই সংসারে সে নাকি অশান্তির দূত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদেরকে নিয়ে চলতে থাকা শিল্পীদলের ভোগ কামনার স্বার্থপূরণের বিষয়টিও। সমাজে তাদেরকে নিয়ে প্রচলিত নানা অপবাদ। সব কিছুকে মাথা পেতে নিয়ে পেটের দায়ে আলকাপকে এরা পেশা হিসাবে বেছে নেয়। শিল্পের নেশায় মেতে অনেকে মনের আনন্দেও

ছোকরা সাজে। ঝাঁকসার দলের ‘শান্তি’, সনাতনের দলের ‘সুবর্ণ’- আলকাপে ছোকরার ভূমিকায় অভিনয় করে। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সর্বদাই চলে এদের আলকাপের নারী সাজার প্রস্তুতি। এই ধরনের চরিত্ররা এইরকম প্রস্তুতি নিতে নিতে মনের দিক থেকে নিজেদের কখন’বা নারীই ভাবতে শুরু করে। আলকাপ দলের অনেক পুরুষ এদের দেখে মোহিত হয়। কখনো কখনো নারীসুলভ এই ছোকরাদের দিয়ে দলের পুরুষেরা তাদের কামনাকে চরিতার্থ করে। ছোকরাদের মধ্যেও দেখা যায় পুরুষাসক্ত হওয়ার প্রবণতা। *মায়ামৃদঙ্গ*-এ কথক শান্তির প্রতি ঝাঁকসুর আকর্ষণকে বর্ণনা করেছেন তার শরীরের বর্ণনা দিয়ে। দুধের মত ফরসা ঝকঝকে শান্তির নিটোল শরীরের বর্ণনা রয়েছে উপন্যাসে। মেয়ে সুলভ শরীর তার। তাই সবসময় ঢাকা থাকার ফলে তার শরীরের এই নিটোল মেয়েলি গড়ন। মেয়েদের মতোই নরম আর অপটু শরীর। এই মেয়েলি গড়নের জন্য বিকৃতি ঘটবার আশঙ্কা ওস্তাদের মনে। তাই ওস্তাদ ঝাঁকসা ওকে একটুকুও পরিশ্রমের কাজ করতে দেয় না। ছোকরাদের বিশেষ পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে সিরাজ আমাদের অবহিত করেছেন। ছোকরা ছাড়া অন্যান্যদের বিশেষ কোনো পোশাক নেই। সুবর্ণ নামে এই ছোকরা চরিত্রটিকে লেখক তার মেয়েসুলভ প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে তাকে জুবেদা বেগমের সঙ্গে তুলনা করে শাহজাদীদের আচার আচরণ, পরিবেশ ও ঘরানার সঙ্গে তুলনা করলেন। ‘সুবর্ণে’র মতো ছোকরা সম্পর্কে সিরাজ বর্ণনা দিয়েছেন, সুবর্ণ ঘুম থেকে চোখ খোলে, চারপাশে শরীর ঘোরায় নাচের ভঙ্গীতে। তার দুহাতের উপর আলো খেলে যায়। ব্লাউজের রঙ ঝকমকে লাল। হাতে চুড়ির শব্দ। কানে আলো করেছে দুলে। শাড়ির এবং দেহের ভাঁজে ভাঁজে আলো খেলে। ঈষৎ কাঁপে তার লাল ঠোঁট। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত, চোখে তার তুলনাবিহীন দৃষ্টি। মায়া ক্রমশ জীবন্ত হচ্ছিল। অপরূপ কণ্ঠস্বরে সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করে সে কোথায় ঘুমিয়েছিল?

কখনও কখনও নিজেদের এই 'অর্ধনারীশ্বর' সত্তা নিয়ে তাদের মনে তৈরি হয় নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা। এই ভাবনাটি লক্ষ করা যায় সুবর্ণের মধ্যে। সর্বজ্ঞ কথকের বয়ানে সিরাজ জানান, সুবর্ণ নিজে হঠাৎ ভয় পায়। তার পুরুষ সত্তাটিকে সে মাঝে মধ্যে ভুলে যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের শারীরিক পরিবর্তন পুরুষ সুবর্ণের শরীরেও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দীর্ঘ সাত বছর ধরে ছোকরা চরিত্রে অভিনয়ের ফলে শারীরিক পরিবর্তন হলেও তার নারীসুলভ মন কখনও বদলে যাবে না। তার নারী মন বুঝবে কে? তার আয়নার সামনে সাজ করে সেজেগুজে নিজেকে বারংবার দেখা, নিজের প্রতি মুগ্ধতা, নিজের প্রতি প্রেম, নিজেকে ভালবেসে ব্যাকুলতা, কারও ভালোবাসায় নিজেকে উজাড় করে সমর্পণ করে দেওয়ার সুপ্ত গোপন বাসনাকে সে তার নিজের মনে গোপনে লালন করে। তার এই সমস্ত ইচ্ছেগুলি কি শেষ পর্যন্ত মিথ্যে হয়ে যাবে, সুবর্ণের মনের ভিতর সব সময়েই এই আশঙ্কা কাজ করে। স্বভাবতই মনে আসে শান্তির মধ্যে নারীসুলভ এই কোমলভাব কি তার নিজের অন্তর সঞ্জাত– না কি অভিনয়ের প্রস্তুতির সময়ে যে লিঙ্গায়ন তা থেকে তৈরি কোনো বোধ? এই প্রশ্নগুলি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যদিও আমি এর নির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছি না। তাদের এই শিল্পময় জীবনের বাস্তব টানাপোড়েনকে উপস্থাপন করেছেন সিরাজ।

এছাড়াও সঙদার বা কপের প্রসঙ্গ এনেছেন। বাজনদারদের কথাও বললেন তিনি। এদের সবাইকে নিয়েই আলকাপ দলের চলাফেরা। সাথীরা যেন পরস্পরের সুখ দুঃখের সঙ্গী। আত্মার আত্মীয়। সিরাজের বর্ণনায়, তাদের আলকাপে আসা যেন মুসাফিরের সফরে চলা। এরা নিজেদের মুসাফির বলে। দলই তাদের জীবনের ঘর ও সংসার। তাদের কাছে দলের স্বার্থই সবার আগে। পরে তাদের বউ ছেলে মেয়ে। আসরের জীবন আর ব্যক্তিগত জীবনেও টানাপোড়েন লক্ষিত হয় এই শিল্পীদের জীবনে। দলবদ্ধভাবে তারা এক জায়গা

থেকে অন্য জায়গায় চলে। ঘর সংসার ছেড়ে আসরে পড়ে থাকতে হয় বহুদিনের জন্য। আলকাপের আসরে অভিনেতার অভিনয় ও কাপে খুশি হয়ে দর্শকেরা বকশিস দেয় শিল্পীদের। এর নাম পেলা তোলা। সিরাজ এই বিষয়টিকেও দেখালেন। উপন্যাসে সিরাজ এক জায়গায় জানিয়েছেন যে শান্তিকে নাকি আসরে পেলা ধরতো সুবিদ পাইকার। সে নাকি একবার একগাদা নোটের মালা গেঁথে ঝুলিয়ে দিয়েছিল তার গলায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আলকাপ দলকে বায়না করেন জুয়াড়িরা। উপন্যাসে চন্দ্র জুয়াড়ির নাম পাওয়া যায়। যে টানা এক পক্ষকালের জন্য আলকাপ দলকে এনেছিল। টানা পনেরো দিন ধরে কোনো খোলা মাঠে অথবা মেলা প্রাঙ্গণে কোনো পুজোকে কেন্দ্র করে আলকাপ দলকে নিয়ে আসেন জুয়াড়িরা। অনেক ক্ষেত্রে তারা দলের খাওয়া-দাওয়ারও দায়িত্ব নেয়। তবে বেশিরভাগ বেনামি দলকে নিজেদের অন্ন নিজেদেরই সংস্থান করতে হয়। রুদ্রেশ্বরের পুজোকে উপলক্ষ্য করে ঝাঁকসাকে রাঢ়বাংলায় নিয়ে যাওয়ার বায়না দেয় পরিতোষ মণ্ডল। উপন্যাসে আসে আলকাপের দলের অর্থনৈতিক সংকটের প্রসঙ্গও। নামজাদা দলের পারিশ্রমিক বেশি। বেনামি দলগুলির সেই তুলনায় খুবই কম। আলকাপের পরিবেশন শেষ হয়ে যাওয়ার পর অনেক জুয়াড়িরাই তাদের প্রাপ্ত পারিশ্রমিকটুকু দেয় না। চন্দ্র জুয়াড়ির সঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে ঝামেলা হয় ঝাঁকসার। ঝামেলার সমস্যাটি ঝাঁকসার ছোকরা শান্তির অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে। ঝাঁকসার মতো লোকের পারিশ্রমিক একশো টাকা। আর বেনামি দলগুলোর কখনো ত্রিশ কখনো বা চল্লিশ টাকা। এই পারিশ্রমিকে দশ বারোজন লোকের সংসার টানা সত্যিই কষ্টের।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ আরেক আলকাপ শিল্পী মনকির ওস্তাদ। তিনি শান্তিনিকেতনে পৌষের মেলায় আলকাপ পরিবেশন করেছেন। এই শিল্পীর কণ্ঠে আলকাপের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে তার মন্তব্য, মহাকবি বেঁচে থাকলে নাকি এ গানের কদর বেড়ে যেত।

রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতিকে বিশিষ্টভাবে সমাদর করেছেন। তাঁর অনেক গানেই রয়েছে লোকগানের প্রভাব। তাই আলকাপ সম্পর্কে মনকির ওস্তাদের বয়ানে ব্যক্ত হয়েছে সিরাজেরই আক্ষেপের সুর। সামাজিক দিক থেকেও আলকাপের গ্রহণযোগ্যতা কতটা তাও লেখক বিভিন্ন চরিত্রের মন্তব্যে পাঠককে জানিয়েছেন। উপন্যাসে দেখা যায়, বেশিরভাগ মেয়েরা আলকাপ দেখতে যায় না। বিশেষত অভিজাত পরিবারের মেয়েরা আলকাপের মতো নাটক শুনলে সমাজ তাদের ছি ছি করত। *মায়ামৃদঙ্গ*- এর চরিত্র সুধার কথায় তার প্রমাণ পাই। সুধা জানিয়েছে, গৃহস্থ মেয়েরা বা বউরা আলকাপ শুনলে নাকি চারিদিকে ঢি ঢি পড়ে যাবে। আবার, সুধা 'ছোকরানাচ'কে ব্যঙ্গ করে বলেছে 'মিঙ্গেনাচানো' নাচ।

ফারাজী মুসলমানরা (শরিয়তি)[১৯] আলকাপকে ভালো চোখে নেয় না। তারা আলকাপ দলের উপর অনেক অত্যাচার করেছে। সুবর্ণের মাথার চুল কেটে নেওয়ার শাসানিও পর্যন্ত দিয়েছে তারা। সাধারণ দর্শকদের আলকাপ সম্পর্কে মন্তব্যে তৎকালীন সমাজে আলকাপের গ্রহণযোগ্যতা কেমন ছিল সেই পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো এক দর্শক আলকাপের আসরকে বলেছে 'চ্যাংড়ামির আসর'– গ্রামের সীমানার বাইরে এর স্থান। এই আলকাপে যত রঙ ঢালা হবে, তা ততই জমবে। এখানে গৃহস্থ মেয়ে-বউদের কোনো স্থান নেই, ভদ্রসমাজও তাদের এড়িয়ে চলে। আলকাপ দলের মানুষ সমাজের একেবারে সব 'বেলেল্লা মানুষ'। আলকাপ কী, এর ব্যুৎপত্তি ও অর্থ নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন সিরাজ তার উপন্যাসে। তিনি জানান, 'কাপ' নাকি আলকাপের পালার নাম। ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, মূল শব্দ সংস্কৃত 'কাপট্য' থেকে কাপ বা ব্যঙ্গরসাত্মক নাটক এসেছে। আল শব্দের অর্থ হুল। এক্ষেত্রে হতে পারে মৌমাছির হুল। মধু খেতে মিস্টি হলেও মধু খেতে গেলে হুল ফুটানোর জ্বালাও সহ্য করতে হবে। এভাবেই আলকাপ শিল্পের গোড়ার কথাটিকে ধরিয়ে দিয়েছেন সিরাজ। শিল্পের কাজ আনন্দদান। আলকাপের কাজও কৌতুকের মোড়কে পুরে মানবচিত্তে হাসি ফুটিয়ে

আনন্দদান করা। তবে এখানে ধরিয়ে দেওয়া হয় সমাজের অসঙ্গতিকেও। তাই সিরাজ মধু খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুলের জ্বালাটিকে সহ্য করার কথা বলেছেন।

আলকাপের বিষয় হিসাবে সিরাজ উপন্যাসে অনেকগুলি পালার কথা বলেছেন। এক অসতী নারীর পালার কাহিনিকে পরিবেশন করেছেন ঝাঁকসা। কখনো আসছে গাঁয়ের আঁকড়ির কথা। আবার কখনো যে বিয়ে করতে চায় অথচ বাবা মা বিয়ে দিচ্ছে না, তার কথাও। এসেছে, লালমুখো ইংরেজদের কথা। যারা হিন্দু পাকিস্তান বিভেদের কথা বলে। কিন্তু আলকাপের শিল্পীরা তাদের তৈরি এই বিভেদকে তোয়াক্কা করে না। স্বাধীনতার প্রসঙ্গ এসেছে পালার বিষয় হিসাবে। স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ ও প্রেম ভালোবাসাও সেখানে আসছে। কেউ ভণ্ড মৌলবীর মুখোশকে উন্মোচন করেছেন কাপে। সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির গান –

> হেথা– বাদশা ফকির সবায় সমান
>
> ...হিন্দু ভাইরা বলুন হরি, আল্লা বলুন মুসলমান।[২০]

লোকশিক্ষামূলক ‘অনেক কাপে’র উল্লেখ করেছেন সিরাজ তার উপন্যাসে। নুনচুরির কাপে এসেছে ভাইদের মধ্যে কোন্দলের প্রসঙ্গ। কোন্দলের শেষে একান্ন হওয়ার কথা। কারণ ভাই ভাই-

> ঠাঁই ঠাঁই হতে নাই– গরীবের সংসার। জোট বেঁধে থাকো। মনে মিল রাখো।[২১]

এভাবেই বিষয়গতভাবে নানারকমের আলকাপের বৈচিত্র্যকে দেখালেন লেখক। ঝাঁকসা পঞ্চরস আলকাপের স্রষ্টা। আলকাপ আগেও ছিল। মালদার বহরমপুরের আরশাদ ওস্তাদকে গুরু বলে প্রণাম জানায় ঝাঁকসু। রহিমপুরের দল সেকালের। আর সিরাজ জানান আরশাদ ওস্তাদ আলকাপকে ‘লোকনাট্য’, ‘নবনাট্য’ বলেছেন।[২২] আলকাপের জন্ম নাকি এই

রহিমপুর। বোনাকানা নাকি এর আদিগুরু। রাঙামাটির দেশের সাঁওতালপাড়া দল আলকাপে নাকি 'আধুনিক'। আলকাপের দলের শিল্পীরা আগে ছিল বেশিরভাগই নিরক্ষর, দরিদ্র শ্রেণির। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে আলকাপে শিক্ষিত অবস্থাপন্ন ঘরের বেকারদের অনুপ্রবেশ ঘটল। সিরাজ আলকাপের এই সময়গত পরিবর্তনকে দেখালেন উপন্যাসে। আনিস জেলার নামকরা রোড কন্ট্রাকটারের ছেলে। সে ম্যাট্রিক পাশ। বাবার মৃত্যুর পর কন্ট্রাকটারি করতে গিয়ে লোকসান হয়ে ফকির হয়ে গিয়েছিল। তারপর আলকাপের নেশায় হঠাৎ মজে আলকাপের দলে যোগ দেয়। তবে কিছু স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, নারী মাংসলোলুপ মানুষেরা টাকার জন্য আলকাপ দলে যুক্ত হয়। তারা আলকাপের দলকে এমনকি সমাজকে পর্যন্ত কুৎসিত করে। এইরকম মানুষের অনুপ্রবেশ আলকাপ দলের একতাকে নষ্ট করলো। তবে একজন প্রকৃত শিল্প-রসিকের শিল্পের প্রতি যথার্থ আন্তরিকতা, অধ্যবসায় ও ভালোবাসাতেই শিল্পের বেঁচে থাকা। সেখানে শুধু সুন্দরেরই আরাধনা। আনন্দের সমাবেশ। আনন্দদানই যেখানে মূল উপজীব্য, সেখানে নোংরামো, কদর্যতার স্থান একেবারেই নেই। এরকম সত্যিকারের সৌন্দর্যপিয়াসী মানুষের হাতেই নির্ভর করে শিল্পের বেঁচে থাকা। আর এরই উপর নির্ভর করে শিল্পের ভবিষ্যৎ। সব শিল্পের মতো আলকাপেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

মায়ামৃদঙ্গ উপন্যাসে বর্ণিত সনাতন, সুবর্ণ, ঝাঁকসা, ফজল, শান্তি, কালাচাঁদ'রা সত্যিকারের আলকাপপ্রেমী শিল্পী। তবে তাদের এই শিল্পচর্চায় শিল্পত্ব ও মানবিকতার কোনো বিরোধ নেই। সবার উপরে আছে মানুষ। আর এই মানুষের ভালোবাসাতেই যুগে যুগে বেঁচে থাকবে আলকাপ। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিরাজ তার উপন্যাসে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে পাঠককে সেই অকৃত্রিম সত্যটি জানিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে সিরাজ একজন আলকাপ শিল্পী হয়ে আলকাপকে সাহিত্যের উপকরণ করেছেন। আর আলকাপের প্রকৃত উদ্দেশ্যটিকে উপন্যাসের নির্মাণের কাজে লাগিয়েছেন। আলকাপে যেমন হুল বিঁধানোর ছলে সামাজিক নানা

অসঙ্গতিকে প্রকাশ করা হয়, তেমনি আলকাপকে কেন্দ্রে রেখে আলকাপের সমাজের শিল্প ও বাস্তব জীবনের নানা অসঙ্গতিকে উপস্থাপন করলেন সিরাজ গোটা উপন্যাস জুড়ে। গোটা উপন্যাসের আখ্যানের বিষয় ও আঙ্গিকগত দিক থেকে তাই এ উপন্যাস হয়ে উঠল আলকাপ শিল্পী ও শিল্পের বা সমগ্র ব্যবস্থাটির আত্ম-সমালোচনা। *মায়ামৃদঙ্গ* তাই পরতে পরতে আলকাপের স্বকীয়তায় হয়ে উঠল অনন্য।

২.৩ *রহু চণ্ডালের হাড়* : বাজিকরি শিল্প

অভিজিৎ সেনের *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসটির কেন্দ্রে রয়েছে বাজিকরদের বাজিকরি শিল্প। বাজিকর সম্প্রদায়ের বাজিকরি লোকশিল্প ছাড়াও এই উপন্যাসে অন্যান্য যেসব লোকশিল্পের উপস্থাপনের বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলি হল– সাঁওতালদের বাদ্যযন্ত্র সহকারে নৃত্যগীতি, বাজিকরদের বিবাহ নৃত্যগীতি ও পোলিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে হাপুগান পরিবেশনের রীতি। 'বাজিকর'[২৩] শব্দের অর্থ ভেল্কিওয়ালা, জাদুকর ইত্যাদি। যে ব্যক্তি হাত সাফাইয়ের মাধ্যমে ভেলকি দেখায়, সেই ভেলকিবাজ, মায়াবাদী, গুনিনকে বাজিকর বলা যেতে পারে। তবে এই ধারণাটি শুধুমাত্র বাজিকর সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা। এই উপন্যাসে বাজিকরেরা আসলে একটি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী। তাদের শিল্পই বাজিকরী শিল্প। এই বাজিকরি শিল্পই বেদে সমাজের জীবিকা। বাজিকরেরা শহরে, নগরে, জনপদে সাপখেলা, ভোজবাজি, ভেলকি দেখিয়ে দর্শকের মনোরঞ্জন করেন। এই শিল্পের মধ্যে ভানুমতীর খেলারও প্রচলন আছে। নাচ, গান, দড়ির উপর খেলা দেখাতে দেখাতে হেঁটে চলা, বাঁদর নাচ দেখানো, ভালুক নাচ দেখানো, বাঁশবাজি, দড়িবাজি, পিচ্‌লু-বুঢ়া পিচ্‌লু বুড়ির কাঠের পুতুল নাচানো, কাঠের ময়ূর নাচানো, নররাক্ষস সেজে কাঁচা মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের খেলা দেখানো হয়। এই ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ খেলা দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে বাজিকরদের নিজস্ব লোক ভাষায় গান।

এই গানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে বাজতে থাকে ঢোলক। এরা যে অঞ্চলে যায় সেই অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে তাদের নিজস্ব ভাষা যুক্ত হয়। তাদের গান ও নাচের সঙ্গে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র যেমন ঢাক, ডুগডুগির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এই বাজিকরেরা লোকালয়ে ঢুকলেই দর্শক হিসাবে কিছু লোক তাদের সঙ্গে পিছু নেয়। জনসমাজ এই বেদে সম্প্রদায়দের আচার-বিশ্বাস-সংস্কারের উপর নির্ভর করে সাপখেলা বা ভেলকি খেলা দেখানোয় ভুলে যায়। এই বাজিকরেরা তথাকথিত ভদ্র সমাজে প্রবেশ করে বশীকরণের ওষুধও বিক্রি করে। তাদের সম্পর্কে প্রচলিত অপবাদ তারা নাকি এই ওষুধে ভদ্র সমাজকে বশে এনে লোক ঠকায়। ভানুমতীর খেলা[২৪] একধরনের ভোজবাজি, ইন্দ্রজাল বা ভেলকিবাজি। ভানুমতীর খেলা দেখিয়ে এরা দরিদ্র সাধারণ মানুষকে টোটকা, মাদুলি, কুহকবিদ্যা দিয়ে ভুলায়। তাদের মনের দুর্বলতা বুঝে নিয়ে তাদেরকে বশ করে। এইগুলিই এই দরিদ্র বাজিকরদের উপার্জনের মাধ্যম। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বাজিকরী শিল্পেও আসে পরিবর্তন। সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞাননির্ভর হয়েছে। মানুষের মধ্যে বেড়েছে শিক্ষার হার। অনেকেই অলৌকিকতা, বুজরুকি ইত্যাদি বিশ্বাস মানতে চান না। যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে সব কিছুকে যাচাই করে নিতে চান। স্বাভাবিকভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাজিকরদের এই টোটকা, মাদুলি, কুহকবিদ্যার মতো বুজরুকি ও অন্ধবিশ্বাস দিয়ে মানুষকে বশীভূত করা ক্রমশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তির উন্নতির ফলে মানুষের জীবনে বিনোদনেও এসেছে পরিবর্তন। সাধারণ মধ্যবিত্তের সামনেও রয়েছে বিনোদন মেটানোর অনেক উপায়। তাই সমাজ পতিত, নিচু শ্রেণির যাযাবর বাজিকরদের বাজিকরী শিল্পের বিনোদনে আজকাল আর মানুষের মন ভরে না। তাই, মূলত দর্শকের অভাবে বাজিকরদের এই শিল্প ক্রমেই অবলুপ্তির পথেই এগিয়ে চলেছে। ফলত একসময় যে যাযাবরেরা ছিল মূলত বাজিকরী শিল্প নির্ভর, তারা তাদের অন্য উপার্জনের পথ

বের করেছে। আর্থিক অনটনে তারা শুধুমাত্র এই শিল্পের উপর নির্ভর করে থাকেনি। অন্য পেশাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এরপরে আসব হাপু গানের[২৫] প্রসঙ্গে। এখনও সমাজে এই বিশেষ ধরনের লোকগানের প্রচলন আছে। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় এই গান অধিক প্রচলিত হলেও উত্তর চব্বিশ পরগনা, নদীয়াতে ও দক্ষিণ বঙ্গেও এই গানের চল আছে। 'হাপু' শব্দটির প্রতিশব্দ 'দুশ্চিন্তা' বা 'দুর্ভাবনা'।[২৬] এই হাপু শব্দটির মধ্যে দিয়েই আমরা বুঝতে পারি এই গানের বিষয় হিসাবে আসবে অভাব, অনটন, হাহাকার ইত্যাদি বিষয়গুলো। 'হা' আর 'পু' এই দুই বিশেষ মাত্রার ব্যবহার হওয়ায় এই গানের এইরকম নামকরণ হয়েছে। আমরা দেখি, তপশিলি জাতির মধ্যে যারা হাড়ি, ডোম, মাল ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষ, তারা ক্ষুধার তাড়নায় এই ধরনের গান গেয়ে ভিক্ষা করে। বিশেষত অল্পবয়সী কিশোরদের এই গানের মধ্য দিয়ে খেলা দেখিয়ে রুজি রোজগারের কথা বলা আছে। এই গানের সঙ্গে কোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। পৃষ্ঠদেশে লাঠির আঘাত করে আবার অনেক সময় নিজের বগল বাজিয়ে এই গানের গায়ক ভিক্ষা করে। এইগানে সুরের চেয়ে গানের কথাই এ গানের মুখ্য বিষয়। এ গান মূলত আখ্যানমূলক ও বেশ দীর্ঘ হয়। এ গানের বর্ণিতব্য বিষয় জীবনের অন্তহীন দুঃখের কথা।

অভিজিৎ সেন তাঁর *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসে বাজিকরদের বাজিকরি শিল্পকে কীভাবে একটি পারফরমেন্স হিসাবে দেখিয়েছেন, এবার তা লক্ষ করব। লেখক জানিয়েছেন, বাজিকরেরা যে দেশ ঘোরে সে দেশের ভাষা শিখে নেয়। আর যে দেশের ভাষা শেখে সেই দেশের ধর্মকর্মও শিখে নেয়। তাদের কাজ মূলত বাজিকরি খেলা দেখিয়ে অর্থ উপার্জন। তারা প্রধানত যে যে খেলাগুলো দেখায় সেগুলি বহুৎ কিসিমের খেলা। চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বাঁদর নাচ দেখানো, ভাল্লুকের নাচ দেখানো, পিচ্‌লু বুঢ়া ও পিচ্‌লু বুঢ়ির কাঠের পুতুল নাচানো, ভান্‌মতির খেল্, বাঁশবাজি, দড়িবাজি ইত্যাদি খেলা দেখিয়ে নাচ ও গান পরিবেশন।

সেইসঙ্গে নররাক্ষসের মতো হয়ে কাঁচা হাঁস মুরগির মাংস খাওয়া ও সেই খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কড়মড় শব্দ করে বাজিকরেরা দর্শকদের বিনোদন করে। এই উপন্যাসে বর্ণিত বাজিকরেরা সাপ ধরতে জানে না। তাই তারা সাপের খেলা দেখায় না। উপন্যাসে এই বাজিকরী পেশার মানুষগুলির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় থেকে জানা যায় যে এরা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ। এদের আদি বাসস্থান ছিল হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চলে ঘর্ঘরা নদীর তীরে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মনুষ্যসৃষ্ট অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে তারা যাযাবরের মতো অনেক অঞ্চলে ঘুরেছে। মোটামুটিভাবে গোরখপুর, সিওয়ান, দানাপুর, পাটনা, মুঙ্গের, রাজমহল, মালদা, নমনকুড়ি, রাজশাহী, আমুনাড়া, পাঁচবিবি ইত্যাদি অঞ্চলে তারা ঘুরে বেড়িয়েছে। পশুপালন এদের প্রধান একটি বৃত্তি। এরা লোকালয়, গ্রাম থেকে পশু চুরি করত। এরা মূল লোকালয় থেকে ছিল ব্রাত্য। এদের অবস্থান ছিল নদীর পাড়ে, শহরের বাইরের মাঠে, গ্রামের প্রাচীন বট গাছের নিচে। এক জায়গায় এরা বেশিদিন স্থিতিশীল হত না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চৌকিদার, থানা, পুলিশ তাদের উৎখাত হতে বাধ্য করত। নতুন স্থানে যাওয়ার সময় বাচ্চাদের আর বুড়ো-বুড়িদের মোষের পিঠে চড়াত। এদের চেহারার যে বিবরণ উপন্যাসে পাই তা হল, বাজিকরের এক সময় গায়ের রঙ ছিল সোনালি গমের মতো। বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক জল আবহাওয়ায় তা অচিরেই শ্যাওলা ধরা তামার মতো হয়ে গেল। পুরুষদের একসময় ছিল ঘাড় অবধি কেশরের মতো চুল, যা নাকি ছিল তাদের অহংকারের প্রতীক। বহু ঝড় ঝাপটার পর এখন বাজিকর পুরুষের অহংকার তার চুল পাটের ফেঁসোর মতো মলিন হয়ে গেল। তাদের দেহে যেন এক হাজার বছরের বিবর্ণতা। আর চোখের চাহনি উদ্‌ভ্রান্ত। এক শতাব্দীর ক্লান্তি তাদের রক্তে। যাদের জীবনে পথের শেষ আছে, তাদের জীবনে ক্লান্তিরও অবসান হয়। কিন্তু, বাজিকরের জীবনে স্থিতি নেই, তাই ক্লান্তিরও অবসান হয় না। তা সীমাহীনভাবে চলতেই থাকে।

বাজিকরেরা তাদের খেলা দেখিয়ে বেড়ায় শহরে, নগরে, জনপদে। তাদের মধ্যে মেয়েদের পরনে ঘাঘরা, কামিজের মতো বর্ণময় পোশাক। আর পুরুষের দেহে নগরু ও কুর্তি। কখনো আবার খেলা দেখানোর সময় তাদের গায়ে থাকে কাচের কাজকরা বস্ত্র, গলায় পাথর। তবে প্রাচীন এই বাজিকরদের জীবনে স্থান বদল ও সময়ের বদলের সঙ্গে সঙ্গেও এসেছে পরিবর্তন। তাদের পোশাক পরিচ্ছদেও সেই পরিবর্তনের চিহ্ন। এখন তাদের পরনে ধুতি, লুঙ্গি ইত্যাদি এদেশীয় বস্ত্র। স্থানিক পোশাক পরিচ্ছদকে তারা গ্রহণ করেছে। তাদের গলার 'মালাকরা মুর্শীদাবাদী সিক্কাগুলো' এখন যেন কেমন শ্যাওলাধরা। শতাব্দীর ক্লান্তিতে সেগুলোকে কেউ ঘসে মেজে চকচকে করেও তোলে না। এই প্রাচীন বাজিকরেরাই একসময় তাদের চলনে, বলনে, গানে, নাচে বিভিন্ন ধরনের খেলা আর কলহাস্যে জনপদ, শহরের রাজপথ মুখরিত করে তুলত। এই ধরনের খেলা দেখানোর সময় বাজিকরী মেয়েদের মাথায় বাঁধা থাকত বর্ণময় রুমাল বা উড়নি।

লুবিনি শারিবাকে জানায় তারা পিচ্‌লু-বুঢ়া আর পিচ্‌লু-বুঢ়ির পুতুল নিয়ে হাতের উপর গামছা ঢাকা দিয়ে পুতুল নাচ দেখাত। কাঠের ময়ূরের নাচ পরিবেশন করত। এছাড়াও তারা যে বাঁশবাজির খেলা দেখাতো উপন্যাসে তারও বর্ণনা পাওয়া যায়। কুড়ি হাত বাঁশের মাথায় সোজাভাবে দাঁড়িয়ে সূঁচে সুতো পরিয়ে দেখাত। এ খেলা নিতান্তই শারীরিক পরিশ্রম সাপেক্ষ ও ঝুঁকিপূর্ণ। এই খেলা বাজিকর ছেলেমেয়েরা ছেলেবেলা থেকেই প্রতিনিয়ত বড়োদের দেখে অভ্যাস করতে করতে শিখে নেয়। তারা জানে এ ধরনের খেলা দেখিয়েই তাদের উপার্জন করতে হবে।

বাজিকরদের এরকমই আরেকটি খেলা হল দড়িবাজির খেলা। দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, দড়ির উপর দোল খাওয়া ইত্যাদি অনুশীলন সাপেক্ষ ও দক্ষতামূলক সব

খেলা। ফোকলা দাঁতি বুড়ি নানি লুবিনিকে নাতি শারিবা যেন মনশ্চক্ষে দড়ির উপর হেঁটে যেতে ও দোল খেতে দেখে। বাজিকরেরা তাদের এই খেলা দেখানোর জন্য বেছে নেয় কোনো একটি জমজমাট হাটকে। তাদের দলের মধ্যে থেকেই অনেকে বিনিময় প্রথায় নানা ধরনের মনোহারী তৈজস পত্র বিক্রি করে। যেমন এরা একটি রঙিন পুঁতির মালা বিক্রি করে বিনিময়ে পেয়ে যায় এক ঝুড়ি চাল। একটি গালা দিয়ে তৈরি চিরুনির বদলে পেয়ে যায় পাঁচ সের সর্ষে। এরা অনেকে মাদক বা নেশার দ্রব্য বিক্রি করে যার প্রতি মানুষের দুর্নিবার আকর্ষণ। স্বাভাবিকভাবে এই নেশার দ্রব্য নেশাড়ুর সামনে ধরলে সে যেন তার বদলে সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত। দূর গ্রাম থেকে আসা সাঁওতাল মানুষ অনেক দূরবর্তী কোনো গ্রাম থেকে গরুর গাড়িতে বা বাঁকে করে শস্য নিয়ে আসে এই হাটে। এদের কাছেই বাজিকরেরা তাদের পসরা বদলি করে। রাজমহল, তিনপাহাড়, সাহেবগঞ্জের হাটেবাজারে এইভাবে বাজিকর মেয়েদের উজ্জ্বল রঙচঙা চকচকে কামিজ ও উড়নি ঘুরিয়ে খেলা দেখিয়ে উন্মাদনা প্রদর্শনের বিষয়টিকে দেখানো হয়েছে উপন্যাসে। মোষের শিঙে বাঁধা দড়ি দুপাশে টানটান করে বাঁধা থাকে। এক বর্ণময় কামিজ ও ঘাঘরা পরিহিতা বাজিকরি রমণী যে লম্বা একটি বাঁশ ঠেলতে ঠেলতে ওই টান টান দড়ির উপর দিয়ে একবার সমনে এগিয়ে আবার কখনো পিছনে সরে এসে খেলা দেখায়। যে মেয়েটি এই খেলা দেখায় তার চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক জানান, তার টান টান শরীর, তার চোখে মুখে যেন আগুনের মসৃণতা, আর পাকা গমের মতো গায়ের রঙ। এই খেলায় সাহায্য করেন আরও দুজন। একজন দড়ির উপরে হেঁটে চলা মেয়েটির চলার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। আর এই নজর রাখতে রাখতেই সে গান গায়। তার সেই বাজিকরী গান বড়োই বিচিত্র। সে গানের ভাষা কেউ বোঝে না। অথচ সে গানের সুরে রয়েছে এক অদ্ভুত মাদকতা। আর একজন ঢোলক বাদক থাকেন যার মাথায় থাকে রঙিন ফেট্টি। বাজিকরী যে গানটি পরিবেশিত হচ্ছিল সেটি হল –

মাধোয়া ধাইর্ যারে

মাধোয়া ধাইর্ যারে

ছোটি ছোটানি মাধোয়া ধাইর্ যা

তিলেক্ পড়োরে তিলেক্ পড়োরে

ছোটি ছোটানি মাধোয়া ধাইর্ যা

হেরছি ফক্‌ড়িরে হেরছি ফক্‌ড়িরে

ছোটি ছোটানি হেরছি ফক্‌ড়ি।[২৭]

আবার রহু চণ্ডালের হাড়ের কারসাজতে ভেলকি দেখায় বাজিকরেরা। তারা খেলা দেখাতে দেখাতে মুখে বলে, সত্যের গুল্লি 'ডবল হ, মিথ্যার গুল্লি চইল্যে যা- হাঁ এই দেখো ডবল''।[২৮] সঙ্গে থাকে ঢোলকের শব্দ- 'ডুগডুগডুগডুগ'। আর তার সঙ্গে চলে একটি চটুল গান –

তেরে নাও পিছল গয়া টুট গইল ঘাঘরিয়া

গাওমে ভিজ গয়া শাড়িরে-

তেরো নাও পিছল গিয়ায়

পুখর ঘাটমে চিকনা মাটি।[২৯]

এই গানটির ভাষা শুনলে বোঝা যায় এটি একটি আদিরসাত্মক গান। এখানে যে দুটি গানের কথা বলা হল সেই গানদুটিতে সেইরকমভাবে গভীর কোনো অর্থ নেই। গানের মধ্যে দিয়ে ওই মেয়েটির চলাফেরার কথা বলা হয়েছে। বাজিকরি দড়িবাজি খেলার উপর দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই গানের উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে গানের তাল ও গানে ব্যবহৃত শব্দ যেন ধ্বনি ঝংকার সৃষ্টি করেছে যা দর্শকের মনকে অন্য বিষয়ের থেকে সরিয়ে এনে তীব্রভাবে খেলার প্রতি মনোনিবেশ করে। এর দর্শক মূলত গ্রাম থেকে হাটে শস্য বেচতে আসা এক শ্রেণির সরল সোজা সাপটা মানুষ। তাদের মধ্যে 'হড়', 'সাঁওতাল' সম্প্রদায়ের

মানুষ। এই বাজিকরদের দলের অনেক মেয়ে জানত ভানুমতীর খেলা। তারা জড়িবুটি, তুকতাক, হাত দেখার মাধ্যমে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করত। এই উপন্যাসে সালমা নামের একটি নারী চরিত্রকে পাব যে এই ভানুমতীর খেলা জানতো। গৃহস্থ মানুষের জীবনের যেসব গোপনীয়তা প্রকাশ্যে আসে না সেই সমস্ত জটিল মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে অনেকেই আসত এই সালমার কাছে। সে 'ভান্‌মতি বিদ্যা' জানে তাই তাকে কেউ কেউ 'ভান্‌মতি' বলেও সম্বোধন করেছে। মানুষের মনের দুর্বলতা বুঝে নিয়ে জড়িবুটি ও তুকতাক করে ভাগ্যগণনা করে এই ভান্‌মতিরা। তাদের মতে এ এক ধরনের গুপ্তবিদ্যা। মানুষের মনোগত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মোহিনী হাসি হেসে সম্মোহিত করে লোক ঠাকায়। উপন্যাসে এক কালীপুজো উপলক্ষ্যে বাজিকরি খেলার ও আসরের বিবরণ আছে। পীতেম বাজিকরদের রাজমহল পাহাড়ের কাছে থাকাকালীন শীতকালে কালীপুজোকে কেন্দ্র করে একটি উৎসবের আয়োজন হয়। প্রেক্ষাপট হিসাবে এখানে দেখা যাচ্ছে, রাজমহল পাহাড়ের কাছে একটি মাঠকে। সেই মাঠের একটা দিককে ঘিরে আসরের স্থান নির্ধারিত হয়। সন্ধ্যার পর সেখানে অনেক আলো জ্বলতে দেখা যায়। বাজিকরি খেলা দেখানোর জন্য বেশ খানিকটা দূরে দূরে বাঁশ পুঁতে মশাল জ্বালিয়ে জাদুকরী খেলা দেখানোর জন্য বেশ আলো-আঁধারির এক রহস্যময় পরিবেশ তৈরি করা হয়। আসরের পরিবেশ বর্ণনায় লেখক জানিয়েছেন, একপাশে দু-দুটো মদের ভাঁটি আবার অন্যদিকে গুটিকয়েক মিস্টি ও ভাজাভুজির দোকান। মাঝখানে থাকে একটি প্রশস্ত জায়গা। সেখানে বাজিকরেরা তাদের শারীরিক কেরামতির খেলা দেখায়। এখানে লেখক এই খেলা দেখানোর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করছেন। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বাজিকরদের তাঁবুগুলি। প্রত্যেকটি তাঁবুতে ভিন্ন ধরনের শারীরিক কসরতের খেলা দেখানো চলছে। একটি তাঁবুতে বাজিকরেরা তাদের রহু চণ্ডালের হাড়ের সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে কিছু পরিমাণ টাকাকে দ্বিগুণ করে

দিচ্ছে। আবার কখনো পিতলকে নিমেষের মধ্যে সোনাতে বদলে দিচ্ছে। আবার আরেকটি তাঁবুতে ভান্‌মতির জাদুদণ্ডের স্পর্শে কোনো একটি মেয়ের মাথার লম্বা এক বিনুনি পলকের মধ্যে খাঁড়া হয়ে যাচ্ছে। কোথাও আবার মুহূর্তের মধ্যে গাছ থেকে ফল আবার ফের ফল থেকে গাছ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আরেক তাঁবুতে পরিবেশিত হচ্ছে বীভৎস নারকীয় যন্ত্রণার মকশো, যার বিষয় বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি অথবা ব্যাভিচারী গৃহবধূর কর্মফল। এই ধরনের পরিবেশনে প্রযোজনার জন্য থাকে এক সুচতুর কথক। সে খুব দ্রুততার সঙ্গে বক্তৃতাবাজির মধ্য দিয়ে চৌর্যবৃত্তি, বিশ্বাস ভেঙে যাওয়া, স্বজনগমনের মতো অনাচার, লোভ, হিংসা ইত্যাদি যাবতীয় নিষিদ্ধ ও উত্তেজনাপূর্ণ বিষয় নিয়ে অনর্গল অভিনয় করে কথা বলে যায়। এর দর্শক হিসাবে থাকে গ্রাম্য মানুষ যারা এই বক্তৃতাবাজির অভিনয়ের দ্বারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। বাজিকরের তাঁবুতে পরিবেশিত হয় আরেকটি উত্তেজক ও রোমহর্ষক খেলা। এই উপন্যাসে বালি নামে এক বাজিকরের এই ধরনের খেলা দেখানোর প্রসঙ্গ এসেছে। বালি একটি চওড়া কাঠের পাটাতনের সামনে তার যুবতী বউকে চোখ বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেয়। তার চারপাশে জ্বলে মশালের আলো। এবার প্রচণ্ড দ্রুততার সঙ্গে দশ হাত দূর থেকে বালি একের পর এক ধারালো ছুরি নিক্ষেপ করে কাঠের পাটাতনে যেগুলি তার বউয়ের স্থির শরীরের চারপাশে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রচণ্ড উত্তেজনায় আর উদ্বেগে দর্শকের চোখের পলক সরে না। এক একটি করে ছুরি নিক্ষিপ্ত হয় আর শিউরে উঠে দর্শক চোখ বন্ধ করে দেয়। তারপর আবার চোখ খোলে, ততক্ষণে আরও একটি ছোরা চলে গিয়ে সুনির্দিষ্ট জায়গায় বিদ্ধ হয়েছে। এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ শারীরিক কসরতের- এর খেলা সাহসী বাজিকরের জীবন ও জীবিকা। এই ধরনের আসর চলতে থাকে বেশ অনেকদিন ধরে। এতে পীতেম ও বাজিকরি দলের অন্যান্যদের বেশ ভালো রকমের রোজগার হয়। দর্শক হিসাবে আসে শহর আর তার

চারপাশের লোকজন। আসে গঙ্গাঘাটের মহাজনী নৌকার বাঙালিরা। আসে মুঘলেরা, কখনবা সাহেব ব্যবসায়ীরা। রাজমহলের কাছের ও দূরের গ্রামগঞ্জের মানুষেরা।

বাজিকরদের শারীরিক কসরতের এই ধরনের শিল্প সম্পর্কে অভিজিৎ সেন সুচারুরূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁর এই বর্ণনায় বাজিকরি শিল্পের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যায়গুলিও বাদ যায়নি। লোকশিল্পের ধারণাটি গতিশীল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গ্রহণযোগ্যতা অনুযায়ী তা নিজেকে অদল বদল করে। বাজিকরদের বাজিকরি লোকশিল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। পরিবর্তনকে সাঙ্গীকৃত করে তারো পথ চলা। বাজিকরি শিল্পকে নিয়ে যাদের পথ চলা সেই শিল্পী মানুষেরা সময়ের পরিবর্তনকে বেশ ভালোকরেই অনুধাবন করে। হাটেবাজারে যখন পণ্যদ্রব্যের বেচা কেনা চলে, দূরের কোনো শহর বা শহরতলীতে মালপত্র রপ্তানি হয়, তখন সেই হাটে যতই জনসমাগম ও প্রাণবন্ততার সতেজতা থাকুক না কেন, বাজিকরেরা বুঝতে পারে তারা বাজিকরি খেলা দেখিয়ে গেলেও দর্শক ঠিক আগের মতো আর তাদেরকে গ্রহণ করে না। দর্শকের পরিবর্তন তাদের নজর এড়ায় না। তারা দেখে, মানুষ ঠিক আর আগের মতো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে একদৃষ্টিতে তাদের খেলা দেখতে থাকে না। জনবহুল প্রাণবন্ত হাটে তারা বাঁদর ভালুক নাচ, রহু চণ্ডালের হাড়ের ভেলকি, বাঁশবাজি, দড়িবাজি ইত্যাদি খেলা দেখিয়ে চলে। বাজিকর মেয়েরা তাদের বিচিত্র কলাকৌশল ও কটাক্ষে পুরুষদের ঘায়েল করতে চেষ্টা করে। সবই চলতে থাকে। তবে আগের মতো উদ্দামতায় নয়। বাজিকরী শিল্প প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনকে দেখালেন লেখক। বাজিকররাও তাদের এই পরিবর্তনকে বেশ ভালো করেই বুঝে নিয়ে শুধু মাত্র এই পেশার উপর নির্ভর করে যে আর তাদের জীবন চলবে না, এই বিষয়টি তারা বুঝে গেল। জীবিকার পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে এই বাজিকরেরা। উপন্যাসে তাদেরকে পরবর্তীকালে গাড়ি

চালানো, চাষবাস, কুলি বৃত্তি, নৌকার মাল ওঠানো নামানো, রাস্তার কাজ, জানোয়ার বিক্রি, কর্মকারের কাজ, জানোয়ারকে খাসি-বলদ করার কাজ করতে দেখা যায়।

তবে এই উপন্যাসে বাজিকর ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য সম্প্রদায়ের কথা। যেমন- সাঁওতালদের মধ্যে দুই দলের যুবকদের মধ্যে সাঁওতাল নাচ গানের উল্লেখ আছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছে সাঁওতাল যুবতীরাও। সেই সঙ্গে তাদের সেই নৃত্যগীত পরিবেশনের সঙ্গে সংগতে রয়েছে ধামসা, তুম্‌দা, ঢোল, বাঁশি এবং মান গোত্রহীন একটি যন্ত্রের কথা যার মধ্য দিয়ে বৈচিত্র্যময় সুরের সৃষ্টি হচ্ছে।

বাজিকরদের বিবাহ সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনের উল্লেখ আছে এই উপন্যাসে। এখানে লুবিনির শারিবার বিয়ের স্বপ্ন দেখায় তাদের একসময় সেই বিয়ের অনুষ্ঠানের বাস্তব যেন উঠে আসে। নওরঁ-নওরিঁ মাঝখানে বসেছে, তার চারপাশে চারটে কঞ্চি পুঁতে তার মধ্যে পাকহীন লাল সুতো দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। সঙ্গে বিবাহগীতি –

দেও আওয়েত দেওরে ভাই
বান্ধনা তো সারিমাদে...।[৩০]

নাচের মুদ্রা ব্যবহার করে যৌতুক দেওয়ার ভঙ্গি করত। এছাড়াও এই উপন্যাসে পোলিয়া সম্প্রদায়ের একটি অনাথ ছেলে আকালুর পরিচয় পাওয়া যায়। সে বেঁচে থাকার জন্য একা একা লড়াই করে যাচ্ছে। তার পেশা হাপু গান। অবুঝ বয়স থেকেই এই গান করেই সে রোজগার করে। এই গান মূলত শারীরিক কসরতের। একটি বড়ো ছড়াকে গান ও আবৃত্তির মতো করে সুর দেওয়া হয়। এর সঙ্গে অনুষঙ্গ হিসাবে থাকে একটা মোটা লাঠি। তার সঙ্গে থাকে শারীরিক অঙ্গভঙ্গি ও শারীরিক বিকৃতি করার প্রবণতা। যে খেলা দেখায় সে একটি মোটা পাঁচন লাঠি দিয়ে উপরের দুই বাহুর সন্ধিতে, পাছায়, জানুতে, শিরদাঁড়ার ঢালু

অংশে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে। শরীরের বিভিন্ন অংশে এই আঘাতের স্থায়ী দাগ পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার নাক, মুখ, বগল থেকে এক বিকৃত ধ্বনি ও শীৎকার ধ্বনি নির্গত হয়। এই গানের দর্শক ও শ্রোতারা এই খেলা দেখার শেষ পর্বে আর শান্ত থাকতে পারে না। ক্রমাগত আঘাত ও ভয়াবহ শব্দে তারা এই খেলুড়ের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নেয়। এইভাবেই এই খেলা দেখিয়ে আকালুর মতো কিছু ছেলে জীবিকা নির্বাহ করে। এই হাপু গানের যারা দর্শক ও শ্রোতা তারা বেশিরভাগই মদ্যপ, বা পরপুরুষাসক্ত আবার পরস্ত্রী আসক্ত। এই খেলার বিচিত্র শব্দে তারা ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করে। এই ধরনের দর্শকদের মধ্যে এই খেলা দেখার পর যে শারীরিক প্রতিক্রিয়া হয় লেখক উপন্যাসে তারও বর্ণনা দিয়েছেন। শ্রোতাদের নাকি উত্তেজনায় শরীর কাঁপতে থাকে, চোখ দুটি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়, নাকের পাতা ফুলে ওঠে, কেউ কেউ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে হাঁপাতে থাকে। অনেকে আকালুর এই পেশাকে ভালো চোখে গ্রহণ করে না। তারা তাকে অন্য পেশা গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়। এই হাপু খেলা, তার শিল্পীদের বয়স, জীবিকা, দর্শক বা শ্রোতা, ভদ্র সমাজে এর গ্রহণযোগ্যতা কতটা ইত্যাদি নানা বিষয়ের উল্লেখ আছে উপন্যাসে। অভিজিৎ সেন এই ধরনের শিল্পগুলিকে তাঁর এই উপন্যাসটির বিষয় হিসাবে রেখেছেন। বাজিকরদের নানা ধরনের কসরতের খেলা যেমন- নাচ, গান, দড়ির উপর খেলা, ভেল্কিবাজি, বাঁশবাজি, দড়িবাজি, বাঁদর নাচানো ইত্যাদি খেলাগুলিকে ঔপন্যাসিক বাস্তবে দেখেছেন। উপন্যাসে বাস্তব থেকে নেওয়া শিল্পগুলির পারফরমেন্সের বিষয়টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপস্থাপন করলেন। এই বিশেষ বিশেষ লোকশিল্পগুলির প্রতিগ্রহণে বাস্তব শিল্প ও তার শৈল্পিক উপস্থাপনের গুণে তা ভিন্ন ভিন্ন স্বাদে পাঠকচিত্তকে আকর্ষণ করে।

২.৪ *রসিক:* ঝুমুর শিল্প

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক* উপন্যাসের প্রসঙ্গে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় ঝুমুর শিল্প। পারফরমেন্সের উপর লোকশিল্পটি দাঁড়িয়ে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে সব থেকে বেশি পরিচিত যে লোকগীতি তা এই ঝুমুর সঙ্গীত। এই ঝুমুর আবার নৃত্যসহযোগে পরিবেশিত হয়। ঝুমুর সংগীতে তালবাদ্য মাদলের ব্যবহার আছে। ভারতীয় লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্যময় আসরে এটি একটি জনপ্রিয় লোকশিল্প।

আদিবাসী জনজাতি অধ্যুষিত অরণ্য পর্বত সংকুল ছোটনাগপুর মালভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ঝুমুরের বিস্তার। উত্তরে সাঁওতাল পরগণা থেকে শুরু করে দক্ষিণে সমগ্র ছোটনাগপুর এবং পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটের সীমান্ত পর্যন্ত ভারতের সমগ্র মধ্যভাগ জুড়ে যে আদিবাসীরা বাস করেন তাদের মধ্যে প্রচলিত এই ঝুমুর লোকসংগীত। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূমের অংশবিশেষ নিয়ে ছোটনাগপুরের মালভূমি গঠিত। এই ভূমিভাগ ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এটি তরঙ্গায়িত উচ্চভূমিতে পরিণত হয়েছে। যার প্রকৃতি ঢেউ খেলানো, অসমতল। মাঝে মধ্যেই রয়েছে বৈচিত্র্যময় ভূমিরূপ। আঞ্চলিক ভূমিভাগ শুষ্ক, মাঝে মাঝে শীর্ণ জলধারায় জারিত। রুক্ষ রাঢ় প্রকৃতির পরিবেশ। শাল, সেগুন, মহুয়া, পিয়াল শাখায় শাখায় পল্লবিত বনানী যেন একে অপরের সঙ্গে আলিঙ্গন রত। বনপথে পড়ে থাকে শুষ্ক পাতার রাশি। এইরকম প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়েই চলে তাদের প্রাণের সংস্কৃতিটির লালন। মানুষ, প্রকৃতি আর তার সংস্কৃতি মিলে এক অখণ্ড ঝুমুর জীবনকে পরম আদরে যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছেন এখানকার মানুষ। অনিশ্চিত বর্ষায় পুরুলিয়ার কৃষিনির্ভর অর্থনীতি প্রায় ভঙ্গুর। অনাবৃষ্টিতে অভাব, অনাহার, দারিদ্র্য পুরুলিয়ার ভূষণ। দারিদ্র্য পুরুলিয়ার মানুষের নিত্যসঙ্গী। তবুও তার

ভিতর থেকেই মানুষ খুঁজে নেয় জীবনকে নাচে, গানে, উৎসবে, আচারে। মানভূমের গীত-নৃত্যধারার মূল স্রোত ঝুমুর। এ যেন এখানকার আঞ্চলিক মানসের জীবনবেদ। চোখের জল, অন্তরের আবেগ, বুকের ভাষা, চলার ছন্দ, প্রেমের লিপি সব নিয়েই ঝুমুর। তাই প্রাণের সঙ্গে তাদের গানের সম্পর্কটি এত বেশি। প্রান্তিক বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে চারিদিকে লাল রুক্ষ পাথুরে মাটি, পাথুরে পথ, উঁচু নিচু শৈলশ্রেণি ও স্নিগ্ধ সবুজ বনাঞ্চল। সেই সবুজ স্নিগ্ধতা কাটিয়ে প্রত্যেক বছর খরায় চারিদিকে নেমে আসে চূড়ান্ত রুক্ষতা। প্রাকৃতিক এই রুক্ষতার কারণে গ্রামীণ মেহনতি মানুষের জীবনে নেমে আসে যাবতীয় যত দুঃখ ও কষ্ট। তবে এই রুক্ষ কঠিন জীবনে তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন তাদের এই প্রাণের সম্পদ ঝুমুর গান। তাদের জীবনের চড়াই-উতরাই, ঘাত-প্রতিঘাতে ক্লান্তিহরণ করে এই গান। গানের ভাষা, সুর, কথা, নাচ, তাল ও গায়নশৈলী নিয়ে লোকসঙ্গীতের এই প্রকরণটির নির্মাতা এই প্রান্তিক মানুষ।

প্রান্তিকের এই ‘ঝুমুর’ শিল্প নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। সুকুমার সেন মতে – এই ঝুমুর নাকি নাটগীতের একটি ধারা। গদ্য সংলাপহীন এই পালা পুরোটাই ছিল গানের পালা। সংস্কৃতে এই ঝুমুরকে নাকি বলা হত ‘জম্ভলিকা’।[৩১] ‘জম্ভলিকা’ থেকে এসেছে রাজস্থানী ‘ঝামাল’ গান। গোবিন্দদাস কবিরাজের মাতামহ দামোদর তাঁর *সংগীত দামোদর*-এ ‘ঝুমরি’ নামে এক শৃঙ্গার রসাত্মক রাগিণীর কথা বলেছিলেন।[৩২] রাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর *সংগীত সমীক্ষা* গ্রন্থে অনুমান করেছেন যা আজকের ঝুমুর আদতে ‘প্রাচীন ঝোম্বড়াই’।[৩৩] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ *ভারত সংস্কৃতির ধারা*-য় বলেছেন, আগে যাত্রায় কৃষ্ণলীলার গানে ছোট ছোট ছেলেরা ঘুঙুর বেঁধে নাচতো।[৩৪] গানের সঙ্গে তাল সহযোগে পা ফেলত। এতে ঝুমুর-ঝুমুর করে এক মিস্টি আওয়াজ হত। সেই গানই ঝুমুর। তাঁর অনুমান, এই ঝুমুর সংগীত থেকেই নিশ্চয় পরে ঝুমুর দলের সৃষ্টি হয়েছে। হরেকৃষ্ণ মুখপাধ্যায় *বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*-এ

জানিয়েছেন– 'ঝুমর' নাকি কীর্তনেরই এক অঙ্গ। এই ঝুমর বা ঝুমরী আদতে একটি সুর। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের একটি গ্রন্থ *পদকল্পতরু*-তে[৩৫] পাওয়া যায় 'যুবতী যুথ শত গায়ত ঝুমরী'। বিদ্যাপতির পদে পাওয়া যায়– 'গওই সহি লোরি ঝুমরি সন – আরাধনে যাঞা'। তাঁর পরবর্তীতে গোবিন্দদাসের পদে পাওয়া যায় 'মদনমোহন হরি মাতল মনসিজ যুবতী যুথ গাওত ঝুমরী'। আশুতোষ ভট্টাচার্য *বঙ্গীয় লোকসংগীত রত্নাকর*-এ জানিয়েছেন, ছোটনাগপুর অঞ্চলে আদিবাসী সমাজে লৌকিক প্রেম সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণের নাম যুক্ত ছিল।[৩৬] যদিও এগুলিকে পদাবলী বলতে রাজী নন তিনি। কারণ রাধাকৃষ্ণের নামের সঙ্গে এই লৌকিক মানুষের কাহিনি যুক্ত ছিল। আদিবাসী জীবনের নিজস্ব সম্পদ এই ঝুমুরের স্বাধীন বিকাশকে কেউ আটকাতে পারেনি। বুদ্ধদেব রায়ের মতে – এই ঝুমুর গান গাওয়া হয় মাদল ও বাঁশি সহযোগে ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা জেলায়। তাঁর মতে, এই ঝুমুর শব্দটিও সম্ভবত সাঁওতালী গান থেকে এসেছে।[৩৭] আবার অনেকে মনে করেন, জুম বা ঝুম চাষ জাতীয় শ্রমগীতি থেকে এই ঝুমুরের উৎপত্তি।[৩৮] নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক, নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় নানা ধরনের কালগত বৈশিষ্ট্য আত্মগত করে এই বিশেষ গীতি বিকশিত হয়েছে। এই গানের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারাকে নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় তিনটি যুগে ভাগ করেছেন।[৩৯] প্রথমটি ঝুমুর গীতের আদিযুগ: ঝুমুর হাঁকা : কৃষিভূমির শ্রমগীতি। দ্বিতীয়টি ঝুমুর গীতের মধ্যযুগ: ঝুমুর গাহা : বাস্তুভূমির ধর্মগীত। শেষ বা তৃতীয়টি হল ঝুমুর গীতের আধুনিকযুগ: ঝুমুর বাঁধা: সমাজভূমির জীবন গীত। অনেক ধরনের ঝুমুর আছে। যেমন- দাঁড় ঝুমুর, টাঁইড় ঝুমুর (আদি রসাত্মক), কাঠি নাচের ঝুমুর, রাধাকৃষ্ণ বিষয় ঝুমুর, লৌকিক ঝুমুর, পৌরাণিক ঝুমুর, নাচনী নাচের ঝুমুর, প্রহেলিকা ঝুমুর ইত্যাদি। সুধীরকুমার করণ ও বিনয় মাহাতো ঝুমুরের যে শ্রেণিবিভাগ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম একটি ভাগ

হল নাচনি-নাচের ঝুমুর বা নাচনি শালিয়া ঝুমুর বা দরবারী ঝুমুর।[৪০] আমার আলোচ্য উপন্যাসটি সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক*, যেখানে আমরা পেয়েছি নাচনি ঝুমুর শিল্পকে।

নাচনি ঝুমুরের উদ্ভব মূলত এক আদিরসাত্মক, চটুল, খেমটি লোকনৃত্য ধারার হাত ধরে। দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য কোনো মেলা প্রাঙ্গণ বা কোনো আসরে এই নাচনি নাচের আয়োজন করা হত। নাচনিদের নৃত্যের সঙ্গে এক ধরনের চটুল রসের যে গান তাকে নাচনীশালিয়া ঝুমুর বলা হয়। এই 'নাচনিশালিয়া' সমাসবদ্ধ পদটিকে বিশ্লেষণ করলে যে দুটি মধ্যপদ বেরিয়ে আসে তার মধ্যেই এই জাতীয় ঝুমুরের আসল পরিচয় পাওয়া যায়। নাচনি শালে গাওয়া হয় ঝুমুর, তা নাচনিশালিয়া।

নাচনি নাচের মূল রূপকার 'রসিক', যার ললিত কণ্ঠে শোনা যায় ঝুমুরের ঝংকার। এ গানে শৃঙ্গার রস প্রধান, মূলত কৃষ্ণরাধার প্রেমলীলানির্ভর। এরা মূলত 'রাজাদের নর্তকী' বা 'দরবারি নটী'। নিছক মনোরঞ্জনের জন্য দরবারে আয়োজন করা হত এই নাচনি নাচ। আর তাদের সঙ্গে গেয়ে উঠতেন তাদের মনের মানুষ রসিক। তাদের উভয়ের কণ্ঠে শোনা যেত ঝুমুরের তাল। এভাবেই তারা নাচ, গান, তালের মধ্যে নেচে নেচে আসর জমিয়ে রাখত। প্রান্তিক বাংলার জনজীবনে ঝুমুরের জনপ্রিয়তার নতুন মাত্রা এনেছে এই নৃত্য গীতি। 'ঝুম্‌-ঝুম মধুর চরণধ্বনি' যিনি একাধারে যৌবনবতী, লাস্যময়ী ও নৃত্যগীত পটীয়সী। ইনিই নাচনি। তার শরীরে ছন্দময় সরসতা। খোপাবাঁধা চুল। সিঁথিতে শিঁতলি। কপালে টিকলি। কানে ঝুমকো দুল, বাহুতে বাজু, আলতা রাঙ্গা পায়ে ঘুঙুর গুচ্ছ বেঁধে, হাতে রুমাল নিয়ে মৃদু দ্রুত বিচিত্র নূপুরের ধ্বনিতে, মাদল-বাঁশি আর মন্দিরার তালে তালে দর্শকের চিত্তকে রঙিন করা ও হৃদয়কে কামনায় উদবেলিত করাতেই তার কৃতিত্ব। আর 'রসিক'কে প্রাকৃত উচ্চারণে 'রইসিকা' বলা হয়। তিনিই ঝুমুর গানের সূচনা করেন।

রসিকের মাথায় থাকে ময়ূরপাখা, রঙিন পাগড়ি, কাজকরা চাপকান জরির কাজ করা নাগরি বা কাপড়ের জুতো, কোমর থেকে নীচে পর্যন্ত ঝোলা পায়জামা কিম্বা মালকোচা বাঁধা রঙিন ধুতি, চোখে সুর্মা বা কাজল। পোশাকে কৃষ্ণ কল্পনা, কিন্তু সাজটা অনেকটা সেনাপতির মতো। সে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে মাদল, বাঁশি, নাগরা, সানাই ইত্যাদি। গানের সঙ্গে চলতে থাকে ছন্দোময় নাচ। নাচনি নাচের ঝুমুর চঞ্চল দেহবাসনা রঙিন মদিরতা দেয় দর্শক ও শ্রোতাদের। নৃত্যগীত সহযোগে ঝুমুরের বোল সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে দেহাতি নরনারীর কণ্ঠে প্রায় শোনা যায়। মাঠে-ঘাটে, বনে-প্রান্তরে, উৎসবে-অবসরে পরিবেশিত হয় এই গান ও নাচ।

মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিতে জমিদার শ্রেণির মানুষ প্রচুর পণের বিনিময়ে তরুণীদের গৃহবধূ করেছে। আর তার কামনাকুটিল লুব্ধ দৃষ্টিতে এদেরকে পণ্য করা হয়েছে। তথাকথিত দরিদ্র, নিম্নশ্রেণির গ্রাম্য যৌবনবতী অশিক্ষিত অথচ নৃত্যগীতে পটীয়সী নারী এই নাচনিরা। নাচনিদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না। সামন্তপ্রভুদের মতো রসিকেরা এদের কিনে নিত। রসিকের আশ্রিতা ও রক্ষিতা এই নাচনিদের আর্থিক দৈন্যদশাও ছিল চূড়ান্ত। ক্ষুধার তাড়নাতেই এদের বিক্রি হতে হয়। বিক্রি হওয়ার পর তাদের খাওয়া পরার ন্যূনতম সংস্থান হলেও আসরে নাচনিদের পারিশ্রমিক ছিল যৎসামান্য। নাচনি সহযোগে আসর জমানোর লভ্যাংশের সবটুকুই যেত রসিকের কাছে। স্বভাবত নাচনিদের ভাগ্যে জুটত না প্রায় কিছুই। রসিকের নাচ গানের সহচরী এই নারীরা ছিল রসিকের ভোগ্য। কিন্তু জীবনে সন্তানসন্তানাদির অধিকার থেকে এই নারীরা ছিল বঞ্চিত। আর আকস্মিকতায় সন্তান জন্মালে সে অপাংক্তেয় বলে গণ্য হত। গবাদি পশু মরলে যেমন তাদের ভাগাড়ে ফেলে দেওয়া হয় নাচনিদেরও সেরকমই সেই ভাগাড়ে ফেলে দেওয়া হত।

তবে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের মানসিকতাও বিবর্তিত হচ্ছে। অনেক জায়গায় এই নৃশংস প্রথা চালু থাকলেও অনেক উদারমনস্ক রসিক এই নাচনিদের সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। তাদের সন্তানাদিদেরও শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছেন। যদিও এই উদাহরণ দুর্লভ। নাচনিশালিয়া বা নাচনি ঝুমুরের পরিবেশনায় রয়েছে পর্যায়ক্রমিকভাবে থাকা অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের নানা বৈশিষ্ট্য। সেগুলি হল– নাচনিশাল, ধুমুল, আখড়া, ঝুমুরিয়া, বন্দনা, রসিক, নাচনি, বাদ্যযন্ত্র (সানাই, ঢুলি, মাদল) জামিন, ভাঙ্গান, আসাল। এভাবেই ঝুমুরের মধ্যেকার বিভিন্ন সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য আবর্তিত হয় ঝুমুরের পরিভাষায়। ঝুমুরদেশের ঝুমুর গানের কবিরা, গীতিকারেরা প্রতিদিন নিজ নিজ সৃষ্টিশীল উৎকর্ষে নব নব সংযোজন ঘটাচ্ছেন। তাই ঝুমুর আপন শক্তিতেই বেঁচে থাকবে। জীবনের বিবর্তনকে ভালোবাসাকে অসীম মমত্বে, শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিদিন প্রতিফলিত করে। ঝুমুর দেশের ঝুমুর গানের অপর নাম তাই জীবন।

খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতকের শেষে এই নাচনি ঝুমুর বৈঠকি ঝুমুরের সঙ্গে সঙ্গে কদর পায়। স্থানীয় জমিদারদের হাত ধরে দরবারী ঝুমুরের ক্ষেত্রটি প্রসারিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতাকেন্দ্রিক ঝুমুরে নাচনি ঝুমুরের আগমন হয়। দরবারী ঝুমুরের অনুপ্রবেশ করে এই নাচনি ঝুমুর দরবারি ঝুমুরে পরিণত হয়। তবে লৌকিক নাচনি নাচের চাকচিক্য বেড়ে যায় এই দরবারী ঝুমুরে। এই ধরনের ঝুমুর নৃত্যে সাধারণ ভদ্রঘরের মেয়েরা স্থান পেত না। তবে সাঁওতালি ঝুমুরে নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। দরবারি ঝুমুরে বাবুশ্রেণির বা সামন্তপ্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্য নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়েরা এই ধরনের চটুল নাচনি নাচ পরিবেশন করত। এই ধরনের দেহকেন্দ্রিক চটুল নাচ অনেকটা খেমটা ঝুমুরের ধরনের। বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্য এই ধরনের চটুল নৃত্য পরিবেশনের সময় নারী পুরুষ রঙচঙে, চাকচিক্যময় উগ্র পোশাক পরত। এই রসিক ও নাচনি এঁদের সামনে লিখিত গান ছিল না বা এঁরা নিজেরাও গান লিখতেন না। শুনে শুনে আগে থেকে তারা

কিছুটা স্মৃতি থেকে করতেন। বাকিটা তারা তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করতেন। এই ঝুমুরের বোল তারা তৈরি করতেন জীবনের পথচলা থেকেই। স্বভাবতই তারা স্বভাবকবি ও বেশিরভাগই নিরক্ষর। পুরুলিয়া মানভূম অঞ্চলেই নাচ গান খুবই জনপ্রিয়তা পায় সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের হাত ধরে। তাদের কামলোলুপ প্রবৃত্তির যৌন আকর্ষণের মূলে ছিল এই নাচনিরা।

প্রথম দিকে ঝুমুর গানের বাদ্যযন্ত্র হিসাবে যে যে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত তার মধ্যে রয়েছে ধামসা, মাদল। তবে কালের পরিবর্তনে যদিও ধামসা মাদল আজও এই গানের সংগত করে। কিন্তু এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মন্দিরা, ঢোল ইত্যাদি। আধুনিক নাগরিক ঝুমুর শিল্পীরা বাণিজ্যিক ও নান্দনিক দিক লক্ষ করে কোথাও এই গানে যুক্ত করছেন তবলা, কোথাও আবার যুক্ত করছেন বাঁশি বা সানাইয়ের ব্যবহার। এমনকি অনেক শিল্পীরা হারমোনিয়াম, গীটার, কীবোর্ড, কীপ্যাড ইত্যাদির ব্যবহারও করছেন। এই ঝুমুর গান আসলে এই অঞ্চলের মানুষের ধর্ম ও কর্ম সঙ্গীত। এই শ্রেণির ঝুমুর গানের সংশ্লিষ্ট উৎসবগুলির মধ্যে করম, ভাদু, তুষু, বন্দনা প্রভৃতি প্রধান। এত ধরনের নামভেদ থাকলেও এটি আদি ও অকৃত্রিম ঝুমুরেরই প্রকার। দর্শক ও শ্রোতারাও সাধারণত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণ, যারা বেশিরভাগই নিরক্ষর। তবে পরিবর্তনকে সাঙ্গীকৃত করেই ঝুমুরের বেঁচে থাকা। বর্তমানে কোনো কোনো আধুনিক ঝুমুর শিল্পী এই গানে নতুনত্ব এনে পরিবেশনার ক্ষেত্রে নানা শহুরে উদ্যোগ নিচ্ছেন। মহুল, ভূমি, দোহার, সহজিয়া ব্যান্ড এই লোক আদলকে বজায় রেখে এর নতুনত্বকে শ্রোতাদের সামনে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। এখানেই ঝুমুরের বেঁচে থাকা।

সুব্রত মুখোপাধ্যায় *রসিক* উপন্যাসে উপজীব্য করেছেন এই ঝুমুর সংস্কৃতিটিকে। এখানে ইতিহাসের মতো করে বা সমালোচকের মন নিয়ে দেখা নেই ঠিকই কিন্তু এক শিল্পীর চোখে আরেক শিল্প যেভাবে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে তা অনবদ্য। ঝুমুরের যে পশ্চাৎপট তা অনেকটা এখানে প্রতিফলিত। *রসিক* উপন্যাসে আমরা দেখি নাচনি ও রসিকের সেই বহু উত্থান পতন। আছে তাদের বাস্তবিক শিল্প জীবন ও জীবনশিল্পের গভীর টানাপোড়েন। ছোটনাগপুর মালভূমির টিলাময় অঞ্চল পুরুলিয়া। পুরুলিয়ার মানুষের প্রাণের সংস্কৃতি এই ঝুমুর। এদের লোকজীবনের আত্মায় এর অবস্থান। রুক্ষ, পাথুরে, একফসলি মানভূম পুরুলিয়ার রুখামাটি আজও আকাশ নির্ভর, সেখানকার মানুষগুলি হতদরিদ্র, তবু তারা জীবনরসের ধারায় রসিক। তাদের জীবন–মৃত্যু, দিন–রাত্রি, সুখ–দুঃখ, নিঃশ্বাস–প্রশ্বাসের সঙ্গে মিলেমিশে আছে ঝুমুরের সুর ও ছন্দ। এই সুরই হল ঝুমুর গান। স্থানীয় কবিয়ালদের সহজাত সৃষ্টি। এরই ছন্দে পরিবেশিত হয় ঝুমুর নৃত্য। শুধুমাত্র রাধাকৃষ্ণের অনুষঙ্গে যুক্ত নয় এই গান, এই ঝুমুরের অন্তরতম রূপটিতে প্রতিবিম্বিত হয় মানভূমেরই জীবনপট। রসিক-নাচনি বিবাহবন্ধনহীন দুই নর-নারী। একে অন্যের শিল্পের সহচর-সহচরী। সেই রসিক-নাচনী জীবনের এক অনন্য কথাশিল্প এই *রসিক* উপন্যাস। জীবনের প্রতি মুহূর্তের আনন্দ-বেদনা-বিরহ-মিলনের জীবন থেকেই রসিক বাঁধেন ঝুমুরের কথা। প্রকৃতির সচলতার স্পন্দনকে মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষ অনুসন্ধান করেন ঝুমুরের ছন্দ ও সুরের। জীবনের পথ চলার প্রত্যেকটি পদক্ষেপই সেই শিল্পের বিষয়ে পরিণত করেন তারা।

বিজুলিবালার নৃত্যগুরু নিশারানী। সে ঝুমুর নাচের অষ্টাঙ্গ শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে নারীশরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছে। এই অভিজ্ঞতা তাদের একেবারেই ব্যক্তিগত শিক্ষা। প্রকৃতি, দেহ সম্পর্কে চেনা পরিচয় থেকেই শুরু হয় তাদের

শিল্পচর্চা। একজন যথার্থ ঝুমুর নর্তকীকে নিজের অঙ্গ সম্পর্কে পরিচিত হতে হয় সর্বপ্রথম। ‘জীবন ফুরায়ে’ যেতে বসা জীবন অভিজ্ঞ নিশারানীর কাছে ঝুমুর নৃত্যশিক্ষায় তার মতো তথাকথিত অশিক্ষিত অথচ জীবন শিল্পরসধারায় ধনী, নারীর কণ্ঠে আমরা উচ্চারিত হতে শুনি যার মূল সুর– এই সংসারে আকাশ, গাছপালা, টাঁড় টিকর, পাহাড় কোনোটিই ফেলনার নয়। আকাশ না থাকলে যেমন পাহাড় মানায় না তেমনি পাহাড় না থাকলে বন–জঙ্গল ভালো লাগে না।[৪১] ঝুমুর নৃত্য সম্পর্কেও এই ধারণাকেই সে পূর্ণতা দেয়। ঝুমুর নাচের অষ্টাঙ্গ হল ভুরু, মাথা, মুখ, চোখ, বাহু, ছাতি, পা আর কোমর। নিশারানী বিজুলিকে জানায় অষ্টাঙ্গ বাদেও মানবদেহের যতগুলি অঙ্গ আছে সবগুলিই নৃত্যের অঙ্গ। বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতায় স্বশিক্ষিত নিশারানী জানিয়েছে, নরদেহের সমস্ত অঙ্গকে মানুষ দেখতে পায় না, কিন্তু নৃত্যের সময় সেই সব অঙ্গেরই দরকার হয়। সকলেই নাকি নৃত্য করে।[৪২] পাণ্ডবকুমারের ঠাকুরদা ভীম মাহাতো। পাণ্ডবকুমারের নাচনি বিজুলিবালার সঙ্গে তার নাতনি সম্পর্ক। দাদু নাতনির এই সম্পর্কটি চিরকালই আদরের ও ঠাট্টা রসিকতার সম্পর্ক। একসময় ভীম মাহাতো নামকরা ঝুমুর গাইয়ে ছিলেন। তিনি ঝুমুরের সুরকার ও গীতিকারও ছিলেন। এখন তিনিও বৃদ্ধ হয়েছেন। একেবারে জীবনের প্রায় উপান্তে এসে দাঁড়িয়ে। তিনি স্নেহের বিজুলিকে ঝুমুর শিক্ষা দিয়েছেন। ভীম মাহাতোকে আমরা বলতে শুনি যে তাদের চলনেই নাকি নাচ আর বলনেই নাকি গান। তবে অকৃত্রিম এই মানুষগুলির জীবনের সবটাই যেন প্রাকৃতিক। তিনি বাজনার অভাবকে পূরণ করছেন প্রাকৃতিক বাজনা ‘টাঁড়ের হুহু’[৪৩] বাতাস দিয়ে, পাতার ঝাঁঝর শব্দ দিয়ে।

তথাকথিত নিরক্ষর হলেও জীবন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষিত বৃদ্ধ ভীম মাহাতোর মুখে রসতত্ত্বের গোড়ার তত্ত্বকথাটির আভাস পাওয়া যায়। শৈবপ্রত্যাভিজ্ঞার গূঢ় তত্ত্বটিকে অত্যন্ত সরল সহজভাবে বুঝিয়ে দিলেন বিজুলিকে। *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস*-এ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

জানিয়েছেন, শৈবপ্রত্যাভিজ্ঞায় মোক্ষ হল "পূর্ণতার মূল অবস্থায় এবং বিশুদ্ধ চৈতন্যে প্রত্যাবর্তন"।[৪৪] শিল্পের এই কঠিন তত্ত্বটিকে নিজেদের জীবন অভিজ্ঞতার ছন্দে মিলিয়ে বিজুলির কাছে পরিবেশন করলেন ভীম মাহাতো। এই নাচ সম্পর্কে বিজুলিকে ঠাকুরদা ভীম মাহাতো বলছে যে বিজুলি যে নাচ জানে সেই খবরটি তার নিজের অজানা থাকলেও নাচ তো বিজুলির দেহেই সাঙ্গীকৃত। বিজুলি অস্ফুটে বলে তাজ্জব কাণ্ড। ভীম মাহাতো বিজুলির হতবাক চোখের দিকে রহস্যজনক হাসতে হাসতে বলে, যে বিজুলির মাটিতে পা ফেলা, হাত নাড়ানো, মাথা নাড়ানো এই সকল বিষয় তো আদতে নৃত্যেরই বিভঙ্গ। বিজুলীকে ভীম নাচের মুদ্রাগুলি শেখায়। সে শেখাতেও মিশে থাকে প্রকৃতির অনুষঙ্গ। ভীম মাহাতোর জীবন অভিজ্ঞতা। তাই প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষায় স্ব-শিক্ষিত ভীম গাছের পাতা দেখিয়ে বিজুলিকে জানায় নাচের সময় তার হাতের আঙুলগুলি যেন উইপোকার ডানার মতো করতে হবে। এভাবেই বাতাস, গাছের ডালপালা, আকাশ সবকিছুর মধ্যে থেকে নাচের মুদ্রাকে সাঙ্গীকৃত করার শিক্ষা দেয় ভীম বিজুলিকে। শিক্ষার্থী বিজুলির বয়ানে কথকের বর্ণনায়, বিজুলি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে শীতের শান্ত আকাশে মেঘ ভেসে চলেছে। আলগাভাবে তার সেই ভেসে যাওয়ার ভঙ্গিটি যেন বড়োই কোমল। কোনো একটি মেয়ের মুখের পাশে যেন তার খোঁপাটি খুলে গিয়ে চুলগুলি ভাসছে বাতাসে। দূরে মাঠে চরছে কাঁড়া-বলদ। দুরন্ত ছেলেরা দস্যিপানা করছে। আর পিছনে রয়েছে কঠিন পাহাড় আকাশ ঘিরে। বিজুলির নিজের কাছে প্রশ্ন জাগে এ সবই কি নকল করতে হবে তাকে? পরিবেশন করতে হবে নৃত্যের কাঠামোয়? নিতান্তই কি সহজ এ কাজ? লেখকের এইরকম মনোরম বর্ণনায় একই সঙ্গে অনেক কিছু এসে গেল। একজন যথার্থ শিল্পগুরুর প্রকৃতি নির্ভর শিক্ষা কীভাবে ছাত্রীটিকে পরিপূর্ণতা দিতে পারে, তারই নিপুণ চিত্র ভীম মাহাতোর শিক্ষা চিন্তা। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের এই সৃষ্টিকে প্রশংসা করতে গিয়ে, সত্যিই পাঠক হয়তো ভাষা হারিয়ে চুপ

হয়ে যান কিছুক্ষণের জন্য। কল্পনায় সাজিয়ে নিতে থাকেন। তারপর পড়তে শুরু করেন আবার। উঠে আসে একজন শিল্পরসিকের মনে নানান যথার্থ প্রশ্ন। ধরা পড়ে উপস্থাপিত ঝুমুরের গড়ে ওঠার নেপথ্য কাহিনি।

রসিক ও নাচনি একে অপরের পরিপূরক। তারা উভয়ে মিলে পরিবেশন করেন নাচনি ঝুমুর নৃত্যগীতি। কোনো এক মেলাকে কেন্দ্র করে ঝুমুরের আসর বসানো হয়। লেখক ঝুমুরের উপস্থাপনের প্রায় সব দিকগুলিকেই ধরতে চেষ্টা করেছেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে। ঝুমুরের উপস্থাপনার নিখুঁত বাস্তব জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসটিতে। মেলার এক আসর। রাত্রি বেশ খানিকটা গড়িয়েছে। ছাউনির পিছনে বাঁশ দিয়ে মঞ্চে উঠে যাওয়ার পথ। আসরের মাঝখানে মঞ্চ বাঁধা হয়েছে কাঠের পাটা বেঁধে। চারটি খুঁটিতে চারিদিকে হ্যাজাক লণ্ঠনের আলো। মঞ্চে দড়ির সঙ্গে বাঁধা ঝুলন্ত মাইক। পুরুলিয়ার কোনো এক প্রত্যন্ত গ্রামের মেলাপ্রাঙ্গণে মঞ্চ বর্ণনার পর, ঝুমুরের আসরের সামগ্রিক আবহ ও দর্শকদের বর্ণনা দিচ্ছেন লেখক। বর্ণনার সারকথা এই যে, আসর ঘিরে মেয়ে পুরুষে জমজমাট। বালকেরা সামনের সারিতে বসে পড়েছে। হ্যাজাকের আলোয় মঞ্চটি কেমন ধোঁয়াশা মাখানো। লোকজনের মুখের সামনে দোদুল্যমান ছায়া। মানুষের মাথা পিছিয়ে যেতেই ছায়া গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে। দূরের অদৃশ্যময় মুখগুলি অপরিচয়ের রহস্যে ঘনীভূত। তার পিছনেই মেলা। আর মেলার দোকানগুলোতে ডিবা এবং গ্যাসবাতিগুলি কেমন মিটিমিটি জ্বলছে। তাদের দুঃখী মুখে যেন কতযুগের বেদনা।

তরণীসেন তার ওস্তাদের নাচনি মঞ্জুরানীর রসিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এই আসরে। প্রভঞ্জন ওস্তাদের সংগতকারী বঙ্কিম কালিন্দী তরণীসেনকে আসরে যাওয়ার আগের মুহূর্তে হাতে তুলে দেয় একটি মাটির ভাঁড়। এর মধ্যে আছে মদ। গানের আগে এইটুকু পান

করে তরণীসেনের মেজাজ তরতাজা হয়ে যায়। জলপানের মতো এক দমে দ্রব্যটি গিলে ফেলে সে। গলা বুকে তার যেন 'আগুনের স্রোত' বয়ে যায়। মাথাটি ঝনঝন করে ওঠে। অন্যদিকে আসরের প্রস্তুতি প্রায় শেষের পথে। বাজনদারেরা সবাই মঞ্চে উঠে বসে গেছে। তাদের মাঝখানে তরণীসেনের ওস্তাদ প্রভঞ্জন একটু এগিয়ে বসেছে। আঙুলগুলি হারমোনিয়ামের উপরে যেন তার পাঁজরের মতো খেলে যাচ্ছে। বায়েনদের বিড়ির ধোঁয়ায় মঞ্চটি ভরে গেছে। তরণীসেনের পরনে টেরিকটনের সাদা জামা। আসরে এসে তার হলদেটে জামা পালটে নিয়ে এই পোশাক পরেছে। মাথায় তার পাগড়ি বাঁধার কথা ছিল। কিন্তু সংকোচে সে তা পরেনি। আসরের মূল আকর্ষণ মঞ্জুরানীকে সাজপোশাকের চড়ায় আর যেন চেনাই যাচ্ছে না। বয়সোচিত মুখের ভাঁজ রঙের প্রলেপ দিয়ে আবৃত করেছে। পরনে তার রঙিন লেস বসানো সায়ার উপর নকল ভেলভেটের শাড়ি। গোলাপি রঙের জমিতে জরির বুটি ছিটান। ভেলভেট ব্লাউজ। কোমরে নকল রুপোর চেন। নকল চুলের বল দিয়ে আটোসাঁটো করে খোঁপাটিকে সাজিয়েছে। কানে তার ঝুমকো। নাকে ঝিকিমিকি পাথরের তৈরি নাকচাবি। কপালে গিলটি করা 'সিঁথাপাটি'। সিঁথি জুড়ে চওড়া সিঁদুর। বাম হাতের মণিবন্ধে টকটকে লাল ব্যান্ড বাঁধা লেডিস ঘড়ি। যদিও তার সময়ের কাঁটাগুলি স্থির। কথকের মতে, এ যেন সামান্য মানুষের চোখে বিভ্রম তৈরি করে রসিকা সুনাগরী সেজেছে। এ যেন প্রায় প্রৌঢ়া মঞ্জুরানীর যৌবনের ধ্যানরতা মূর্তি। মঞ্চে প্রবেশের পর মঞ্জুরানী শুরু করেছে তার নৃত্যগীত। নানাধরনের শারীরিক মুদ্রা ও চোখের ইশারার ব্যবহার করছে সে। মঞ্জু তরণীসেনের বুকের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অনবনত তার বুক দুটির অনবরত ওঠা-পড়া লক্ষ করা যায়। তরণীসেনের হাত দুটোকে নিজের হাতে তুলে নিয়ে মঞ্জুরানী দর্শকের কামার্ত চোখের সামনে ঝুমুর নৃত্য পরিবেশন করে।

রসিকের নাচনি রেখে ঝুমুর গাওয়া এই প্রথাটি বংশ পরম্পরায় চলে আসছে পুরুলিয়ার অনেক পরিবারে। লেখক পাণ্ডবকুমারের পরিবারের মতো অনেক পরিবারকে এনেছেন তার উপন্যাসে। ঠাকুরদা ভীম মাহাতো। তার ছেলে ধ্রুবকুমার। ধ্রুবকুমারের ছেলে পাণ্ডবকুমার। তাদের বংশে তিন পুরুষ ধরে চলে আসছে নাচনি রাখার প্রথাটি। ঔপন্যাসিক সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঝুমুরের পরিবর্তনকেও দেখিয়েছেন। রসিক অনুষ্ঠান শুরুর আগে নাচনির সঙ্গে 'রসকলি' করতেন। এই প্রথাটি ঝুমুর গাওয়ার একটি অন্যতম অঙ্গ ছিল। এই বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত ছিল রাধাকৃষ্ণের অনুষঙ্গ। কিন্তু আসরে পরিবেশিত ঝুমুর ক্রমেই এই ধারা থেকে ভ্রষ্ট হতে থাকলো। ঝুমুরের আসর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে উঠলো মদ্যপানের আসর, জুয়াখেলার আসর। দর্শকের রুচিও ক্রমেই বদলে যাচ্ছে। নাচনির যৌন আবেদনমূলক দেহকেন্দ্রিক নৃত্য দেখে তৃপ্ত হচ্ছে নেশাতুর দর্শকের লালায়িত কামার্ত চাহনি। রসিকের তত্ত্বজ্ঞানের গভীরতাও ক্রমেই হারাচ্ছে। তার জায়গায় আসছে ফাঁকা কলসির ঠুন্‌কো আওয়াজ। দেখা যাচ্ছে গলাবাজি, বেলেল্লাপনা। সেক্ষেত্রে ঝুমুরের যথার্থ রসিকেরা এই ভ্রষ্ট সংস্কৃতিকে যে কোথাও মেনে নিতে পারছেন না তার উল্লেখ রয়েছে উপন্যাসে। উপন্যাসে বর্তমান শিল্পীদের সম্পর্কে ঝুমুরের ওস্তাদ প্রভঞ্জনের বক্তব্যে রয়েছে এরকমই আভাস। প্রভঞ্জন ছাড়াও অন্যান্য রসিকের কথায়ও এই নিম্ন পথগামিতার বিরোধী সুর শোনা যায়– এমন জলের মতো রসিক তিনি এ জন্মে দেখেননি।

ঝুমুরের দর্শকদের মধ্যেও অনেক পরিবর্তনকে দেখালেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। নাচনি রসিকের 'ডুয়েট নৃত্য' দেখে দর্শকদের মধ্যে সিটি পড়ে। এর শব্দ অনেকটা-'পুইই পুঁইই চিলিক্ চিলিক্'। ঝুমুরের বিষয়গত পরিবর্তনটি আরও অভিনব। এর ভিতর মিশে আছে লেখকের তীব্র শ্লেষ। যদিও বিষয়টি পাঠকের হাস্যরসের স্থায়ীভাবকে জাগিয়ে দেয় কথকের সুরসিক কথন-কৌশলে। দূর গ্রামের এক এম.এল.এ ভীম মাহাতোর বাড়িতে এসে হঠাৎ

তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুরু করেন। গ্রামের তথাকথিত অতি সাধারণ, অশিক্ষিত, তুচ্ছ মানুষ হলেও ভীম জীবনের অভিজ্ঞতায় ধনী। তাই এম.এল.এ সাহেবের গোপন অভীপ্সাটি সে সহজেই বুঝে নেয়। এম.এল.এ বোঝানোর ভঙ্গিতে ভীমকে বলেন এই মানভূমের প্রাণের সম্পদ ঝুমর। আর ভীম মাহাতো তার গানে সেই প্রাণটিকে বজায় রেখেছেন। পাঠক তো বটেই তথাকথিত নিরক্ষর ভীম মাহাতোও বুঝতে পারেন এই তোষামোদকে। যদিও এর কৃতিত্ব পুরোপুরি ঔপন্যাসিককেই দিতে হবে। এম.এল.এ.-র আর তর সইছে না। এবার তার গোপন ইচ্ছাকে সরাসরি পেড়ে ফেলে এম.এল.এ-এরই এক পার্ষদ। তাদের এম.এল.এ. সাহেবের বাসনা যে প্রবীণ ভীম মাহাতো তাকে নিয়ে আরেকটি ঝুমুর রচনা করুন। এম.এল.এ. এই ইচ্ছাটিকে সার্থক করলেন বৃদ্ধ ভীম মাহাতো। তার উদ্দেশ্যে রচিত হল একটি ‘এম.এল.এ ঝুমুর’। কিন্তু মৌখিক গান মনে রাখা অসম্ভব। নিজের স্বার্থে অত্যন্ত গোছানো স্বভাবের এম.এল.এ বাবু তাই গুছিয়ে এনেছেন তার কাগজ-কলমধারী পার্ষদকে। ভীম মাহাতোর বলবার সঙ্গে সঙ্গেই বা তার প্রায় কিছু আগে থেকেই খস খস শব্দে লিখে রাখলেন- পাছে কিছু বাদ পড়ে যায়! এম.এল.এ.র সর্বাঙ্গীণ রূপকে প্রকাশ করে দিলেন ভীম মাহাতো যেখানে তার শোষক ও ভক্ষক রূপটিও বাদ পড়লো না। ভীমের এই শাণিত বিদ্রূপকে বোঝার ক্ষমতা ভগীরথ এম.এল.এ.-র নেই। তাই ভীমের উপর আরওপিত চালাকির প্রত্যুত্তর এইভাবেই দিলেন বৃদ্ধ ভীম। পুরুলিয়ার প্রান্তিক জীবনের সম্পদ ঝুমুরকে এইভাবেই হয়তো বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ নিচ্ছেন রাজনৈতিক নেতারা। সুব্রত মুখোপাধ্যায় আড়ালে থেকে যথার্থ শিল্পের এই মর্যাদাভ্রষ্ট হওয়াকেই আঘাত করলেন। সরস হাসির আড়ালে থেকে গেল তার চরম বিদ্রূপ ও আন্তরিক ক্ষোভ। *রসিক*-এ সুব্রত মুখোপাধ্যায় ঝুমুরের স্বরূপগত নানা বৈশিষ্ট্যকে কাহিনি ও আখ্যান নির্মাণে ধরতে চেষ্টা করলেন।

'রসিক'-এর সাধারণ অর্থ করা যায়- রসের সমাদর করে যে। এদিক থেকে উপন্যাসে আলোচিত ঝুমুরশিল্পের চর্চা ও তার রসাস্বাদনকে বোঝানো যেতে পারে।

নাচনির সঙ্গে ঝুমুরশিল্পের সহচর হিসাবে যে নাগরের উপস্থাপনা দেখা যায় তাকেও 'রসিক' বলা হয়। আবার অন্যভাবে 'রসিক' শব্দটিকে কিন্তু ব্যঙ্গার্থেও বোঝানো যায়। ঝুমুরশিল্পের শিল্পী সমাজের হতদরিদ্র নারীদের জীবনের নাচনি হয়ে ওঠা এবং জীবনের শেষতম বিন্দু পর্যন্ত তাদের জীবনে রসিকের দ্বারা নিগ্রহ, লাঞ্ছনা, অপমান ও তিরস্কারের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত তাদের জীবন। একজন যথার্থ রসিকের কাজ প্রকৃত শিল্পের সমাদর করা। আর শিল্পের সমাদরের অর্থ তার শিল্পীর প্রতিও সম্মান প্রদান। ঝুমুরগানের রসিকেরা বাস্তবে ঝুমুরগান ও নাচের শিল্পী নাচনিদের প্রতি অবিচার করে চলেছেন। বাস্তব ও শিল্পের এই মর্মান্তিক সত্যটিকে প্রকাশ করতেই সুব্রত মুখোপাধ্যায় ব্যঙ্গার্থে 'রসিক' শব্দটিকে বুঝিবা ব্যবহার করলেন। *রসিক* উপন্যাসে ঝুমুর গাইয়েদের জীবনের এই চরম সত্যটিকে ঔপন্যাসিক প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতির তালে, সুরে, ছন্দে, পাথুরে পথ চলায় ঝুমুরের ছন্দ অনুরণিত হয় পুরুলিয়া মানভূমের নর-নারীর জীবনে। স্বতঃস্ফূর্ত এই সুর ও তালকে সাঙ্গীকৃত করে বেড়ে ওঠা নারীকে চরম দারিদ্র্যের জীবনে সুর ও তালকে সঙ্গত করেই বেঁচে থাকতে হয়। পেটের দায়ে বিক্রি হতে হয় তাদের রসিকের কাছে। স্বতঃস্ফূর্ত সুর ও তালকে বিক্রি করে বাজী রাখতে হয় তাদের জীবন। ঝুমুরগানের মনোরম আবেশে ছন্দ ও সুরের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নাচনি জীবনের এই অন্ধকার দিকটিকে ধরতে চেষ্টা করেছেন লেখক সুব্রত মুখোপাধ্যায়। গোটা উপন্যাস জুড়ে তাই তিনি প্রকৃতির বর্ণনায়, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ঝুমুরের তালের চড়াই উৎরাইকে মেলে ধরলেন। ঝুমুরের আঁতের কথাকে উপন্যাসের বয়ানে এভাবেই অসামান্য দক্ষতায় নিয়ে এলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। শিল্পের অস্ত্রেই আঘাত করলেন যথার্থ শিল্পের এই মর্যাদা ভ্রষ্ট হওয়ার কারণকেই। সরস হাসির

আড়ালে উগরে দিলেন তার চরম বিদ্রূপ ও আন্তরিক ক্ষোভ; অনেকটা ঝুমুরের শুভাকাঙ্ক্ষী প্রতিনিধি হয়েই। হতে পারেন তিনি ঔপন্যাসিক, শিল্পীতো বটেই। আরেক শিল্পের দুর্দশায় তাঁর বিবেক তো কথা বলবেই। *রসিক* যেন সেই অব্যক্ত যন্ত্রণার উপন্যাস রূপ।

২.৫ *আড়কাঠি:* লোকশিল্পের পরিবেশন

ভগীরথ মিশ্রের *আড়কাঠি* উপন্যাসে বেশ কয়েকটি লোকশিল্পের প্রসঙ্গ এসেছে। উপন্যাসে অল্প পরিসরে হলেও ভগীরথ মিশ্র দেখালেন বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গজাশিমুল গ্রামের বসু-শবর জনজাতিদের পালনীয় সমস্ত লোকশিল্পগুলিকে। এগুলির মধ্যে রয়েছে টুসুগান, ভাদুগান, নিশি উজাগর পালাগান, শীতলা বন্দনা, শিকার নাচ, চাঙ নাচ, ঝুমুর, পাতানাচ, কাঠিনাচ, বিহা গীত, পরবের গান, গাঁওলি নাচ, আষাঢ়িয়া গীত, জলকেলি নৃত্য ইত্যাদি। উপন্যাসটিতে এইসমস্ত লোকসংস্কৃতির উল্লেখ থাকলেও এগুলি সম্পর্কে বিশদে বলা নেই। উপন্যাসে কাহিনির মধ্যে জানা যায়, লোকসংস্কৃতিপ্রেমী রাজীব অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে কংসাবতীর চরে খাতরা থানায় পোড়কুলের মেলায় টুসুগানের সন্ধান পায়। বিষ্টুপুরে হোলিগানের আসরে রাত্রি উজাগর পালা শোনে রাজীব। সেটি ছিল নিশি উজাগর পালা। স্থানীয় ভাষায় যা ‘লিশি-উজাগর’[৪৫] নামে পরিচিত। ফাল্গুন মাসে যখন বসন্তের হাওয়ায় ঘরে ঘরে ‘মায়ের দয়া’ অর্থাৎ বসন্ত হয়, সেসময় দেবী শীতলা মাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য গজাশিমুলের মানুষ ভক্তি সহকারে এই পূজা করে। পূজার সঙ্গে ‘লিশি-উজাগর’ করলে মা শীতলা দেবী নাকি অনেক বেশি করে সন্তুষ্ট হন। তিন রাত্রে তিনটে পালাগান করে তারা। প্রথম রাত্রে পরিবেশিত হয় শীতলা বন্দনা। এই গজাশিমুলের স্থানীয় বসু-শবর জনজাতির লোকেরা নিজেদের মধ্যে বৈচিত্র্যময় সুরে গান করে। এর সঙ্গে চলে বন্য তালে বাজনা। এরা নিজেরা কেউ শীতলা দেবীর ছদ্মবেশ, কেউ বা বাহন গর্দভ, এমনকী অনেকে রোগ-জীবানুর ছদ্মবেশ ধারণ করে।

তারা নাচ গানের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়, এই সমস্ত রোগ-জীবাণুর শক্তির ভয়াবহতাকে। এদের এমন মৌলিক অভিনয় দেখে সহজেই মানুষ এই রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে বোঝে। দর্শক হিসাবে এদের এই প্রাণবন্ত অভিনয় দেখে রাজীবের গা ঘিন ঘিন করে। দর্শকের বিশ্বাস উৎপাদনে সাহায্য করে এই গান। এরপর দ্বিতীয় রাত্রে চলে শিকার-নাচ। অরণ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই মানুষদের জীবনের এক বিশেষ উৎসব এই শিকার–উৎসব। সাধারণভাবে জঙ্গলে শিকার করা তাদের এক জীবিকা। তাদের সে শিকারের আলাদা মেজাজ। তবে আনুষ্ঠানিক শিকারের উদ্দীপনা যেন আরও অনেক গুণ বেশি। বাস্তবের জীবিকা নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। শিকারজীবী মানুষেরা নাচ করে, গান গায়, মেতে ওঠে কোলাহলে। বীরত্বসূচক মন্তব্য শোনা যায় বীর পুরুষের প্রতি প্রিয়জনের উক্তিতে। ঘর থেকে বেরোবার সময় এই বীরদের প্রতি প্রিয়জনদের আজ্ঞা শোনা যায়। প্রিয়জনদের ধারণা, পুরুষের নাকি বীরত্ব প্রকাশিত হবে তার জন্য সবচেয়ে বড়ো গোসাপটি আনলে। এই অভিনয়টি চলতে থাকে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে। একে ঔপন্যাসিক নৃত্য-নাট্য বলছেন। লাফানো-ঝাঁপানো, শৌর্য-বীর্য সব দিক থেকেই এই শিকার-নাচ অভিনব।

তৃতীয় রাতের পরিবেশন চাঙ-নাচ। এক বিশেষ ধরনের গানের সঙ্গে সমবেতভাবে এই নাচ পরিবেশিত হয়। তার সঙ্গে থাকে চাং আর মাদল। শ্রোতা হিসাবে শুনতে শুনতে এই নাচগানের স্বতন্ত্র ভাষা, বিশেষ ধরনের সুর, নাচের অভিনব আঙ্গিক কৌশল মানুষের রক্তের মধ্যে কেমন একটা মাদকতা তৈরি করে। গজাশিমুলের মানুষেরা একাধারে এই নাচ গানের অংশগ্রহণকারী ও শ্রোতা। বংশ পরম্পরায় এরা এই শিল্প ও সংস্কৃতির লালন ও পালনকারী। সে জানায় তাদের জাতির মূল বসতি ছিল তামাজোড় গ্রামে। পাহাড়, ডুংরি ও বনে ঘেরা সে গ্রামের চারপাশ। পাশ দিয়ে বয়ে চলে সুবর্ণরেখা নদী। এই জনজাতির ধারণা ও বিশ্বাস যে তাদের বসু-শবর জাতের মধ্যে জন্ম নিয়েছিলেন স্বয়ং ব্রজরাজ কানাই। যাঁর

ভুবন ভোলান রূপ আর ভাস্করের মতো জ্যোতি। সুমধুর কণ্ঠ। বাঁশির সুরে যেন অমৃত মাখানো। মেয়েরা সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করতে যায়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। তারপর বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়। মেয়েরা সন্ধ্যের সময় ঘরে ফেরে। গ্রামের মুরুব্বিদের মনে সন্দেহ হয় মেয়েদের নিয়ে। তারা এতক্ষণ ধরে স্নান করতে করতে আদতে কি করে? সুযোগ বুঝে তারা সুবর্ণরেখার তীরে যায়। সেখানে গিয়ে তারা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। এক কোমর জলের মাঝে উদোম গায়ে মেয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। নদী পাড়েই একটি মহুল গাছের ডালে ডালে থরে থরে রয়েছে মেয়েদের অঙ্গের বসন। আর ওই মহুল গাছেরই একেবারে মগডালে চড়ে বসেছে কানাই। একমনে বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। বাঁশির সুর সকলের মন আকুল করে তুলছে। আর গ্রামের মুরুব্বিরা তো সেই দৃশ্য দেখে প্রচণ্ড রেগে যায়। মেয়েদের নামে কলঙ্ক রটায়। মুরুব্বিরা সকলে মিলে তখন কানাইকে গাছ থেকে নামিয়ে এনে প্রচণ্ড প্রহার করে তাকে গ্রাম ছাড়া করলে। এরপর নাকি ঠিক সেই বছরেই দেখা গেল নিদারুণ খরা। সুবর্ণরেখার জল গেল শুকিয়ে। খালে বিলে শুধুই বালি। প্রকৃতিতেও রুক্ষতা। গাছগুলি পত্রশূন্য। বনে ফল নেই, ক্ষেতে ঘাস নেই। হাহাকার করে মরতে শুরু করল তামাজোড়ের সব মানুষ। এরকমই এক দিনে নাকি কস্তো মল্লিকের ঠাকুরদার ঠাকুরদা দেখল কানাইজীর স্বপ্ন। ব্রজরাজ কানাই স্বপ্ন দেখালেন তাকে তামাজোড়ের মানুষ নাকি মেরে ফেলেছে। এই কারণেই নাকি তামাজোড়ে এই খরা। কস্তো মল্লিকের ঠাকুরদার ঠাকুরদাকে কানাইজী এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায়ও বলে দেয়। কানাইজী তামাজোড়ের মানুষদের সুবর্ণরেখা নদীর ধারে মহুল গাছের তলায় তাঁকে পুজো করার কথা বলে। ব্রজরাজ কানাইজী নাকি চাইলেন যুবতীরা জলকেলি নৃত্য করে ব্রজরাজের আরাধনা করে কানাইজীকে সন্তুষ্ট করুক। তবেই তাদের শান্তি আসবে। বৃষ্টি আসবে। ফলত ফসল ফলবে। আর যে যুবতীরা এই আরাধনা করবে তারা স্বর্গলাভ করবে। এরপর থেকে

তামাজোড়ে খুব আড়ম্বর করে পুজো হল। ওই কলঙ্কিনী মেয়েরা সেই মহুল গাছের তলায় জলকেলি নৃত্য করলে। একেবারে হাতেনাতে ফল পেল তামাজোড়ের মানুষ। ঠিক তিনদিন বাদে হঠাৎ ঈশান কোণে একাবারে কৃষ্ণ ঠাকুরের গায়ের রঙের মতো ঘন কালো মেঘ। আকাশ ফেটে বৃষ্টি এল। এরকম বৃষ্টি আগে কখনো দেখেনি তামাজোড়ের মানুষ। প্রকৃতির অনেক সমৃদ্ধি দেখা দিল। জমিতে জমিতে দেখা গেল হাতি-ঠেলা ধান। অফুরন্ত ফল-ফলাদি। মৌচাক ভর্তি মধু। গাই গরুর বাটে অঢেল দুধ।

সাতদিন পরে ব্রজরাজ কানাই পুনরায় স্বপ্নে জানালেন যে তিনি নাকি কানাই শবর হয়ে শবরদের ঘরে জন্ম নেন। কিন্তু এরপর থেকে তাঁর অবস্থান পাহাড়ে। তাঁর নতুন নামকরণ হল- কানাইশর জিউ। সেই পাহাড়ে অধিষ্ঠান থেকে পাহাড়টির নাম হবে কানাইশর পাহাড়। তিনি নিয়ম করে তাঁর পুজো চাইলেন আষাঢ় মাসের তৃতীয় শনিবার হোক। সেই থেকেই আষাঢ় মাসের প্রত্যেক শনিবারে কানাইশর জিউর পুজো চলছে। এই উপলক্ষ্যে সেখানে বিরাট মেলা বসে। আর ঐদিন রাতে মেয়েরা নদীর পাড়ে জলকেলি নৃত্য করে। কানাইশর জিউয়ের এই আজ্ঞা থেকেই তামাজোড়ের বসু-শবর জাতির মধ্যে এই জলকেলি নাচের প্রচলন। এই গানের সুর নাকি স্বয়ং ব্রজরাজই বেঁধেছিলেন। আর সে গানের ভাষা হল দৈবভাষা। তাই এই জনজাতির বিশ্বাস জনসমক্ষে সেই নাচ দেখানো যাবে না। লোকসংস্কৃতি ব্যবসায়ী রাজীবের কাছে এই নতুন ধরনের লোকসংস্কৃতি জলকেলি নৃত্য অসামান্য একটি পুঁজি। তার ধারণা একে নিয়েই বেশ অনেকটা পথ চলা যাবে। অভিনব এই লোকনৃত্যের আঙ্গিক দেশীয় তথা আন্তর্জাতিক বাজারে জনপ্রিয়তা অর্জন করবে। রাজীবের ধারণা জলকেলি নৃত্য বিপুল সাফল্য পাবে। এর সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে রাজীবের খ্যাতি ও যশ। একজন দর্শক হিসাবে এই জলকেলি নৃত্য দেখে ক্যাথি বার্ড মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছে। সে রাজীবকে তার প্রতিক্রিয়া লিখে জানিয়েছে। ভালুকমুড়া ডুংরিতে ছোট-

খরসতিয়া নদীর পাড়ে জ্যোৎস্না রাতে বুড়ো মহুল গাছের নিচে জলকেলি নৃত্যের রিহার্সাল দেখে ক্যাথি বার্ড নামে এক বিদেশিনী বেশ কয়েকদিন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। সেই অলৌকিক পরিবেশ, মাদলের ধ্বনি, মলের আওয়াজ সে এখনও চোখ বন্ধ করলেই শুনতে পায়। তার শিরায় যেন সেই সুর এখনও তরঙ্গ তোলে। ক্যাথি বার্ডের এই বিষয়টি নিয়ে আবেগময় রোমাণ্টিক বিলাসিতার ফানুস গড়ে ও রাজীবের প্রশংসা করে আদতে রাজীবকে দিয়ে কাজ হাসিল করানোর উদ্দেশ্যটিকেই পাঠকের ধরতে বাকি থাকে না। উপন্যাসের সূচনায় যে রাজীবকে পাওয়া যায় লোকসংস্কৃতি-প্রেমী হিসাবে, কাহিনির অগ্রগতিতে ও পরিণতিতে সে ক্রমশ লোকসংস্কৃতি ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়েছে। সে গজাশিমুল গ্রামের লোকসংস্কৃতিকে পুঁজি করে নিজের নাম-যশ তো বাড়িয়েছেই। সেই সঙ্গে লাভের অংকও ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে সেই গজাশিমুলের বসু-শবর জাতির মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের সংস্কৃতি সর্বোপরি তাদের জীবনকে পণ্য করেছে। তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বিশ্বাসকে কলুষিত করেছে। লেখক ভগীরথ মিশ্র ঔপন্যাসিক বুদ্ধিজীবী লোকসংস্কৃতিপ্রেমীদের লোকসংস্কৃতি ও শিল্পীদেরকে পুঁজি করে নিজেদের আখের গোছানোর স্বার্থবাজিকেই দেখিয়েছেন তাঁর এই উপন্যাসে। লোকসংস্কৃতি নিয়তই পরিবর্তনশীল। নাগরিক সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতির আদান-প্রদান চলে। কোনো একটি লোকশিল্প কোন্ স্থানে, বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে উপস্থাপন করা হবে সেই অনুযায়ী তার দৃষ্টিভঙ্গী, রুচি ও দর্শক নির্ধারিত হয়। এর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয় লোকসংস্কৃতির বাণিজ্যিক স্বার্থ। তবে এই বাণিজ্যিকতায় আদতে মূল শিল্পীরা কতটা উপকৃত হয়, সেই প্রশ্ন বার বার আজকের দিনেও তৈরি হয়। ভগীরথ মিশ্রের *আড়কাঠি* উপন্যাসেও আদতে রাজীবের দ্বারা ঠিক কতটা উপকৃত হয়েছে বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত গজাশিমুল গাঁয়ের বসু-শবর জাতির লোকশিল্পীরা? উপন্যাসের শেষে সুচাঁদের রাজীবকে ত্যাগ করে নিজেদের পথ নিজেদের খুঁজে বের করে

এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প যেন নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সর্বোপরি মানুষের আত্মসম্মান রক্ষার আন্তরিক প্রয়াস। শিল্প সর্বদাই সত্য, সুন্দর ও শিবের সাধনা করে। শিল্পের আঙিনায় সব কিছুই সুন্দর। সেই ক্ষেত্র বিদূষিত হলে সুন্দর হয়ে উঠবে কুৎসিত। মানুষের হাতেই রয়েছে এই সুন্দর কুৎসিতের সৃষ্টির মূল চাবিকাঠি। পারফরমেন্সের দৃষ্টিতে লোকশিল্প ও লোকশিল্পীদের এই বাণিজ্যিকভাবে কলুষিত হওয়ার বিষয়টি অর্থাৎ লোকসংস্কৃতিকে ব্যবহার করে একদল লোভী মানুষের স্বার্থপরতাকে দেখালেন ঔপন্যাসিক ভগীরথ মিশ্র। প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা পেয়ে গেলাম নিশি-উজাগর পালা, শিকার-নাচ, চাঙ-নাচ, জলকেলি নৃত্য ইত্যাদি লোকশিল্পের রিচ্যুয়ালিস্টিক বিষয় ও পারফরমার বা শিল্পীদের দেহভঙ্গিমার মতো উল্লেখযোগ্য লোক শিল্পের লোক কৌশল।

২.৬ *কলাবতী কথা:* পটশিল্পের পরিবেশন

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের *কলাবতী কথা* উপন্যাসটির মূল উপজীব্য পটশিল্পের উপস্থাপন। পটশিল্প বাংলা তথা ভারতের এক ঐতিহ্যবাহী শিল্প। ‘পট’ কথাটির মূল উৎস সংস্কৃত ‘পট্ট’ শব্দ। পট্ট শব্দের প্রতিশব্দ কাপড়। এক টুকরো কাপড়ের উপর কোনো পৌরাণিক বা দেবদেবী সম্বলিত বিচিত্র কাহিনিকে চিত্রের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয় পটচিত্রে। এই পটচিত্র যারা আঁকেন সেই শিল্পীদের বলা হয় পটুয়া। এই পটুয়ারা একদিকে পটচিত্র দেখিয়ে এবং তার সঙ্গে সংগীত সহযোগে উপস্থাপন করেন তাদের এই শিল্প। তারা মূলত দর্শক-শ্রোতাদের গানের সাহায্যে পটচিত্রের আখ্যানভাগ বুঝিয়ে দেন। পটশিল্পীরা মূলত গান সহযোগে পটচিত্র দেখিয়েই এই শিল্পের উপস্থাপন করেন। এই শিল্পের উপর নির্ভর করে তারা জীবিকা নির্বাহ করেন।

পট মূলত তিন রকম। এই গুলি হল – ক) দীর্ঘ জড়ানো বা গোটানো পট, খ) আড়েলাটাই ও ক্ষুদ্রাকার চৌকো পট। জড়ানো পট লম্বায় পনেরো থেকে ত্রিশ ফুট আর চওড়ায় দুই থেকে তিন ফুট। আড়েলাটাই পটের বৈশিষ্ট্য হল তার আকার লম্বাটে নয় বরং আনুভূমিক। আর চৌকো পট আকারে অনেক ছোট হয়। আর জড়ানো পটগুলি দীর্ঘ বলে এগুলিকে দীঘল পট বলে। এই দীঘল পটে অনেকগুলি কাহিনি যুক্ত চিত্র আঁকা হয়। তবে শুধুমাত্র পটচিত্র বা শুধুমাত্র পটগান একটির কোনোটিই একে অপরকে ছাড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। গুরুসদয় দত্তের মতে – এরা একে অপরের পরিপোষক। পটচিত্র ও পটগান পারস্পরিকভাবে দুটি শিল্পের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করে। একটি ছাড়া অন্যটি অসম্পূর্ণ। একাধারে পটুয়াদের অঙ্কন শিল্পী হিসাবে মুনশিয়ানা ও গায়ক হিসাবে কণ্ঠে সুরেলা যাদুর স্পর্শ ও ভাবের উপযুক্ত স্বরক্ষেপণ থাকলে এবং একই সঙ্গে গভীর মেলবন্ধন তৈরি হলে তা যথার্থ পটশিল্প হবে। কাদা, গোবর ও জলের প্রলেপ দিয়ে প্রথমে কাপড়ের উপর জমিন তৈরি করা হয়। নানা রকমের দেশীয় উপায়ে তৈরি রঙের ব্যবহার দেখা যায় এই পটচিত্র তৈরিতে। পটে ব্যবহৃত দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে গাছের পাতার রস, ফুলের রস, গাছের আঠা, ইটের গুঁড়ো, ভুসোকালি, কাজল, লাল সিঁদুর, আলতা, কাঠ-কয়লা ইত্যাদি। তুলি হিসাবে ব্যবহৃত হয় কঞ্চির ডগায় কাঠবিড়ালির লেজের চুল বা পাখির লোম বা পালক।

পটের প্রচলন আছে সারা ভারতেই। বাংলার পটশিল্পে রয়েছে নানা ধরনের বৈচিত্র্য। যখন ভাষা আসেনি সে সময় মনের ভাব প্রকাশ করার মাধ্যম ছিল রেখা। রেখা দিয়ে তৈরি ছবি মনের ভাব বহন করত। তাই সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই গুহার দেয়ালে, বড়ো পাথরের গায়ে, গাছের উপর আঁকা হত। এখনও বাড়ির বাইরে ও ভেতরে ছবি আঁকার এই রীতির প্রচলন আছে। জীবজগতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নানা বৈচিত্র্যময় চিত্র ভাবের মধ্যে দিয়ে ছবি আঁকা হত। পরবর্তীকালে এই সমস্ত ছবির সঙ্গে যুক্ত হয় মানুষের বিশ্বাস ও লোককাহিনি। পঞ্চদশ

শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে পৌরাণিক কাহিনিকে বাংলায় বর্ণনা করার প্রচলন দেখা যায়। এসময় পটুয়ারা তাদের পটচিত্রের মাধ্যমে এই ধরনের পৌরাণিক কাহিনিকে ছবির মাধ্যমে পরিবেশন করতেন এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে সেগুলিকে সচিত্র বর্ণনা করে গানের আকারে গাইতেন। পটের মাধ্যমে জাতকের গল্প এভাবে পরিবেশিত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের জন্ম ও জন্মের আগের নানা কাহিনি পটের মাধ্যমে ছবি এঁকে ও গানের মাধ্যমে দেখানো হত। 'মস্করী'[৪৬] নামের এক শ্রেণীর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উদ্দেশ্য ছিল চিত্রপট গানের মাধ্যমে বুদ্ধের বাণী প্রচার করা। জানা যায় বুদ্ধদেব নিজে এই পটচিত্রের প্রশংসা করেছেন। *আর্যমঞ্জুশ্রীকল্প* [৪৭] নামে একটি বৌদ্ধ গ্রন্থে নাকি পটচিত্রের উল্লেখ আছে। অষ্টম নবম শতকে ইসলামী প্রভাবে বাংলায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বেশ প্রভাব পড়ে। পটচিত্রে এই হিন্দু ও ইসলাম প্রভাব দেখা যায়। সব ধরনের আখ্যানেই এই পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন- বনদুর্গা হয়ে যান বনবিবি, সত্যনারায়ণের জায়গায় তিনি হয়ে ওঠেন সত্যপীর, দক্ষিণরায় হন কালুগাজি ইত্যাদি। স্বভাবতই হিন্দু দেবদেবী নির্ভর পটের পাশাপাশি ইসলামী সংস্কৃতির মিশ্রণের বিষয়টি আসে। কালীয়দমনের পটের পাশাপাশি তৈরি হয় গাজিরপট। পরে বৈষ্ণবীয় ধারায় পটচিত্র আঁকার প্রচলন দেখা যায়। নিমাই সন্ন্যাস, নগরকীর্তনের এর মতো নানা বিষয় নিয়ে পট আঁকা হয়েছে। মূল পালা গান শেষ হওয়ার পর যমপটের গাওয়ার রীতি উল্লেখ দেখা যায় অনেকক্ষেত্রে। যুগ যুগ ধরে এই যমের কাহিনি পটশিল্পে আসছে। গুরুসদয় দত্ত মনে করেছেন বাণভট্টের *হর্ষচরিত* -এর রচনার সময় পটগানের রীতি প্রচলিত ছিল। আর এখানে পটচিত্রের বর্ণনা দিয়ে গান গাওয়ার রীতি ছিল। এখনও রাম অবতার, কৃষ্ণলীলার পটে যমপটের স্থান রয়েছে।

বর্তমানে পশিমবঙ্গে অনেক পটশিল্পী রয়েছেন যাঁরা আজও আর্থিকভাবে ও সামাজিক দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন। এই শিল্পীরা সমস্ত রকম ধর্মীয় গোঁড়ামীর ঊর্ধ্বে।

হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধরনের পট দেখা যায়। সুনির্দিষ্ট একটি বিষয়কে নিয়ে নির্মিত কাহিনি পটচিত্র ও পটগানের বিষয়। পৌরাণিক, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, সামাজিক ঘটনাবহুল, কখনো কখনো সমসাময়িক বিষয় নিয়ে পটশিল্প তৈরি হয়। অর্থাৎ এর উপজীব্য নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় কাহিনি পটশিল্প। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে অনেক পটশিল্প তৈরি করা হয়। যেমন- যম পট, সাবিত্রী সত্যবানের পট, মনসার পট, লক্ষ্মীর পট ইত্যদি। এছাড়াও রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনি, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, রাধাকৃষ্ণের কাহিনি, চাঁদ সদাগর ও মনসার দ্বন্দ্বসংঘাতের কাহিনির পাশাপাশি সাম্প্রতিক কালের কন্যাশ্রী প্রকল্প ও বর্তমানের করোনা পরিস্থিতির জনসচেতনতা নিয়ে প্রচারমূলক ছবি ও গান নিয়ে পটচিত্র ও পটগান তৈরি করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, নারী ও শিশু কল্যাণ বিষয়ক প্রচারমূলক ছবি ও গান পরিবেশিত হয় এই পটশিল্পের মাধ্যমে। এইভাবেই সমসাময়িক বিষয়কে প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহার করে পটশিল্পের ঐতিহ্যটিকে লালন করে চলেছেন পটশিল্পীরা। ভেষজ বা প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহারে তৈরি বর্ণময় ছবি জীবন্ত হয়ে ওঠে পট গায়েনের সুরে, ভাষায় ও ছন্দে। তবে এই পটশিল্প শুধুমাত্র আর পটের মধ্যেই সীমায়িত নেই। বরং তার ব্যাপ্তি অনেকটাই বেড়েছে। সুতি, মলমল ও সিল্কের শাড়ি, মেয়েদের সালোয়ার, কুর্তি ও অন্যান্য পোশাক, ঘর সাজাবার নানা ধরনের শৌখিন দ্রব্যেও এই পটশিল্পের অঙ্কনশৈলীর ব্যবহার ও প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এইসব ক্ষেত্রে পটশিল্পীরা সময় ও খরচ বাঁচাতে ফেব্রিক রঙের ব্যবহারও করে থাকেন কেউ কেউ।

পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে এই পটুয়া শ্রেণির মানুষ বাস করেন। তবে অনেকে বংশ পরম্পরায় এই শিল্পকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে বেঁচে রয়েছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে ভালোবেসেও এই শিল্পের প্রতি একাত্মতা অনুভব করেন। তারাও এই শিল্পকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। আগে অনেক পটুয়া শিল্পী বিভিন্ন

বাড়িতে ঘুরে ঘুরে তাদের এই পৌরাণিক ও লৌকিক পটচিত্র ও পটগান সম্বলিত গান পরিবেশন করে বিনোদন করতেন। তবে বাড়ি বাড়ি ঘুরে এই গান শোনাবার চলনটি এখন প্রায় উঠে গেছে বললেই চলে। বেশ কয়েক বছর ধরে সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এই হারিয়ে যেতে বসা শিল্পগুলিকে সাহায্য করার জন্য। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প মেলা, বইমেলায় ও বিভিন্ন ধরনের পুজোকে কেন্দ্র করে পটশিল্পীদের পসার সাজাতে দেখা যায়। বর্তমানে এই পটশিল্পের প্রতি আকর্ষণ থেকে এই পটের অঙ্কনশৈলী থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন ঘর সাজাবার সামগ্রী মানুষ কিনছে। বর্তমানে অনেক পটশিল্পীরা বিদেশ থেকে ডাক পান তাদের এই লোকশিল্পের পরিবেশনের জন্য। পট বিক্রি ও পটশিল্পের উপস্থাপনে বেশ অর্থ উপার্জন করে। বর্তমানে বহু মানুষ এই শিল্পের প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ থেকে, কেউ গবেষণার কাজ করতে, কেউ বা শিল্পের প্রতি ভালোবাসায়, অনেকে এইধরনের আগ্রহ থেকেই এদের কাছে আসেন। এই শিল্পের পরিবেশকরা বেশিরভাগ দরিদ্র, খেটে খাওয়া শ্রেণির। তারা বেশিরভাগ নিরক্ষর। অনেকে লিখতে না জানলেও একটু আধটু পড়তে জানেন। বড়োরাও অনেকক্ষেত্রেই নিজেদের প্রয়োজনে লেখাপড়া শিখে নেয়। অনেকে আবার উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। উচ্চ শিক্ষার প্রসার এদের মধ্যে খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম শিক্ষিত হচ্ছে। তবে এখন শুধুমাত্র পটুয়া শিল্পকে বংশ পরম্পরায় নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ আবার অনেক শিক্ষিত মানুষেরাও এই পেশাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করছেন। তবে এরা বেঁচে থাকার জন্য অনেকেই এই পেশার পাশাপাশি অন্য বৃত্তিকেও অবলম্বন করছেন।

পটশিল্পকে নিয়ে ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের *কলাবতী কথা* উপন্যাসে কনক নামে একটি চরিত্রকে পাই যে এই পটশিল্পকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে। কনক পটুয়া সম্প্রদায়ের মেয়ে নয়। বংশ পরম্পরায়ও সে পটুয়া পরিবারের মেয়ে নয়। ভালোবেসেই সে এই শিল্পে

এসেছে ঔপন্যাসিক পটশিল্প তার ভালোবাসা। জানিয়েছেন, মেদিনীপুর অঞ্চলে বাস করার জন্য তাঁর সেই অঞ্চলের পটশিল্পীদের সঙ্গে বেশ পরিচয় ছিল। তিনি সেখানে থাকার সুবাদে এই পটশিল্পীদের সঙ্গে বেশ পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এই উপন্যাসের গানগুলির বেশ অনেকগুলিই তাঁর সেই পটশিল্পীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা। আবার তার সঙ্গে ঔপন্যাসিক নিজের মনের মাধুরীও মেশালেন। এই উপন্যাসে মূলত এই পটশিল্পের কথাই এসেছে বিশেষভাবে। তবে আরও অন্যান্য লোকশিল্পেরও উল্লেখ রয়েছে। মূলত এই উপন্যাসের কেন্দ্রে থাকা পটশিল্পের উপস্থাপন ও পরিবেশনের কথাই বিশদভাবে এসেছে। *কলাবতী কথা* উপন্যাসে পটশিল্পের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপাদান হিসাবে আসে পটচিত্রের রঙ তৈরির বিষয়। আর সেই রঙ থেকেই তৈরি হয় কোনো এক বিষয়কেন্দ্রিক কাহিনির চিত্ররূপ। *কলাবতী কথা* উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে কীভাবে পটুয়া শিল্পীরা সেই ভেষজ রঙ প্রস্তুত করে, তার প্রক্রিয়া। শীতকালের দুপুরে এই পিংলা গ্রামের পটশিল্পীরা মিঠে রোদে পা মেলে দিয়ে মাটির ঘরে বসে তাদের পটশিল্পের পসরা সাজায়। পরিবারের সদস্যদের অনেকেই এই পেশায় যুক্ত থাকে। পটুয়ারা যে বংশ পরম্পরায় এই শিল্পের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ঔপন্যাসিক সেই বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর কথায়, এই পটশিল্পীরা মূলত প্রাকৃতিক রঙ দিয়ে ছবি আঁকেন। এই রঙ তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, এই পটশিল্পীরা নাকি কাঁচা হলুদ, শিমপাতার সবুজ, অপরাজিতা ফুলের নীল, গাঁদা ফুলের পাপড়ি আর কাঁটাওয়ালা জাফরন ফলের লাল বীজ শিলে বেটে রঙ তৈরি করেন। কাঁচা বেলের আঠা মেশানো হয় এই রঙের সঙ্গে। এইভাবে তৈরি হয় সব অভিনব শিল্প। এই রঙের ব্যবহারে পটশিল্পীদের হাতের চামড়ার কোনো ক্ষতি হয় না। অন্যদিকে এর আবার খরচও কম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাদের বয়স কম, যারা আঁকতে পারে না তাদের দিয়ে এই প্রাকৃতিক রঙ তৈরির উপাদানগুলিকে জোগাড় করিয়ে এনে বাটাবুটির কাজ করিয়ে

নেওয়া হয়। ছবি তৈরি হলে পটুয়াশিল্পীরা গান গেয়ে ছবির কাহিনির ব্যাখ্যা করে। পটশিল্পীরা তাদের অঙ্কন শৈলী দিয়ে মাটির পট, ফুলদানি, হাতপাখা, টি-শার্টের উপর ছবি এঁকে সেগুলিকে এমনভাবে সাজিয়ে রাখে দেখে মনে হয় প্রতিটি পটুয়া পরিবারে যেন শিল্পের মেলা বসেছে। কনক এই পটশিল্পের বিচিত্র সম্ভার দেখে অভিভূত হয়েছিল। সে এই শিল্পের সঙ্গে এক অকৃত্রিম টান অনুভব করে। কনক এই পট আঁকা শিখতে যায় তাদেরই গ্রামের পটমাস্টার শ্যামল পটিদারের কাছে। ইনিই কনককে রঙ তুলি ধরিয়েছিলেন এবং রঙ তৈরির পদ্ধতি, কৌশল শিখিয়েছিলেন। পটমাস্টারের কথামত কোঁচড় ভরতি করে জাফরন ফল, গাঁদা ফুলের পাঁপড়ি আর শুকনো জবাফুল জোগাড় করেছিল সে। কনকের মধ্যে ছবি আঁকার এই প্রতিভাটি ছিল। পিংলা গ্রামের পটচিত্রকে সে তার পটশিল্পে হুবহু অনুকরণ করেনি। নিজের মনের মাধুরী দিয়ে নিজস্বতা তৈরি করেছে। কনকের এই পটচিত্র আঁকার শৈলী বা স্টাইলটা ঠিক পিংলা গ্রামের পটচিত্রের ঘরানার অনুকরণে নয়। খুব অল্প দিনের মধ্যেই কনক অনেক ধরনের পটচিত্র অঙ্কন করে। এমনকি কালীঘাটের পটের[৪৮] মত অনেক কঠিন চিত্রই সে এঁকে ফেলে বেশ দক্ষতার সঙ্গে। কালীঘাটের কঠিন পটটি পটমাস্টার ঠিক যেমনটা চেয়েছিলেন ঠিক সেই মতো আঁকতে পেরেছিল সে। আবার কনকের আঁকা পটশৈলীর স্টাইলে চাটাইয়ের উপর বাংলার নর-নারীর জীবন যাপনের চিত্র দেখে শ্যামল পটিদার তো হতবাক। কনকের প্রতিভার গুণেই সে বাড়তি সুবিধা পায়। কনক বাড়িতে বসেই কাঁচামালের যোগান পেয়ে যায়। আর চুক্তি হয় প্রতিবছর পিংলায় যখন বাৎসরিক পটমায়ার উৎসব হবে, ঠিক সে সময় কনক স্বয়ং বসে গান গেয়ে সেই পটশিল্পের পসরা সাজিয়ে বিক্রি করবে শহরের মানুষের কাছে। এবারে লক্ষ করা যাক, কনক কীভাবে একজন পেশাদার পটশিল্পী হয়ে উঠছে। কনক প্রাকৃতিক রঙ তৈরি করে। কাঁচামালের উপর ছবি আঁকে ও সেই রঙ দেয়। তুলি দিয়ে কখনো ধারাবাহিকভাবে রামায়ণের কাহিনি ফুটিয়ে

তোলে। ছবি আঁকা শেষ করেই সে পটগান গাওয়ার প্রতি মনোনিবেশ করে। এজন্য সে পটুয়াদের পটগানের লিরিক্স বা কথা জোগাড় করে। এই শিল্পের ক্ষেত্রে ছবির যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনি রয়েছে গানের গুরুত্ব। গানের জন্য সুর যেমন তেমন হলেও সুরেলা গলা চাই। পটুয়ারা একদিকে ছবি দেখান ও অন্যদিকে এই ছবির কাহিনিকে নিয়ে গান গেয়ে কথকতা করেন। এভাবেই পটশিল্পের গান ও ছবি মিলে তৈরি হয় গানছবি। কনকের মত অনেক মেয়েরাই এই শিল্পের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে।

কনক কিছুদিনের মধ্যেই পটশিল্পী হওয়ার সমস্ত টেকনিক শিখে নেয়। সুনিপুণ পটশিল্পীদের হাতের সমস্ত কায়দা, তুলির টান শিখে নেয়। বড়ো ফুলদানির গায়ে এঁকে ফেলে মেয়ের মুখ, পুরুষের নৃত্যশৈলী। বাদ্যযন্ত্রের গায়ে আঁকে লতা, পাতা, ফুলের বৈচিত্র্যময় চিত্র। কনকের পারফরমেন্স ভালো হলে কুরুম্বেরা দুর্গে দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে আয়োজিত হস্তশিল্প মেলায় ডাক পাবে সে। সেইকারণে বেশ দুরু দুরু বুকে ভেষজ রঙের ব্যবহারে প্রায় নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে সে শুরু করে দেয় পটশিল্পের সাধনা। একসপ্তায় মা দুর্গার পট। প্রায় চার ডজন পটের গায়ে মা দুর্গার মাহাত্ম্য আঁকতে হবে কনককে। এর সঙ্গে চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করার জন্য পটমাস্টার শ্যামল পটিদার তাকে চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-ফুল্লরার কিছু চটি বই দিয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের কিছু কিছু গল্প কনকের জানা। এই কাহিনিকে নিয়ে সুর সংযোগে তৈরি হয় পটুয়ার ছন্দময় ও ছবিময় জীবন। এভাবে আখ্যানের মাধ্যমে ছবি ও ছন্দময় কাহিনি পরিবেশনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে কনক। কনকের দেখাদেখি তার ছেলে রামুও এই কাজে যোগ দেয়। মায়ের কাজে সাহায্য করে। হলদে রঙ দিয়ে ভরিয়ে দেয় একে একে মা দুর্গার পটচিত্রের মুখগুলি। এরপর কনক তার নিপুণ হাতের তুলির টানে একের পর এক এঁকে ফেলে মা দুর্গার ত্রিনয়ন, নাকের নথ, ওষ্ঠ। ভ্রূযুগলের মাঝে তুলির সাহায্যে নিখুঁত টিপ-কুমকুম পরিয়ে দেয়। একেবারে শেষে ঘামতেল ঢেলে সে

ফিনিশিং টাচ দেয়। সেই নিজের হাতের আঁকা চিত্র দেখে কনকের নিজেরই খুব পছন্দ হয়ে যায়। সে ভাবে চণ্ডীমায়ের কৃপাতেই সে একাজ পেয়েছে। তাই সেই বিশ্বাস থেকে সে ভাবে সামনের চৈত্র মাসের অশোক ষষ্ঠীতে বাসন্তীপুজোর সময় সে নিজের আঁকা এই পট দেওয়ার মানসিক করে। এরপর আমরা দেখব কনক কুরুম্বেরা মেলায় ডাক পায়। তার ছেলে ও শাশুড়ি লতু তার এই মেলায় আসবার প্রস্তুতিতে অনেক সাহায্য করেছে। সারাদিন পটকাহিনি শোনাতে হবে কনককে। এজন্য গলা ঠিক রাখা দরকার। তার শাশুড়ি কনকের আঁচলে কয়েকটি যষ্টিমধুর ডাঁটি বেঁধে দিয়েছে। প্রয়োজন মতো মুখে দিয়ে সে গলা ঠিক রাখে। খোলা আকাশের নিচে দুর্গ চত্তরে বসেছে এককে ধরনের হস্তশিল্প ও তাদের শিল্পীরা। কেউ এনেছেন মাটির জিনিস, কেউ মাদুর আবার কেউ কেউ পটচিত্র নিয়েও বসেছেন। এসেছে শীতলপাটি, কাঠের মুখোশ, কাঠের পুতুল, ডোকরা ইত্যাদি শিল্প ও তাদের শিল্পীরা। বিহার থেকে এক দম্পতি এনেছেন মধুবনী আঁকা পট। তারা দামী তসর, এন্ডি, মুগার শাড়িতে পটশৈলীর চিত্র আঁকেন। তাদের খুব দামী পট। সেসব দিক থেকে এই পটশিল্প বেশ একটি অর্থকরী শিল্প। এছাড়াও কেউ কেউ বহুরূপী সেজে পয়সা রোজগার করছে। এসেছে পুরুলিয়ার ছৌনাচের দল। তারা তাদের বেশ পরে সেজে এসেছে। সেখানে এসেছে ঝুমুর শিল্প। এসেছে বীরভূমের মাদল নাচের দল। এসেছে সাঁওতালি জিওন ঝরনা দল তাদের মাদল নাচ পারফরমেন্সকে নিয়ে। এছাড়াও মেলায় আসবে লোকগীতির ব্যান্ড, লোকগাথার দল, লোকনাটকের দল, চারণ কবির দল, বাউল ফকির। নানা রঙে ও লোকশিল্প-লোকসংস্কৃতির বৈচিত্র্যময়তায় সেজে উঠেছে কুরুম্বেরা মেলা প্রাঙ্গণ। মেলা প্রাঙ্গণে সমবেত হয়েছেন অসংখ্য দর্শক। আশেপাশের গ্রাম থেকে মানুষের সমাগমে তখন মেলা জমজমাট। পূর্ব মেদিনীপুরের পটশিল্পীদের সম্পর্কে ঔপন্যাসিক জানান যে প্রায় আড়াইশো বছরের পুরনো বংশানুক্রমিক পেশা তাদের। পটশিল্পীরা মানুষের দরজায় দরজায় পট নিয়ে

গান গেয়ে গেয়ে বেচতে যেত। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কাহিনি সচিত্র গান করে বুঝিয়ে দিত তারা। এর বিনিময়ে মানুষ এদের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে পেতল কাঁসার বাসন দিত। কেউ দিত চাল-ডাল, আবার কেউ বা কাপড়চোপড় ইত্যাদি। আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে পটশিল্পের গবেষণাভিত্তিক মূল্যও কম ছিল না। বিদেশিরা লোকশিল্পের প্রতি আগ্রহ নিয়ে গবেষণার কাজ করতে আসে। এই আগ্রহ বশত পটশিল্পকে নিয়ে অনেক বিদেশী গবেষক মেদিনীপুরের একটা ব্র্যান্ড খুলে ফেলে। সাধারণ ঘরের মেয়ে-বউরা এই কাজের সুযোগ পেয়েছে। ঔপন্যাসিক ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন- স্বাধীনতার পরে পটশিল্পীরা বিষয়গত পরিবর্তন এনেছেন। আধুনিক ধ্যানধারণার ছাপ পড়েছে এই পটশিল্পীদের কাজে। পটশিল্প সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনকে সাঙ্গীকৃত করে এগিয়ে চলেছে। এই উপন্যাসেও পটশিল্পের সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রগুলিকে এনেছেন। সমাজ সচেতনতাকে বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের এনজিও থেকে পটশিল্পীদের এড্‌স, পাল্‌স পোলিও, পরিবার পরিকল্পনা, পণপ্রথা, বধূ-নির্যাতন, বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ দূষণের মতো বিষয় নিয়ে পট এঁকে গান রচনা করার ফরমান আসে। বিদেশী উদ্যোক্তাদের উদ্যোগে শ্যামলদের মতো ব্যবসায়ীদের প্রচেষ্টায় পটশিল্পীদের অর্ডার পাওয়ার সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতিতে ইণ্টারনেট ও ই-মেলের মাধ্যমে।

বিশ্বভারতীতে পাঠরতা এক জাপানি মেয়ে মিকি বাংলার সাহিত্য ও শিল্প নিয়ে পড়াশুনো করছে। তার নিজের একটা ওয়েবসাইটও আছে। ময়নাগড়ের রাসমেলায় কনক ও তার ছেলের বউ কলাবতী যখন তাদের নিজেদের পইঠা সংস্থার পটশিল্পের সম্ভার সাজিয়ে বসেছে, মহাভারতের কাহিনি নিয়ে কনক পরিবেশন করছে পটগান, আবার সেইসঙ্গে কলাবতী একটা লম্বা পটচিত্র স্ক্রোল করতে করতে সেই মহাভারতের একই কাহিনি সম্বলিত পটচিত্র দেখাচ্ছে মিকি তখন এদের দুজনের ছবি নিচ্ছে। আর টিভি

ক্যামেরা কনকের দিকে তাক করে এক একটা বাইট নিচ্ছে। এরপর দেখা যাচ্ছে টিভি ক্যামেরা ঘুরে যাচ্ছে মিকির দিকে। জাপানি মেয়ে পটচিত্রের গান ও ছবির ভিডিও করতে ব্যস্ত। মিকি এই পারফরমেন্স নিয়ে পরে কাজ করতে চায়। মিকির মাথায় খেলে একটি নতুন আইডিয়া। জাপানের এক অনবদ্য শিল্প হল মাঙ্গা আর্ট।[৪৮] সকলের কাছে মাঙ্গা কমিক্স[৪৯] খুব জনপ্রিয়। জাপানে মিকির এক বন্ধু থাকে। তার নাম আকিও। আকিও গ্রাফিক আর্টস নিয়ে কাজ করে। পটশিল্পের বিষয়টিকে মাথায় রেখে তার গতিশীলতার বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে কমিকে রূপদান করতে চায় মিকি। মিকি ভেবে নেয়, কাহিনির মোড়কে ছবি আঁকবে কলাবতী। আর তার কারিগর বন্ধু আকিওর সাহায্যে তার ডিজিটাল রূপ দেবে। জাপানে মহাভারতের ভীমের আখ্যান নিয়ে তারা কমিককে ডিজিটাল রূপদান করবে। মিকির ধারণা এই গ্রাফিক আর্টের যুগে ইন্টারনেটের সুবিধায় ভারত ও জাপানের দূরত্বটা কোনো ব্যাপার নয়। বন্ধু আকিওর সঙ্গে চ্যাটের মাধ্যমে কথাবার্তা সেরে নিয়ে, শিল্পগ্রামের কর্তা ব্যক্তিদের নির্ধারিত দামে ছবিগুলি আকিওর নির্দেশে কিনে নিল মিকি। নতুন টপিক, নতুন স্টাইল আর নতুন ধরনের গায়কিতে পইঠার এরকম প্রচার ও কাটতি অন্যান্য পটশিল্পীদের কাছে অনেকটাই আশ্চর্যের। পরে জাপানী পুতুল উৎসবে আকিওর হাতে প্রস্তুত গ্রাফিক্স আর্টের পারফরমেন্স দেখাতে কলাবতীর ডাক পড়ল জাপানে। কলাবতীর পটশিল্পের দক্ষতাকেই মাঙ্গা আর্টে কাজে লাগালো আকিও। আর তাই আকিওর ভাবনায় জাপানী মাঙ্গা আর্টও কলাবতীর পটশৈলীর হাত ধরে বেশ কিছু নতুন বিশেষত্বকে সাঙ্গীকৃত করে নতুনত্ব পেল। পটশিল্পের সূত্র ধরেই কলাবতীর জীবনের বদল এল। কলাবতীর মতো সরল পটশিল্পীদের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকেই কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে এই মিকি ও আকিওরা। মিকি ও আকিওদের মতো বিদেশীদের বাণিজ্যিক ফাঁদে পড়ে ক্রমে বৈদেশিক

মুদ্রা অর্জনের নেশায় কলাবতীর মতো এক পটশিল্পীর বিক্রি হয়ে যাওয়াকে দেখালেন ঔপন্যাসিক ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়।

২.৭ উপসংহার:

আমাদের আলোচ্য প্রত্যেকটি উপন্যাসই কোনো না কোনো লোকশিল্পকে নিয়ে হাজির হয়েছে। আর এইসকল উপন্যাসের কেন্দ্রীয় লোকশিল্পগুলির বাস্তবিক রূপ ও উপন্যাসে বর্ণিত রূপ পারফরমেন্সের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে। তবে এই বিষয়গুলি প্রত্যেকটি উপন্যাসের ক্ষেত্রেই আলাদা। ভিন্ন ভিন্ন লোকশিল্পের মধ্যে রয়েছে ঝুমুর, আলকাপ, বাজিকরী শিল্প, পটশিল্প, বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত গজাশিমুল গ্রামের বসু-শবর জনজাতির লোকশিল্প। এই গবেষণায় নির্বাচিত প্রত্যেকটি উপন্যাসই ভিন্ন ভিন্ন লোকশিল্পকেন্দ্রিক। নির্বাচিত এই উপন্যাসগুলিতে বাস্তবের যে যে লোকশিল্পের উপস্থাপন দেখানো হয়েছে সেগুলিকে পারফরমেন্সের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখাতে চেয়েছি। স্বাধীনতা-পরবর্তী আমার নির্বাচিত লোকশিল্পকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে ঔপন্যাসিকদের ভিন্ন ভিন্ন স্বরে লোকশিল্পের উপস্থাপন, ভাবনা ও পরিবেশিত হয়েছে। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক*-এ পারফরমেন্সের দৃষ্টিকোণ থেকে ঝুমুর শিল্পকে ও তাদের শিল্পীদের দেখালেন। পাশাপাশি ঝুমুর শিল্পের শিল্পীদের পালনীয় আচার-আচরণ, সংস্কার, যাবতীয় রীতি-নীতি, প্রথা, রসিক-নাচনীর অবস্থান, শিল্প-আঙ্গিক, তার সাংগীতিক দিক, নৃত্যশৈলী ও নাট্যগত দিক, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঝুমুর শিল্প ও শিল্পীদের যাবতীয় পরিবর্তন, বিষয়গত দিক থেকে সমকালীন ঘটনার অনুপ্রবেশ, এর বাণিজ্যিক দিক এককথায় পারফরমেন্স হিসাবে ঝুমুরের সর্বাঙ্গীণ দিক দেখিয়েছেন তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি *রসিক*-এ। এভাবে বাস্তবের ঝুমুর শিল্প আর *রসিক*- এর

ঝুমুরের মিল-অমিল, উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের ঝুমুর শিল্প সম্পর্কে নিজস্ব স্বরকে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসে যেভাবে লোকশিল্প আলকাপকে হাজির করেছেন তা সত্যিই অনবদ্য ও অভিনব। আলকাপ শিল্পের চলন বলন, তার চরিত্র, নাট্যশৈলী, অভিনেতাদের চরিত্র, তার প্রাচীন ও নব্য ঘরানা, শিল্প ও শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, কুশীলবদের মানসিক অবস্থা, তাদের সমাজ- বাস্তবতা ও শৈল্পিক অবস্থান, স্থান ও পরিবেশগত বদলে শিল্প ও শিল্পীদের অবস্থা, আলকাপের তাৎক্ষণিক পালার রূপায়ণ সব মিলিয়ে গোটা আলকাপ শিল্পের উপস্থাপন। বাস্তবের আলকাপ শিল্প ও *মায়ামৃদঙ্গ*-এর আলকাপ শিল্পের পার্থক্য হল বাস্তবে এখন আলকাপ দলে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তি দেখা যায়, কিন্তু সিরাজ *মায়ামৃদঙ্গে* দেখিয়েছেন, তাঁর বর্ণিত আলকাপ দলে সেসময় মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সমাজ পরিত্যক্ত কোনোও দূরাঞ্চলে বা লোকালয় থেকে দূরে কোনো মেলাপ্রাঙ্গণে আলকাপ লোকনাট্য পরিবেশিত হত। তবে সিরাজের উপন্যাসে আলকাপ শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত বর্ণনার যে পরিচয় পাওয়া যায় আজ সেই পরিস্থিতি ঠিক সেরকমভাবে একই নেই। বর্তমানে এই আলকাপ শিল্প ও তাদের শিল্পীদের সমাজে অচ্ছুত করে রাখার ব্যাপারটি অনেক কমেছে। এখন বহু গুণীজন সমাদৃত একাডেমিক আসরে, লোকসংস্কৃতির মঞ্চে, প্রসেনিয়াম মঞ্চে আলকাপ শিল্পীরা তাদের শিল্প পরিবেশন করেন ও উপযুক্ত সম্মান পান। তবে আর্থিক দিক থেকে শিল্পীদের আগের চেয়ে খুব একটা উন্নতি হয়নি, তার চিত্র পরিবেশিত হয়েছে।

রহু চণ্ডালের হাড়-এ লোকশিল্প হিসাবে এসেছে বাজিকরী শিল্প। সে শিল্প আদতে একধরনের খেলা। নানা ধরনের শারীরিক কসরতের খেলা, রিচ্যুয়ালিস্টিক রহুচণ্ডালের হাড়

দিয়ে ভেল্কি দেখানো, বাঁশের উপর দিয়ে, দড়ির উপর দিয়ে গানের সঙ্গে বাজনার তালে তালে হেঁটে যাওয়ার খেলা দেখানো, ডুগডুগি বাজিয়ে বর্ণময় সাজ-পোশাক পরে নৃত্য সহযোগে গান করে করে বাঁদর খেলা দেখানোর মতো বিষয়গুলি আদতে এক একটি পারফরমেন্স। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নানা ধরনের যাদুকরী খেলার কৌশল, হাপুগান পরিবেশনের ধরন, শারীরিক কসরত, গান ও অভিনয়। অভিজিৎ সেন বেদে জনজাতির এই বিশেষ ধরনের লোকশিল্পকে তার এই উপন্যাসটির বিষয় হিসাবে এনেছেন। উপন্যাসে পারফরমেন্সের দৃষ্টিকোণ থেকে এই লোকশিল্পের বর্ণনা করা হয়েছে। ঔপন্যাসিক বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত নৃতাত্ত্বিক, সমাজ-অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রীয় দিকের সাপেক্ষে এই বেদে সমাজের অবস্থাকে পরিবেশন করেছেন।

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের পটশিল্পকে নিয়ে লেখা *কলাবতী কথা* উপন্যাসে কোনো কোনো জায়গায় পারফরমেন্স হিসাবে পটশিল্পের পরিবেশন ও উপস্থাপনের প্রসঙ্গ এসেছে। বিভিন্ন মেলা প্রাঙ্গণে শিল্পীদের নিজের হাতে আঁকা পটচিত্রের সাহায্যে কাহিনি সম্বলিত পটগানের বর্ণনা আমরা পেয়েছি। জাপানের মঞ্চে মাঙ্গা আর্টের উপস্থাপনে পটশৈলী ও পটশিল্পীকে দিয়ে পটগান গাওয়ানোর বিষয়টিও পটশিল্পেরই একধরনের বিবর্তন। সব মিলিয়ে এ তো পারফরমেন্স হিসাবে পটশিল্পেরই পরিচয়।

ভগীরথ মিশ্রের *আড়কাঠি* তো বিশ্বায়নের কবলে কলুষিত একজন বাঙালি তথা ভারতবাসীর নিজের সংস্কৃতিকে বিক্রি করে দেওয়ার কাহিনি। তার নিজের ঐতিহ্যকে নষ্ট করা আদতে তার নিজের সম্পদকে নষ্ট করা। বাণিজ্যিক স্বার্থে একদল শিক্ষিত স্বার্থলোলুপ আড়কাঠির হাতে পড়ে লোকসংস্কৃতির পরিচিতির বদলে লোকসংস্কৃতিকে পণ্য করার প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। পারফরমেন্সের দৃষ্টিকোণ থেকে লোকসংস্কৃতির এই বাণিজ্যিক দিকটির

বিষয়টি এই উপন্যাসে অভিনব। এর সঙ্গে এসেছে বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামের লোকমানুষ বসু-শবর জাতির লোকশিল্প চাঙ নাচ, শিকার নাচ ও জলকেলি নৃত্যের উপস্থাপন প্রসঙ্গ। এরমধ্যে দিয়ে এই জনজাতির পরম্পরাগত লোকবিশ্বাস, আচার-আচরণ, ব্রত, ট্যাবু, লোকাচার ও এই জনগোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে বর্ণিত প্রত্যেকটি লোকশিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য এগুলির সজীবতা রক্ষা। পারফরমেন্স সেই সজীবতার কথাই বলে। আর, সাহিত্যিকদের বাস্তবের এই লোকশিল্পগুলিকে উপন্যাসের মূল উপজীব্য করে সেগুলির প্রকরণগত নবরূপ দান, প্রকাশ, উপস্থাপন ও সজীবতা রক্ষা আদতে যেন এই লোকশিল্পগুলির একধরনের সাহিত্যিক আর্কাইভ রচনাই বটে। এই রচনায় আলোচ্য প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই সফল ও যথার্থ।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১. Schechner, Richard (2002). *Performance Studies: An Introduction*, and New York: Routledge, pp. 39

দ্র:https://www.bdword.com/english-to-bengali-meaning-performance Date-24.05.2019

২. Siddiqui, Zillur Rahman (2002). *Bangla Academy English-Bangla Dictionary.* Dhaka: Bangla Academy Dhaka, Pp. 524

৩. চক্রবর্তী, সুধীর (২০০৫)। *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। পৃ. ৪১৮

৪. 'Ethnography (Noun) meaning the scientific description of peoples and cultures with reference to their particular customs and characteristics'.

Stevenson, Angus and Waite, Maurice (2011). *Concise Oxford English Dictionary*, New Delhi. pp490

৫. চক্রবর্তী, সুধীর (২০০৫)। *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*। কলকাতা: পুস্তক বিপনি। পৃ. ৪১৮

৬. মজুমদার, মানস(২০১০)। *লোক ঐতিহ্য চর্চা*। কলকাতা: দে'জ। পৃ. ৩৫

৭. শক্তিনাথ ঝা জানিয়েছেন –

> গম্ভীরা থেকে পৃথক করে ঝাকসু মণ্ডল জানালেন যে গম্ভীরা রাষ্ট্র নিয়ে, আলকাপ পরিবার নিয়ে।... মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় (কংগ্রেসী ও মন্ত্রী) স্নেহভাজন ছিলেন ঝাকসু। ...ছোকরা এবং তাদের অতিরঞ্জিত নারীভাব মায়া হয়ে গুরুত্ব পেল ঝাকসু, মৈনুদ্দিনের চেতনায়। ... ধনঞ্জয় মন্ডলের সমসময়ে বিভিন্ন সূত্র হেকে আলকাপ গানে প্লাবিত হয়েছিল মুর্শিদাবাদ অববাহিকা।

দ্র: ঝা, শক্তিনাথ (২০১০)।*আলকাপ*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃ. ১১

৮. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা(২০১৩)।২ *উপন্যাস সমগ্র, মায়ামৃদঙ্গ*। কলকাতা: দে'জ, । পৃ. ১৬২

৯. মজুমদার, মানস(২০১০)।*লোক ঐতিহ্য চর্চা*। কলকাতা: দে'জ। পৃ. ৩৫

১০. পূর্বোক্ত।

১১. ঝা, শক্তিনাথ (২০১০)।*আলকাপ* । কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃ.৩

১২. পূর্বোক্ত।

১৩. মিত্র, শ্রী সনৎ কুমার (সম্পাদিত)(২০০০)। *বাংলা গ্রামীণ লোকনাটক* । কলকাতা: পুস্তক বিপণি। পৃ. ২৫

১৪. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার (সম্পাদিত) (১৯৯৫)। *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ* । কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। পৃ.২৪

১৫. মধ্যযুগীয় মরমী সাধক দাদু বলেছিলেন, 'দুনুঁ হাথী হৈব রহে, মিলি রস পিয়ান জাই'। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান দুই হাত, এই দুই হাত একত্র না হলে কেমন করে অমৃতের অঞ্জলি রচিত হবে? কেমন করে অমৃতের রস পান করা যাবে।

দ্র: আবু,জাফর(১৯৯১)। *সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ঐতিহাসিক পটভূমি: সেকাল একাল*। উত্তরাধিকার,বাংলা একাডেমী। পৃ. ৮

১৬. মানিক সরকার, তিনি ৪০-এর দশকে এই গানটি রচনা করেন। সংগ্রহ : মোহসীন আহমদ, মোনাকষা, থানা-শিবগঞ্জ, জেলা-নবাবগঞ্জ।

প্রথম মোনাকষার বোনাকানাই

আলকাপ গান করেন রচনা।

দ্র: নৌমান, সৈয়দ খালেদ (১৯৮৮)।*মুর্শিদাবাদের লোকসংস্কৃতি: আলকাপ,* শ্রী প্রতিভারঞ্জন সম্পাদিত মুর্শিদাবাদ চর্চা, শীর্ষক গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ।

১৭. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার (সম্পাদিত, ১৯৯৫)।*বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ* । কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। পৃ.২৪

১৮. ঝাকসু প্রমুখ অনেকে জনগণের ওপর নির্ভরশীলতা হারিয়ে, অধিকতর অনুষ্ঠান এবং অর্থের প্রত্যাশায় আলকাপকে পঞ্চরসে পরিণত করেন। উচ্চবর্গের যাত্রা- নাটকের বাহ্যিক অনুকরণে স্বভাব নির্জিত হয়ে আলকাপ পথ হারায়। কৃষিবিপ্লবের মধ্যপর্বে পঞ্চরস পরিণত হয় পঞ্চরস অপেরায়। অনেকে এতে মূলধন

বিনিয়োগ করতেন। শহুরে যাত্রা এবং হিন্দি সিনেমার গ্রামীণ সংস্করণ ছিল এসব পঞ্চরস অপেরায়। জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বিষয়সমূহ, মেয়েদের যৌন আবেদনমূলক নাচগান প্রাধান্য পায় পঞ্চরস অপেরায়।

দ্র: ঝা, শক্তিনাথ (২০১০)। *আলকাপ* । কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসি সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃ. ১৩।

১৯. ইসলামিক ঐতিহ্যের একটি ধর্মীয় আইন বা কর্মপদ্ধতি বা জীবনপদ্ধতি। ইসলামি পরিভাষাকোষ অনুযায়ী, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং নবি হযরত মুহাম্মাদ যেসব আদেশ-নিষেধ, নিয়ম-নীতি ও পথনির্দেশনা মুসলমানদের জন্য প্রদান করেছেন, তার সমষ্টিই হচ্ছে শরিয়ত।

দ্র: ইসলাম, আনিমূল(২০১৬)। *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন* । ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।পৃ. ৪৩, ৪৪

২০. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা(২০১৩)। *২ উপন্যাস সমগ্র, মায়ামৃদঙ্গ*। কলকাতা: দে'জ। পৃ. ২১৬

২১. পূর্বোক্ত। পৃ.২৩৮

২২. *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসের চরিত্র আরশাদ ওস্তাদ তাঁর আলকাপ নিয়ে বক্তব্য প্রসঙ্গে মন্তব্যই করেছেন।

দ্র: সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা(২০১৩)। *২ উপন্যাস সমগ্র, মায়ামৃদঙ্গ*। কলকাতা: দে'জ।

২৩. যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 'বাজি' শব্দের অর্থ করেছেন- খেলা, খেলায় পণ, ইন্দ্রজাল, হস্তলাঘব। বাজিকার-এর অর্থ করেছেন, কুহকী, ক্রীড়ক। বাজিকার নাচাএ যেন কাষ্ঠের পুত্তলী (চৈতন্য মঙ্গল)। বাজিকর, বাজিগর- কুহকী, ঐন্দ্রজালিক। বাজিকরি, বাজিগরি- কুহকীর কর্ম।

দ্র: রায়, যোগেশচন্দ্র (সংকলিত, ১৩২০-২২ বঙ্গাব্দ)। *বাঙ্গালা শব্দকোষ* । কলকাতা: ভূর্জপত্র। পৃ.৬৪৮

২৪. রাজা বিক্রমাদিত্যের এক মহিষী। তিনি ভোজরাজের কন্যা। ভানুমতী ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় বা জাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। সেখান হেকেই ইন্দ্রজাল আসে। শূন্যে দড়ি ধরে ওঠা ভানুমতীর এক প্রসিদ্ধ খেলা ছিল। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নাকি এই খেলা লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন যা আছে ভোজবিদ্যা।

দ্র: রায়, যোগেশচন্দ্র (সংকলিত, ১৩২০-২২ বঙ্গাব্দ)। *বাঙ্গালা শব্দকোষ* ।কলকাতা: ভূর্জপত্র। পৃ.৭১৯

২৫. পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম–বাঁকুড়া-মুর্শিদাবাদ জেলার এক বিশেষ ধরনের লোকগান এই হাপু গান। হাপু শব্দের অর্থ দুর্ভাবনা বা দুশ্চিন্তা। এই গানের প্রসার ব্যাপক না হলেও এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। সাধারণভাবে একে দুঃখ-বেদনার ও হাহাকারের গান বলা হলেও গভীরভাবে শুনলে বোঝা যায় হাপু গানে যে সুরটি ধ্বনিত হয় তা হল প্রতিবাদী সুর।

দ্র: দাস, সৌমেন। হাপু। চক্রবর্তী, বরুণ কুমার (সম্পাদিত) (১৯৯৫)।*বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ* । কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। পৃ. ৬১০

২৬. ইয়াসিন, এমএম। *দৈনিক বসুমতী,* হাপুগান ও তার গায়ক । ১৭ই জুন ১৯৭৯।

২৭. সেন, অভিজিৎ(২০১০)। *রহু চণ্ডালের হাড়*। কলকাতা: এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং। পৃ. ১৮।

২৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ১৮৪।

২৯. পূর্বোক্ত।

৩০. পূর্বোক্ত। পৃ: ১৮৬।

৩১. চট্টোপাধ্যায়, নরনারায়ণ (১৯৯৯)।*ঝুমুর* । কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃ. ২৬।

৩২. সিংহ, শান্তি (সংকলিত, সম্পাদিত) (১৯৯৭)। *লোকসংগীত সংগ্রহ ঝুমুর* । কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃ. ১২।

৩৩. পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩।

৩৪. চট্টোপাধ্যায়, নরনারায়ণ (১৯৯৯)। *ঝুমুর* । কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃ. ২৬।

৩৫. শ্রী সতীশচন্দ্র রায় জানিয়েছেন- পদকর্ত্তা বৈষ্ণবদাসের সংকলিত সার্দ্ধশতাধিক বৈষ্ণব পদকর্ত্তৃগণের তিন সহস্রের অধিক পদাবলি এবং সম্পাদকের সংগৃহীত ও পরিশিষ্টে মুদ্রিত প্রায় এক সহস্র পদাবলি, শব্দকোষ, পদসূচী, ভূমিকা ইত্যাদি- সম্বলিত পদসংগ্রহ।

রায়, শ্রী সতীশচন্দ্র। *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু* । কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ মন্দির।

৩৬. ভট্টাচার্য, আশুতোষ (১৯৬০)। *বঙ্গীয় লোকসংগীত রত্নাকর* । কলিকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা. লি.।

৩৭. চট্টোপাধ্যায়, নরনারায়ণ (১৯৯৯)। *ঝুমুর* । কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃ. ২৯, ৩০

৩৮. পূর্বোক্ত। পৃ. ৩১

৩৯. পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৫

৪০. পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৮

৪১. মুখোপাধ্যায়, সুব্রত (২০১৩)। *রসিক*। কলকাতা: আনন্দ। পৃ: ৬১০

৪২. পূর্বোক্ত। পৃ. ৬০৯, ৬১০

৪৩. পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৩২, ৫৩৩

৪৪. ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ (২০০০)। *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস*। কলকাতা: জেনারেল। পৃ.২১২

৪৫. 'উজাগর' শব্দের অর্থ 'জাগরণ'।

দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন (২০১৪)। *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*। কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ।পৃ.২৯৭

রাত জেগে গান করা হয় বলে মঙ্গল গানের আর এক নাম রয়ানী [রজনী] বা 'জাগরণ'।

দ্র: শরীফ, আহমদ (২০১৪)। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য [প্রথম খণ্ড]*। কলকাতা: নয়া উদ্যোগ। পৃ. ৩৪৪।

এক জনপ্রিয় লৌকিক আনন্দানুষ্ঠানের নাম জাগরণ।সংস্কৃত ভাষায় শব্দটির অর্থ জেগে থাকা।

দ্র: ভট্টাচার্য, আশুতোষ(২০০৫)। বাংলার লোক-সংস্কৃতি।কলকাতা: ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট।পৃ. ১৪১

৪৬. খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে যমপটের প্রচলন ছিল। ওই সময় 'মস্করী' উপাধিধারী এক শ্রেণির লোক ছবি দেখিয়ে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রচার করত। এই মস্করী বা চিত্র ব্যবসায়ীরা পাপীদের শাস্তির দৃশ্য এঁকে সেই সঙ্গে যমদূতের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখাত।

দ্র:https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%AF%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%9FDate-3.5.2020

৪৭. বৌদ্ধ গ্রন্থ *আর্যমঞ্জুশ্রীকল্প* নামক গ্রন্থে পটচিত্র অঙ্কন শিক্ষার রীতি বর্ণনা করা আছে।

দ্র:http://lokfolk.blogspot.com/2010/10/blog-post.html?m=1Date-7.12.2020

৪৮. কলকাতায় কালীঘাটের কালীমন্দিরের কাছাকাছি বাস করে বলে বাংলার এক বিশিষ্ট শ্রেণীর চিত্রকরকে কালীঘাটের পটুয়া বলে। তাদের ছবির বিষয় কখনো কখনো পৌরাণিক দেবদেবী, আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমসাময়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নাগরিক জীবনকে ব্যঙ্গ করেও এরা অনেক ছবি আঁকেন। এদের বেশিরভাগ ছবিতে প্রকাশ পায় জীবনের প্রতি বিশ্বাহীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা।

দ্র: ভট্টাচার্য, আশুতোষ(২০০৫)। বাংলার লোক-সংস্কৃতি।কলকাতা: ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট।পৃ. ১২৭

৪৯. Manga are comics or graphic novels originating from Japan. Most manga conform to a style developed in Japan in the lae 19th century, and he form has a long prehistory in earlier Japanese art. The term manga is used in Japan to refer to both comics and cartooning.

দ্র: Tomoko Aoyama, Hiromi Tsuchiya Dollase, Satoko Kan(2010).*Shojo Manga: Past, Present, and Future – An Introduction. Japan Women's Journal.* No.38, pp.3-11

তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাচিত উপন্যাসগুলির শিল্প আঙ্গিকগত প্রতিতুলনা

৩.০ ভূমিকা:

আলোচনার মুখ্য বিষয় প্রান্তিক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা লোকশিল্প। তবে প্রত্যক্ষত বা ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ তথ্যের মাধ্যমে সংগৃহীত উপাদানের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ নয়। প্রান্তিক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা অনভিজাত লোকশিল্পগুলি কীভাবে অভিজাত শিল্প মাধ্যম উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে এবং উল্টোভাবে অভিজাত শিল্প মাধ্যম তার নিজস্ব বয়ানে বা আখ্যানের দেহভঙ্গিমায় প্রান্তিকের এই লোক মর্যাদাকে কতটা তুলে ধরতে পেরেছে তারই আখ্যানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে উপন্যাসগুলিতে লেখকের লোকশিল্প পরিবেশন বা উপস্থাপন প্রকরণগত দিক থেকে উপন্যাসকে কতটা স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে- সংশ্লিষ্ট বিষয়টি দেখানোই আমার উদ্দেশ্য।

৩.১ গ্রহণ প্রতিগ্রহণ তত্ত্বের নিরিখে লোকশিল্প নির্ভর উপন্যাস

প্রান্তিক মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ লোকজীবনের সংস্কৃতি শিল্পসমন্বিত হয়ে তাদের নিজস্ব চেহারায় হাজির হয়। এই শিল্পে থাকে তাদের নিজস্ব জীবন দর্শন। কোনো কল্পনাপ্রসূত সমাজ ব্যাখ্যা সেখানে থাকে না। চোখে দেখা জগতের কঠিন বাস্তবকে লোকশিল্পী শিল্পসমন্বিত করে হাজির করেন। এক্ষেত্রে শিল্পী গ্রহণ করেন বাস্তবকে। আবার তার প্রকাশও করেন শিল্প মাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবতায়। বাস্তব জগতকে গ্রহণ করে গড়ে ওঠা লোকশিল্পকে উপজীব্য করে ঔপন্যাসিক যখন নিজের শিল্প মাধ্যমকে সমৃদ্ধ করেন তখন তা হয়ে যায় সেই গ্রহণের প্রতিগ্রহণ।

প্রান্তিকের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লোকশিল্পের রূপান্তর ও নবায়ন হয়েছে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব মৌলিকতায়। এখানেই এসেছে গ্রহণতত্ত্বের বিষয়টি। গ্রহণ তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপন্যাসগুলির আলোচনায় প্রবেশের আগে গ্রহণতত্ত্বের বিষয়টি প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসে। ইংরেজি Reception Theory-র বাংলা পরিভাষা করা হয় গ্রহণ বা অধিগ্রহণ তত্ত্ব, অনেক ক্ষেত্রে পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ।[১] এই তত্ত্বের চর্চা শুরু হয় ১৯৬০ থেকে ৭০-এর দশকে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে। বিশেষত আমেরিকা ও জার্মানীতে। নরম্যান হল্যাণ্ড (১৯২৭-২০১৭), স্ট্যানলি ফিশ (জন্ম-১৯৩৮), উলফ্যাঙ্গ ইজের (১৯২৬-২০০৭), হ্যানস রবার্ট জাস (১৯২১-১৯৯৭), র‍্যোঁলা বার্থের (১৯১৫-১৯৮০) মতো তাত্ত্বিকদের লেখায় এই পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা পায়। প্রাথমিকভাবে গ্রহণ বলতে আমাদের মনে আসে কোনো বিষয়ের প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া বিষয়টি ঠিক কেমন? একটি সিনেমা দেখে দর্শকের মনের মধ্যে যেমন প্রতিক্রিয়া হয় ঠিক তেমনি একটি সাহিত্য পড়েও পাঠকের মনের মধ্যে ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কোনো শিল্প সাহিত্য বা অপরাপর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একদিকে যেমন স্রষ্টা থাকেন, অপরদিকে তেমনি থাকেন সেই শিল্প-সংস্কৃতির পাঠক, দর্শক বা শ্রোতা। এইক্ষেত্রে আমরা স্রষ্টাকে যদি বলি প্রেরক তবে একইভাবে পাঠক, দর্শক বা শ্রোতা হয়ে যাবেন গ্রাহক। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় মূলত সাহিত্য। সাহিত্যিকের সাহিত্য রচনার লক্ষ পাঠকের বিনোদন সৃষ্টি। তবে কোনো একটি নির্বাচিত সাহিত্যের পাঠ পাঠকের কাছে কালের সাপেক্ষে বদলে যায়। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত অনুযায়ী ওই পাঠের গ্রহণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন- রামায়ণের পাঠ মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) তাঁর *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১)- এ যেভাবে নির্মাণ করেছিলেন, সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর *ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা*-য়[২] সম্পূর্ণ অন্যরকম করে দেখালেন। এক্ষেত্রে এই দুজন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে আলাদা। আবার একই ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ যৌবনে *মেঘনাদবধ*

কাব্য-এর যে সমালোচনা করেছেন, পরিণত বয়সে এই কাব্যের আরেকটি সমালোচনায় সম্পূর্ণ আরেক ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দিলেন। আমরা দেখলাম দুই সময়ে দুই ভিন্ন পাঠকের আবার একই পাঠকের ভিন্ন সময়ে দাঁড়িয়ে আলাদা ধরনের পাঠক প্রতিক্রিয়াকে। ইয়ার্ডস্-এর 'The horizon of expectation' অনুযায়ী গ্রহণতত্ত্বের ধারণাটি অনেকটা এরকম। তবে গ্রাহকের পাঠপরিবর্তনের ধারণাটি শুধুমাত্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই বদলায় না, এই ধারণাটি একই সময়ের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে ব্যক্তির বদল অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন পাঠক অনুযায়ী গ্রাহক বা পাঠকের পাঠ প্রতিক্রিয়ার ধারণাটি বদলে যায়। বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬) উপন্যাস প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের আলাদা ধরনের মতামত। মানব জীবনকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের কাছে বহুমাত্রিক মূল্যায়ন তৈরি করে। তৈরি হয় নির্দিষ্ট একটি পাঠের বহুমাত্রিক পাঠক প্রতিক্রিয়া। গ্রহণতত্ত্বের দিক থেকে উলফ্যাঙ্গ ইজের-এর 'পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদে'র ধারণাটি অনেকটা এরকম। এক্ষেত্রে এই গ্রহণ তত্ত্ব বা পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদ তত্ত্বটি গবেষণায় লোকশিল্পের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। লোকশিল্পীরা তাদের নিজস্ব শিল্পকে হাজির করেন। তাঁরা এই পরিবেশনের মাধ্যমে নিজেরা যেমন আনন্দ পান, তেমনি দর্শকদেরও বিনোদন দেন। বাস্তবের থেকে উপাদান সংগ্রহ করে স্বতন্ত্র শিল্পপ্রকরণ ও টেকনিককে গ্রহণ করে নিজেদের শৈল্পিক মুনশিয়ানায় তাদের পারফরমেন্স পরিবেশন করেন। আমাদের আলোচ্য লোকশিল্পগুলি আলকাপ, ঝুমুর, পটগান ও বাজিকরী শিল্প প্রান্তিক শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয়। বাস্তবের বিষয় তাদের শিল্পের কাহিনি বা স্টোরি হিসাবে আসে। স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী লোকশিল্পের পারফর্মারদের গ্রহণও বদলে যায়। ফলে লোকশিল্পের শিল্পীদের বাস্তব জগতকে গ্রহণ ও সেই গ্রহণ অনুযায়ী আরেক শিল্পে প্রতিবিম্বন শিল্পী অনুযায়ী অনবরত বদলাচ্ছে।

এই বদল আবার কালগত ব্যব্ধানেও হচ্ছে। ব্যক্তি ও সময়ভেদে এই ফারাক অভিজাত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সত্য। এক্ষেত্রে সাহিত্যিকও তো প্রথমত একজন দর্শক বা বলা ভালো একজন গ্রাহক। কারণ তিনিও তার অনুভবের জগত থেকে উপাদান সংগ্রহ করেন। এই জগতে তাঁর সংগৃহীত উপাদানের সাম্রাজ্যে লোকশিল্পও অমূলক কিছু নয়। যখন কোনো ঔপন্যাসিক তাঁর অভিজ্ঞতা লব্ধ লোকশিল্পকে উপজীব্য করেন তখন তিনি প্রথমতঃ সংশ্লিষ্ট শিল্পটিকে নিজের মননে গ্রহণ করেন। এখানে ঔপন্যাসিকের কাছে কোনো বিশেষ ধরনের লোকশিল্প, সেই শিল্পের শিল্পীদের শিল্পময় জীবনকে দেখার বিষয়টি লেখক মনে এক বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। তৈরি হয় ঔপন্যাসিকের কাছে প্রান্তিকের তথাকথিত লোকশিল্পের ভিন্ন এক মৌলিক পাঠ। এই পাঠ প্রতিক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন লেখক তাদের আলাদা চিন্তন দিয়ে একই লোকশিল্পের বহুমাত্রিক পাঠ নির্মাণ করেন। গড়ে ওঠে বৈচিত্র্যময় শিল্প বা একই শিল্প মাধ্যমের বহুমাত্রিক উপস্থাপন। যেমন- একই লোকশিল্প আলকাপকে নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *বৈতালিক* উপন্যাসে যে পাঠ তৈরি করেছেন, সেই একই লোকশিল্প নিয়ে সৈয়দ মুজতবা সিরাজ তাঁর *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসে আরেক পাঠ নির্মাণ করলেন। আবার, ঝুমুর লোকশিল্পকে নিয়ে নিমাই ভট্টাচার্য তাঁর *নাচনী* উপন্যাসটিকে যেভাবে হাজির করেছেন, সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক* উপন্যাসে সেভাবে হাজির হয়নি। *রসিক*-এ ঝুমুর শিল্পই শুধু নয়– সেই শিল্পের শিল্পীর জীবনের টানাপোড়েনটিও লেখক হাজির করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য উপন্যাসগুলি হল অভিজিৎ সেনের *রহু চণ্ডালের হাড়,* সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক,* সৈয়দ মুজতবা সিরাজের *মায়ামৃদঙ্গ,* ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের *কলাবতী কথা* এবং ভগীরথ মিশ্রের *আড়কাঠি* ।

৩.১.১ *মায়ামৃদঙ্গ* :

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসটি পড়লে আলকাপ লোকশিল্প সম্পর্কে সম্যক একটি ধারণা পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে সিরাজ দেখিয়ে দেন আলকাপের সমাজকে। আদতে সমাজে আলকাপের লোকশিল্পীদের অবস্থান ঠিক কোথায় তার আভাস মেলে কিছুটা। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ব্যক্তিগত জীবনে একজন বড়োমাপের আলকাপ শিল্পী ছিলেন। তাই আলকাপের জীবন থেকে তাঁর আলকাপ লোকনাটককে দেখা। তাই আলকাপ লোকশিল্পের এক যথার্থ ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষক হিসাবে তাঁর এই শিল্পকে দেখা। তাই এই শিল্পের অন্দরে অবস্থান করে শিল্পকে এবং শিল্পীদের শিল্পগত ও মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান করেছেন। সিরাজ একজন পারফরমারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আলকাপের লোকজীবনকে প্রতিফলিত করেছেন তাঁর *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসে। জন্মসূত্রে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুরের বাসিন্দা। গাছপালা, ফুল, ফল, মাটি, জল, পাখি, নদী, বন সবকিছুর সঙ্গে সিরাজ একাত্মতা অনুভব করতেন বাল্যকাল থেকেই। ছেলেবেলায় স্কুল পালানো বালকটির প্রকৃতির প্রতি তৈরি হওয়া অগাধ বিস্ময় থেকেই বাংলার লোকশিল্প, লোক ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর এই নিবিড় একাত্মতা। আর এই একাত্মতা থেকেই তাঁর আলকাপের প্রতি অনুরাগ। মুর্শিদাবাদে থাকার সুবাদে ছেলেবেলা থেকেই মাঠে, ঘাটে, মেলায়, পার্বণে আলকাপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে তিনি আলকাপের দল তৈরি করেছেন যার নাম ছিল ‘খোশবাসপুর আলকাপ দল’। যদিও সেই দল বেশিদিন টেকেনি। তবে অন্যান্য আলকাপ দলে তিনি অভিনয় করতেন, পালা বাঁধতেন। বাঁশি বাজাতেন, সুর করতেন, গান লিখতেন আলকাপের। ওস্তাদের ভূমিকায় থাকতেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের স্ত্রী শ্রীমতী হাসনে আরা সিরাজের কথায় বিয়ের আগে তিনি আলকাপ দলের মাস্টার হিসাবেই সিরাজের সম্পর্কে শুনেছিলেন।[৩] সিরাজের *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসে বাস্তবের চরিত্রদের প্রসঙ্গ

এসেছে। আলকাপের স্বনামধন্য ওস্তাদ ধনঞ্জয় সরকার ওরফে ‘ঝাঁকসা’ ওস্তাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিল। *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসেও আলকাপের এক প্রথিতযশা ওস্তাদ ধনঞ্জয় সরকার ওরফে ঝাঁকসু ওস্তাদের প্রসঙ্গ এসেছে। বাস্তবের আলকাপ শিল্পী সিরাজ ধনঞ্জয় ওস্তাদের সঙ্গে আলকাপের লড়াই করেছেন। *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসেও বাস্তবের আলকাপ সম্রাট ঝাঁকসা ওস্তাদের কথাই আছে। তবে উপন্যাসের ঝাঁকসা আর বাস্তবের ঝাঁকসার মধ্যে পার্থক্য আছে। উপন্যাসের ঝাঁকসা সিরাজের কল্পনার সৃজন। সৈয়দ মুজতবা সিরাজ যখন গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেসময় গণনাট্য সংঘের অন্যতম সদস্য সুধীন সেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে আলকাপ নিয়ে কাজ করতে বলেন। আদতে উপন্যাসটি প্রান্তিক আলকাপ শিল্পীদের শিল্পজীবন ও জীবন শিল্পের কাহিনি। তবে এই কাহিনি সিরাজের দেখা বাস্তব শিল্প ও কল্পনার মিশেল। আলকাপ রাঢ় বরেন্দ্রভূমির অবলুপ্তপ্রায় শিল্প। এ একধরনের গ্রামীণ লোকনাটক। এর পরিবেশকরা সমাজের নিম্নশ্রেণির হিন্দু-মুসলমান। মধ্যবিত্তীয় চেনা জগতের বাইরে এই অন্ত্যেবাসী মানুষগুলির জীবনযাপন। এরা তথাকথিত ভদ্র সমাজের কাছেও অসংস্কৃত ও অপরিশীলিত। সিরাজ উপন্যাসে একে ছোটলোকের সংস্কৃতি বলে মনে করেন যাকে পরিশীলিত শিক্ষিত সভ্য সমাজের মানুষ সচেতনভাবে এড়িয়ে চলে। আধুনিক নাটকের বিপ্রতীপে এর স্থান। যার সমাদর নাগরিক ভদ্ররুচি ও চৌহদ্দির বাইরে। আর এই তথাকথিত ব্রাত্যসংস্কৃতির বাহক যারা তারাও সমাজের ব্রাত্যজন। জীবনের পথচলায় তারা প্রান্তিক। এদের শিল্পের ভাষা মূলত লোকভাষা। এরাই শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে দর্শক মনোরঞ্জনে ও আনন্দদানে সার্থক। আলকাপের শ্রোতা ও দর্শক যারা তারা এই ধরনের লোকনাট্য উপভোগ করে। বাহবাও দেয়। কিন্তু মর্যাদা দেয় না। দেয় না উপযুক্ত পারিশ্রমিকও। আলকাপের প্রধান আকর্ষণ দলের ছোক্‌রা চরিত্র। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মেজভাই আনোয়ার আলম তাঁর এক সাক্ষাৎকারে জানান সিরাজের পাড়ার ছেলেদের নিয়ে তৈরি করা

আলকাপ দলে তাদের পাশের দাসপাড়ার বিখ্যাত আলকাপের ছোক্‌রা সুধীর দাসের সঙ্গে সিরাজের বিশেষ সখ্য ছিল।[৪] *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসে আলকাপের প্রধান আকর্ষণ ছোক্‌রা চরিত্রের জীবনকে দেখিয়েছেন লেখক। শান্তি, সুবর্ণকে এখানে ছোক্‌রা হিসাবে পাওয়া যায়। দৈহিকভাবে কমবয়সী তরুণ পুরুষ অথচ মনের দিক থেকে মেয়েলি সাজ-পোশাক ও মুখমণ্ডল বিশিষ্ট। এদেরকে নিয়ে আলকাপ দলের পুরুষদের কেচ্ছা যা সমাজের চোখে নিষিদ্ধ, পাপ ও অসংস্কৃত। তাই এদিক থেকে এই আলকাপ শিল্পীরা সমাজের ব্রাত্যজন। অথচ এহেন শিল্পীরাই তাদের শিল্পে সুন্দরের সাধনা করেন। সমাজের অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গের বা হাসির মোড়কে পুরে আল বা হুল বিঁধানোর মধ্যে দিয়ে খোঁচা মেরে সমাজে জানান দেয় এই শিল্প। উপন্যাসের মানুষ, ঘটনা আর বাস্তবের মানুষ ও ঘটনা মিলেমিশে গেলে মুশকিল। ঔপন্যাসিকই পারেন এর মধ্যে সীমা টানতে। এভাবেই বাস্তবের ঘটনা সাহিত্য শিল্পের রঙে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। সিরাজ একাজে সুদক্ষ। রাঢ়-বরেন্দ্রভূমির আলকাপ শিল্প তথা শিল্পীদলের শৈল্পিক পথচলা ও সামাজিক দিক থেকে স্বীকৃতি না পাওয়াতেই উপন্যাসটি এগিয়ে চলে।

৩.১.২ *রহু চণ্ডালের হাড়* :

অভিজিৎ সেন রচিত *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে বাদিয়া বাজিকর সমাজের বাজিকরী শিল্পের কথা। ঔপন্যাসিক বাস্তবের এই বাজিকরি শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। *জনপদপ্রয়াস*[৫] পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিজিৎ সেন নিজেই ব্যক্ত করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। তিনি জানিয়েছেন তাঁর কর্মসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা। এই সূত্রেই জানা যায়, তিনি উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটে জীবনের খানিকটা সময় কাটিয়েছেন। তিনি সেখানে থাকার কারণে ও ব্যক্তিগত আগ্রহে এই সময় সেখানকার বৈচিত্র্যময় জনজীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। পশ্চিম

দিনাজপুরের বালুরঘাট মহকুমার একটি সমবায় ব্যাঙ্কে চাকরীর সূত্রে বালুরঘাট মহকুমার তপন থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রামে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। সেই সময় বেশ কিছু গ্রামে তাঁর বাজিকর বৃত্তির মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। পরবর্তীতেও তিনি বাজিকরদের সঙ্গে বেশ মেলামেশা করেছিলেন। এছাড়াও জেলা লাইব্রেরি থেকে এদের সম্পর্কে গভীর পাঠ নিয়েছিলেন। তবে বাজিকরদের সম্পর্কে তাঁর এ পাঠ কখনো সরাসরি ও কখনো দূর থেকে। সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক-ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক-আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর সমাজের তথাকথিত প্রান্তিক বাজিকর শ্রেণিকে দেখা। মূলত পেশাকে কেন্দ্র করেই বাজিকর নামের সঙ্গে তাদের পরিচিতি। আর এই পেশাই এক ধরনের শিল্প, যার নাম বাজিকরী শিল্প। বাস্তবের তাঁর এই দেখাই *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসের রসদ। তাই এক্ষেত্রে তিনি একজন গ্রাহক হিসাবে বাস্তবিক বাজিকরী শিল্পের পাঠ নিয়েছেন। আবার একই সঙ্গে বাস্তবের বাজিকরী শিল্পকে গ্রহণ করে নির্মাণ করলেন উপন্যাসটি। আর এভাবেই বাস্তবের বাজিকরী শিল্পের এক বিশেষ পাঠক প্রতিক্রিয়া তৈরি করলেন এই উপন্যাসটিতে।

এবারে দেখা যাক বাস্তবের থেকে কোন্ কোন্ উপাদানকে ঔপন্যাসিক এক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসটিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় গোটা উপন্যাসে ছড়িয়ে রয়েছে বাজিকর জনজীবনের অজস্র লোক উপাদান। লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোককথা, তাদের আচার-আচরণ ইত্যাদি নানা বিষয় এসেছে সেই যাযাবরদের চলমান জীবনে। তাদের জীবিকা ভিক্ষাবৃত্তি। আর এই ভিক্ষাবৃত্তির উপায় বাজিকরী শিল্প। তবে এই শিল্প অবশ্যই লোকশিল্প। তবে এই বাজিকরের শিল্প কীভাবে লোকশিল্প হতে পারে সেই অনুসন্ধানের সূত্রে প্রথমেই বলতে হয় বাজিকর হল একটি যাযাবর গোষ্ঠী। এই বাজিকর বাদিয়াদের একটি শাখা। উপন্যাসে অনেকবার ‘বাউদিয়া–বাজিকর’, ‘জাত বাদিয়া’ বাজিকর

সম্পর্কে কথককে বলতে শোনা যায়। ‘বাউদিয়া’, ‘বাদিয়া’ শব্দটির মূলে রয়েছে ‘বেদে’। ‘বেদে’ অভিশ্রুতি আর ‘বাউদিয়া’ ও ‘বাদিয়া’ ওই শব্দটির অপিনিহিতি। শব্দদুটির অর্থ আদতে এক। নৃতত্ত্বের দিক থেকে আদতে বাজিকর বেদেদের এক জীবিকাভিত্তিক উপশাখা। বেদে সমাজকে জেমস ওয়াইজ (১৮৩৫-১৮৮৬) সাতটি শাখায় ভাগ করেছেন। তারা হল- বেবাজীয়, বাজিকর, মাল, মিরশ্চিকার, সাপুড়িয়া, সান্দার ও রসিয়া।[৬] তাহলে দেখা যাচ্ছে বেদেদের মধ্যে বাজিকর অন্যতম একটি শাখা।

এই উপন্যাসে বাজিকর শ্রেণির মানুষেরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে খুব বেশিদিন স্থিতিশীল হয় না। এই ঘুরে বেড়ানোর সূত্রে তারা ভাল্লুক, মহিষ, বাঁদর চুরি করে। এই চৌর্যবৃত্তি তাদের স্বভাব ও নেশা। বুড়ো বুড়িরা, বাচ্চারা ভঁইশের পিঠে চড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। কখনো কখনো শহরের বাইরে বটগাছের মতো গাছের তলায় ঘর বেঁধে তারা আশ্রয় নেয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সমাজের ক্ষমতাশালী মানুষের তাদের উপর অত্যাচার, শোষণ ইত্যাদির কারণে তারা পুরোনো স্থান ত্যাগ করে নতুন জায়গার সন্ধান করে।

তবে এই গোষ্ঠীপ্রধান মানুষগুলির জীবনে জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সংস্কার, বিশ্বাস, প্রথা, আচার, আচরণ, জীবিকা, ক্রিয়া-কর্ম একই। তাই এই গোষ্ঠীবদ্ধ বাজিকরদের লোক বলা চলে। আর বাজিকরদের এই পেশাভিত্তিক লোকশিল্প হল বাজিকরদের বিভিন্ন ধরনের খেলা যার মাধ্যমে তারা রুজি রোজগার করে। উপন্যাসে বাজিকরদের বলতে শোনা যায় তাদের কাজ হল ‘ভিখ মাঙ্গার’ কাজ। তাদের মতে এই ভিখ চাওয়ার কাজ হল দুনিয়া ঘুরে ঘুরে বাঁদর–ভাল্লুক দিয়ে নাচ দেখানোর খেলা, কাঠের পুতুল পিচ্‌লু বুড়া-পিচ্‌লু বুড়ি, কাঠের ময়ূর দিয়ে নাচ দেখানো, ভানুমতীর খেলা, বাঁশবাজি, দড়িবাজির খেলা, নররাক্ষসের মত কাঁচা মাংস ভক্ষণ, নাচ দেখানো, গান গাওয়া ইত্যাদি। আর এইগুলোই ছিল তাদের

জীবিকা। এইভাবে শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা বাজিকর গোষ্ঠীর সুকৌশলে খেলা দেখানো, নাচ-গান গেয়ে রুজি রোজগারের এ জীবিকা আদতে একধরনের শিল্প। আর এই শিল্প অবশ্যই লোকশিল্প। এইভাবে রুজি রোজগার করে বাজিকররা যে খাদ্যের সংস্থান করে তাও যৎসামান্যই। শস্যদানা ও ছাই পাশ যা পায় তাই তারা ফুটিয়ে খায়। তবে তাদের সাজ পোশাক বর্ণময়। মেয়েদের পরনে ঘাঘরা, কামিজ আর পুরুষের দেহে নগরু ও কুর্তি। তাদের ঘরের যে বর্ণনা উপন্যাসে পাওয়া গেছে তা হল শনের ঘর, বাঁশের খুটি, নিচু বারান্দা, তালপাতার বেড়া। নিচু দাওয়ার স্যাঁতসেতে ঘরগুলিতে যেন গুহার অন্ধকার।

কালীপূজাকে উপলক্ষ্য করে বাজারের পাশে এক ময়দানে আলাদা আলাদা তাঁবুতে তাদের বৈচিত্র্যময় খেলার বর্ণনা পাওয়া যায় উপন্যাসে। কখনো তারা রহু চণ্ডালের হাড় নিয়ে অদ্ভুত সব কেরামতি দেখায়। যেমন- তাদের হাতে নিমেষে টাকা দ্বিগুণ হয়ে যায়, পিতল সোনায় পরিণত হয়। আবার কখনো জাদুদণ্ডের স্পর্শে যুবতীর বিনুনি মাথার উপর খাঁড়া হয়ে যায়। আবার কখনো গাছ থেকে তৎক্ষণাৎ ফল, ফের ফল থেকে গাছ ইত্যাদি অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটে। এগুলির পিছনে রয়েছে তাদের শারীরিক কসরত, ভেলকিবাজি। কখনো আবার ভানুমতীর খেলা। সুকৌশলে মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতা বুঝে নিয়ে সহজে লোকঠকিয়ে ভবিষ্যৎ গণনা ও ভাগ্যবিচার করে এরা। একজন চতুর কথক যাবতীয় উত্তেজক প্রবৃত্তি ও নিষিদ্ধ বিষয় নিয়ে কথা বলে যায় যেগুলি গ্রামের মানুষকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। তাদের আরেকটি জনপ্রিয় ও চিত্ত আকর্ষণকারী খেলা হল একটি কাঠের ফ্রেমের মাঝখানে একটি যুবতী মেয়েকে চোখ বেঁধে দড়ি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে একটু দূর থেকে সেই কাঠের পাটাতনের উপর ধারালো ছুরি নিক্ষেপ করা। বাজিকরদের শারীরিক কসরত দিয়ে এই বিচিত্র ধরনের খেলা দেখানো আদতে এক-একটি শিল্প। সমাজের মূল ধারা থেকে বিচ্যুত এই বাজিকরের শিল্প তাই আদতে প্রান্তিকের এক লোকশিল্প।

তবে শুধুমাত্র লোকশিল্পই নয়, পাশাপাশি অভিজিৎ সেন লোকসংস্কৃতির নানাধরনের উপাদানকে সুনিপুণভাবে কার্য-কারণ সূত্রে প্রাসঙ্গিক করেছেন। উপন্যাসে এনেছেন বাজিকর সমাজের নানা ধরনের প্রথা, বিশ্বাস, ট্যাবু, কথা, রীতিনীতি, পালনীয় আচার-আচরণ ইত্যাদি লোকজ উপাদানগুলিকে। যাযাবরদের যাযাবর বৃত্তির পিছনে রয়েছে তদের মধ্যেকার এক প্রচলিত বিশ্বাস। তাদের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্কে বিয়ে হয় না। তাদের ধারণা এই সম্পর্কের মধ্যে বিয়ে হলে তার পরিণতি ভয়ানক। সে যেন এক অভিশাপ। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয় পঙ্গু হবে নতুবা মৃত্যু সুনিশ্চিত। এই বিশ্বাসের পিছনে রয়েছে তাদের মধ্যে প্রচলিত এক কাহিনি। হাজার বছর আগেকার কথা। পুরা নামে এক প্রাচীন পুরুষ পালি নামে এক নর্তকীর প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে বিয়ে করতে চায়। ঘটনাচক্রে জানা গেল পুরা ও পালি সম্পর্কে ভাই বোন। সুতরাং তাদের এ বিয়ে অসামাজিক ও অমঙ্গলসূচক। এরপর তাদের বিয়ে হল ও তারা পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালো। তাদের উপর নেমে এল দেবতাদের অভিশাপ। অন্তর্কলহে অনেক মানুষ নষ্ট হয়। দেবতাদের অভিশাপে তারা দুবার এক গাছের ফল খেতে পারে না। দুবার এক পুকুরের জল খেতে পারে না। এক আচ্ছদনের নিচে এক রাতের বেশি থাকতে পারবে না, এক ভূমিতে দুবার পা পর্যন্ত ফেলতে পারবে না। সেই পাপ থেকেই নাকি বাজিকরদের এই ভ্রাম্যমান জীবন। তারা দেবতার আশ্রয় থেকে বিচ্যুত। এই কারণেই তারা নাকি তাদের সরল জীবনযাপনে নাচ গান করে নিজেদের ভুলিয়েছে, মানুষ ঠকাতে শিখেছে। আর এই কারণেই তাদের গোষ্ঠীর এই আলাদা ধরনের ভিক্ষাবৃত্তি। আর এই ধরনের পেশায় তারা সংকোচহীন। এই সংস্কার যাদেরকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে তারা এই সংস্কার থেকে বেরোতে পারে না আর বেরোতে চায় না। হয়তো এর পিছনে থাকে তাদের মধ্যেকার ভয়। তাই দেখা যায় উপন্যাসের দুই উল্লেখযোগ্য চরিত্র পীতেম ও সালমাকে। যাদের ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে কিনা এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে তাদের

জানা নেই। এ কারণে তারা একে অপরকে ভালোবাসলেও বিয়ে করতে ভয় পায়। পুরা ও পালির এই লোককথাকে নিয়ে ঔপন্যাসিক অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত করলেন দেড়শ বছরের বাজিকর প্রজন্মের ইতিহাসের মধ্যে থেকে উঠে আসা দুই চরিত্রকে। বাস্তবের বাজিকর জীবনের লোককথাকে পাঠ করে লেখক তাঁর মৌলিক কল্পনার মিশেলে সুকৌশলে জুড়ে দিলেন উপন্যাসটিতে। তাই এ অবশ্যই সুদক্ষ লেখক অভিজিৎ সেনের লোকসংস্কৃতি পাঠের পাঠক প্রতিক্রিয়া।

একইভাবে ঔপন্যাসিক উপন্যাসে পীতেমের পূর্বপুরুষ দনুর প্রসঙ্গের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে এনেছেন তাদের পূর্বপুরুষ ও নেত্রী স্থানীয় দলপতি রহুর কথা। সে বাজিকরদের কাছে দেবতুল্য। এই রহু তাই বাজিকর জাতির কাছে এক কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। বাজিকরদের নিজেদের রক্ষার জন্য সে তাদের তার দেহের অস্থি দিয়েছিল যাতে বাজিকরেরা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে। রহুর সাম্রাজ্যে মানুষের জীবন ছিল সচল প্রবহমান এক নদীর মতো। মানুষ ছিল স্বাধীন ও সুখী। হঠাৎ একদিন তাদের সুখের জীবনে এল এক শত্রু। প্রথমে সে রহুর সেরা ঘোড়াটিকে ধরে নিয়ে যায়। অন্যায়ভাবে ঘোড়াটিকে মেরে ফেলে। প্রথমবারে রহু তার এই অন্যায়ের কারণ জানতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়বার রহুর জনপদকে নষ্ট করে দিয়ে নদীর পথে মন্দির তৈরি করেছিল। শস্য নষ্ট, নারীদের অত্যাচার ও যারা বাধা দিয়েছিল তাদের নির্বিবাদে হত্যা করেছিল। দ্বিতীয়বারও রহু এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল। এর পরের আক্রমণটি হয়েছিল সরাসরি রহুর উপর। রহু এবারও প্রতিরোধ করল। সে তার পরিজনদের বুক দিয়ে আগলেছিল। রহু তাদের রক্ষা করবার চিরকালীন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। রহুর উপর খড়্গাঘাত হল। রক্তে নদী ভেসে গেল। রহুর রক্তের স্রোতে নদীর জল উছলে পড়ল। কেবল রহুর অনুগামীরা তার দেহকে নিয়ে দূর দূরান্তে ভেসে চলল। অবশেষে একদিন তারা তীর খুঁজে পেল। রহুর দেহের কতগুলি

অস্থিকে সম্বল করে এগিয়ে চলল নতুনের খোঁজে। বাজিকররা জানে রহুর হাড় লুকিয়ে আছে কোনো এক ভূখণ্ডে মাটির গভীরে। সেই স্থানটিকে তাদের খুঁজে বের করতে হবে। তাই তাদের এই চলমানতা, স্থান বদল। সব বাজিকরেরা সেই লোকবিশ্বাসে বুক বেঁধে সেই মাটির খোঁজে পথ চলে। তারা বিশ্বাস করে যে মাটির গভীরে সেই হাড় খুঁজে পাবে সেখানেই হবে তাদের স্থিতি। উপন্যাসের এক প্রধান চরিত্র পীতেমকে তার স্বর্গীয় পিতা দনু তাদের বাজিকরদের জীবনে রহুর গুরুত্ব বোঝায়। উপন্যাসটিতে বাজিকরদের যে দেড়শ বছরের ইতিহাস পেয়েছি তাতে দেখা যায় রহুই তাদের জীবনের রক্ষক। এভাবেই রহুর হাড়ের কাহিনি বাজিকর জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বারংবার ফিরে ফিরে এসেছে। তাদের জীবনে বিবাহ রীতি ও গীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাজিকরদের লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান। মহারানির রাজত্বে ষোল বছরের উপরে ছেলেমেয়েদের আর বিয়ে দেওয়া যাবে না এই গুজব রটায়, দলপতি পীতেম বাজিকর একসঙ্গে ষোল জোড়া বালক বালিকার বিয়ে দেয়। লাল সুতোয় ঘেরা পরিধির মধ্যে বাজিকরদের বিয়ে হয়।

> 'লাল পাড়াঙ্গি রেশকি ডোরি-, দেও আওয়েতো দেওরে, ভাই'[৭]

-এই গানগুলি গায় মেয়েরা। এই গানগুলি প্রাচীন বাজিকরদের মুখে মুখে চলে আসছে। একটি গানে বিয়ের আগে হলুদ তোলার প্রসঙ্গ আসে, এ সে হলদি লাগিরে, এতো মায়েরি

> তেল মেশুরে লুড়ে, এ তো মায়েরি।[৮]

লুবিনি তার গলায় এইগান গুলি গায় আর যৌবন কালের কথা মনে করে। মনে পড়ে তার বিবাহের কথা। সে তার প্রিয় নাতি শারিবার বিয়ের অনুষ্ঠানকেও যেন আপনমনে সাজিয়ে ফেলত তার মনের কল্পনায়।

বাজিকরদের সঙ্গে পরিচিতির সূত্রে উপন্যাসে আসে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কথা। আসে ঝালো, মালো, পোলিয়া সম্প্রদায়ের কথা। সমাজের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বিত্ত- শ্রেণিগত দিক থেকে শোষিত, অত্যাচারিত এই মানুষগুলি সমাজের প্রান্তিক শ্রেণি। তাদের জীবন- শিল্প- সংস্কৃতি সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখা যায় এই উপন্যাসটিতে। ঔপন্যাসিক তাঁর বাস্তব জীবনে নানান সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে অসাধারণভাবে ব্যবহার করেছেন উপন্যাসে। ঝালো ও মালোদের জীবিকার সূক্ষ্ম তফাৎকে উল্লেখ করেছেন ঔপন্যাসিক। মালোরা নদীতে যায় বড়ো জাল ও নৌকো নিয়ে। তাদের জালে ফাঁস থাকে। কিন্তু জালোদের নিতান্তই আটপৌরে জাল। সেই জালে ফাঁস নেই। লম্বা লাঠির ভিতরে সুতোর কারিগরি করে মৌচাকের মতো ঝুলে থকে সেই জাল। চৈত্র মাসে ঝালোদের মধ্যে চড়কের প্রচলন আছে। তাদের মধ্যে আমরা পাখির বাবা নীলুর কথা পাই যে গাজনের একজন প্রধান সন্ন্যাসী হয়। তাকে এর জন্য বিশেষ কিছু নিয়ম ও রীতি পালন করতে হয়। একমাস উপোস, ঠাকুরের কাঠ ঘাড়ে করে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে পথ পরিক্রমা, ভিক্ষা ইত্যাদি রীতিগুলি পালন করতে হয়। তাদের মধ্যে চড়কের সন্ন্যাসীরা 'হাজরা ছাড়া'[৯] নামে প্রচলিত রীতি ও প্রথা পালন করে। নীলুই সেই হাজরা ছাড়ার মন্ত্র জানে। সংক্রান্তির আগের রাতে তেল সিঁদুর মাখানো খড়্গা দেওয়া হয় কোনো একজন ভক্তকে। সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চারিদিকে ছুটে বেড়ায়। তার সামনে পড়লে সে যা খুশি তাই করতে পারে। এসময় তার সঙ্গে নাকি শ্মশানের ভূত প্রেতরাও এসে যুক্ত হয়। তাই এ সময় তার সামনে পড়া খুব বিপদের। ভোর হওয়ার আগে মড়ার খুলি জোগাড় করে তাকে হাজির হতে হবে।

উপন্যাসে আমরা পোলিয়াদের ছেলে আকালুর উল্লেখ পাই। আকালু একা পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে। সে বাজিকর শারিবার বন্ধু হয়। আকালু হাপু গান করে। নিতান্তই

অবুঝ বয়স থেকেই সে এই গান শুনিয়ে তার পেট চালায়। নিজের শরীরকে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়ে তার এই পেশা। গান, একটি দীর্ঘ ছড়া ও কবিতার মাঝামাঝি এর গায়কি। গায়কের হাতে থাকে একটি পাঁচন লাঠি। গানের সময় দ্রুত লাঠি দিয়ে গায়ক নিজের গায়ের পিঠ, বগল, নাকে ও মুখে আঘাত করে একধরনের বিকৃত আওয়াজ বা শীৎকার ধ্বনি করে। শরীরের এই সমস্ত অংশে প্রবল ও ক্রমশ আঘাত খেতে খেতে কড়া পড়ে শক্ত আর কালশিটে পড়ে যায়। ঔপন্যসিক শারিবার বন্ধু ও পোলিয়াদের একধরনের জীবনবৃত্তিকে দেখাতে গিয়ে এই ধরনের হাপুগানের প্রসঙ্গ উপন্যাসে এনেছেন।

আবার নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য এই বাজিকররা একবার সাঁওতালদের গ্রামে এসে তাদের অনুষ্ঠানে এসে যোগ দেয়। সেইসময় তারা সাঁওতালদের সংস্কৃতি, উৎসব, পার্বণ, প্রথা সংস্কারের সঙ্গে পরিচিত হয়। তাদের গ্রামে প্রবেশ করবার সময় তারা দেখে গরুর চামড়া আর একজোড়া বাঁশি টানানো। ঝাণ্ডা, ঘণ্টা ও ভাঙা কুলো প্রবেশের পথে। এগুলো তাদের লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার। অঘ্রাণ মাসে তারা গোয়াল ঘরে মারাংবুরুর পুজো করে। আতপ চাল, মেথির গুঁড়ো ও তেলসিঁদুর দিয়ে খঁড় সাজিয়ে তারা এই পুজো করে। সাঁওতালদের মধ্যে মোষ, শূকর, সাদা মোরগ বলি দেওয়াকে বলা যেতে পারে তাদের মধ্যে প্রচলিত ট্যাবু। তাদের মধ্যে প্রচলিত 'ডাইনী' বা 'ডান' নামে একটি কুসংস্কারের কথাও অভিজিত সেন তাঁর এই উপন্যাসে বলেছেন। গুনিনের বিচারে যে এই 'ডান' সাব্যস্ত হয় তাকে যাবতীয় দুর্ভাগ্যের জন্য মানুষ দায়ী করে। তাই এই 'ডান' অভিধায় অভিহিত নারীদের হাত পা বেঁধে তাদের অন্যায়ভাবে কুপিয়ে মেরে ফেলা হয়।

৩.১.৩ *রসিক* :

এরপর আলোচনা করবো সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক* উপন্যাসটি নিয়ে। লেখক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম উত্তর চব্বিশ পরগণার কাঁচড়াপাড়ায় হলেও জীবনপিপাসু মন নিয়ে

ছোটবেলা থেকেই বনে-পাহাড়ে এবং যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো ছিল তার নেশা। সেই সূত্রেই বৈচিত্র্যময় জীবনকে দেখার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ। লোকায়ত জীবন তাঁর প্রাণ মনকে টেনে নিয়ে যেত বহুদূর। অনিবার্যভাবে তারই প্রতিফলন তাঁর সমস্ত লেখালেখিতে। ব্যতিক্রম নয় তাঁর পাঠক মহলে সাড়া জাগানো *রসিক* উপন্যাসটি। বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রাঞ্জল বর্ণনায় সমৃদ্ধ উপন্যাসটি। এই উপন্যাসের পটভূমিও পশ্চিমবাংলার মানভূম-পুরুলিয়া। সেখানকার লোকজীবনের জীবন ছন্দ ঝুমুরের তালে বোলে তাদের অদ্ভুত জীবনধারাকে তুলে ধরে। সে জীবন খুব সহজ নয়। সে অঞ্চলের পাথুরে মাটি একদিকে যেমন রুক্ষ, কর্কশ ও একফসলি, তেমনি সেই কঠিন মাটির মতোই সেখানকার আঞ্চলিক মানুষের জীবনের পথেও প্রতিমুহূর্তে রয়েছে চড়াই উৎরাই। একফোটা বৃষ্টির আশায় বুক বেঁধে থাকা মানুষগুলির জীবনে দারিদ্র্য, অসহায়তার ক্লান্তি তাদের জীবনের পথে পদে পদে পর্যুদস্ত করে। দারিদ্র্যের প্রবল তাড়নায় তৈরি হয় সামাজিক–পারিবারিক নানা ধরনের জটিলতা। সেই সঙ্গেই এসে যায় সম্পর্কগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, সংঘাত। কিন্তু তাদের জীবনের এই চূড়ান্ত বাস্তব দিকগুলি তো আছেই, সেই সঙ্গে তাদের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে তাদের প্রাণের সংস্কৃতি ঝুমুর। এই ঝুমুরের ছন্দ সেই অঞ্চলের মানুষগুলির শিরা-উপশিরায়, কোষে কোষে। স্থানীয় মানুষের সহজাত সৃষ্টি এই ঝুমুর। আর সেই ঝুমুরের সূত্রেই এসেছে মানভূম-পুরুলিয়ার লোকজীবনের একটি প্রাচীন প্রথা। রসিক ও নাচনি প্রথা। বংশানুক্রমিকভাবে চলে আসছে এই প্রথাটি। মানভূম-পুরুলিয়ার ঝুমুর গাইয়ে আদিবাসী সমাজের অনেকে নেশা ও পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন এই শিল্পকে। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বিস্তৃত জীবনবোধ ও জীবন দর্শন প্রকাশিত হয়েছে এই উপন্যাসে। যিনি শিল্পী যিনি জীবনরসিক তিনি প্রান্তিক মানুষের এই আত্মিক শিল্প ঝুমুরের রস-সন্ধান করবেন এ তো স্বাভাবিকই। বাস্তবে লোকশিল্প ঝুমুরকে তিনি যেভাবে দেখেছেন, উপন্যাসে তাঁর সেই

লোকশিল্পের সঙ্গে মেলালেন লোকজীবন, দর্শন, লোকবিশ্বাস, লোকসমাজে প্রচলিত ভয়ংকর নাচনি প্রথাকে। আবার সেই সঙ্গেই আনলেন রসিক ও নাচনির সম্মিলিত প্রয়াসে সৃষ্ট তাদের এক সার্থক শিল্প ঝুমুরকে। এই রসিক-নাচনি বিবাহ বন্ধনহীন দুই নর-নারী। এরা একে অন্যের শিল্প সহচর সহচরী। রসিক ঝুমুরের গান বাঁধেন, সুর দেন, কথকতা করেন আর নাচনি তাকে নৃত্য সহযোগে পরিবেশন করেন। তারা উভয়ে মিলেই পরিবেশন করেন নাচনি ঝুমুর নৃত্যগীতি। ঝুমুরের বহিরঙ্গে মিশে আছে লৌকিক রাধাকৃষ্ণের অনুষঙ্গ। তার পাশাপাশি লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য হিসাবে এই শিল্পের গুরুত্ব তো রয়েছেই। তবে এর অন্তরঙ্গে রয়েছে নাচনি জীবনের জটিল দিকটি। এই উপন্যাসে পাওয়া যায় দারিদ্র্যের তাড়নায় ক্লিষ্ট এক মাকে যে মাতৃত্বকে বিসর্জন দিয়ে নিজের পেটের মেয়েকে বিক্রি করে দেয় এক নারী মাংস খাদকের কাছে। সামন্ততান্ত্রিক শোষক ভরতসর্দারের অত্যাচারের শিকার হয়ে তরতাজা মেয়েটির শেষ পরিণতি হয় নাচনিতে। রসিকের স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে নাচনি গ্রহণের প্রথাটি চলে আসছে। শিল্পের সহচরী হিসাবে রসিকের জীবিকা অর্জনের যন্ত্র বা উপায় নাচনিরা। রসিকের পরিবারে তাদের স্ত্রীদের যেমন যাবতীয় কাজকর্ম করতে হয়, সেরকমই একই দায়িত্ব পালন করেন এই নাচনিরা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার যে মানসিক ও শারীরিক সম্পর্ক রসিক-নাচনি উভয়ের মধ্যেও সেই সম্পর্ক তৈরি হয়। কিন্তু এই নাচনিদের কোনো সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা থাকে না। রসিকের ঝুমুর নাচ গানের এই মাধ্যম নাচনিরা তাদের যৌবনকে পণ্য করেই বেঁচে থাকে। তাদের যৌবন বেঁচেই রসিক উপার্জন করে। সেই নাচনিদের কারণে বেঁচে যায় রসিক ও তার পরিবার পরিজন। অথচ সমাজ ও পরিবারে সে ব্রাত্য। স্ত্রীর সম্মান তারা কোনো দিনও পাবে না। মানভূম-পুরুলিয়ার আদিবাসী সমাজে নারীরা এমনিতেই শোষিত। তাও রসিকের স্ত্রীদের সিঁথির সিঁদুরের অধিকার রয়েছে। অথচ নাচনিদের তাও নেই। তারা শুধুমাত্র দারিদ্র্যের

তাড়নায় বিক্রি হওয়া পণ্য। রসিকের পরিবারে রান্নাঘরে প্রবেশ তো দূরস্ত, সামান্য ভাতের হাঁড়ি স্পর্শ করার অধিকারটুকু থেকেও তারা বঞ্চিত। আদতে তারা রসিকের আশ্রিত। আদিবাসী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রচলিত উপপত্নী বা রাখনির চেয়ে নাচনিদের স্থান আদরে খুব একটা উঁচুতে নয়। রসিকের শিল্প ও জীবিকার সঙ্গেই এদের জীবনের যা কিছু মূল্য। রূপ যৌবনেই তাদের চাহিদা। রূপ যৌবনের জৌলুস কমে গেলে তাদের দরও কমতে থাকে। তাই রসিকদের জীবনে ও শিল্পে বয়স্কা নাচনির চেয়ে যুবতী নাচনির চাহিদা বেশি। মা হওয়ার অধিকার থেকেও বঞ্চিত এই নাচনিরা। কোনো কারণে রসিকের সন্তান যদি বা নাচনির গর্ভে আসে আর নাচনি যদি সেই সন্তানের জন্ম দেয় তবে নাচনির সন্তান হিসাবে জন্ম হওয়ায় সেও সংসারে ও সমাজে ব্রাত্য বলে পরিগণিত হবে। এই উপন্যাসে বিজুলিবালা, কুস্‌মি, মঞ্জুরানী, মালতী, নিশারানিদের মতো নাচনিদের কঠিন জীবনকে দেখিয়েছেন লেখক। আর কুস্‌মির মতো এক নাচনির মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সমাজে ব্রাত্য অপমানিত নাচনিদের জীবনের মর্মান্তিক পরিণতির কথা বলেছেন ঔপন্যাসিক। মৃত্যুর পর সমাজ পরিবার এই নাচনিদের স্পর্শ পর্যন্ত করে না। এমনকি রসিক ও তার পরিবার তাদের সৎকারের ব্যবস্থাও করে না। ডোমেদের ডেকে তাদের মৃতদেহ কোনোরকমে বেঁধে ফেলে দেয় কোনো ভাগাড়ে বা নদীতে। আস্তাকুঁড়েতে শিয়াল কুকুরে ছিন্ন ভিন্ন করে তাদের দেহ। মানভূম–পুরুলিয়ার কোনো কোনো জায়গায় এখনও প্রচলিত এই নৃশংস লোকপ্রথাটিকে সুব্রত মুখোপাধ্যায় উপন্যাসে দেখালেন। লোকশিল্প ঝুমুর গানের সঙ্গে মিশে গেছে সেই পাথুরে প্রকৃতির মানুষের লোকজীবন। তাদের বিশ্বাস চলনে আছে ঝুমুর গানের ছন্দ আর তাদের বুলিতেই আছে ঝুমুরের ভাষা। তাদের জীবনে প্রকৃতিকেই তারা ঝুমুরের শিক্ষক বলে মনে করে।এর সঙ্গে যুক্ত হয় তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাও। রসিক পাণ্ডবকুমারের ঠাকুরদা ভীম মাহাতোর কাছ থেকে পাণ্ডবকুমারের নাচনি বিজুলিবালা ঝুমুরের

শিক্ষা পায়। গাছের পাতা দেখিয়ে বিজুলিকে তার আঙুলের মুদ্রার মতো ভঙ্গিমা করতে বলে। এভাবে বাতাস, গাছের ডালপালা, আকাশে সবকিছুর মধ্যে থেকে নাচের মুদ্রাকে সাঙ্গীকৃত করার শিক্ষা দেয় ভীম বিজুলিকে। বিজুলিবালার আরেকজন ঝুমুর শিক্ষাগুরু নিশারানি। তার ঝুমুর শিক্ষার অভিজ্ঞতা একেবারেই ব্যক্তিগত। এরকম অভিজ্ঞতা অনেক ঝুমুর নাচিয়েদের। প্রকৃতি, দেহ সম্পর্কে চেনা পরিচয় থেকেই শুরু হয় তাদের শিল্পচর্চা। মানভূম-পুরুলিয়ার আদিবাসী সমাজে প্রচলিত এই গান, নাচ, উৎসব, আচারে স্বাধীনভাবে ঝুমুর লোকশিল্পের বিচরণকে দেখালেন লেখক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পরিবর্তিত করে নতুনত্বকে গ্রহণ করে আদিবাসী সমাজে তার এগিয়ে চলার চেহারাকে বর্ণনা করছেন লেখক। তাদের সমাজে ও চারপাশের দর্শকের কাছে এই শিল্পের গ্রহণযোগ্যতার চেহারাটি আদতে কেমন সব কিছুকে ধরছেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। কাহিনির সূত্রে এসেছে ভাদু গান, টুসু গান, মাঝি-মেঝেনদের গান ইত্যাদি।

৩.১.৪ *আড়কাঠি* :

আবার যদি ভগীরথ মিশ্রের *আড়কাঠি* উপন্যাসের প্রসঙ্গে আসা যায় সেখানে দেখা যাবে বাঁকুড়ার এক প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রামের কথা। গ্রামটির নাম গজাশিমুল। সেখানকার মানুষের বিনোদনের জগৎ তাদের লোকশিল্প। এই লোকশিল্প তাদের প্রাণের সম্পদ। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাদের গোটা জীবন। শিল্প-সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে জড়িয়ে রয়েছে গজাশিমুল গাঁয়ের আদিবাসী মানুষগুলির সংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোকপ্রথা, রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস, আচার-আচরণ, ট্যাবু, টোটেম, ন্যায়, নীতি, মূল্যবোধ সবকিছু। গজাশিমুল গ্রামের মানুষেরা মূলত বসু-শবর শ্রেণির। এই উপন্যাসে ভগীরথ মিশ্র আদিবাসী বসু-শবর জাতির লোকসংস্কৃতিকে এক স্বতন্ত্র ভাবনায় ও ভিন্নভাবে পরিবেশন করেছেন। অভিজিৎ সেন যেমন- *রহু চণ্ডালের হাড়*-এ বাজিকরদের শিল্প, সংস্কৃতি, দারিদ্র্য, শোষণ অর্থাৎ তাদের

গোটা জীবনকে তাদের অবস্থান থেকেই দেখিয়েছেন। তাদের অবস্থান থেকেই তাদের চাওয়া, পাওয়া ও না পাওয়ার বাস্তব অবস্থাকে দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেন। কিন্তু এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের পরিবেশনের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। এখানে কাহিনিকার এনেছেন এক শহুরে লোকসংস্কৃতিপ্রেমী বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক রাজীবকে। উপন্যাসে প্রথম থেকে যাকে লোকসংস্কৃতিপ্রেমী বলে মনে হয়, উপন্যাসের শেষ পর্বে সেই লোকসংস্কৃতিপ্রেমীর যে আসল পরিচয় পাওয়া গেল, তাতে বোঝা যায় আদতে সে একজন লোকসংস্কৃতির ব্যবসায়ী। তার লোকসংস্কৃতির প্রতি প্রেম আদতে ছদ্মপ্রেম। তার ভণ্ড প্রেম ও ভালোবাসা দেখানোর পিছনে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধি। তার এই ভেক মুখোশের আড়ালে মুখকে চিনতে পারে পাঠক। ভগীরথ মিশ্র *আড়কাঠি* উপন্যাসে গজাশিমুল গ্রামের সরল, সাদাসিধে মানুষগুলিকে ঠকিয়ে, তাদের লোকসংস্কৃতিকে ব্যবহার করে তাদেরকে এক ব্যবসায়িক ফাঁদে জড়িয়ে নিজ স্বার্থসিদ্ধির লিপ্সায় মত্ত এক লোকসংস্কৃতি ব্যবসায়ীর শোষণের এক ভয়ংকর দৃষ্টান্ত আনলেন। সেই অবস্থান থেকেই এখানে বাঁকুড়ার গজাশিমুল গ্রামের বসু-শবর জাতির লোকশিল্প, লোকসংস্কৃতিকে আনছেন ঔপন্যাসিক। গজাশিমুল গ্রামের মানুষকে ধান্দাবাজ দাসব্যবসায়ী রঙলালের হাত থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে রাজীব। সেইসঙ্গে রঙলাল তাদের ছলে বলে কৌশলে এদের শেষ সম্বল জমিটুকু আত্মসাৎ করে বংশানুক্রমিকভাবে দাসে পরিণত করে। ভালো থাকার লোভ দেখিয়ে তাদের বিক্রি করে পাচার করে দেয় আসাম মুলুকে। এদের পাশে দাঁড়ায় রাজীব। শুধু তাই নয় পাশাপাশি অনুসন্ধান করে তাদের লোকসংস্কৃতির। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে রাজীবের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় গজাশিমুল গ্রামের খাঁজে খাঁজে লুকিয়ে থাকা লোকসংস্কৃতিকে জনসমক্ষে তুলে ধরা। সে তাদের ভাদু, টুসু, হোলিগান ইত্যাদি যা কিছুর সন্ধান পায় তাকে সংরক্ষণ করে। এই সকল গানের শিল্পীদের নিয়ে দল তৈরি করে। পরিকল্পনা মাফিকভাবে প্রতিনিয়ত অভ্যাস করে

রাজীবের নেতৃত্বে তারা সুসংগঠিত হয়। রাজীব এদের নিয়ে পত্র পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করে। বেশ ভালোও প্রচার পায়। একসময় প্রচারের নেশা তাকে পেয়ে বসে। প্রথমে তার দলের নাম দেয় 'গজাশিমুল পার্টি'। এই গজাশিমুল পার্টির পরিবেশন বিশেষ স্থান অধিকার করে সুনাম পায়। সেই সঙ্গে আসে অর্থ পুরস্কার। কিন্তু রাজীবের প্রচেষ্টায় গাঁয়ের বিভিন্ন প্রান্তে লুকিয়ে থাকা নিশি উজাগর, শীতলা বন্দনা, শিকার-নাচ, চাং-নাচ, বিয়ের গীতি, পরবের গান, আষাঢ়িয়া ইত্যাদি অচেনা অজানা লোকসংস্কৃতিগুলি প্রচারের আলোয় আসে। লেখালেখি, বক্তৃতার সূত্রে রাজীব একদিকে যেমন পায় বিশেষ খ্যাতি- যশ, অন্যদিকে লাভ করে প্রচুর অর্থ। ক্রমে গজাশিমুল পার্টির নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখে রাজীব 'গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘ'। প্রথমে রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন পারফরম্যান্স করে সুনাম ও প্রচারের আলোয় আসে। শীঘ্রই তাদের ডাক আসে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেমন চেন্নাই, ম্যাড্রাস, দিল্লী। বিদেশীদের দৃষ্টি এড়ায় না গজাশিমুল সংস্কৃতি সঙ্ঘের সুখ্যাতি। তাছাড়াও লোকসংস্কৃতি নিয়ে কাজকর্মের সূত্রে পরিচয় হয় এক বিদেশিনী ক্যাথি বার্ডের সঙ্গে। তার সঙ্গে একসঙ্গে মিলে কাজকর্ম করতে থাকে। প্রথমে ক্যাথি বার্ডকে তাদের বাস্তবতাবর্জিত শৌখিন রোমান্টিক লোকসংস্কৃতিপ্রেমকে ব্যঙ্গ করে রাজীব। পরে দেখা যায় রাজীবই তদেরকে অস্বীকার করলেও তাদেরকে এড়িয়ে যেতে পারে না। প্রচার ও অর্থের লোভে সে সেই বিদেশিনীর একের পর এক চক্রব্যূহে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। 'ইস্ট–ওয়েস্ট ফোক ফাউণ্ডেশনের' পূর্ব ভারতীয় ডিরেক্টর ক্যাথি বার্ড বাঁকুড়া শাখার ডিরেক্টর করে দেয় রাজীবকে। রাজীব এরপর আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেতে শুরু করে। 'দ্য ফোক' পত্রিকার সর্বভারতীয় করসপন্ডেন্ট ক্যাথি রাজীবের লেখালেখিকে প্রচার করতে থাকে এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। এরপর বিদেশ থেকে বক্তৃতার ডাক পায় রাজীব। বিদেশী অনেক পত্র পত্রিকা রাজীবের লেখা ছাপাতে চায়। এরপর অর্থ যশের মোহে যত বিত্তশালী হয়ে ওঠে ততই

গজাশিমুল গাঁয়ের মানুষগুলিকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে অর্জিত তাদের প্রাপ্য অর্থ থেকে এই সহায় সম্বলহীন নিঃস্ব মানুষদের ঠকাতে শুরু করে। তাদের প্রাণের সম্পদ লোকসংস্কৃতিকে বিক্রি করে শিল্পীদের শোষণ করে। এরপর রাজীব অর্থের নেশায় গজাশিমুল গাঁয়ের বসু-শবর জাতির প্রাণের সম্পদ, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাদের কৌলিক ও নৈতিক সম্মান, পরম শ্রদ্ধার এক প্রাচীন প্রথা জলকেলি নৃত্যকে নিয়ে শুরু করে যথেচ্ছাচার। কৌলিক এই সংস্কৃতিকে তারা পরম আদরে, শ্রদ্ধায় নিজেরা লালন করে। তাদের ধারণা এই নৃত্য নাকি তাদের সকল বিপদের হাত থেকে আড়াল করে রাখে। এই জলকেলি নৃত্য গজাশিমুল গ্রামের বসু-শবর জাতির মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রাচীন প্রথা। এটি একান্তই মেয়েদের পালনীয় উৎসব। রাজীব এই গ্রামের মানুষের সঙ্গে ছলনা করে তাদের ঠকিয়ে তাদের অসম্মান করে। তাদের এই সম্মানের সঙ্গে পালনীয় প্রথাটিকে নিয়ে পণ্য করে। প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় মেয়েদের দেহ দেখিয়ে বেশি লাভবান হওয়াই ছিল রাজীবের একমাত্র উদ্দেশ্য। আদ্যন্ত সাদাসিধে, সরল, সৎ ও সোজাসাপটা মানুষগুলি রাজীবের এই মুখোশটিকে চিনতে পারে। সকলের সামনেই তার এই ভালোমানুষের মুখোশটি টেনে খুলে দেয়। রাজীবের পথ ত্যাগ করে তারা নিজেদের রাস্তা দেখে নেয়। তাদের সামনে নেমে আসা অন্ধকার থেকে তাদের আলোর পথ দেখায় তাদের মতো এই প্রান্তিক মানুষগুলির আত্মসম্মান। এর উপর ভর দিয়েই মেরুদণ্ড সোজা করে তারা আবার নতুন করে বেঁচে থাকার পথ খোঁজে।

৩.১.৫ *কলাবতী কথা* :

এরপরে দেখা যাক, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় তাঁর *কলাবতী কথা* উপন্যাসটিতে লোকশিল্পকে কীভাবে ব্যবহার করেছেন। এই উপন্যাসে রয়েছে বাংলাদেশের বারোমাসে তেরোপার্বণকে

কেন্দ্র করে মেয়েদের পালনীয় যাবতীয় ব্রতকথার বর্ণনা। কনক নামে এক স্বামীপরিত্যক্তা গ্রাম্যবধূর লোকবিশ্বাসের মূলে রয়েছে তার বারো মাসে তেরো পার্বণের পালনীয় ব্রতকথা বা পনেরো ষষ্ঠীর কথা। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন বাংলাদেশে মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত লোকবিশ্বাস এই ব্রতকথাগুলির উদ্দেশ্য নাকি লোকশিক্ষা দেওয়া। পতি দেবতা এই ভাবনা থেকেই পতির মঙ্গল কামনায় এই স্ত্রী আচার। এই ব্রতকথাগুলি ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখানো হয় মেয়ে সন্তানের প্রতি তাচ্ছিল্য। কিন্তু এই বই সর্বস্ব লোক আচার বাস্তবে মেলানো সত্যিই খুবই কঠিন। সরল লোকবিশ্বাসে কনক এই প্রত্যাশায় ব্রতকথা পালন করলেও বাস্তবে তার স্বামী ক্রমশ আরও বেশী মাত্রায় বিপথগামী হয়ে যায়। কনকের শাশুড়ি লতুর উৎসাহেই শাশুড়ি বৌমা যুগলে মিলে ব্রতকথা পালন করে। উপন্যাসে পাওয়া যায় পটশিল্পের কথা। জন্মসূত্রে কোনো পটুয়া পরিবারে জন্ম হয়নি কনকের। তাই জন্মগতভাবে বংশ পরম্পরায় সে এই জীবিকাকে লালন করেনি। এই পটশিল্পকে সহজাতভাবে না পাওয়ায় কোনো লোকসমাজের প্রতিনিধি হিসাবে সে এই লোকশিল্প চর্চা করেনি। বরং ভালোলাগা আর ভালোবাসাতেই সে এই লোকশিল্পনির্ভর পট আঁকা ও পটের গানকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে। সাংসারিক দারিদ্র্যে কর্মসূত্রেই সে এই লোকশিল্পকে বেছে নিয়েছে ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহ বশত। কুরুম্ভেরা মেলায় মেদিনীপুরের বাবুন পটুয়া, টগরী পটুয়ার পট আঁকা, গান গেয়ে কথকতা করা দেখে ভালোলাগা থেকেই কনকের পটুয়া হওয়ার সখ ও হয়ে ওঠা। তাই কনকের এই পটশিল্পকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করা আদতে পেশাদারী শিল্পীর পটশিল্প চর্চা ও সেই চর্চার মধ্য দিয়ে একজন লোকশিল্পী হয়ে ওঠা। এই পটশিল্পের সূত্রেই কুরুম্ভেরা মেলায় কনকের সঙ্গে পরিচয় হয় কলাবতী নামের একটি সাঁওতাল মেয়ের সঙ্গে। সে এই মেলায় এসেছিল বীরভূমের জিওন-ঝরনা দলের হয়ে সাঁওতালী ভাষায় নাচ-গান করতে। সেখানে এসে এক

নেশাগ্রস্ত মাতালের লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের শিকার হয় কলাবতী। মমতাময়ী কনকই তাকে আত্মহত্যার পথ থেকে জীবনের পথ দেখায়। পরিবার পরিজন সমাজের কটাক্ষ এড়িয়ে কনকই তাকে এক নিরাপদ আশ্রয় দেয় নিজগৃহে। সামাজিক কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাতে জাত-পাতের বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করে নিজের ছেলে রামুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেয় সে। ছবি আঁকায় তারও খুবই আগ্রহ। তাকেও কনক যুক্ত করে পটশিল্পে। কলাবতীও ভালো পট আঁকে। কনক, রামু ও কলাবতী একসঙ্গে মিলে কাজ করে। তাদের নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে গড়ে তোলে একটি সংস্থা। যার নাম দেয় 'পইঠা'। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কীভাবে কম পরিশ্রমে কম খরচে রঙ তৈরি করা যাবে তার প্রচেষ্টায় আধুনিক ফেব্রিক রঙের ব্যবহার শুরু করে। শুধুমাত্র সরায় পট আঁকা নয়, পাঞ্জাবিতে, টিশার্টের উপর পুরাণ, লোককথার কাহিনিকে চিত্রে রূপ দেওয়ার কথা বলে কলাবতী। কিছুদিনের মধ্যেই ব্যবসায়ীদের সুনজরে চলে আসে এই পটশিল্পের সংস্থা পইঠার কাজকর্ম। এভাবে মূল পেশা হিসাবে পট আঁকা, সেই পটচিত্র ও তার কাহিনিকে নিয়ে পটগান গাওয়ার পাশাপাশি এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য লোকশিল্প যেগুলির মাধ্যমে সহজে ও সুলভে ব্যবসা করা যায়, তার বাজারী চাহিদার দিকটির কথা মাথায় রেখে কলাবতীর এই নতুনভাবে পরিকল্পনা। এতে পইঠার বিক্রি বাটরাও বাড়ে আবার বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প মেলা থেকে তারা ডাকও পায়। আদতে বোঝা যায়, কলাবতীরও কনকের মতো একইভাবে এই পটশিল্পকে গ্রহণ করা। তবে কলাবতীর লোকশিল্পচর্চা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। বাণিজ্যিক স্বার্থের কথা মাথায় রেখে। তাই কনকের মতো শুধুমাত্র পটশিল্পই নয় কলাবতী এর সঙ্গে যুক্ত করে নেয় আরও নতুন কিছু ভাবনা চিন্তা। তাই শিল্পগ্রামের মতো ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের প্রচার ও বিজ্ঞাপনকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। ক্রমে পইঠা দলের পটচিত্রের কাহিনির নতুন নতুন গান পরিবেশনের স্টাইল ও গায়কি দেখে হতভম্ব হয়ে যায় মেদিনীপুর, বীরভূমের নামকরা

পটশিল্পী দলও। বিদেশী গবেষক ও ব্যবসায়ীদেরও চোখ এড়ায় না পইঠা দলের কার্যকলাপ। আন্তর্জাতিক বাজার দখলের খ্যাতি অর্জন করে কলাবতীকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হতে চায় জাপানী লোকশিল্পব্যবসায়ী আকিও। লোকশিল্পের ডাক তো আসেই পাশাপাশি ডাক আসে সেই শিল্পের পরিবেশক হিসাবে শিল্পীর। জাপানের হিনামাৎসুরিতে পুতুল উৎসবে পইঠা দলের ডাক আসে। বিশ্বভারতীর ভাষাতত্ত্বের গবেষক জাপানের মিকি ও তার বন্ধু আকিও দুজনে মিলে ঠিক করেছে পইঠার পটচিত্রকে ব্যবহার করে ওরা অভিনব কাঠের পুতুল তৈরি করবে। পটের রঙ দিয়ে তারা ছবি আঁকবে কাঠের উপর। আর কিছু পটকাহিনি থাকবে যেগুলোকে পটগানের মতো করে পরিবেশন করবে কলাবতী। মিকি অনুবাদ করবে জাপানি ভাষায়। কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র হবে রাধা কৃষ্ণ। রাধা-কৃষ্ণের কথাই হবে গানের বিষয়। জাপানী পুতুলের স্টাইলে তৈরি করা হবে রাধা-কৃষ্ণ। ছুতোরেরা সেইসব পুতুল বানাবে। আর সেই কাঠের পুতুলগুলিতে রঙ দেয় কলাবতীরা। জাপানের হিনামাৎসুরিতে পুতুল উৎসবে পটগানের পরিবেশনের পর কলাবতী খুব সাড়া ফেলে। ইণ্ডিয়ার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা সাঁওতাল মেয়ে কলাবতী জাপানের এই পুতুল উৎসবে গানে গানে সকল দর্শককে মাতিয়ে দিয়েছে। জাপানের অনেকগুলি টিভি চ্যানেল তার ছবি তুলেছে। অনুষ্ঠানের পরদিন খবরের কাগজে তার পুতুল হাতে নিয়ে ছবি ও নাম বেরিয়েছে। এই পারফরমেন্সের উপর নির্ভর করছিল কলাবতীর ভবিষ্যৎ। আর প্রথমদিনের পরিবেশনেই সে বাজিমাত করেছে। এরপর কলাবতীর আর জাপান থেকে ফেরা হয় না। প্রথমদিকে তার স্বামী, শাশুড়ি কনককে এক-আধটা চিঠি লিখলেও পরে দিনে দিনে সুনাম, খ্যাতি, কর্মব্যস্ততার ফাঁকে তার আর কনককে রামুকে চিঠি লেখা হয়ে ওঠে না। সে পাকাপাকিভাবে হয়ে ওঠে আকিওর ঘরনি। আকিওর ব্যবস্থাতেই সুপ্রসিদ্ধ জাপানি কমিক মাঙ্গা আর্টের ডিজিট্যাল ছবি আঁকে কলাবতী। তবে তার বিষয়টা থাকে কলাবতীর দেশেরই। মনসামঙ্গল, দুর্গা, রামায়ণ,

মহাভারত, কৃষ্ণকথাকেই আশ্রয় করে। উপন্যাসের কথকের বক্তব্য এই জাপানযাত্রাতেই নাকি কলাবতী প্রকৃত কদর পেল। তবে এই কদর এই সম্মানের পিছনে কলাবতীর যে শিল্পীসত্তা তাকে স্বীকার করলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে কলাবতীর পূর্বজীবনকে। আর সে জীবন পাওয়া সম্ভব হত না যদি না তাকে কনক আত্মহত্যার পথ থেকে জীবনের পথ না দেখাত। এই পটশিল্পকে আশ্রয় করে কলাবতীর যে উত্থান তার পিছনে অবশ্যই কনকের ভূমিকা রয়েছে। পটশিল্পের সঙ্গে হাতে কলমে কলাবতীর যে পরিচয় তা আদতে কনকের পটশিল্পচর্চার হাত ধরেই। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বাস্তবের পটশিল্পকে দেখেছেন। সেই সূত্রে তার সামনে এসেছে পটশিল্পীরা। জন্মসূত্রে যাঁরা এই পেশার সঙ্গে যুক্ত এখানে তিনি তাদের কথা বলেননি। এই লোকশিল্পকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে যারা লোকশিল্পী হয়েছেন তাদের শিল্পময় জীবনকে দেখাচ্ছেন। এক্ষেত্রে বাস্তবের লোকশিল্প তো থাকছেই তার পাশাপাশি থাকছে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকশিল্প ও নাগরিক শিল্পের নিরন্তর আদান-প্রদানের মাধ্যমে লোকশিল্পকে নিয়ে একশ্রেণির মানুষের পথচলার কথা। এই উপন্যাসে পটশিল্পের দিকে ঔপন্যাসিক তাঁর মূল ফোকাস দিলেন কিন্তু পাশাপাশি দেখালেন সাঁওতালদের নিজস্ব কিছু সংস্কৃতিকে, নারী সমাজে প্রচলিত ব্রতকথা পূজা পার্বণ, বেশ কিছু লোক উৎসব, প্রথা, প্রবাদ, ট্যাবু ইত্যাদি লোকউপাদানকে। এই উপন্যাসে যে যে দেবদেবীর পুজোর কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন মা ষষ্ঠী, সর্বমঙ্গলা, মঙ্গলচণ্ডী, দুর্গা ষষ্ঠী, ইতু, দীপান্বিতা লক্ষ্মীপুজো, নীল ষষ্ঠী, বিপত্তারিণী, সতী, আনন্দলিঙ্গ দণ্ডেশ্বর মহাদেব ইত্যাদি দেব-দেবীগণ। গ্রামীণ সমাজে মেয়েদের পালনীয় ব্রতকথা পালনের কথা এসেছে কনকের প্রসঙ্গে। কনকের শাশুড়ি লতুই তাকে পালনীয় যাবতীয় ব্রতকথা ও তার পালন, রীতি নীতি আচার ও খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জানিয়েছে। মঙ্গলচণ্ডী ব্রতকথার পালন, শুক্লপক্ষের একাদশী হিসাবে ভৈমী একাদশী পালন, সরস্বতী পুজোর পরের দিন শীতল ষষ্ঠী পালন, অশোকষষ্ঠীর

ব্রতপালন, রামনবমী পালন, বিষহরি ব্রত, লাউসেনের ব্রত, শ্রাবণ মাসে লোটনষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গাষষ্ঠী, চাপড়া ষষ্ঠী, নীলষষ্ঠী, মকর সংক্রান্তি, অক্ষয়তৃতীয়া পালনের প্রসঙ্গ এনেছেন ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। এই উপন্যাসে যে যে ব্রতকথার উল্লেখ আছে সেই সকল ব্রতকথার কাহিনিকে লতু, কনক ও কলাবতীর ব্রত পালনের সূত্রে ঔপন্যাসিক প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণনা করেছেন। সরস্বতী পুজোর পরের দিন শীতল ষষ্ঠী পালন ও গোটাসেদ্ধ খাওয়ার যে রীতি ও সংস্কারের উল্লেখ করেছেন তা হল, শ্রীপঞ্চমী তিথি থাকতে থাকতে এই রান্নাটি করে রাখতে হয়। এই রান্নার উপকরণ গোটা সবুজ মুগকলাই আর সবচেয়ে কম ছটি করে শিম, মটরশুঁটি, রাঙাআলু, আলু, বেগুন আর গোটা শুকনোলঙ্কা। নুন ও শুকনোলঙ্কা দিয়ে সবটাকে গোটা সেদ্ধ করে কাঁচা সরষের তেল দিয়ে নামিয়ে রাখতে হয়। আর তার সঙ্গে থাকবে পান্তাভাত আর সজনেফুল ছড়ানো কুলের টক ও টকদই। এই ব্রত পালনের রীতি সরস্বতী পুজোর দিন দুপুরে উপোস করতে হবে। শিলনোড়াকে তেল হলুদ ছোপানো কাপড় পরিয়ে ঠাণ্ডা হলুদ জলে রাখা হয়। আর নোড়াটিকে রাখা হয় শিলের কোলে আর শিলের মাথায় রাখা হয় জোড়া শিম ও জোড়া কলাইশুঁটি। পশ্চিমবঙ্গের অনেক মেয়েদের পালনীয় এই নিয়মটিকে আদতে বলা যেতে পারে ট্যাবু। উপন্যাসে একাধিক জায়গায় এই ট্যাবুর উল্লেখ আছে। যেমন মঙ্গলচণ্ডী ব্রতপাঠ করার সময় পুজোর ঘটে জোড়া কলা রাখা একটি নিয়ম। আদতে এটিও একটি ট্যাবু। উপন্যাসে ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় এনেছেন একাধিক লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে। যেমন- শিবরাত্রিতে শিবের মাথায় দুধ ও ঘি ডালা। আবার লতুর বিশ্বাস হারাণপাগলের বউ তার মেয়েকে লতুর একমাত্র ছেলে নিরঞ্জন দলুইয়ের জীবনে লেলিয়ে দিয়ে নিরঞ্জনকে বশীকরণ মন্ত্রে বশ করেছে। কনকের লোকবিশ্বাস মকর সংক্রান্তিতে শিবের মাথায় জল ঢাললে, স্বামী ফিরে আসবে। এখানে এসেছে জগন্নাথ মন্দিরের পুরোহিত মস্ত গণৎকার মাধবাচার্যের কথা, যিনি শুধু পায়ের দিকে তাকিয়ে মানুষের মনের কথা বলে

দিতে পারেন। কনকের পা দেখে তাকে শ্বেতবেড়েলার মূল দেয় ও হাতে তাগা বেঁধে পরতে বলে। এও একধরনের লোকবিশ্বাস ও ট্যাবু। নানা ধরনের দেবদেবী ব্রতকথা, থান মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র করে অনেক ধরনের মেলার প্রসঙ্গ এসেছে উপন্যাসে। যেমন- মকর সংক্রান্তির মেলা, ভৈমী একাদশীকে কেন্দ্র করে মেদিনীপুরের এক মেলা, কুরুম্বেরা মেলা, শিব রাত্রির মেলা, কার্তিক মাসে ময়নাগড়ের রাসের মেলা ইত্যাদি। এই সব মেলায় বিভিন্ন আঞ্চলিক লোকশিল্পের সমাগম হয়। যেমন- সাঁওতালী নৃত্য-গীতি, পটশিল্প, তরজাগান, ডোকরা শিল্প, কাঁথার কাজ, ফলের বীজ শুকিয়ে গয়না তৈরি, তালপাতার কাজ, বাটিকের কাজ, বাউল গানের আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, পোড়ামাটির শিল্প ইত্যাদি আরও কত ধরনের হস্তশিল্পের সামগ্রী এনে বিক্রি করেন লোকশিল্পীরা। প্রাসঙ্গিকভাবে উপন্যাসে দেখা যায় প্রবাদের ব্যবহার’। প্রাসঙ্গিকভাবে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন-

> লগ্নে গলা কাটা, সাথে চলে শতেক ব্যাটা , [১০]
>
> একা খেতে পায় না, আবার শঙ্করাকে ডাকে,[১১]
>
> বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর ,[১২]
>
> জামাইয়ের জন্যে মারি হাঁস গুষ্ঠিসুদ্ধ খায় মাস।[১৩]

এই উপন্যাসে ইলিশ মাছ কাটা, ধোওয়া ও রান্নার পদ্ধতি সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা আসলে লতুদের রান্নার পদ্ধতি যেটা কনক তার শাশুড়ির কাছ থেকে শিখেছে। এই ধরনের ইলিশ মাছ রন্ধন পদ্ধতি সম্পর্কে কলাবতী পরিচিত নয়। সে তার শাশুড়ি দিদিশাশুড়ির কাছ থেকে শিখছে রামুদের তথা তার শ্বশুর বাড়ির রন্ধন পদ্ধতি। সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত রন্ধন পদ্ধতি খাদ্যাভ্যাস ভুলে কলাবতী নতুন ধরনের খাওয়া দাওয়ার অভ্যাসকে শিখছে। অর্থাৎ একধরনের গোষ্ঠীগত খাদ্যাভ্যাস পালটে গিয়ে পরিবর্তিত হচ্ছে। এভাবে ঔপন্যাসিক গোষ্ঠীগত লোক-অভ্যাসের বদলকে দেখালেন। উপন্যাসটিতে

ঔপন্যাসিক সচেতনভাবে লোকউপাদানকে ব্যবহার করতে চেয়ে উপন্যাস পাঠকালে পাঠককেও যেন তার লোকউপাদান ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনভাবে জানিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে এ যেন অনেকটা পোলাও খাওয়ার সময় রাঁধুনির গোলমরিচ, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, জায়ফল, মিঠা আতর ইত্যাদির আলাদা স্বাদকে খাদ্যরসিককে আলাদাভাবে জানান দেওয়া। তাই যদি *রহু চণ্ডালের হাড়*-এর সঙ্গে এই উপন্যাসের তুলনা করা যায় তবে দেখা যাবে লোকশিল্পকে অভিজিৎ সেন এমনভাবে উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন যেন লোকজীবন লোকশিল্প একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে এগুলি সবই একই সাহিত্য প্রকরণ। এখানে সবগুলিই উপন্যাসের কথা বলা হল। তবে লোকশিল্পকে গ্রহণ করে যেমন তৈরি হতে পারে উপন্যাস, ঠিক তেমনই তৈরি হতে পারে ছোটগল্প, সৃষ্টি হতে পারে নাটক, নির্মাণ হতে পারে চলচ্চিত্র ইত্যাদি। তখনই একটি সংরূপ থেকে তৈরি হয় আরেকটি নির্মাণ। সেক্ষেত্রে লোকশিল্প থেকে থেকে তৈরি হতে পারে উপন্যাস, কখনো ছোটগল্প, কখনো বা নাটক, কোথাও বা কবিতা, কোথাও বা হতে পারে সাহিত্য ছাড়াও অন্য শিল্প যেমন ছবি, চলচ্চিত্র ইত্যাদি। এইভাবে একই শিল্প থেকে তৈরি হয় ভিন্ন ভিন্ন শিল্প। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে দেখানো যেতে পারে। কবিগান ও ঝুমুরের উপস্থাপনকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে *কবি* লিখছেন তার কাহিনিকে নিয়ে তৈরি হয়েছে *কবি* চলচ্চিত্র। আবার স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আলকাপ লোকশিল্পটিকে গ্রহণ করে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ লিখছেন *মায়ামৃদঙ্গ*। এই আখ্যানকে নিয়েই বাংলা চলচ্চিত্র পরিচালক রাজা সেন তৈরি করছেন *মায়ামৃদঙ্গ* চলচ্চিত্র, আবার এই আখ্যানকে নিয়ে তৈরি হয়েছে *মায়ামৃদংগ* নাটক। রাকেশ ঘোষের নির্দেশনায় দমদম শব্দমুগ্ধ নাট্যকেন্দ্র *মায়ামৃদংগ* নাটকটি মঞ্চস্থ করেছে। আবার সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক* উপন্যাসটি অবলম্বনে নান্দীকার *নাচনী* নাটকটি

উপস্থাপন করেছে। বাস্তবের ঝুমুর শিল্প থেকে তৈরি হল *রসিক* উপন্যাস। আবার সেই উপন্যাস থেকে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের পরিচালনায় তৈরি হল *নাচনী* নাটক। ঝুমুরের প্রকরণ, রসিক উপন্যাসের প্রকরণ আর *নাচনী* নাটকের প্রকরণ তো এক নয়। আবার, *কলাবতী কথা* উপন্যাসে ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় পটশিল্প ও মেয়েদের ব্রতকথাকে উপন্যাসে কাহিনির পরিবেশনে ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশন করছেন। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক পটশিল্প ও ব্রতকথার বিষয়কে নিয়ে উপন্যাস শিল্পে তার পরিবেশন করলেন। অভিজিৎ সেনের *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসটি নিয়ে রেজা আরিফের নির্দেশনায় আরশিনগরের প্রযোজনায় তৈরি হয়েছে নাটক। রেজা আরিফ জানিয়েছেন এর কোনো নাট্যরূপ তিনি দেননি। এটি সরাসরি উপন্যাস থেকে রূপান্তর। একই বিষয়কে গ্রহণ করে ভিন্ন ভিন্ন সংরূপে বহুমাত্রিক পাঠক প্রতিক্রিয়া তৈরি হল। তৈরি হল নব নির্মাণ। একে বলা যেতে পারে বিনির্মাণ, ইংরেজিতে 'ডি-কন্সস্ট্রাকশন'। এ প্রসঙ্গে ভাবা যেতে পারে দেরিদার বিনির্মাণ বা 'ডি- কন্সস্ট্রাকশন' তত্ত্বটি। এখানে আমি যে যে উদাহরণগুলি গ্রহণ করেছি প্রত্যেক পাঠের ক্ষেত্রে আখ্যানের বিনির্মাণ হয়েছে।

৩.২ আখ্যানতাত্ত্বিক গঠন

কোনোও শিল্পী বাস্তবের উপাদানকে যেভাবে তার শিল্পের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করছেন তার কিছু কারুকার্য আছে। একে বলা যেতে পারে শিল্পটির প্রকরণগত কারিগরী। এই গবেষণাটির নির্বাচিত বিষয় লোকশিল্প নির্ভর উপন্যাস। আর এই উপন্যাস নির্মাণের সময়ও ঔপন্যাসিক বাস্তবের অপর শিল্পকে গ্রহণ করে যেভাবে পরিবেশন করছেন, তার পিছনেও রয়েছে লোকশিল্প নির্ভর উপন্যাসগুলির কারিগরী শিল্প। সাধারণভাবে সৌন্দর্যকে উপভোগ করা হয় কিন্তু শিল্পীর প্রয়োগ কৌশলকে খেয়াল থাকে না সাধারণের। যেমন গানের সুর

শুনে মুগ্ধ হই, কিন্তু রাগিণীর খোঁজ করি না। তেমনি আবার কোনো মূর্তির বাহ্যিক সৌন্দর্যে মোহিত হই, কিন্তু তার ভেতরকার কাঠামোকে দেখতে পাই না। বাইরের সৌন্দর্যের আবরণে ভেতরকার খড় কুটোর কাঠামোটি ঢাকা পড়ে যায়। এককথায়, প্রকরণের উপর সাজ পোশাক পরিয়েই সৌন্দর্য নির্মিত হয়। অর্থাৎ দেহের কঙ্কালকে আড়াল করেই একটা গোটা রক্ত মাংসের মানুষ। সুতরাং ব্যক্ত সৌন্দর্যের মধ্যে যে অনেক অব্যক্ত ভাঁজ থাকে সেই না বলা কথাই সৌন্দর্যের মূল। আলোচ্য লোকশিল্প নির্ভর উপন্যাসগুলিতে আখ্যানের কাঠামোটির বিন্যাসকে পর্যালোচনা করা জরুরী। লোকশিল্পনির্ভর উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রেও আখ্যানের কাঠামোগত বিন্যাসকে না জানলে সে জানা অপরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *সাহিত্যের সামগ্রী-* প্রবন্ধতে জানিয়েছেন যে তত্ত্বকথা, ভাব, বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষের জন্য। কিন্তু কোনো লেখকের কোনো একটি লেখা সম্পূর্ণভাবে তাঁরই একান্ত। আর সেই কারণেই লেখক তাঁর রচনার গুণে নিজে বেঁচে থাকেন সমগ্রের হৃদয়ে। আর এই বেঁচে থাকা শুধুমাত্র বিষয় বা ভাবসর্বস্বতায় নয়। ভাবের সঙ্গে ভাব প্রকাশের উপায়ের মিলনেই তৈরি হয় প্রকৃত রচনা।

এবার আসা যাক আখ্যানের হাল হকিকতে। উপকরণ হল বিষয়ের অংশ। প্রকরণ একটি শিল্পের অনিবার্য দিক। এই প্রকরণগত কারণেই একটি শিল্প হয়ে যায় কবিতা। সেটি কখনোই নাটক হবে না। আবার একটি নাটক কখনোই প্রবন্ধ বা উপন্যাস হবে না। ছোটগল্পের সঙ্গে উপন্যাসের এখানেই তৈরি হবে পার্থক্য। একটা শিল্প মাধ্যম আরেকটার থেকে সম্পূর্ণত আলাদা তা আখ্যানের বিন্যাস কৌশলে বুঝতে পারি। এই বুঝতে পারার রূপায়ণ রহস্যই মূল। আর সেকারণেই আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট ও লেখকের সাপেক্ষে একটি কাহিনির বিচার সম্ভব হলেও তা সম্পূর্ণ নয়। তার টেকনিকের বয়ান সেখানে অধিক মূল্যবান। আখ্যান ও কথা সমার্থক ধরে নেওয়াটা ঠিক নয়। আখ্যানের মধ্যে যে 'বর্ণনা' ব্যাপারটি থাকে কথার মধ্যে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। কথা শুধু গল্প উপন্যাসে খাটে। অথচ

আখ্যানের মধ্যে পড়ে সাহিত্যের মধ্যযুগের কাব্যগুলিও। দণ্ডী তাই বুঝি তাঁর *কাব্যাদর্শ* -এ আখ্যায়িকাকে জোর দিয়েছেন। বাংলায় উপন্যাসের ক্ষেত্রে আখ্যান কথাটাই আলোচ্য গবেষণায় ব্যবহার করব।

শিল্পের অজস্র ধরন এই আখ্যানের মধ্যে পড়ছে। এর কারণে প্রত্যেক সংস্কৃতি তার অভিজ্ঞতাকে শিল্প সুষমায় অর্থময় রূপ দেওয়ার জন্য তৈরি করে নানান কোড। লেখক এই কোডকে ক্রমাগত নিজের যোগ্যতায় বা বলা চলে প্রতিভায় এনকোড করে পাঠককে। পাঠক তা নিজের পরিণতি অনুযায়ী ডিকোড করতে করতে এগিয়ে চলে। এইভাবে ক্রমশ 'And then' এর দ্বারা গল্প এগোয়। আখ্যান তাই এখানে বিশেষ কোনো সীমাবদ্ধ কোড নয়, বরং মেটাকোড। এই মেটাকোড সর্ব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই কাহিনি বা মেটাকোড যেমন অনেক কিছু বলা তেমনি অনেক কিছু না বলা। এই বলা আর না বলার বাচন তৈরি হয় লেখকের নিজস্বতা অনুযায়ী। লেখক বিষয়কে নিরপেক্ষ রেখে ফোকালাইজেশনকে বদলে দেন। এই ফোকালাইজেশনই হল তাঁর মনোভঙ্গী। এই কারণেই অমিতাভ দাস তাঁর *আখ্যানতত্ত্ব* আলোচনায় যথার্থ বলেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *শ্রীকান্ত* যদি শ্রীকান্তের বয়ানে না হয়ে রাজলক্ষ্মীর বয়ানে হত তবে উপন্যাসটির পরিবেশন সম্পূর্ণ বদলে যেত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *চতুরঙ্গ* -এ যদি সর্বজ্ঞ কথক থাকত তবে উপস্থাপনটিও অন্যরকম হত। একই বিষয় কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কথকের জন্য পাঠক লেখক সংযোগ বদলায়। সেকারণেই মঙ্গল কাব্যের কবিদের আলাদা আলাদাভাবে চেনা যায় তাদের লেখায় বয়ানে।

আখ্যানের সংগঠনটিকে দুই স্তরে ভাগ করা যায়। যথা – ফ্যাবুলা (Fabula) ও সুজেট (Sjujet)। কোনো আখ্যানের পরিকল্পনা অংশটি ফ্যাবুলা (Fabula) আর যে অংশটি নিটোল বর্ণনা তা হল সুজেট (Sjujet)। অধ্যাপক অমিতাভ দাস আখ্যানের ফ্যাবুলাকে

(Fabula) অধোগঠন (Deep Structure) আর ও সুজেটকে (Sjujet) অধিগঠন (Surface Structure) বলেছেন। আখ্যানের পরিকল্পনা অংশটির প্রকাশ একধরনের শিল্প। লেখক তার রচনার ক্ষেত্রে যখন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তা অধোগঠন। আর অধোগঠনের পরিকল্পনা অংশ যখন অধিগঠন স্তরে পরিবর্তিত হয়ে আসে তখন তার নির্মাণটি ডিসকোর্স বা বাচন। বাচনের স্তরে ফ্যাবুলা বা স্টোরি কীভাবে কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ হবে তার ভেতরের উপাদানগুলির চালিকাশক্তি হল ফোকালাইজেশন। এই ফোকালাইজেশনের বিষয় হল অধোস্তরের বিষয়। এই ফোকালাইজেশনের ফলেই স্থির হয়ে যায় কথনরীতি কেমন হবে- সেটি আত্মকথনরীতি হবে না সর্বজ্ঞ কথনরীতি হবে, নাকি তৈরি হবে ভূমিকানুগ কথনরীতি। সময় আখ্যানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সময় সাহিত্যের প্রকরণের বিন্যাসকে বদলে দিতে পারে। অমিতাভ দাস এ প্রসঙ্গে গোয়েন্দা কাহিনির উদাহরণ টেনে জানিয়েছেন গোয়েন্দা কাহিনিতে সময়ানুযায়ী ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক না থাকায় আসল রহস্যটি প্রথম থেকে পাঠকের অজানাই থাকে। পাঠক একেবারে শেষে রহস্যটি জানতে পারেন। তিনি উদাহরণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের *গোরা* উপন্যাসের সময়ের বিন্যাসকে দেখালেন। উপন্যাসটির সময়কালকে খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে উপন্যাসটিতে গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী গোরা তার জন্ম পরিচয়টি জেনেছে উপন্যাসের একেবারে শেষে। কিন্তু পাঠক গোরার জন্মরহস্যটি জানতে পারে উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। আখ্যানের চরিত্র আসলে চরিত্রের হয়ে ওঠা। এই হয়ে ওঠা আসলে চরিত্রায়ণ (Characterization)। এই চরিত্রায়ণ নির্ভর করে আখ্যানের সংস্থানের (Setting) উপর। বাচনের স্থান-কাল-ঘটনা ও চরিত্রের সংস্থাপনের কলা-কৌশল অর্থাৎ সম্পূর্ণটাই হল সংস্থান। এই চরিত্রায়ণ হয় কখনও কাহিনিকথকের বর্ণনায় কখনো বা সংলাপে। কথক যখন চরিত্রের হয়ে সংলাপ বলে তখন তাকে বলে মুক্ত পরোক্ষ বাচন। কাহিনির কথক যখন উত্তম পুরুষ তখন তৈরি হয়

আত্মকথন পরিস্থিতি। এক্ষেত্রে কথক উত্তম বা বক্তা পুরুষ আখ্যানেরই কোনো ভূমিকা বা চরিত্র। কাহিনির কথক যখন কাহিনির কোনো চরিত্র নয়, কাহিনির ভিতরকার কোনো ঘটনাক্রমে প্রত্যক্ষভাবে তার কোনো ভূমিকা নেই, অথচ কাহিনির ভিতরের চরিত্রের মনোভূমির পরিচায়ক বা সেই চরিত্রের মানসিক উত্থান পতনের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে তখন তৈরি হয় ভূমিকানুগ কথন।

৩.২.১ *মায়ামৃদঙ্গ* :

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসও অন্ত্যজের জীবনালেখ্য। বিষয়গত তারতম্যের স্বাতন্ত্র্যে তা পরিবেশিত হয় একটু অন্যভাবে। *মায়ামৃদঙ্গ*-এ এসেছে প্রান্তিক আলকাপ শিল্পীদের জীবনকথা। রাঢ়–বরেন্দ্রভূমির অবলুপ্তপ্রায় শিল্প আলকাপ, যা এক ধরনের লোকনাট্য। আর এর পরিবেশকরা সমাজের অন্ত্যেবাসী হিন্দু-মুসলমান। মধ্যবিত্তীয় অভ্যস্ত চেনা পরিচিতির বাইরে এদের জীবনযাপন। তথাকথিত ভদ্রজনোচিত সংস্কৃতির সঙ্গে একই আসনে বসায় না আলকাপের মতো অসংস্কৃত ও অপরিশীলিত সংস্কৃতিকে। তথাকথিত ভদ্র সমাজের নাগরিক সংস্কৃতির সঙ্গে এর তুলনা করে সমাজ একে ‘ইতর জনিত ছোটলোক সংস্কৃতি’ বলে প্রতিপন্ন করে। সুশীল সমাজে এসব ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরায় না। সযত্নে গা বাঁচিয়ে এড়িয়ে চলে অনেকটা মুখে কাপড় দিয়ে দুর্গন্ধ থেকে বাঁচবার মতো। এই ধরনের লোকনাট্য তাই আধুনিক নাট্যরীতির দরবারে একেবারেই ব্রাত্য।

আর এই তথাকথিত ‘ব্রাত্যসংস্কৃতি’র বাহকও এই ব্রাত্যজন। তারা জীবনের পথচলায় প্রান্তিক। তবে এরাই আবার শিল্পী। তাদের সৃষ্টির মাধ্যমে তারা দর্শক মনোরঞ্জন করে মানুষের আনন্দ বিধান করে। আলকাপের দর্শক ও শ্রোতা এই ধরনের লোকনাট্য উপভোগ করে। বাহবাও দেয়। কিন্তু মর্যাদা দেয় না। দেয় না উপযুক্ত পারিশ্রমিকও।

আলকাপের প্রধান আকর্ষণ দলের ছোক্‌রা চরিত্র। *মায়ামৃদঙ্গ*-এ ছোক্‌রা হিসাবে রয়েছে শান্তি ও সুবর্ণরা। মেয়েদের হৃদয়, মুখমণ্ডল, সাজ-পোশাক বিশিষ্ট তরুণ পুরুষ এরা। এদেরকে নিয়েই পুরুষের পাপাচরণ। যা সমাজের চোখে নিষিদ্ধ, অসংস্কৃত। তাই এদিক থেকে আলকাপ শিল্পীরা সমাজের ব্রাত্যজন। অথচ এহেন শিল্পীরাই তাদের অভিনয়ে পারদর্শিতায় সুন্দরের সাধনা করেন। এ প্রসঙ্গে আলকাপ শিল্পী সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মন্তব্যটি মনে আসে। তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি হাজার হাজার বিপন্ন মানুষকে দেখেছেন যাদের চোখের মায়ায় তিনি মোহিত হয়েছেন। চোখের এ মায়া অচরিতার্থ কামনার সৌন্দর্যের। সমাজের চোখে এ পাপ। আজকের দিনে সমকামিতা সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃত একটি বিষয়। কিন্তু সিরাজ যখন উপন্যাসটি লিখছেন তখন সমকামিতা ছিল সমাজিকভাবে নিষিদ্ধ। তাই সিরাজ তাঁর উপন্যাসে আলকাপের ওস্তাদ ঝাঁকসা যখন পুরুষ ছোকরার চোখের কামনার মায়া দেখে তা সমাজের চোখে একধরনের পাপাচারণ। তাই সমাজ নিষিদ্ধ হওয়ায় এই কামনার মায়া পাপ হিসাবে অচরিতার্থই থেকে যায়। এই উপন্যাসে আলকাপের ওস্তাদ ও শিল্পী ধনঞ্জয় সরকার জীবনের পঞ্চাশের প্রান্তে এসে উপলব্ধি করেছেন আলকাপের এই একধারে শুচিতা আর অন্যধারে অশুচিতাকে, একপাশে পুণ্য আর অন্যপাশে পাপকে। আলকাপ একদিকে শিল্পের সাধনা যা পরম সত্যের সাধনা তাই তার শুচিতা। আর আলকাপ শিল্পী যারা সেই শিল্পের সাধক তাদের বাস্তব জীবনের সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণকে কেন্দ্র করে অশুচিতার বিষয়। তাই সত্য সুন্দরের সাধনা করে একদিকে যেমন আলকাপ লোকশিল্পের পুণ্যের প্রশ্ন অন্যদিকে শিল্পীদের সমকামিতাকে নিয়ে আলকাপের সমাজে অননুমোদিত পাপের প্রশ্ন ওঠে। ঔপন্যাসিক নিজেই ভূমিকায় তাঁর এই উপন্যাস সম্পর্কে জানিয়েছেন যে তার এই উপন্যাস মূলত অর্ধনারীশ্বর বিষয়ক। অকপটে আলকাপ শিল্পীদের শিল্পজীবন ও বাস্তব জীবনের প্রকৃত তথ্য জ্ঞাপন করে। কিন্তু উপন্যাসের

মানুষ, ঘটনা আর বাস্তবের ঘটনা, মানুষ মিলেমিশে গেলে মুশকিল। লেখকের কল্পনাই এর মধ্যে সীমা টানতে পারে। এভাবেই বাস্তবের ঘটনা সাহিত্য শিল্পের রঙে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। সিরাজ একাজে সুদক্ষ ও সুনিপুণ। রাঢ়-বরেন্দ্রভূমির আলকাপ শিল্প তথা শিল্পীদলের শৈল্পিক পথচলা ও সামাজিক দিক থেকে স্বীকৃতি না পাওয়াতেই উপন্যাসটি এগিয়ে যায়। উপন্যাসের শেষে তাই সিরাজ দেখালেন সমাজ সমালোচিত তথাকথিত পাপ ও অমর্যাদাকে পাথেয় করেই আলকাপ শিল্পীদের সুন্দরের অনুসন্ধানেই পথচলাকে। অভ্যস্ত সমাজের যাবতীয় নিন্দাবাণী, নিষ্ঠুরতা, পঙ্কিলতাকে পিছনে ফেলে যায় তারা। আর সে কারণেই সুবর্ণকে নিয়ে সনাতন দলত্যাগ করে। যদিও সে অলক্ষ্যে শোনে ওস্তাদ ঝাঁক্সার গুরু মনিরুদ্দিন বিশ্বাসের সতর্ক বাণী –

> হুঁশিয়ার ! পিছনে জাহান্নাম ![১৪]
>
> তবু দুজনে এগিয়ে চলে
>
> অনেক গান আর মায়ায় ভরা একটা জগতের দিকে।[১৫]

সুবর্ণকে ছুঁয়ে সনাতন ওস্তাদের মনে একটা নতুন 'পালা' বাঁধবার সাধ জাগে। "আর এভাবেই বেজে চলে 'মায়ামৃদঙ্গ'।[১৬] সিরাজ আলকাপ শিল্পীদের ভয়ংকর এই বাস্তব জীবনের সংঘাতকে গভীর মুনশিয়ানায় শিল্পরূপ দিয়েছেন।

১৯৭২ সালে *মায়ামৃদঙ্গ*-তে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ হাজির করেছেন লিঙ্গ-রাজনীতির এক অন্ধকার জটিলতাকে। আলকাপ দলের 'ছোকরা' চরিত্রদের জীবনকে কেন্দ্র করে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা, নারীদের মনকে গুরুত্ব না দেওয়া, পুরুষ কর্তৃক তাদের ভোগ্যপণ্যে পরিণত করা এবং সর্বোপরি নারী জীবননাশের মতো পাশবিক নিষ্ঠুরতার সাক্ষী এই উপন্যাসটি। আলকাপ দলের ওস্তাদের সঙ্গে ছোকরাদের তৈরি হয় সমকামিতার সম্পর্ক। এই ছোকরা চরিত্ররা পুরুষ অথচ পুরুষ নয়, নারী অথচ নারী নয়, 'সে কিম্পুরুষ ও নয়-

সে এক অমর্ত্য মায়া'।[১৭] এই অর্ধনারীশ্বরদের জীবনকেও সিরাজ নিয়ে এসেছেন নারী-পুরুষ, না নারী না পুরুষ-রাজনীতির অদ্ভুত টানাপোড়েনে।

মায়ামৃদঙ্গ-এ ভূমিকানুগ কথনরীতি দেখা যায়। অমিতাভ দাস জানিয়েছেন ভূমিকানুগ কথন তখন হয় যখন যে দেখছে সে কাহিনির মুখ্য বা গৌণ ভূমিকায় থাকে অথচ সে কথক নয়। এই রকম কথন পরিস্থিতি এই উপন্যাসে বারংবার এসেছে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ভালো করে বোঝানো যায়। ঔপন্যাসিক চারিদিকে নিস্তব্ধ ঘন অন্ধকারের বর্ণনা দিচ্ছেন। চারিদিক সারা পাড়া নিঃঝুম। জ্যোৎস্না অনন্ধকারের ঘনছায়ার মধ্যে জনা দশেক মানুষের পথ চলার শব্দের সামান্য শব্দ যেন চারিদিকের নিঃস্তব্ধতাকে আরও প্রগাঢ় করে তুলছে। তাদের সেই পথ চলার শব্দই যেন নিঃঝুম ঘুমন্ত পাড়ার হৃদ্‌স্পন্দন। এরপরেই হঠাৎ সর্বজ্ঞ কথকের বয়ানে সেই জনা দশেক মানুষের সম্পর্কে বর্ণনা। তারা আলকাপের মানুষ। গভীর রাত, দুর্গম পথ, বিরূপ ঋতুতেও ওরা হুল্লোড়বাজ। কখনো কোমর দুলিয়ে গান গায় কাপের ভাষায় আলাপচারিতা করে। এভাবেই নিরীক্ষক বাইরে থেকে কখনো এসেছে সর্বজ্ঞ কথন পরিস্থিতি। যেখানে যে দেখছে তার স্থান কাহিনির বাইরে। যে দেখছে সেই এখানে কথক। আবার কখনও তৈরি হয় অন্তঃপ্রেক্ষিত। কাহিনি তলের চরিত্রের নিরীক্ষণে ভূমিকানুগ কথন তৈরি হচ্ছে। যেমন- সর্বজ্ঞ কথকের বয়ান ঝাঁকসা ওস্তাদের অদ্ভুত ধরনের হাসির সম্পর্কে। তারপরেই ঝাঁকসা ওস্তাদ বলছে এরকম সরাসরিভাবে কিছু না বলে কথক সরাসরি ঝাঁকসার মনের ভিতর ঢুকে পড়ে ঝাঁকসার সংলাপ বলছে যে ঊনপঞ্চাশে তার খুব কাছের আলকাপ দলের ছোকরার কথা। ঝাঁকসা কথাগুলি বলছে আলকাপ সঙ্গী ফজলের সঙ্গে। ঝাঁকসা ছোকরা সুফলের পলায়নে তার যৌবনকালের অস্থির চিত্তের কথা প্রকাশ করেছে ফজলের কাছে। এখানে উপন্যাসে কথকের বহিঃপ্রেক্ষিত ও অন্তঃপ্রেক্ষিতের অনবরত বিনিময় ঘটছে। সর্বজ্ঞ কথক রয়েছে আবার

সংলাপের কথক চরিত্রের ভিতর ঢুকে পড়েছে এবং কথা বলে চলেছে।এভাবেই সিরাজের *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসে তৈরি হয়েছে ভূমিকানুগ কথনরীতি।

মায়ামৃদঙ্গ উপন্যাসে সংলাপ ব্যবহারে ঔপন্যাসিকের অভিনবত্ব উপন্যাসটিকে প্রাণবন্ত করেছে। প্রথম পুরুষ বাচনে উত্তম পুরুষ হিসাবে এসেছে। অব্যবহিত স্থানকালগত প্রসঙ্গ (এখানে, আজ ইত্যাদি) মুক্ত পরোক্ষ বাচনে অপরিবর্তিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

> তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকায় ওস্তাদ ঝাঁকসা। তারপর একটু হাসে। কিন্তু বলে না কিছু। এ চরিত্র আজকাল এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে। এদের মতিগতি, গতিবিধি তার জানা। মানুষ তো কম দেখা হল না এদেশে-সেদেশে।[১৮]

কথন ও সংলাপের অনুপাত এবং তার ভারসাম্যকে নিপুণতার সঙ্গে বজায় রেখেছেন লেখক। সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকীয়তা তৈরি করেছেন। পদ্মা-গঙ্গা-অজয়-ময়ূরাক্ষীর উপর আকাশ থেকে ঝাঁকসা গুরু ওস্তাদ মনিরুদ্দিন বিশ্বাসের চিৎকার শুনতে পায় 'হুঁশিয়ার'।[১৯]

– এই পর্যন্ত গেল সর্বজ্ঞ কথকের বর্ণনা। কথক চরিত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে তার সামনে মায়া। ছায়ারূপী মায়া। তার পেছনেই রয়েছে ভয়ংকর জাহান্নাম। এরপরেই কথক আর চরিত্র উভয়ে তাদের স্থানটি অদল বদল করেছেন।

> সুবর্ণ !
>
> উস্তাদ !
>
> কোনোদিন আমাকে ছেড়ে পালাবি না তো ?
>
> আপনি পালাবেন না তো?
>
> না ?
>
> আমিও না ![২০]

চরিত্রের স্বরক্ষেপণ, অঙ্গভঙ্গি, উচ্চারণ, অনুচ্চারণ ইত্যাদি প্রায়ভাষাকে ঔপন্যাসিক অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। উপন্যাসের উদ্ধৃতি থেকে চয়ন করা পঙক্তিগুলিতে এই বিষয়গুলি দেখা যাচ্ছে।

আবার কথকের বর্ণনায় বয়স্ক কালাচাঁদের ছোকরা হিসাবে আলকাপ দলে অভিনয় জীবনের সম্পর্কে বলা হয়- হঠাৎ একটা বিষণ্ণতা তাকে চেপে ধরে। তার নিজেকে একলা লাগে। স্মৃতি তাকে উত্যক্ত করে। রাগে নিজের কাছে প্রশ্ন রাখে। আদতে সে পুরুষ কিনা। নাকি নারী? ক্রমে তার বয়স বেড়েছে, চুল পেকেছে, দাঁত ভেঙেছে, শরীর নড়বড়ো করছে – তবু জীবনে কামনার সাধ মেটেনি। বিষণ্ণতা বোধ, নিজেকে একা মনে হওয়া, স্মৃতিকে জড়িয়ে অস্থিরতার মধ্যে এক অদ্ভুত নাটকীয়তা তৈরি করেছেন ঔপন্যাসিক। পাশাপাশি অঙ্গভঙ্গি, প্রায়ভাষার ব্যবহারও দেখা যাচ্ছে যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কালাচাঁদের নিজের সম্পর্কে উক্ত এই সংলাপ তার যৌবনের ছোকরা জীবনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। একই সঙ্গে তার ‘অর্ধনারীশ্বর’ জীবনের মানসিক ও দৈহিক টানাপোড়েনকে ধরিয়ে দেয় পাঠকের কাছে।

উপন্যাসে যে যে চরিত্ররা এসেছে তাদের মধ্যে রয়েছে আলকাপের ওস্তাদ ঝাঁকসা ও তার দলবল। তার ব্যক্তিগত জীবনের তিন স্ত্রী। তাদের মধ্যে ঢপওয়ালী গঙ্গামণির জীবন ঝাঁকসার সঙ্গে তার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে নানান জটিলতা। অন্যদিকে আলকাপ দলের সুফল ও শান্তির কথা। অন্যদিকে এসেছে নবীন শিক্ষিত আলকাপ মাস্টার সনাতন ও তার ছোকরা সুবর্ণের সম্পর্ক। সনাতনের জীবনের সুধা নামক একটি গৃহবধূর উপস্থিতি ও তার সংসার ত্যাগ ও শেষ পর্যন্ত আলকাপ দলের দুই অভিনেতার দ্বারা ধর্ষিত হওয়া ইত্যাদি ঘটনা এসেছে। এসেছে আলকাপের বয়স্ক শিল্পী কালাচাঁদের কথা যিনি যৌবনের ছোকরা চরিত্রের নারীসুলভ স্বভাব আজও বহন করছেন। বাস্তব জীবন ও শিল্পজীবনের

টানাপোড়েনের নানা ধরনের সংকটকে সিরাজ এই উপন্যাসে অভিনবভাবে উপস্থাপন করেছেন। শিল্পের বহিরঙ্গের নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সংঘাত থেকেই যাবে। কিন্তু আলকাপ শিল্পের অমলিন নির্মল আনন্দ রস আস্বাদন করে আলকাপের সুরে প্রাচীন ঐতিহ্যের আকর আলকাপ ওস্তাদ ঝাঁকসার সঙ্গে সুর বাঁধার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যায় বয়সে নবীন সনাতন। তার এই পথের সঙ্গী থেকে যায় সুবর্ণ। দেশে দেশে এভাবেই সুরের পথের আনন্দের সন্ধান করে প্রান্তিকের লোকশিল্পকেন্দ্রিক সংকট থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। এই উপন্যাসে তাই শিল্পজীবনের শিল্পীদের ভালো- মন্দ নানাদিককে সাঙ্গীকৃত করেই কার্যকারণ সূত্রে উপন্যাসের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির হয়ে ওঠা।

এই উপন্যাসটির প্রকাশ ১৯৭২ সাল। ঝাঁকসা চরিত্র বা তাঁর গুরু মনিরুদ্দি, আলকাপের আদি গুরু বোনাকানার প্রসঙ্গ এসেছে। তবে উপন্যাসের কাহিনিকাল ঝাঁকসা ওস্তাদের জীবনকে নিয়ে ও পাশাপাশি সনাতন ওস্তাদের মতো নতুন আলকাপ শিল্পীদের প্রসঙ্গ এসেছে। বাস্তবে ঝাঁকসার জীবনকালের পরিধি জানলেই উঠে আসবে উপন্যাসটির কাহিনি কালের সময়। এছাড়াও *মায়ামৃদঙ্গ*-এ লেখকের কাহিনি বর্ণনার ক্রম এবং কাহিনির বিন্যাস ক্রমের প্রবাহধারা সমগতিতে ও সমমাত্রায় এগোয়নি। আগের ঘটনা পরে কখনো বা পরের ঘটনা আগে ঘটেছে। কাহিনি বর্ণনায় আখ্যানের সময় ক্রমকে দেখাতে গিয়ে লেখক ফ্ল্যাশ ব্যাক (Flash back) ও ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড (Flash forword)-এর ব্যবহার করেছেন বারংবার। একটি উদাহরণ হল গঙ্গামণির সঙ্গে ঝাঁকসুর সাক্ষাৎ-এর বর্ণনায় ঔপন্যাসিক এই ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। লেখকের বর্ণনায় রয়েছে হঠাৎ অবেলায় সূর্যের গ্রহণযোগ। চোখদুটো জলে ঝাপসা হয়ে আসে ঝাঁকসা ওস্তাদের প্রিয় ছোকরা শান্তি ও তার স্ত্রী ঢপওয়ালী গঙ্গামণির মিলন দৃশ্য দেখা ফেলার ঘটনাকে মনে করে। আবার সনাতনের প্রতি সুধার বক্তব্যে রয়েছে ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ডের উদাহরণ। সনাতনকে সুধা জানায় যে সে তার

শ্বশুর বাড়ি আর থাকবে না। সে সনাতনকেই ভালোবাসে। তাই তার মনের বিরুদ্ধে তার শ্বশুরবাড়ি থাকলে সে মরে যাবে। তাই সে সনাতনের সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে পালিয়ে যেতে চায়।

সিরাজের লেখনী শৈলীকে সহজ হিসাবের গাণিতিক সীমানায় ধরা সহজ নয়। উপন্যাসে দুটি প্রধান কাহিনি। একটি, প্রথিতযশা আলকাপ শিল্পী ঝাঁকসু ওস্তাদের কাহিনি। আর অন্যটি বর্তমানের শিক্ষিত যুবক ও আলকাপ শিল্পী সনাতন ওস্তাদের কাহিনি। ঝাঁকসুর কাহিনির সঙ্গে সনাতনের কাহিনিকে লেখক এক সুতোয় গেঁথেছেন। কাহিনি বিন্যাস পর্বটি মোটামুটি এইরকম। অধ্যায় বিভাজনে ঔপন্যাসিক 'নামকরণ' বা 'সংখ্যা' দিয়ে চিহ্নিত করেন নি। বরং পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন 'অন্তর্বর্তী ব্যবধান'কে।

আলো-আঁধারি 'জননী জাহ্নবী' ভাগীরথীর বর্ণনা দিতে দিতে ছোকরা জীবনের সংকটকে ঔপন্যাসিক সুচারু কৌশলে বর্ণনা করেছেন। 'ছোকরা' জীবনের আঁতের স্বরূপটি দেখানোই লেখকের কাজ। কখনো 'পড়ন্ত বিকেলের লালচে সূর্যে'র বর্ণনা, কখনো 'শ্মশানের স্তব্ধ নিঃঝুম পরিবেশ' আর 'পাখির গুঞ্জন', 'পিঁপড়ে উইপোকাদের নরম ঢিবি'র চিত্রকল্প ব্যবহার করে পাঠকের মধ্যে ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত, আলো-অন্ধকারের বৈপরীত্য তৈরি করেছেন লেখক। এই বর্ণনার ভিতর দিয়ে এভাবে ঔপন্যাসিক আলকাপ শিল্পীদের জীবনকে তথা সমাজকেও দেখালেন এক অভিনব আঙ্গিকে। ছোকরার জীবনের এই ধোঁয়াশার সংকটের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ঝাঁকসুর কথা শুরু করলেন। ঝাঁকসু ও শান্তির জীবনকে ব্যখ্যা করতে করতে এগোলেন। আলকাপের ইতিহাস, আঞ্চলিক ভূগোল, সমাজে আলকাপ দলের অবস্থান, আলকাপ শিল্পীদের আন্তরিক ও অকৃত্রিম জীবন ও তাদের সংকটকে ঔপন্যাসিক মুনশিয়ানায় উপস্থাপন করলেন। যা এককথায় অসামান্য। পাঠককে এই লেখকের বর্ণনা

কৌশলটি টান টান উত্তেজনায় ধরে রাখে উপন্যাসের সমাপ্তি পর্যন্ত। সমাপ্তির মধ্যে থাকে অনেক না বলা ব্যঞ্জনা। পাঠকের ভাবনা চিন্তার সূচনা হয় সেখান থেকে। সবদিক থেকে রাঢ় বরেন্দ্রভূমির এই আলকাপ ঐতিহ্যকে নিয়ে আলকাপ শিল্পী জীবনের ও বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্বময় সংঘাতকে স্থান, কাল, ঘটনা ও চরিত্রের মেলবন্ধন কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। এ কাজে সিরাজ অভিনব ও মৌলিক।

৩.২.২ *রহু চণ্ডালের হাড় :*

১৯৮৫ সালের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয় অভিজিৎ সেনের *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসটি। উপন্যাসটি বহির্বঙ্গীয় যাযাবর জাতির চলমান আখ্যান। তাদের এই চলমানতার পিছনে রয়েছে তাদের জীবনের স্থায়িত্বের খোঁজ। যাবতীয় ঝড়, ঝাপটা, বাধা, বিপত্তি ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে নিজেদের অবস্থার উত্তরণের পথ অনুসন্ধান করতে করতেই তারা স্থিতিশীল হতে চায়। আর সেই কারণেই *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসে বাজিকরদের বিশ্বাস যে বাজিকর গোষ্ঠীর প্রাচীন পুরুষ ও দলপতি রহু, যে তাদের একমাত্র আরাধ্য ও দিক নির্দেশক- সেই রহুর হাড় লুকিয়ে আছে মাটির গভীরে। যে মাটিতে সেই হাড়ের সন্ধান পাবে, সেই মাটিই হবে তাদের জীবনের সোনা। সেই মাটিই তাদের জীবনে সোনা ফলাবে। সেই মাটিই হবে বাজিকরদের শান্তি ও আশ্রয়। সেই মাটির সন্ধানে তাদের পথচলা। শারিবা তার নানি লুবিনির কাছ থেকে যাযাবর বাজিকর গোষ্ঠীর কাহিনি শোনে। নানির মুখে বাজিকরদের জীবনের নানা কথা শুনে বর্তমানের সঙ্গে অতীতের এক যোগসূত্র তৈরি করে শারিবা। লুবিনির নানাশ্বশুর পীতেমের কাছ থেকে লুবিনিও একসময় বাজিকর ও তাদের জীবন সম্পৃক্ত নানা কথা শুনেছে। পীতেমের বাবা দনু থেকে শুরু করে শারিবা পর্যন্ত প্রায় মোটামুটি দেড়শ বছরের বাজিকর জীবন কথাকে অভিজিৎ সেন তার এই

উপন্যাসে দেখিয়েছেন। উপন্যাসটিতে বাজিকর গোষ্ঠীর ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, আর্থ-সামাজিক, পেশাগত, লৌকিক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই পরিচয় শুধুমাত্র ইতিহাসের প্রেক্ষিতে নয়, বাজিকর জীবনের নানান ঘটনা, বাস্তব সংঘাত, তাদের সঙ্গে ঘটা অন্যায়, জুলুম, শোষণ, অত্যাচার, দ্বন্দ্ব, পর্ব-পর্বান্তরের মধ্য দিয়ে। এই জীবনে বাজিকরদের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কখনো প্রকাশ পেয়েছে হিংস্রতা আবার কখনো আপস। এই সব কিছু নিয়েই তাদের চলমানতা। কিছু পাওয়া আবার কিছু না পাওয়ার দ্বন্দ্ব। ঘর্ঘরা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গোরখপুরে ছিল বাজিকরদের আদি জীর্ণ বাড়িঘর। লুবিনি তার পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে শুনে আসছে কোনো এক শনিবারের ভূমিকম্পে ঘর্ঘরা নদীর ভূত্বক বসে যাওয়ার কথা। তার ফলস্বরূপ বাজিকরদের জীর্ণ বাড়িঘর তলিয়ে যায় নদীগর্ভে। বাজিকরদের জীর্ণ বাড়িঘর নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়ে আর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না। এরপর যাযাবররা সরে যায় ঘর্ঘরা নদীর আরও উত্তরে। সেখান থেকে তারা উৎখাত হয়ে এল গোয়ালাদের দ্বারা। এর কারণ ঘর্ঘরার উত্তরে যে গ্রামে বাজিকররা বসতি গড়ে তুলেছিল সে গ্রামটি ছিল গোয়ালাদের। তারা বনের জন্তু জানোয়ার তাড়ানোর লাঠি নিয়ে বাজিকরদের তাড়ায়। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে ঘর্ঘরা নদীর উত্তর তীরে স্থিতিশীল গোয়ালারা আদতে বাজিকরদের খুবই হীন দৃষ্টিতে দেখতো। তাদের জীবনের মূল্য এই গোয়ালা শ্রেণির কাছে পশুর জীবন তুল্য। তবে বাজিকরদের সে জীবন গোয়ালাদের পোষ্য জীবজন্তুর মতো নয়। বাজিকররা তাদের কাছে ব্রাত্য। যাযাবররা ঐ স্থিতিশীল মানুষের কাছে উপদ্রব সামিল। লোকঠকানো, চৌর্যবৃত্তিই যাদের পেশা তাদেরকে বালাই হিসাবে দেখা খুবই স্বাভাবিক। অথচ বাজিকররা তাদের দলপতিদের কাছ থেকে বংশানুক্রমে শুনে আসছে যে সারা দুনিয়াটা নাকি তাদের। উপন্যাসটির কাহিনি এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় তাদের সম্পর্কে কথিত এই বাণী আদতে বাস্তবে তাদের জীবনের প্রসঙ্গে কতটা ঠুনকো। আগের দুটি কারণ যা তাদের

জীবনে যাযাবর থাকতে বাধ্য করে তার মধ্যে প্রথমটি দেখা গেল প্রাকৃতিক। আর দ্বিতীয়টি সামাজিক। গোয়ালাদের অত্যাচারের শিকার হয়ে বাজিকরদের মাথায় হাত। বাসস্থান হারিয়ে দলপতি পীতেম নিজেদের অসহায়তায় তাদের একমাত্র আরাধ্য, সহায় ও পথনির্দেশক রহুর উপর আস্থা রেখে প্রথমে বন জঙ্গল তারপর সেগুলি পেরিয়ে দিগন্তের পথে চলল। এভাবেই নাকি তাদের পথচলার শুরু। এরপর তারা একের পর এক ক্রমাগত ঠাঁই বদল করেছে। তারপরেও ডেহ্‌রিঘাট, সেখানে কয়েক বছর থেকে সিওয়ান, সেখানে কিছুদিন, তারপর দানাপুর, পাটনা, মুঙ্গের কত দেশে বসতি গড়ে তুলবার চেষ্টা করল। কিন্তু এরপরেও তারা স্থায়ী বসতি গড়ে তুলতে পারলো না। ক্ষমতাশালী মানুষের অত্যাচারে অত্যাচারিত শোষিত এই জনজাতি বারবার এক জায়গা থেকে উৎখাত হতে বাধ্য হয়েছে। তারা আধিপত্যবাদের স্বীকার হয়ে আপস করেছে তাদের পূর্বপুরুষের বিশ্বাসে। বাস্তবে স্থিতির অভাবে শান্তি খুঁজে না পেয়ে তাদের লোকবিশ্বাসে কিছুটা হলেও ভরসা পেয়েছে। পূর্বপুরুষদের বিশ্বাসে বুক বেঁধে নিজেদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে এই ভেবে যে বাজিকরদের জীবনে ঘর গেরস্থালি এগুলো অর্থহীন। তারা যাযাবরই থাকবে। তবে তাদের মধ্যে একজন দলপতি পীতেমের বাবা দনু তাদের পূবের দেশের সন্ধান দেয়। তখন তারা প্রথমে রাজমহল, তারপর তাদের বাংলায় আসে। এরপর একের পর এক মালদা, তারপর নমনকুড়ি, রাজশাহী, আমুনাড়া ও শেষে পাঁচবিবি। তবে উপন্যাসে এই সকল জায়গার নামের উল্লেখ থাকলেও তারা আরও অনেক জায়গায় ঘুরেছে। তবে লুবিনি আর অন্যান্য জায়গার কথা মনে করতে পারে না। উপন্যাসে পাওয়া যায় প্রায় দেড়শ বছরের বাজিকর জীবন পরম্পরাকে। দনু, দনুর ছেলে পীতেম, পীতেমের দুই ছেলে ধন্দু ও পরতাপ আর একটি মেয়ে পেমা। ধুন্দুর ছেলে জামির, জামিরের ছেলে রূপা। রূপার ছেলে শারিবা। লুবিনি জামিরের বউ। অর্থাৎ শারিবা লুবিনির নাতি। শারিবাকে লুবিনি তাদের পূর্বপুরুষের কাছ

থেকে শুনে আসা কাহিনি ও নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলে। এই কাহিনির মধ্যে থেকে বাজিকর জাতির নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস, পেশা, খাদ্যাভাস, রীতি, প্রথা সর্বোপরি তাদের জীবন সম্পর্কে জানা যায়। ভৌগোলিক দিক থেকে ঘর্ঘরা নদীর উৎপত্তিস্থল তিব্বতী মালভূমিতে অবস্থিত মানস সরোবরের কাছে।এই নদী নেপালের হিমালয়ের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভারতে ব্রহ্মঘাটে শরদ নদীর সঙ্গে মেলে। এই নদীটি ভারতে ঘর্ঘরা নাম নিয়ে গঙ্গার উপনদী হিসাবে যুক্ত হয়। আর গোরখপুর ভারতের উত্তরপ্রদেশে। অর্থাৎ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলেই এই ঘর্ঘরা নদী ও গোরখপুর যেখানে ছিল বাজিকরদের আদি বাসস্থান। এরা প্রথমে কৃষিকাজ জানত না, যদিও উপন্যাসে অনেক পরে বাঁচার তাগিদে সাঁওতালদের কাছ থেকে তাদের কৃষিকাজ শিখবার কথা পাওয়া যাচ্ছে। তবে এই গোষ্ঠীর মধ্যে পশুপালনের ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে। যে কোনো সভ্যতার প্রাচীন এই রূপটি বাজিকর গোষ্ঠীর ইতিহাসের রূপরেখাটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়। এদিক থেকে দেখতে গেলে আর্যদের সঙ্গে এদের মিল আছে। সেই বহির্বঙ্গীয় অস্থায়ী বাজিকর গোষ্ঠীর উত্থান পতনের পালাবদল ঘটেছে। ঘর্ঘরার মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করার পর তারা প্রত্যাখ্যাত হয় গোয়ালাদের অত্যাচারে। এরপরেও বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি একের পর এক সাহেব, পুলিশ, মুন্সি, মহাজন, শুঁড়ি, কয়াল, দালালদের চক্রান্ত ও অত্যাচারের শিকার হয় তারা। বসতিস্থান বদল করে নতুন জায়গার সন্ধান করে। বাজিকর শ্রেণির মূল্য মূল সমাজের শোষকদের কাছে জন্তু জানোয়ারের থেকেও কম। তাদের নারীদের অবস্থা আরও ভয়ানক। রাখনী করে রাখা, লুঠতরাজ, ধর্ষণ, খুন, জখম, পুড়িয়ে মারার মতো নৃশংস অত্যাচারে পর্যুদস্ত হয় বাজিকর মেয়েদের জীবন। তবে উপন্যাসের একেবারে শেষ পর্যায়ে দেখা যায় বাজিকররা স্থায়ী জমি পায়। তাদের স্থিতিশীল হয়। কিন্তু স্থিতিশীল হওয়ার পরিবর্তে বাজিকরকে মুসলিম হতে হয়। প্রায় দুশো জন

বাজিকর মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তবে যেহেতু এতদিন পর্যন্ত বাজিকরের কোনো ধর্ম ছিল না তাই তাদের হিন্দু কিম্বা মুসলিম কোনো জাতিই তাদের স্বীকার করে প্রাপ্য সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা দিত না। তাদের না ছিল রেশনকার্ড। ফলত চিনি, কেরোসিন ইত্যাদি প্রাপ্য সামগ্রীর দাবীদার যে বাদা কিসমতের জমিগুলির বাসিন্দারাও হয়েছিল, কিন্তু বাজিকররা সেই সুবিধা পায়নি। বাজিকর মূলত তাদের অস্তিত্ব রক্ষার ভয়েই সেই সুবিধা অর্জন করে নিতে পারেনি। বাজিকর পাড়ায় ছয় ঘরের মতো মানুষ মুসলমান হয়নি। বাজিকরদের স্থিতি পাওয়ার একবছর পরেও তাদের জীবনে সত্যিকারের কোনো উন্নতি হল না। বাজিকরদের অবস্থা যে তিমিরে ছিল, ধর্মান্তরিত হয়ে, জমি পেয়েও তাদের অবস্থা সেই একই থাকলো। নিরন্ন, অসহায়। প্রথম পরিচ্ছেদে লুবিনি শারিবাকে স্বর্গের অঢেল খাবারের বন্দোবস্তের কথা জানায়, সেখানে শারিবার মন্তব্যটি বড়োই মর্মস্পর্শী। বাস্তবের না পাওয়া থেকেই লুবিনি স্বপ্ন দেখে মৃত্যুর ওপারে বাজিকর বেদেদের স্বর্গরাজ্যে তাদের জন্য সাজানো রয়েছে রাশি রাশি খাবার। শারিবার মনে প্রশ্ন জাগে মরার পরে অঢেল খাবার খেয়ে কী হবে। ধর্মের দিক থেকেও দেখা গেল হাজিসাহেব তাদের জাতে তুলতে চান না। তারা বেজাত মুসলমান হয়েই থাকে। হাজিসাহেব তাদের সত্যিকারের মুসলমান হওয়ার জন্য নিয়ম মতো নামাজ পড়া, ক্রিয়াকর্ম পালন করা, হাদিস মানার কথা বলেন। কিন্তু এসব কিছু পালন করেও তারা জাতে উঠতে পারে না। সাচ্চা মুসলমানের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান হয় না তাদের। ধর্মান্তরিত বাজিকর তথা বেজাত মুসলমান মেয়েদেরকে কেউ বিয়ে করতে চায় না। তাদের মধ্যে লোকসংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। তাই সমাজ তথা রাষ্ট্রের কাছে তাদের অবস্থার কোনো উন্নতিই হয় না। তাই কোনোরকম মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু পেয়েও তাদের মধ্যে এখনও প্রবল ভয়, সংশয় কাজ করে। তাই স্থিতিশীল হওয়ার পরও শারিবার রক্তের মধ্যে প্রবহমান অস্থিরতা কিছুতেই কাটতে চায় না। তাই নানি

লুবিনির চোখে মুখে দেখা যায় ভয়ের ছায়া। তার মনে পড়ে পীতেমের মার খাওয়া, পেমার আর্তনাদ, নমনকুড়ির বন্যায় সোনার ফসল শেষ হয়ে যাওয়ার দৃশ্য, লুবিনির ধর্ষিতা হওয়া, সাপে কাটা, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া, ওমরের ছিন্ন ভিন্ন মুণ্ডকে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়ার মতো ভয়ংকর সব কথা। মূল সমাজের কাছ থেকে বাজিকরদের জীবনে বারংবার ফিরে পাওয়া লাঞ্ছনা, অপমান, আঘাত থেকে সমাজের কাছে আদতে তাদের জীবনের মূল্য কতখানি তা রূপা বাজিকর টের পেয়েছিল। তাই সে তার প্রথম স্ত্রী শারিবার মাকে বলে বাজিকরদের জীবনে হারানোর কিছুই নেই। তাদের পূর্বপুরুষের সময় থেকে তারা একটি নির্দিষ্ট ভূমিতে স্থিতু হতে চাইছে কিন্তু বাস্তবে তা তারা কিছুতেই সম্ভব করতে পারছে না। এক জায়গা থেকে ক্রমাগতই অজানা স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে চলেছে। তাদের মধ্যে ক্ষমতাশালী মানুষেরা হিন্দু ও মুসলমানের বিভেদ তৈরি করে তাদের পৃথক করতে চেষ্টা করে। তারাও সামাজিক মর্যাদা পাওয়ার জন্য ধর্মান্তরিত হয়ে কেউ নিজেকে ভাবে হিন্দু আবার কেউ নিজেকে ভাবে মুসলমান। কিন্তু ধর্মের দিক থেকেও মূল সমাজের চোখে তাদের কোনো পদোন্নতি হয় না। তারা আদতে সেই বেদে বাজিকরই থেকে যায়। এর জন্য রূপা নিজেদের অদৃষ্টের কাছেই নতি স্বীকার করে। তাদের এই অবস্থার কারণ হিসাবে নিজেদের পাপের ফলকেই দায়ী করে তারা। এভাবে তারা নিজেদের নিয়তির সঙ্গে আপস করে। এও আদতে তাদের উপর নেমে আসা শোষক সমাজের অত্যাচারে জর্জরিত নিঃস্ব রিক্ত মানুষগুলির মধ্যে শিরায় শিরায় বয়ে যাওয়া আধিপত্য (হেজেমনি)। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কবি* উপন্যাসে আমরা নিতাই কবিয়ালের কণ্ঠেও আমরা এই নিয়তিকে দায়ী করার আক্ষেপটিকেই লক্ষ্য করি। নিতাইয়ের মনে হয়েছে পূর্বজন্মের কোনো অপরাধের কারণেই তার ডোমকুলে জন্ম। আর সেকারণেই তার কবিয়াল হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যতরকমের বাধা। তবে, *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসের শেষ পর্বে দেখা যায় বাজিকররা জমি পায়, স্থিতি

পায়, কৃষিকাজ শেখে। ওমর-মালতীর প্রেম ও বিয়েকে কেন্দ্র করে বাজিকর ওমরের উপর নেমে আসা নমঃশূদ্রদের অত্যাচারের ফলস্বরূপ ওমরকে খুন করে নমঃশূদ্ররা। পরে মালতীকে তার পরিবার আর বিয়ে দিতে পারেনি কারণ বাজিকরের ঘরের ছোঁয়া মেয়েকে বিয়ে করতে চায় না কেউ। নমঃশূদ্র সমাজের যথেচ্ছ অত্যাচারের শিকার হওয়া থেকে কোনোমতে বেরিয়ে দেখা যায় মালতী বাজিকর ওমরের জীর্ণ ঘরখানা দখল করে। তারপর অনেকদিন পেরিয়ে যায়। মালতীর ছেলেটিও বড়ো হয়ে ওঠে। মালতীর জীবনে শারিবা আসে। তাদের উভয়ের মনেই ওমর থেকে যায়। শারিবা মালতী ও তার ছেলের দায়িত্ব নেয়। ওমর ও মালতীর প্রেমে, ভালবাসা, বিবাহে যে সমাজ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, শারিবা ও মালতীর ক্ষেত্রে আর সেই বাধা থাকে না। শারিবা ও মালতীর তাদের গ্রামে ফিরে যাওয়ার দৃশ্যেই উপন্যাসটি শেষ হয়। এই দৃশ্য যাযাবর বাজিকর জাতির ঠাঁই পাওয়া, সমাজ পাওয়া, ভূমি পাওয়া, ঘর পাওয়া সর্বোপরি আশ্রয় খুঁজে পাওয়ারই ইঙ্গিতবাহী।

এই উপন্যাসটির প্রকাশ সাল ১৯৮৫। এই উপন্যাসের কাহিনিকাল ও কথনকাল এক নয়। এই দুই সময়কালের মধ্যে পার্থক্য আছে। উপন্যাসটিতে মোট তেষট্টিটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এখানে ঔপন্যাসিক প্রায় দেড়শ বছরের বাজিকর সম্প্রদায়ের জীবনকে দেখিয়েছেন। লেখক একেবারে শেষে তেষট্টি পরিচ্ছেদে জানিয়েছেন পীতেম থেকে শারিবার মধ্যেকার একশ বছরের জীবনের ব্যবধান। পীতেমের বাবা দনুর কথা এসেছে প্রসঙ্গ সূত্রে। তার জীবনের সময়কাল মোটামুটি প্রায় কম বেশি পঞ্চাশ বছর ধরা যায়। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যেতে পারে মোটামুটি দেড়শ বছর। প্রথম পরিচ্ছেদে বাজিকরদের জাত বিচারের প্রশ্নে চৌধুরী সাহেবের 'তুমরা হিঁদু না মোছলমান' এ প্রশ্ন যখন ওঠেনি, আবার লালকুঠির ম্যানেজার বাবু তাদের একই সঙ্গে শুয়োর ও গোরু খাওয়ার প্রশ্নে কোনো আপত্তি ওঠেনি, সেই সময়ের কথা লুবিনি শারিবাকে বলছে। কথক পাঠককে জানায় সেসময়

হিন্দুস্থান-পাকিস্তান ভাগ হয়নি। অর্থাৎ হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে বিভক্ত হওয়ার প্রসঙ্গ ওঠায় বোঝা যাচ্ছে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা পায় ও ইংরেজরা ভারতীয়দের হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত করে। তার অনেক আগে থেকে উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে কাহিনি কাল আরও পূর্বে। তবে উপন্যাসটির কথন কাল ১৯৪৭ সালে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে ভাগ হওয়ার কিছুদিন আগের ঘটনা। আর এই ১৯৪৭ -এর পরবর্তী কালের সাপেক্ষে বাজিকরদের জীবনের নানা ঘটনা, পরম্পরা, বদলকে দেখছে শারিবা। লুবিনির পরবর্তী পর্বে বাজিকরদের জীবন কথাকেও ঔপন্যাসিক হাজির করেছেন। উপন্যাসে শারিবার জীবৎকালের প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। বাজিকরদের জমি পাওয়ার বা স্থিতি পাওয়ার সময় মোটামুটি ১৯৬৬–৬৭ সাল নাগাদ। উপন্যাসে ১৯৬৬ সালে ভায়রোর প্রসঙ্গে বাজিকরদের বিচার চাওয়ার প্রসঙ্গ ওঠে। ১৯৬৭ সালে নির্বাচনের ডামাডোলে বাজিকরদের মুসলমান হয়ে যাওয়ার কথা আছে। সুতরাং কথন কাল পাওয়া গেলেও কাহিনি কাল বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে সেটি মোটামুটি শারিবার জীবনের পর্ব থেকে দেড়শ বছর পিছিয়ে যেতে হবে। সুতরাং পীতেম বাজিকরের বাবা দনুর সময় কাল মোটামুটি আনুমানিক ১৮০০ সালের প্রথম দশকের আগে পরে। আখ্যানের সময় নির্ণয় করতে গেলে আমরা স্বশাসিত কালকে পাই। এই স্বশাসিত কাল তখনই হবে যখন উপন্যাসের কাহিনি কাল ও কথন কালের মধ্যে পার্থক্য থাকবে। এই উপন্যাসটির সমকাল নির্ণয় করতে গিয়ে দেখা গেল এর সময় স্বশাসিত। এখানে কাহিনি কাল ও কথন কাল আলাদাভাবে পাওয়া যায়।

ঘটনার সঙ্গে কার্য-কারণ সূত্রে এই উপন্যাসের চরিত্রগুলির প্রাসঙ্গিকভাবে ‘হয়ে ওঠা’ এক অনবদ্য রূপ নিয়েছে। এই উপন্যাসে অনেক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। ঔপন্যাসিক প্রত্যেকটি চরিত্রের হয়ে ওঠাকে দেখিয়েছেন। নানি লুবিনি ও নাতি শারিবার কথোপকথন

দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। উপন্যাসের শেষেও দেখা যায় শারিবার প্রসঙ্গ। কাহিনির বিন্যাসের সূত্রে উপন্যাসের মাঝখানেও বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে শারিবার প্রসঙ্গ এসেছে। শারিবাকে সেই দিক থেকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে দেখতে পারি। এছাড়াও উপন্যাসটিতে দেখা গেছে একাধিক চরিত্র যেমন দনু, পীতেম, সালমা, পীতেমের ভাই বালি, ধন্দু, পরতাপ, জিল্লু, পেমা, রোহীন, জামির, লুবিনি, পলবি, ওমর, রূপা বাজিকরদের। বাজিকরদের জীবনের সূত্রে সমাজের বাজিকর ছাড়াও উপন্যাসে এসেছে চৌকিদার, জানকীরাম দারোগা, দয়ারাম ভকত, সাঁওতাল ডুমকা সোরেন, বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সোরেন, আনন্দ, ইয়াসিন, হাজি সাহেব, ভায়রো, আজুরা মণ্ডল, পাতালু, মালতী, পাখি ও আরও অন্যান্যরা।

সর্বজ্ঞ কথকের বয়ানে উপন্যাসটি শুরু। তারপর দেখা যাচ্ছে মুক্ত পরোক্ষ বাচন। লুবিনির দৃষ্টিকোণ থেকে তার নাতি শারিবাকে ঠাকুরমার ঝুলি থেকে গল্প বলার ধরনে এ উপন্যাসের এগিয়ে যাওয়া। সেই সূত্রে তৈরি হয় ভূমিকানুগ কথন। তারপরেই চলে তাদের সংলাপ। শারিবা ও লুবিনির সংলাপ চলে তাদের সমাজ উপভাষায়। চরিত্রের অন্তরালে রয়েছে সর্বজ্ঞ কথক, ভূমিকানুগ কথক ও মুক্ত পরোক্ষ বাচন। লুবিনির শারিবাকে গল্প বলার পরিপ্রেক্ষিতে কাহিনির চলন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে কথন ভঙ্গির দুটি স্তর আছে। একটা স্তর রয়েছে বাইরে আর আরেকটি স্তর রয়েছে অন্তরালে। বাইরের যে স্তর সেখানে কখনও এসেছে সর্বজ্ঞ কথন কখনও বা ভূমিকানুগ কথন। আর বাইরের এই দুটি কথন পরিস্থিতির সঙ্গে অভ্যন্তরে সমান্তরালে চলছে কখনো মুক্ত পরোক্ষ বাচন, কখনো বা ভূমিকানুগ কথন আবার কোথাও চরিত্রের মনোভাবকে বলে সর্বজ্ঞ কথন। আবার তার সঙ্গে আসছে চরিত্রের মুখের সংলাপ। উপন্যাসটি যখন শুরু হচ্ছে শারিবার ও লুবিনির সম্পর্কের সাধারণ বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে উপন্যাসটির একেবারে শুরুর লাইনটিতে। কথক যখন চরিত্রের হয়ে সংলাপ আওড়ায় তখন দেখা যায় মুক্ত পরোক্ষ বাচন।

লুবিনি বলে এক অজ্ঞাত দেশের কথা। সি দ্যাশ হামি নিজেই দেখি নাই, তোক্ আর কি কমো।...[২১]

সংলাপ শেষ হওয়ার পর সর্বজ্ঞ কথকের বর্ণনা চলছে। বর্ণনায় পাওয়া একটি উদাহরণ-

চৌকিদার এসে সর্দারকে থানায় ডেকে নিয়ে যেত। জী হুজুর, আমরা বাউদিয়া-বাজিকর বটি। জী মালিক, হামার নাম পীতেম বাজিকর।[২২]

সর্দার যে আদতে পীতেম বাজিকর তা নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হল না। কিন্তু কাহিনিতলের বাইরের সর্বজ্ঞ কথক সর্দারের সম্পর্কে বলছে, সেই সর্দার আদতে কাহিনির অন্তর্গত পীতেম চরিত্রকে প্রতিফলক হিসাবে আয়নার মত ব্যবহার করছে। পীতেম বাজিকর নিজের ও নিজেদের গোষ্ঠীর মানুষের সম্পর্কে কথা বলছে। এক্ষেত্রে তৈরি হল ভূমিকানুগ কথন। এভাবে কখনো দেখা যাচ্ছে সর্বজ্ঞ কথকের আবার কখনও ভূমিকানুগ কথকের বয়ান। তবে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বাইরের স্তরে, যেখানে দেখা যাচ্ছে লুবিনি ও শারিবার গল্প বলে চলার বিষয়টি। এবার ভেতরের স্তরটিতে অর্থাৎ গল্পের মধ্যেকার যে গল্প তার কথন পরিস্থিতিকে লক্ষ্য করব। কখনও দেখা যাচ্ছে মুক্ত পরোক্ষ বাচন। যেমন দারোগা ও পতিত সাউ-এর একটি ঘটনা শুনে পীতেম বিষাদগ্রস্ত হয়। পীতমের এই বিবরণটি সর্বজ্ঞ কথকের বয়ানে রয়েছে। কথক পীতেম চরিত্রের হয়ে সংলাপ বলে,

আহারে এমন মানুষ, এমন মর্যাদাবান মানুষ।[২৩]

কোথাও হয়েছে ভূমিকানুগ কথন।

আর সেই মানুষ! অনেকক্ষণ দু-জনে চুপচাপ বসে থাকে।[২৪]

আবার কখনো সর্বজ্ঞ কথক। যেমন-

সালমা যখন আকারে ইঙ্গিতে এসব কথা বলেছিল তখন যে পেমা বোঝেনি এমন নয়।[২৫]

রহু চণ্ডালের হাড় উপন্যাসে লেখক অভিজিৎ সেন মূল কেন্দ্রে রেখেছেন বাজিকর জাতির জীবনপ্রবাহকে। স্থায়িত্বের খোঁজে তাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অভিভাষণকে। তাদের জীবনের এই চলায় একের পর এক বাধা বিপত্তি, প্রতিরোধকে সামনে রেখে নিজেদের অবস্থার উত্তোরণের পথ খুঁজেছে তারা। খুন, জখম, ধর্ষণ, প্রতিহিংসা, জমি ও ফসল থেকে উৎখাত হয়ে অত্যাচারে বিপর্যস্ত হয়েছে বারবার। এই বাজিকর গোষ্ঠীকে ব্রাত্য করে রেখেছে সমাজের মানুষ। সামাজিকভাবে মর্যাদা দেয়নি কোনোদিন। চুরির অপবাদে মিথ্যা অভিযোগ তুলেছে তাদের বিরুদ্ধে। তাদের গোষ্ঠীর বাইরে অন্য জাতের মেয়েকে ভালোবেসে নৃশংসভাবে খুন হতে হয়েছে তথাকথিত উঁচুজাতির দ্বারা। কখনো পতিত অনাবাদী জলা জমি কখনো আবার শ্বাপদ সংকুল পাথুরে ভূমি তাদের দিয়ে মানুষের বসবাসের উপযুক্ত করে তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। কখনো অন্যায়ভাবে তাদের জান প্রাণ দিয়ে অতিকষ্টে ফলানো তরমুজের ক্ষেত নষ্ট করেছে। তরমুজ ভর্তি নৌকা জলে ডুবিয়ে সব ফসল লুঠ করেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবল থেকেও রেহাই পায়নি তারা। বন্যা তাদের জমি কেড়ে নিয়েছে। জীর্ণ ঘরবাড়ি, মাথা গোঁজবার ঠাঁই নষ্ট করে দিয়েছে। অনেক সময় কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়ার আশায় আপস করতে হয়েছে ক্ষমতাশালী মানুষের সঙ্গে। অন্যায় যখন অসহনীয় হয়ে উঠেছে, তখন তারা প্রতিবাদ করেছে সংগঠিতভাবে। নিজেদের উন্নতি চেয়েছে। বাসস্থানের স্থায়িত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে বারংবার মানুষ তাদের ঠকিয়ে বিভ্রান্ত করেছে। গোষ্ঠীবদ্ধ বাজিকর মানুষগুলির জীবনে হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজ সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন, ধর্মের প্রশ্ন তুলেছে। স্থায়ী জমি পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করেছে। কিন্তু দেখা যায়, ধর্মান্তরিত হয়েও তারা বেজাতি মুসলমানই হয়ে থাকে। তারা আর জাতে ওঠে না। আদতে তারা কোনোদিনই জাতে ওঠে না। তারা হিন্দু সমাজে যেমন ব্রাত্য হিসাবে পরিগণিত হয় সেরকমই মুসলমান সমাজেও

ব্রাত্য মুসলমানই থেকে যায়। জাতে উঠতে চাওয়া ও জাতে উঠতে না পারার যন্ত্রণাটা তাদের মধ্যে থেকেই যায়। এটাই তাদের জীবনের চরম ট্রাজেডি। তাই তারা ভয়েই দাবী করে না ভোটাধিকার। দাবী করে না রেশন কার্ডের মাধ্যমে চাল, চিনি পাওয়ার সুবিধা। অর্থাৎ একশো বছরে তারা শুধু জমির স্থিতি ছাড়া আর কিছুই পায় না। প্রাচীন কালেও যেমন তারা ছিল সমাজ পরিত্যক্ত প্রান্তিক, এখনও মূল ধারার সমাজে অন্যান্য জাতির পাশাপাশি তাদের স্থান হয় না। তাদের স্থান থেকে যায় সমাজের সেই প্রান্তেই। দেশ, কাল, সমাজের সাপেক্ষে বাজিকরদের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অবস্থানকেই দেখালেন লেখক অভিজিৎ সেন তাঁর এই উপন্যাসটিতে।

এই উপন্যাসের স্থান-কাল-ঘটনা-চরিত্রের সংস্থাপনের কৌশলটি নিখুঁতভাবে পরিবেশিত হয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে লেখক অভিজিৎ সেন একজন বড়োমাপের শিল্পী। তিনি যথার্থই একজন শিল্পী হিসাবে উপন্যাসে স্থান, কাল, ঘটনা, চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তাদের প্রত্যেকটি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে কার্য-কারণ সম্পর্ক। সেক্ষেত্রে কোনো অসঙ্গতি নেই। নেই কোনো অপ্রাসঙ্গিক বিষয়। বাজিকরেরা যখন অত্যাচারী শ্রেণির শোষণের শিকার হচ্ছে চারিদিকে দেখছে শুধুই অন্ধকার, তখন দলপতি পীতেম বাজিকরের দিশেহারা অবস্থা। তাদের দলকে নিয়ে তারা কোথায় একটু মাথা গোঁজবার ঠাঁই খুঁজে পাবে তা তার একেবারেই অজানা। এসময় তার মনে আসে তার পিতা দনু তাকে একদা বলেছিল পুবের দেশে যাওয়ার কথা। দনুর বিশ্বাস ছিল যে পুবের দেশে গেলে বাজিকরদের ক্ষুধা নিবৃত্তির অভাব হবে না। সেখানে জল আছে, ফল আছে, মানুষ ও পশুপাখি আছে। এই সূত্র ধরেই এক বাজিকর নারী সালমার মনে আসে ভানুমতীর খেলার ভবিষ্যৎ কী সেই প্রশ্ন। সেই প্রসঙ্গেই আসে সভ্যতার বিবর্তনে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের টিকে থাকার প্রসঙ্গ। যান্ত্রিক সভ্যতার অন্যতম এক আবিষ্কার রেলগাড়ি দৈত্যের মতো গাড়ি প্রচণ্ড গতিতে

মাইলের পর মাইল ছুটে যায়। সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষ যখন বিজ্ঞান-মনস্ক, প্রযুক্তি-নির্ভর তখন কারা দেখবে সালমার এই বুজরুকি, কুহক বিদ্যা। সালমার স্থান থেকে তৎকালীন জীবন ও সময়কে দেখা তার মনের মধ্যে তৈরি করে তাদের অস্তিত্বের সংকটের বাস্তবিক এই প্রশ্ন। সে বুঝতে পারে সাহেবদের নিত্য নতুন দ্রব্যের আমদানির যুগে মানুষের হাতে থাকবে না কোনো সময়। তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে মানুষ বাজিকরের এই নাচগান আর দেখবে না। এই চরম বাস্তব সত্যের উপলব্ধি হয় সালমার মনে। উপন্যাসটির থেকে উদ্ধৃত এই অংশটি স্থান-কাল-ঘটনা-চরিত্রের সংস্থাপনের নিখুঁত কৌশলটিকে নির্দেশ করে। এ সকল দিক থেকে উপন্যাসের সংস্থানের বিষয়টিকে সার্থকভাবে দেখিয়েছেন অভিজিৎ সেন।

৩.২.৩ *রসিক* :

রসিক-এ সুব্রত মুখোপাধ্যায় মানভূম পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলের ঝুমুর গাইয়ে নাচিয়েদের জীবনকথা ও তাদের শিল্পময় জীবনকে এঁকেছেন কাহিনির ঘনঘটায়। তিনি মুখ্যত আনছেন দুই ঝুমুর গাইয়ে নাচিয়ে পরিবারকে। সেখানকার আদিবাসী মানুষজনই মূলত সমাজের অন্ত্যজ। ঝুমুর গান নাচ তাদের প্রাণের সম্পদ। তাকে কেন্দ্র করেই তাদের বাঁচা মরা। এ গান নাচ তাদের পাথুরে পথচলায়, পাতার মর্মর শব্দে। আবার, নদীর কুলু কুলু বয়ে চলায়, বৃষ্টির শব্দে। কখনো বা পাখির কলতানে। প্রকৃতির মধ্যে বিচিত্র সুরে ও ছন্দে এ অঞ্চলের মানুষ সহজাতভাবেই শিখে যায় এই গানের সুর। আর জীবনের অভিজ্ঞতায় তারা সৃষ্টি করে এ গানের ভাষা। এই অঞ্চলের অনেকেই ঝুমুরকে নেশা ও পেশা হিসাবে গ্রহণ করে সমৃদ্ধ করে তাদের জীবন। বংশানুক্রমিকভাবে একে জীবিকা হিসাবে পাশে রাখে। এই উপন্যাসে বর্ণিত রসিক ও তাদের নাচনিদের জীবনও চালিত হয়

এইরকম ঝুমুর গানের দ্বারা। এরা সমাজের খেটে খাওয়া মানুষ। এরাই বিত্ত, জাতি সমস্ত দিক থেকে অন্ত্যজ। নুন আনতে এদের পান্তা ফুরানোর অবস্থা।

পথ চলতে চলতে, কথা বলতে বলতে মুখে শিস্ দিয়ে অথবা ঝুমুরের কলি ভেঁজে কিশোর যুবক যুবতীর নাচের ভঙ্গী শেখেন, ঝুমুরের সুর তোলেন। তাই মানভূমের প্রবাদ 'হামদের বলাটাই ঝুমুর, চলাটাই নাচ'। নারী পুরুষের এই নাচ তাদের সহজাত আনন্দের বশেই। নাচনি নাচের মূল রূপকার 'রসিক' যার ললিত কণ্ঠে নিজেরই সুর দেওয়া ঝুমুরের ঝংকার। এই গানে শৃঙ্গার রস প্রধান, মূলত রাধার প্রেমলীলা নির্ভর। তাই রাধার ভূমিকায় নর্তকীদের প্রয়োজন অনিবার্যভাবেই এসেছে। এসেছে সেই একই ধারায় অতীতের চর্যাপদ দোহায়, সেখানেও সেই নারী শবরীবালা ডোমনি রসিকের সাধনের পদ্মমণ্ডলে নৃত্যরতা। আজও সেই নারী নেচে চলেছে যাদের বংশগত পরিচয়ে কুলীনতার ছাপ নেই। বাউরি, মুচি বা ডোম সম্প্রদায় থেকে এসেছে সামন্তপ্রথার স্মারক ভূমিজ সর্দারেরা বা জমিদারেরা এক বা একাধিক নাচনিদের ভরণ পোষণে সমর্থ হত। এই সামন্তপ্রথা অবলুপ্ত হয়ে আজ যেসব ভুমিজ সর্দার, যাদের পুরোনো দিনের বংশজ অভিমানের রক্ত তাদের ধমনিতে রয়েছে, তাদের কেউ কেউ আজও রসিকের ভূমিকায় ঝুমুর রচনা করে নাচনিদের আর্থিক দুর্গতি থেকে বাঁচিয়ে নাচের সুযোগ দিয়ে নাচনি নাচের শুষ্ক ফল্গুধারাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে চলেছে অবিরাম।

তবে এহেন নাচনিরা সমাজে পতিতা। তাই এরা রসিকের ভাতের হাঁড়ি স্পর্শ করার অধিকারটুকু পায় না। নাচনি নাচের মধ্যে এক ধরণের অশ্লীলতা, গ্রাম্যতা, স্থূলতা ও মার্জিত রুচিবোধের অভাব থাকে। তাই এই নাচ সামাজিক মর্যাদার উচ্চ সংস্কৃতির কাছে ব্রাত্য বলে পরিগণিত হয়। এই নাচনিদের শিল্প জীবনের সঙ্গে বাস্তব জীবনের রয়েছে নানারকমের দ্বন্দ্ব। সেখানে শুধুই না পাওয়ার বেদনাবোধ। অভাবের তাড়নায় কেউ বা বিক্রিত হয়ে,

আবার কেউ ভাগ্যের পরিহাসে এই জীবনে অভ্যস্ত হতে বাধ্য হয়। এদের জীবন যন্ত্রণার এক নির্মম ভয়াবহ পরিণতিকে *রসিক* উপন্যাসে হাজির করেছেন ঔপন্যাসিক। নাচনি রসিকের শিল্পচর্চার সঙ্গিনীরূপে তার জীবনকে প্রেম, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও অধ্যবসায়ে ভরিয়ে দেয়। অথচ মৃত্যুর পরে সে তার স্নেহের মানুষগুলির স্পর্শটুকু থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত হয়। তার সৎকারের দায়িত্ব গিয়ে বর্তায় ডোম সন্তানদের উপর। এই ধরণের পতিত জীবনের ইস্তেহাররূপে অন্ত্যজ মানুষের জীবনালেখ্যকে হাজির করলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। নাচনি জীবনের সূচনা থেকে পরিণতি ও সমাপ্তির কাহিনিকে দেখালেন তিনি। বংশ পরম্পরায় আবর্তিত হতে থাকা এই ভয়ংকর সমাজ নিষ্পেষিত নাচনি জীবনের প্রবহমানতা আজও বিদ্যমান। প্রকৃতির লালিত্য সুষমার বর্ণনায় একধরনের রোমাণ্টিক বাতাবরণ তৈরি করে তাদের জীবনের চরম রুক্ষতাকেই যেন নির্দেশ করেছেন। জীবন যন্ত্রণার ঘাত-প্রতিঘাতে রোমাণ্টিক বাতাবরণ ভেঙে চুরে লেখক যেন পাঠককে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন টান টান উত্তেজনার সঙ্গে। ঘটনার অভিঘাতে পাঠকও যেন সেই সত্যটিকেই অনুভব করেন।

এরপরে **১৯৯১** সালে প্রকাশিত *রসিক* উপন্যাসের নারী-পুরুষের এই রাজনৈতিক টানাপোড়েন অন্যধরনের এক বাস্তবতার সঙ্গে পরিচয় করায়। ঝুমুর গাইয়েদের ‘নাচনি’ প্রথা, একই সঙ্গে স্ত্রী ও নাচনিকে নিয়ে রসিকের সঙ্গে তাদের মধ্যেকার জটিল জীবন আবর্তের টানাপোড়েনকে লেখক মুনশিয়ানায় দেখিয়েছেন। অভাবের তাড়নায় বিজুলিবালার মতো নিষ্পাপ নারীর তরতাজা ফুলের মতো প্রাণ কিভাবে পুরুষের ছোবলে নিষ্পেষিত হয়ে ‘রাখনি’, ক্রমে ‘নাচনি’র পর্যায়ে পৌঁছায়; *রসিক* উপন্যাসটি তারই ভয়াবহ ইস্তেহার। রসনাবালার মতো মায়েরা নিজে নারী হয়েও মাতৃত্ব বিসর্জন দিয়ে নিজের পেটের সন্তানকে পণ্যে পরিণত করে। ভরত সর্দারদের মতো জমিদারদের ভোগের মাংসপিণ্ড হিসাবে তুলে দেয়। এই পাশবিকতা হয়তো পশুদের পক্ষেও অসম্ভব। রসনাবালার মতো মায়েরা যেন

পুরুষের মনোবাঞ্ছা পূরণের দরজা। ডাকাত যেমন ঘর লুঠ করে, ঘরের দরজাকে কাজে লাগিয়েই। পুরুষেরাও তেমনই নারীসমাজের উপর আগ্রাসন চালায় এই নারীদেরকে হাতিয়ার করেই। নির্জীব দরজার অবশ্য ডাকাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কোনো ভাষা নেই। কিন্তু রসনাবালাদের তা থেকেও নেই। নিষ্প্রাণ দরজা তার ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে ক্ষমতা প্রদর্শনের চেষ্টা করে। কিন্তু রসনাবালার মতো নারীরা ক্ষমতা দেখায় পুরুষের অন্যায়ের পথকে সুগম করতে। ফলত, পুরুষ তো বটেই নারীরাও বা কোথাও হয়ে পড়ে তাদের নিজেদের অত্যাচারিত হওয়ার কারণ। এ একধরনের হেগেমনি। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনোও মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার পর তা নিরুপায়ভাবে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়ার যে মানসিকতা তা থেকেই এর সৃষ্টি। অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান বাঙালি সমাজে নারীকুল এর জ্বলন্ত উদাহরণ। পুরুষের নারীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া এই আধিপত্যের (হেজিমনি) আরও ভয়ঙ্কর পর্যায় দেখা যায়, যখন দেখি নিজে বিক্রি হতে না পারার জন্য মালতী তরণীসেনের কাছে হাহুতাশ প্রকাশ করে। সত্যি কী দারিদ্র্যই তার একমাত্র কারণ? একথাই বা মানি কী করে! কারণ, এই মালতী তো একসময় বিচ্ছেদ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে মা'কে দায়ী করেছিল নিজে বিক্রি হওয়ার কারণে। এত দোষারোপের পরে মালতীর এই সিদ্ধান্ত বদলের রহস্য কী! আলগোছে পড়ে থাকে একটাই যুক্তি- দারিদ্র্য থেকে মুক্তি! দু'মুঠো অন্নের জন্য এই আত্মবলিদান অবশ্য প্রান্তিক নারীদের কাছে অতি সামান্য ঘটনা। একারণেই *মায়ামৃদঙ্গ*-এ ঝাঁক্সা ওস্তাদের প্রথম স্ত্রী'র অস্তিত্ব শুধুমাত্র অন্নবস্ত্রের সংস্থানেই ঝাপসা হয়ে গেছে। সবক্ষেত্রে চিত্রটি অবশ্য সমান নয়। ব্যতিক্রমও মেলে। নারীর মধ্যেও লুকিয়ে থাকে নীরব আত্ম-সচেতনতা। *কবি* উপন্যাসের ঠাকুরঝি তাই ভালোবাসায় আহত হয়ে আত্মগোপন করে। সেখানে ভূতগ্রস্ত ঠাকুরঝি আসলে বিকারগ্রস্ত।

এছাড়াও উপন্যাসটিতে দেখি নাচনিদের মৃত্যুর পর তাদের সমাজ পরিত্যক্ত জীবনকে। জীবিতাবস্থায় যাদের কোনোদিন সংসারে ভাতের হাঁড়ি স্পর্শ করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত দেওয়া হয় না। মৃত্যুর পর ব্রাত্য ডোমেরাই তাদের সৎকারের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেয়। অভিজাতের শ্মশানেও তাদের শেষ আশ্রয়টুকু জোটে না। মৃত্যুর পর নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় তাদের নিষ্প্রাণ দেহ। ভালোবাসা, মানবিকতার ছদ্ম আবরণ খসে গিয়ে উন্মুক্ত হয়ে যায় এই পাশবিক প্রথাসর্বস্বতার নির্মম চেহারা। এভাবেই 'নাচনি' জীবনের নির্মম চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক* উপন্যাসে আমরা সর্বজ্ঞ কথনরীতি দেখতে পাই। বাইরে থেকে চরিত্রদের মনের কথা বলেছেন কথক। পাশাপাশি উপন্যাসের কাহিনির ঘটনা, বিষয়বস্তু সবটাই তার জানা। যেমন এই উপন্যাসে পাণ্ডবকুমারের জীবনে দুই নারীর অবস্থান দেখাতে গিয়ে তাদের নারী মনস্তত্ত্বকে দেখালেন লেখক। পাণ্ডবকুমারের জীবনে এসেছে দুই নারী। একজন লতা যে তার অগ্নিসাক্ষী করা বিবাহিত স্ত্রী। আর অপরজন বিজুলিবালা। এই দুজন নারীই পাণ্ডবকুমারকে ভালোবাসে। তাই তাদের মধ্যে থেকে যায় পারস্পরিক হিংসা। মনের অতল গভীরে লতা ও বিজুলি এই প্রকৃত সত্যটি জানে। আর সেকারণেই উভয়েই তাদের একান্ত করে পেতে চায় পাণ্ডবকুমারকে। বাইরে থেকে তাদের মনের এই গোপন ইচ্ছেটা সুপ্তই থেকে যায়। পাণ্ডবকুমারও তাদের বুঝেও বোঝে না। ঔপন্যাসিক সর্বজ্ঞ কথকের বয়ানে পাণ্ডবকুমারকে নিয়ে বিজুলি ও লতার এই ত্রিকৌণিক সম্পর্কটিকে ইমেজারি ও ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে পাঠককে অনুভব করান। তাই নারী মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাটি তিনি জানিয়েছেন সর্বজ্ঞ কথকের বয়ানে।

> দ্বিপ্রহর বাঁধের জলে এখন হাত দিয়ে জল সরানো ছাড়া আর কনও শব্দ নেই। এবং সে জল নড়ায় চড়ায় লতা আর বিজুলিবালা। দুইজনে দুই মুখে। আর দুইজনের মুখেই

> বাকবন্ধের মরণ কাঠি বুলানো। কেউ কথা বলছে না। কারোর দিকে তাকাচ্ছে না। বাঁধের জলে আশ্বিনের আকাশ। দুই মেয়ের হাতের তাড়নায় সেই জলবন্দী আকাশ এবং তার নিচেকার নারীমূর্তির ছায়াছবি কেবলই চুরমার হয়ে যাচ্ছে।[২৬]

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় উপন্যাসের চরিত্ররাও অনেক ঘটনা জানে না। অথচ কথক আগে থেকেই সেই ঘটনা পাঠককে জানিয়ে দেন। সব চরিত্রের গতি একই রকম ভাবে এগোয় না। যেমন- বিজুলিকে যখন মা রসনাবালা ভরতসর্দারের গৃহে পাঠায়, তখন মাসিদেরকে টাকার লোভ দেখিয়ে প্ররোচিত করে। মিথ্যার জাল বিস্তার করে বিজুলিবালার সামনে। বিজুলি তাই প্রকৃত গন্তব্যস্থল সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। অথচ বিজুলির মূল ঘটনা জানবার আগে থেকেই পাঠক সত্য ঘটনাটি জেনে ফেলেন। কথকই তাকে প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে দেন।

রসিক-এ লেখক সুব্রত মুখোপাধ্যায় কথন ও সংলাপের ভারসাম্যের সুসমতা বজায় রেখে কাহিনিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। যেমন- তরণীসেনের সঙ্গে ওস্তাদ প্রভঞ্জনের কথোপকথনের সময় প্রভঞ্জন তার বাবাকে অপমান করে 'ঢেমন্যা সাপ' বলেছে। এছাড়াও তার সঠিক পিতৃপরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এখানে কথন ও সংলাপকে ঔপন্যাসিক সুবিন্যস্তভাবে সাজিয়েছেন। আবার সংলাপের ব্যবহারে ঔপন্যাসিক প্রত্যক্ষ কথোপকথনের পর কথকের পরোক্ষ বাচন ব্যবহার করেছেন। তরণীসেনের অপমানের প্রত্যুত্তর দিতে তার ক্রোধের প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বজ্ঞ কথক জানান তার দেহের আগুন ছড়িয়ে যায় কখনো বুকে, কখনো হৃদয়ে, সেখান থেকে মনে। এই বর্ণনায় পরোক্ষ বাচনের ব্যবহার দেখা যায়। এছাড়াও সর্বজ্ঞ কথকের বক্তব্যেও রয়েছে নিঃশব্দতা, অনুচ্চারণ। প্রায়ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে লেখক অসামান্যতা এনেছেন গদ্য আখ্যানে। আখ্যানে লেখক কথন ও সংলাপের ভারসাম্য বজায় রেখেছেন বেশ নিপুণতার সঙ্গে। নির্জনতা, একাকিত্ব,

নিঃসঙ্গতাকে বোঝাতে গিয়ে ঔপন্যাসিক ‘খাঁ খাঁ’, ‘শূন্যতা’ ইত্যাদি শব্দকে ব্যবহার করেছেন। দেদার হাওয়ার মধ্যেকার টানা চৌকোনা জায়গাটির ‘হা হা’ রব যেন সেই নিঃসঙ্গতাকে আরও প্রকটভাবে বোঝাচ্ছে। কুস্‌মি ও বিজুলির কথোপকথনে এক অপরূপ নাটকীয়তা তৈরি করেছেন লেখক। আবার এইরকম অদ্ভুত নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি করেছেন লেখক দুলালীর সংলাপের মাধ্যমে। চরিত্রের বর্ণনায় লেখক দুলালীর সংলাপে ও কথকের বয়ানে সংশক্তিকে বজায় রেখেছেন। বহুগামিনী দুলালীর সংলাপটি চরিত্রটির মনস্তত্ত্বকে জানান দেয়। এই চরিত্রটির জটিল মনস্তত্ত্বকে উন্মোচন করতে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন যে, দুলালী কি করবে সে নিজেও জানে না। একজন পুরুষকে তার দুইদিন পর বাসি মনে হয়। তাই তার প্রতিদিন মুখ বদল করতে সাধ জাগে।

রসিক উপন্যাসের প্রকাশ সাল **১৯৯১**। তবে ঔপন্যাসিক কোথাও কাহিনি কালের উল্লেখ করেননি। এখানে বিজুলিবালা ও তরণীসেনের দুটি আলাদা আলাদা উপাখ্যান সমান্তরালভাবে চলেছে। দুটি কাহিনি সম্পূর্ণভাবে আলাদা। তবে আখ্যানের সময় প্রসঙ্গে বলা যায় আখ্যানের সময়ের ক্রম সুবিন্যস্তভাবে এগিয়েছে। সেক্ষেত্রে আগের ঘটনা পরে পরের ঘটনা আগে ঘটছে। *রসিক*-এ সুব্রত মুখোপাধ্যায় কাহিনি বর্ণনার ক্রম এবং কাহিনির বিন্যাসক্রমের মধ্যে পারম্পর্য রেখে এগিয়ে চলেছেন। *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাস সাধারণভাবে দেখে মনে হয় তার কাহিনি কেমন যেন খাপছাড়া। এর কাহিনির বিস্তার ক্রম বুঝি এলোমেলো, বিপর্যস্ত। সেগুলোর আপাত ধারাবাহিকতা ছিল না বলে পাঠকের মনে হয়। কিন্তু কাহিনির মধ্যে অগ্রসর হলে দেখা যাবে উপন্যাসে ঝাঁকসুর জীবন ও আলকাপ দল, সমাজে তাদের অবস্থান ইত্যাদির মধ্যে কাহিনিগত সংশক্তি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয়েছে। *রসিক*-এ অবশ্য সেরকম কাহিনিগত আপাত অগোছালো ভাব নেই। বিপর্যস্তভাবে কাহিনি সজ্জিত নয়। কাহিনিগত পর্যায়কে বজায় রেখেছেন ক্রমপরম্পরায়। কাহিনির

বিন্যাসক্রম ও কাহিনি বর্ণনার বিন্যাসক্রমের সঙ্গতির দিক থেকে লেখক ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। ঘটনা এগিয়ে চলেছে। ঔপন্যাসিক মুনশিয়ানায় দেখিয়ে চলেছেন একের পর এক ফ্ল্যাশ ব্যাক ও ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ডকে। চিত্রকল্পের ব্যবহারে ঘটনাকে, চরিত্রকে ব্যাখ্যা করে চলেছেন লেখক। ফ্ল্যাশ ব্যাকে পরে আগের ঘটনাকে টেনে আনা হয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝা যায়। বিজুলিবালা তার মায়ের নৃশংসতা ভুলতে পারে না। বিজুলির মা রসনা স্বভাবে ও অভাবে তার মেয়েকে বেচে দিতে দিয়েছিল। এই সত্যটি মেয়ে বিজুলি বুঝে যায়। তখন নিজের মায়ের প্রতি তীব্র ঘৃণা থেকে তার মন নিজের রক্তের সম্পর্ক মা যে এই কাজ করতে পারে তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। বাঁচার জন্য মেয়েও প্রস্তুতি নিচ্ছিল। পাশবিক মায়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে সে তাই মায়ের জন্য সে কোমরে লুকিয়ে রেখেছিল নরুন। এই মেয়েকে মা জননী রসনা অভাবের তাড়নায় বিক্রি বাটার পাল্লায় তুলে টাকার লোভ করেছে। রসনা নামটি যেন লোভাতুর মায়ের চরিত্রের প্রতীক। প্রসঙ্গটি বর্ণনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। আর ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ডকে পদ্ধতি হল যেখানে পরের ঘটনাকে আগে বলে দেওয়া হয়। লেখক ঘন আবছায়ার অস্পষ্টতার বর্ণনা দিচ্ছেন সর্বজ্ঞ কথকের বয়ানে। এই অস্পষ্টতা আদতে মা রসনার সঙ্গে তার মেয়ে বিজুলির সম্পর্কের মধ্যে তৈরি হওয়া অস্পষ্টতা। ভরত সর্দারের মতো নারী-মাংস ভক্ষকের হাতে বিক্রি করে দিয়ে কলা-কৌশলে বিজুলিকে পাচার করে পাষাণ মা রসনার মনে ধোঁয়ার মেঘ জমেছে। পেটের দায়ে পেটের সন্তানকে বিক্রি করলেও মাতৃত্বের অবশেষটুকু হয়তো কোথাও আছে। তাই তার মনের আশঙ্কা ভবিষ্যতে মেয়ে বিজুলির সঙ্গে দেখা হলে কেমন হবে সেই সাক্ষাৎ। এখানে ঔপন্যাসিক মা রসনার মনস্তাত্ত্বিক এই সংঘাত, টানাপোড়েনকে বোঝাতে ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

রসিক উপন্যাসটিও সম্পূর্ণ হয়েছে মোট ‘৮৯’ টি পরিচ্ছেদে। ঔপন্যাসিক পরিচ্ছেদের শিরোনাম হিসাবে সংখ্যা ব্যবহার করেছেন। *রসিক* বর্ণিত হয়েছে সমান্তরালভাবে বয়ে চলা দুই কাহিনির মাধ্যমে। একটি বিজুলিবালার; অন্যটি তরণীসেনের। বিজুলিবালার কাহিনি দিয়ে উপন্যাসটির সূচনা ও সমাপ্তি। প্রথম অধ্যায়ে বিজুলিবালার কাহিনি এবং তার পরবর্তী অধ্যায়ে তরণীসেনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসে এরকম ক্রম বজায় রয়েছে ‘৭৯’ তম অধ্যায় পর্যন্ত। কিন্তু ‘৮০’ তম পরিচ্ছেদ থেকে বিজুলিবালার কাহিনি বলার পর কিছুটা ব্যবধান রেখে তরণীসেনের কাহিনিকে বলে গেলেন ঔপন্যাসিক। একই অধ্যায়ে এই দুই আলাদা আলাদা কাহিনির বলার ধরনটি চললো ‘৮০’ থেকে একেবারে উপন্যাসের সর্বশেষ পরিচ্ছেদ ‘৮৯’ পর্যন্ত। বিজুলিবালার উপাখ্যানে নানা উপকাহিনির ব্যবহার করেছেন লেখক। পারম্পর্যের অত্যন্ত সূক্ষ্মতায় গ্রথিত করেছেন ঔপন্যাসিক। প্রথমে দেখা যায়– মা রসনাবালার ঘরে বিজুলিবালাকে। সেখানে মায়ের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক, পারিবারিক অবস্থা, পিতার কথা, বিজুলির বিক্রির প্রসঙ্গের মতো নানা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপরে রয়েছে ভরত সর্দারের মত নারীলোলুপ ক্রেতার কাছে বিজুলিবালার বিক্রির কাহিনি। ভরত সর্দার দ্বারা বিজুলির উপর নেমে আসা অকথ্য অত্যাচারের পাশবিক নির্মম কাহিনি। জঠু সহিসের মতো বিজুলির জ্ঞাতি সম্পর্কীয় এক ব্যক্তি ও একই সঙ্গে ভীম মাহাতো, পাণ্ডবকুমারের দ্বারা বিজুলিবালার উদ্ধার। এই ঘটনা সূত্রের দ্বারা পাণ্ডবকুমারের কাহিনিকে বিজুলিবালার জীবনের সঙ্গে গ্রন্থন করেছেন লেখক।

এরপর পাণ্ডবকুমারের নাচনি হিসাবে বিজুলিবালার জীবনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এসেছে পাণ্ডবকুমারের পরিবারের কথা; বিজুলির ঝুমুর নাচ, গান শিক্ষা ও পাণ্ডবকুমারের গৃহে ঝুমুর চর্চার গল্প। এরপর গুরু দাদাশ্বশুর ভীম মাহাতো ও নিশারাণীর কাছে বিজুলির ঝুমুর শিক্ষার কথা। কাহিনির শেষে রয়েছে পিতৃসম ধ্রুবকুমারের বিজুলির প্রতি যৌন

আগ্রাসনের লালসা ও তার পরিণামে কুস্‌মির আত্মহত্যার কাহিনি। আর মাতৃসমা নাচনি কুস্‌মির মৃত্যুর পর বিজুলিবালার নাচনি জীবনের নিরন্তর প্রবহমানতায় শেষ হয় উপন্যাস।

আর তরণীসেনের কাহিনি শুরু হয় তরণীসেনের জীবন কথা, তার পরিবারের কথা দিয়ে। তরণীসেনের ঝুমুর শিক্ষাগুরু ওস্তাদ প্রভঞ্জন। নাচনি মঞ্জুরানীর রসিক এই প্রভঞ্জন। গুরুর সঙ্গে তরণীসেনের জীবনের যোগাযোগ, ঝুমুর গানের শিক্ষা , সেক্ষেত্রে নানাধরনের দ্বন্দ্ব, সংকট ইত্যাদি বিষয় সেখানে উপস্থিত। এরপর তরণীসেন খোঁজ পায় মালতীর, যে শয়নে স্বপনে তার সমস্ত মন প্রাণ জুড়ে থাকে। লেখক তরণীসেনের বোন কমলার কাহিনি দিয়ে তরণীসেন ও মালতীর অধ্যায়কে সংযুক্ত করেছেন। এরপর তরণীসেন ও মালতীর বিচ্ছেদ পর্ব। জীবনের এই না পাওয়াকে মানতে না পেরে কংসাবতীর তীরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় তরণী। যদিও সে এই প্রচেষ্টায় সফল হয়নি। নাচনি সরস্বতীবালা ও ব্রজরাম তার নবজীবন দান করে। তারপর তার জীবনে আসে দুলালী। তরণীসেন, প্রভঞ্জন পুত্র বদন ও দুলালীর সম্পর্কের ত্রিকৌণিকতায় কাহিনি নতুন মোড় নেয়। মনস্তত্ত্বের নানান স্তরায়ন ও জটিলতায় কাহিনি এগিয়ে যায়। তরণীসেনের কাহিনির সমাপ্তি টানে দুলালীর পলায়ন। এভাবেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঔপন্যাসিক কাহিনির ব্যাপ্ত পরিধিকে একাধিক উপকাহিনির সমাবেশে কার্য-কারণ সূত্রে গ্রন্থন করেছেন।

৩.২.৪ *আড়কাঠি* :

আড়কাঠি উপন্যাসটিতে লেখক ভগীরথ মিশ্র দেখিয়েছেন লোকজীবনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জীবন, বৃত্তি, জীবিকা, ভাবনা-চিন্তা, স্বপ্নদেখা অর্থাৎ জীবনের প্রায় সকল অবস্থাতেই আধিপত্য বিস্তারকারী শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের চেহারাকে।

ভগীরথ মিশ্রের *আড়কাঠি* উপন্যাসটির পটভূমি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামবাংলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চল। উপন্যাসের কেন্দ্রিয় বিষয় বাঁকুড়ার গজাশিমুল গ্রামের মানুষজন ও তাদের সংস্কৃতি। এই গজাশিমুল গ্রামের মানুষজন ও তাদের সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে দুটি কাহিনি। একটি আবর্তিত দাস ব্যবসায়ী রঙলালকে ঘিরে। আর দ্বিতীয়টি প্রফেসর রাজীবের ছদ্ম লোকসংস্কৃতিপ্রেম। রঙলাল ধান্দাবাজ। গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রামের সরল মানুষগুলিকে পয়সা ধার দেয়। তাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও ভালো থাকার লোভ দেখিয়ে বিহার, আসাম মুলুকে পাচার করে। গজাশিমুলের মানুষদের সে চড়া সুদে টাকা ধার দেয় এবং শোধ দিতে না পারলে তাদেরকে পাচার করে দেয়। এভাবেই গজাশিমুলের গ্রামের মানুষের নিজেদের জমি-জায়গা, গাছ-গাছালি, ফল-ফলাদির জন্য অফুরন্ত জমি জায়গা থাকা সত্ত্বেও সেগুলো রঙলালের হাতে চলে যায়। নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তারা। গজাশিমুল গাঁয়ের বসু-শবরদের কাছে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দাঁড়িয়েও দেশীয় শোষক তথা আড়কাঠিদের অভিশাপ যে কি ভয়ংকর রূপে নেমে আসতে পারে, তারই বর্ণনা দিয়েছেন ভগীরথ মিশ্র। বসু-শবরের প্রায় প্রত্যেকেই বংশ পরম্পরায় রঙলালের কেনা গোলাম। বুদ্ধি প্রয়োগ করে গজাশিমুল গাঁয়ের প্রতিটি ঘরে ঘরে বন্ধু সেজে ঢুকে সে সরল সোজা মানুষগুলির বিশ্বাস নিয়ে খেলেছে। তাদের বাড়িতে বসে তাদের দেওয়া চিঁড়ে, মুড়ি খেয়েছে। প্রয়োজনে তাদের বাড়ির উঠোনে বসে খোশগল্প করেছে। জমিদারদের যেমন দাদন খাতা থাকত, রঙলালেরও সেরকম লালরঙের দাদন খাতাটি ছিল অত্যাচারের এক ভয়ানক হাতিয়ার। গ্রামের মানুষেরা সেই খাতাটি দেখলে ভয়ে সিঁটিয়ে যেত। দাদন খাতাকে ব্যবহার করে সে কেড়ে নিত তাদের শেষ সম্বল জমিটুকু। মেয়েদের দিকে হাত বাড়াত। নষ্ট করতো তাদের সতীত্ব। আইনের ভয় দেখিয়ে বংশ পরম্পরায় তাদের চিরকালীন দাসে পরিণত করতো। এমনিতে প্রাকৃতিকভাবে রুক্ষতার কারণে এই রুখা-ভুখা মাটির দেশে কাজকর্ম

নেই। তার উপর পাথুরে মাটি টাঁড় টিকর ভাঙা। একবারই ফসল হতে চায় না সে জমিতে। প্রাকৃতিক এই অসহায়তাকে হাতিয়ার করে রঙলালের মতো দাস ব্যবসায়ী। গজাশিমুলের মানুষদের আসামে নিয়ে গিয়ে কুলি কামিনের কাজ দেওয়ার লোভ দেখায়। এর গভীরে থাকে স্বার্থলোভী-অর্থলোভী রঙলালের মতো অন্ত্যজ মানুষদের চালান করে পয়সা রোজগারের নেশা। গরিব মানুষগুলির কাছে কল্পনার জগৎ তৈরি করে আদতে সে মিথ্যার প্রলোভনের চক্রব্যূহে তাদের জড়িয়ে দেয়। এই সামন্ততান্ত্রিক জুলুমের শোষণে গজাশিমুলে-র মানুষের প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত তখনই সেই গ্রামে উপস্থিত হয় বাঁকুড়ার একটি কলেজের জনৈক অধ্যাপক রাজীব। একজন লোকসংস্কৃতিপ্রেমী। পরিবার ও নিকটজনের কাছ থেকে পেশাগত কারণেই অনেক দূরে থাকতে হয় রাজীবকে। নিজের ক্যারিয়ার, ভালোলাগার বিষয়গুলি নিয়ে ব্যস্ত রাজীব স্থানিক দূরত্বের পাশাপাশি তৈরি করে মানসিক দূরত্বও। রাজীবের প্রেমিকা সুতপা। সে বহরমপুর কলেজে পড়ায়। তার পাঠানো চিঠির উত্তর লিখি লিখি করেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের অজুহাতে রাজীব লিখে উঠতে পারেনি। সুতপা অনেকবারই তার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। তবে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার মতো সামান্য কাজের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও অসামান্য কাজ রাজীবের আছে। তাই সুতপা চাইলেও সেই চাওয়ার গুরুত্ব রাজীবের কাছে নেই। প্রাণাধিক মা যিনি শান্তিপুরের বাসিন্দা, দাদার সংসারে বউদির মুখ ঝামটায় যার প্রাণ ওষ্ঠাগত, তিনি নিরাপত্তাবোধ করেন এই ভেবে যে আদরের ছোটখোকার বউ তাকে কোনোদিনই কষ্ট দেবে না। মায়ের মুখের হাসি ফোটানো আর সুতপাকে কাছে আনা কখনোই আর বাস্তবায়িত হয় না। রাজীবের জীবনে এর চেয়েও অনেক বড়ো কাজ গজাশিমুল গ্রামের বসু-শবর জাতির পাশে দাঁড়ানো। তাদেরকে রঙলালের হাত থেকে উদ্ধার করা। আর গজাশিমুলের আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকা লোকসংস্কৃতিকে খুঁজে বের করে জনসমক্ষে তুলে ধরা। অধ্যাপনার পাশাপাশি এটাই

এখন রাজীবের জীবনের ব্রত। অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে রাজীব ওই এলাকার লোকসংস্কৃতি নিয়ে কাজকর্ম শুরু করে। টুসুগান, ভাদুগান, হোলিগান ইত্যাদি নতুন কিছুর সন্ধান পেলেই রাজীব কখনো চলে যায় কংসাবতীর চরের মেলায়, কখনো বা বিষ্টুপুরে। গহীন বন-জঙ্গল, খাল-বিল, পাহাড়-ডুংরি পেরিয়ে সেই গজাশিমুল গাঁ। সেখানকার আদিবাসী মানুষ শহুরে 'ভদ্দর' লোকেদের বলে 'কাঁকড়া'। এই 'কাঁকড়া'দের দেখে গাঁ ছেড়ে দৌড়ে পালায় সেখানকার জোয়ান লোকেরা। ঘরের কোণে মুখ লুকায় সেখানকার মেয়ে বধূরা। অনেক হাঁকডাকের পর, অনেক সাহস দেওয়ার পর ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে দু'চারজন বের হয়। তারা একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে- কী উদ্দেশ্যেই বা তাদের এই আগমন তারা তা জানে না। তবে তাদের জীবনে রাজীবের অনুপ্রবেশকে তারা ভালোভাবে নেয় না। ধারণা হয় নিশ্চয় রাজীবের কোনো মতলব আছে। রাজীবের পরিচয় পেয়েও সহজে তারা ধরা দেয়নি। রাজীবও সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়। তাদের উঠোনে বসেছে। তাদের সঙ্গে গল্প করার চেষ্টা করেছে, বাচ্চাদের কোলে–কাঁখে নিয়েছে। বাচ্চাদের মধ্যে লজেন্স- বিস্কুট বিলিয়েছে। সর্বোপরি গজাশিমুলের অধিবাসীদের একজন পড়াশুনা জানা সুচাঁদ ভক্তাকে হাত করে আদিবাসীদের মধ্যেকার পাথর গলাতে চেষ্টা করেছে। তাদের জীবনের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজ করেছে সাঁকো নির্মাণ করে। রঙলালের হাত থেকে তাদের বাঁচাতে প্রয়োজনে নিজ অর্থ ব্যয় করেছে। যদিও এর পিছনে নিজের বৃহত্তর স্বার্থই কাজ করেছিল। সুচাঁদকে নিয়ে আসামে পাড়ি দিয়ে রঙলালের দ্বারা পাচার হওয়া গজাশিমুলের মানুষের জীবনের মর্মান্তিক পরিণতিকে প্রত্যক্ষ দেখিয়েছে সে। ভালোবেসেছে গজাশিমুলের মানুষকে। তাদের মধ্যে গোপনে লুকিয়ে থাকা লোকসংস্কৃতিকে খুঁজে বের করে প্রচারের আলোয় এনেছে। ছোট গাঁয়ের আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকা 'নিশি উজাগর', 'শীতলা-বন্দনা', 'শিকার-লাচ', 'চাং-লাচ', 'বিহা-গীত',

'পরবের-গান', 'আষাঢ়িয়া' ইত্যাদিকে নিয়ে রাজীবের নেতৃত্বে প্রথমে 'গজাশিমুল পার্টি' পরে তারাই 'গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘ' নাম নিয়ে একের পর এক পুরস্কার জিতেছে। দিল্লী, বোম্বে, ম্যাড্রাস ক্রমে বিদেশে যাওয়ার খ্যাতি অর্জন করেছে। রাজীবের সঙ্গে এই ধরনের অনুষ্ঠান চলাকালীন পরিচয় হয় ক্যাথি বার্ড নামে এক বিদেশিনীর। দেশ-বিদেশের লোকশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও মানুষের কাছে তার পরিচয় করানোই তার কাজ। গজাশিমুল গাঁয়ের লোকসংস্কৃতিও তার ভালো লাগে। 'ইস্ট-ওয়েস্ট ফোক ফাউন্ডেশনে'র পূর্ব ভারতীয় শাখার ডিরেক্টর এবং 'দ্য ফোক' পত্রিকার সর্বভারতীয় করসপন্ডেন্ট সে। ফোক ফাউন্ডেশনের বাঁকুড়া শাখার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয় রাজীব। মাটির নিচে থাকা গুপ্তধনকে তুলে এনে চোরাকারবারিরা যেভাবে আনন্দ পায়, ক্যাথি বার্ড ও রাজীব সেই ধরনের আনন্দ লাভ করছিল গজাশিমুল গাঁয়ের লোকসংস্কৃতিকে নিয়ে। ক্রমে সেই গ্রামের বসু-শবরদের লোকসংস্কৃতিই হয়ে যায় রাজীবের পেশা। ক্রমেই ব্যক্তিগত নাম, যশ, মোহ, অর্থলাভ তার কাছে বড়ো হয়ে উঠেছিল। ফোককে নিয়ে ক্যাথিবার্ডের সঙ্গে কথাবার্তার কমার্শিয়াল সুর আমরা আগে থেকে পাই। ক্যাথি বার্ড এই গজাশিমুল গাঁয়ের লোকসংস্কৃতির প্রচারের সুখ্যাতি ও সুনামের মোহ দেখিয়ে রাজীবের সামনে প্রলোভনের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ফাঁদ দেখিয়ে দেয়। রাজীব সেই ফাঁদে পা দেয়। বিদেশী সংস্থাগুলির হাতে নিজেকে সমর্পণ করে সে। ক্রমশ রাজীব আগের চেয়ে আরও অনেক বেশি প্রচার পায়। গজশিমুলের লোকসংস্কৃতির কর্ণধার রূপে রাজীবের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে যায়। আঞ্চলিক খ্যাতি ছাড়িয়ে দেশীয় তারপর আন্তর্জাতিক বাজারে পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশনে রাজীবের কর্মকলাপ ছড়িয়ে যায়। ব্যক্তিগত নাম, যশ, খ্যাতি, অর্থলোভের নেশা ও মোহ ক্রমেই রাজীবকে পেয়ে বসে। দাস ব্যবসায়ী রঙলালের হাত থেকে রঙী সর্বোপরি গজাশিমুলের মানুষকে বাঁচাতে দলীয়

অর্থের পাশাপাশি রাজীব রঙলালের হাতে তুলে দেয় নিজের টাকা। সেই অর্থের পরিমাণও নিতান্ত কম নয়।

অবশ্য এক্ষেত্রে তার উদ্যোগ সদর্থক। প্রচারের আলোয় এসে গজাশিমুল গাঁয়ের লোকসংস্কৃতি বসু-শবরদের নিজেদের বেশ আর্থিক সুরাহা দিয়েছিল। এ পথ অবশ্য তাদের রাজীবই দেখিয়েছে। বিদেশী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়া রাজীব রাজ্য লোক উৎসবে প্রথম হওয়ার নেশায় রঙীকে রঙলালের হাত থেকে বাঁচানোর পর গজাশিমুলের মানুষের কাছে চেয়ে বসে তাদের প্রাণের গুপ্তধনকে, যা একান্তই তাদের কাছে শ্রদ্ধার ও গোপনীয়। কৌলিক এই সংস্কৃতিকে তারা পরম আদরে, শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়, যত্নে ও সম্মানে সকল বিপদের হাত থেকে সরিয়ে গোপনে লালন করে। পুরুষের প্রবেশাধিকার এতে নিষেধ। কানাইশরজীউকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বসু-শবরদের মেয়েরা আষাঢ় মাসের তৃতীয় পক্ষে গভীর রাত্রিতে প্রায় উলঙ্গ হয়ে জলকেলি নৃত্য প্রদর্শন করে। এটি তাদের প্রাচীন প্রথা। একান্তই মেয়েদের উৎসব। তাদের এই গোপন সংস্কৃতিটিকে রাজীব তাদের কাছ থেকে চেয়ে বসে রাজ্য উৎসবে প্রথম হওয়ার লোভে। যুবা থেকে বয়স্ক কেউই এ প্রস্তাবে রাজী নয়। একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। অশিক্ষিত রত্নেশ্বর থেকে শিক্ষিত সুচাঁদ কারোরই মন সরে না। তাদের ধারণা কানাইশরজীউকে নিয়ে অসম্মান করলে হয়তো বসু-শবর জাতি অভিশপ্ত হবে। রাজীবের প্রতি গভীর বিশ্বাস রেখে সুচাঁদই বৃদ্ধ মোড়লদের রাজী করায়। মুখোশের বাইরের রূপটাতে ভুলে সকলেই বিশ্বাস করে তাকে। সরল, সাদামাঠা, অশিক্ষিত মানুষগুলি রাজীবের স্বার্থান্বেষী ছলনাকে ধরতে পারে না। পরম মূল্যবান গুপ্তধনটি হাতে পেয়ে সেই পুঁজিকে বাজারি করে। বসু-শবর জাতির এই কৌলিক উৎসবকে অসম্মান করে। অসম্মান করে বসু-শবর জাতির মেয়েদের। সরল গোবেচারি মানুষগুলিকে ফাঁকি দিয়ে তাদের আড়ালে তাদের রূপ যৌবন দেহকে বাজারি করে অর্থের মোহে। গজাশিমুল

গাঁয়ে বসু-শবরদের গোপন লোকাচারকে বাইরে এনে রাজীব ফাটকা বাজার পেতেছে লোকসংস্কৃতি প্রচারের নামে। ধান্দাবাজি করে গজাশিমুলের মানুষকে অসম্মান করেছে। তাদের বিশ্বাস নিয়ে খেলেছে। নারী দেহকে পণ্য করে কেনাবেচার দরদাম করেছে মি. বাজোরিয়ার কাছে। রঙীকে অপমানিত করেছে 'ডবকা ছুঁড়ি' বলে। রঙী যে কারও সন্তান, কারও বোন বা প্রেমিকা এই বোধটুকু হারিয়ে ফেলে টাকার নেশায় তার শরীর নিয়ে দর কষাকষি শুরু করেছে। সুচাঁদ এতদূর ভাবতে পারেনি। তবে সে বন্ধু সুনীলের কথায় রাজীবের প্রতি বিশ্বাস হারায়নি। কিন্তু নিজের কানকে তো সে অস্বীকার করতে পারে না। ঘরের বাইরে থেকে মি. বাজোরিয়ার সঙ্গে কথোপকথনকে শুনতে পায় সে। রাজীবকে বলতে শোনে সম্প্রতি রাজীবেরা রেট রিভাইজ করেছে। তাদের রেট আট হাজার। রাজীব মি. বাজোরিয়াকে তাদের দলের ম্যানেজারকে ঐ আট হাজার টাকাই দিতে বলেন। বাকিটা রাজীব নিজে চায়। সে বাজোরিয়াকে টুয়েন্টি পারসেন্ট কমিশন দেবে বলেও আশ্বস্ত করে। বাজোরিয়াকে সে বোঝায় যে শুধুমাত্র তাকে দেওয়া ওই আলাদা বাইশ হাজারের কোনো রসিদ পাবেন না।

বাজোরিয়ার সঙ্গে কথোপকথন চলাকালীন টাকার লোভ যেন রাজীবকে আরও মোহগ্রস্ত করে। নেশায় দেশলাই জ্বালানোর আওয়াজ যেন রাজীবের মনের সেই নেশারই আগুন। রাজীব তার তরল গলায় এবার তাদের দলে জনা বারো মেয়ের কথা তোলে। রাজীবের ভাষায় তারা নাকি সবগুলিই এক একটি জুয়েল। শিল্পী হিসাবে রঙীর মূল্যকে পণ্য করে সে তার শরীরের লোভ দেখিয়ে বাজোরিয়াকে প্রলোভন দেয়। 'ডব্‌কা ছুঁড়ি' বলে অপমান করে বাজোরিয়ার কাছে। নোংরা ভাষায় জানায়, ওকে দেখলে নাকি বাজোরিয়ার বড়ো বাজারের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে। 'ওর এক-একখানা বুকই আঠারো হাজারে বিকোবে।'[২৭] নারীর সতীত্বের এই চরম অপমান রাজীবের অধঃপতনের শেষ সীমায় নিয়ে

যায়। এ অপমান শুধু মানুষের অপমান নয়, এ অপমান মানবিকতার অপমান। গজাশিমুলের সরল নিষ্পাপ মানুষগুলির জীবনে রাজীবের কাছ থেকে পাওয়া বিশ্বাসঘাতকতার শেষ পরিণাম কী মর্মান্তিক হতে পারে! কিন্তু সর্বনাশের আর কিছুই বাকি নেই! সুচাঁদ মেনে নিতে পারে না কিছুতেই। রাজীবের এক নম্বরের ভক্ত সুচাঁদের রাজীবের প্রতি তৈরি হয় প্রবল ঘৃণা। তার বারবার মনে পড়ে সুনীলদার সেই কথা যে রঙীর উদোম শরীরের ফোটো নাকি বিদেশের খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

রাজীব এতটা নিচে নামতে পারে! গুরু সম্পর্কে একথা বিশ্বাস করতে পারেনি সে। কিন্তু নিজের কানকে সে কিভাবে অবিশ্বাস করবে? গরীব নিরক্ষর মানুষগুলির কাছে তাদের আত্মসম্মানটাই প্রধান। নারীর সম্মানটাই তাদের কাছে বড়ো। সরল সাদাসিধে মানুষগুলির বিশ্বাসকে পুঁজি করে তাদের আর্থিকভাবে ঠকিয়েই সে থামতে পারতো। বিশ্বাসের, ভালোবাসার এই মূল্যই কী পাওনা ছিল গজাশিমুল গ্রামের বসু-শবর শ্রেণির নিরক্ষর-সরল-গরীব মানুষগুলির? তাও আবার একজন বুদ্ধিজীবী অধ্যাপকের কাছ থেকে! নারীর অপমান, তার মনুষ্যত্বের অপমান। নারীর প্রতি তার দৃষ্টি নিতান্তই কামের দৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজের প্রেমিকাকে যে সম্মান করতে পারেনি সে অন্য মেয়েদের কিভাবে সম্মান করবে? গজাশিমুল গাঁয়ের মানুষের জন্য তার কাজ আদতে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে তাদেরকে শোষণ। তাদের লোকসংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করা। এইভাবে তাদের এই সংস্কৃতিকে পুঁজি করে নিজের নাম যশ খ্যাতি প্রতিপত্তি সর্বোপরি লাভের অঙ্ক বাড়ানোই হয়ে উঠলো বুদ্ধিজীবী অধ্যাপকের নেশা ও পেশা। তাই অর্থের নেশায় উন্মত্ত রাজীব লোকসংস্কৃতি প্রচারের নাম করে মেয়েদেরকে আন্তর্জাতিক বেশ্যাতে পরিণত করেছে। রঙলালের মতো অর্ধশিক্ষিত শোষকের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে গজশিমুলের মানুষ ভেবেছিল তারা স্বস্তি পেয়েছে। কিন্তু তারা যে আরও বৃহত্তর মরণফাঁদে আটকে গেছে সে খবর তাদের অজানা

ছিল। শিক্ষিত সুনীল, সুচাঁদ যখন সেই বিষয়টি অনুধাবন করেছে তখন আর কিছুই করার নেই। নিজেকে সামলাতে পারে না সুচাঁদ। তীব্র ঘৃণায় দুচোখ তার জলে ভরে আসে। লটবহর মাথায় নিয়ে সে এগিয়ে যায়। রাজীবকে সে জানায় যে এবার থেকে রাজীবের পথ আর তাদের পথ আলাদা। তবুও 'মাস্টারদা' সম্বোধন টুকু করতে সে ভোলেনি। রাজীবের তাদের প্রতি অবদানকে সে ভোলেনি, তারা মনেই রেখে দেবে। তাদের নিজেদের জীবনের ভাবনা এবার থেকে তারা নিজেরাই ভাববে বলে জানিয়ে দেয় সুচাঁদ। এ যাত্রায় তারা ডুবে যাবে নাকি ভাসবে এ দায় তারা তাদের নিজেদের হাতেই রাখতে চায়। এখানেই তাদের জীবনের উত্তরণকে দেখালেন ঔপন্যাসিক ভগীরথ মিশ্র।

আদতে রাজীব এখানে নিজেই বিদেশী অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক চক্রের শিকার হচ্ছে। যে রাজীব একদিন ক্যাথি বার্ডের শৌখিন ও বিলাসী লোকসংস্কৃতি চর্চার ঘোর বিরোধী ছিল, সেই এখন ক্যাথিবার্ডের আন্তর্জাতিক ফাঁদে ধরা দিল। ক্যাথির অনুরোধ রাখতে বাধ্য রাজীব সুরাপায়ী নেশাগ্রস্ত হয়ে উঠল। ক্যাথিরা রাজীবের মতো মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের আসক্ত করে মরণফাঁদের শিকার হতে। বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক বাজারের প্রলোভনের মায়াজাল বিস্তার করে রাজীবের সামনে। সুকৌশলে রাজীবদের মতো শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের ধরতে চায় ও ক্রমাগত বাধ্য করে চলে। একসময় রাজীব নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে এই বিশ্বব্যাপী মরণফাঁদে পা দেয়। ক্যাথিরা এই চক্রব্যূহের বেরোনোর পথটি জানে। কিন্তু রাজীব সে পথটি জানে না। ক্যাথিও সে সন্ধান তাকে দেয় না। বিশ্বব্যাপী মরণফাঁদের শিকার হয়ে রাজীব নিজের বুদ্ধি, চেতনা, ঐতিহ্য সব কিছুই বন্ধক দেয় আন্তর্জাতিক বাজারে। সর্বপ্রথমে সে নিজে শিকার হয়। পরে সেই শিকারের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে নিজের দেশকে। সেই দেশের ঐতিহ্যকে, সেই দেশের নারীকে। যে নারী হয়তো বা তার বোন, তার মা, তার স্ত্রী। যে নারী না থাকলে এই পৃথিবীর আলোই দেখা হত না তার। সেই সকল বিষয়কে সে

কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করল। যে একদিন লোকসংস্কৃতিপ্রেমী হয়ে গজাশিমুল গ্রামে এসেছিল সেই হয়ে উঠলো সবচেয়ে বড়ো লোকসংস্কৃতির শত্রু। এ শত্রু রঙলালের চেয়েও আরও বেশি ভয়ানক। কারণ শোষক রঙলালের অত্যাচারকে জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে। কিন্তু রাজীবের মতো বুদ্ধিজীবীর সুকৌশলী ছদ্মবেশী শোষণ প্রথাগতভাবে নিরক্ষর দরিদ্র মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাই শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সুনীল যা ধরতে পেরে সুচাঁদকে বোঝাতে চেষ্টা করে, কিন্তু সুচাঁদ প্রথমে তা বিশ্বাস করে না। রাজীব আদতে বিশ্বব্যাপী বাজারী ব্যবস্থায় শিকার হওয়া একটি যন্ত্র বিশেষ। এই যন্ত্রের শিকার পদ্ধতি রাইজোমেটিক পদ্ধতি।[২৮] শিম্বীজ জাতীয় উদ্ভিদের প্রধান শিকড়ের পাশাপাশি রাইজোবিয়ামের সাহায্যে মাটি থেকে খাদ্য শোষণের পদ্ধতি রয়েছে, রাজীবদের শোষণ পদ্ধতি অনেকটা সেরকম। তাই বন্ধুর মুখোশ পরে তাদের জীবনের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে এসে তাদের জীবনের খুঁটিনাটি সবটা জেনে তাদের সংস্কৃতি, লোকাচার, প্রথা, ধর্ম, অর্থনীতি, নরনারীর জীবন- সকল বিষয়ের উপর সুকৌশলী থাবা বসিয়েছে দরকারে। নিজের আরও অর্থের প্রয়োজনে। নিজেকে জড়িয়েছে রাজীব নিজেরই প্রকৃত সত্তাকে বিক্রি করে। লোকসংস্কৃতিপ্রেমী রাজীব হেরে গেছে উত্তর ঔপনিবেশিকযুগে বাজার অর্থনীতির শিকার হওয়া ব্যবসায়ী রাজীবের কাছে। গজাশিমুলকে পণ্য করে রাজীব যে কার্যত তার নিজের জগতেও একা হয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে তার বহু সময় পেরিয়ে গেছে। ততদিনে গজাশিমুল গ্রামের মানুষ সুচাঁদের নেতৃত্বে তাদের নিজেদের সংস্কৃতি, তাদের মূল্যবোধ, সর্বোপরি আত্মসম্মান নিয়ে অনেক সতর্ক ও সাবধানী। দ্বিতীয় ভুল করতে তারা আর রাজী নয়।

আড়কাঠি উপন্যাসটিতে দুটি কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। প্রথমটি রঙলাল নামক একটি চরিত্রকে নিয়ে। অপরটি রাজীব নামক আরেকটি চরিত্র যে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। দুটি চরিত্র নির্মাণে ঔপন্যাসিক ভগীরথ মিশ্র অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। তবে রঙলাল

চরিত্রটির ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই পাঠক বুঝতে পারে যে আদতে সে একটি খল চরিত্র। কিন্তু আমরা উপন্যাসে যে রাজীবকে পাই তাকে প্রথম থেকে পাঠক বুঝতে পারে না। বাঁকুড়ার এক প্রত্যন্ত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা গজাশিমুল গ্রাম। রাজীবকে সেই গজাশিমুল গ্রামের বসু-শবর জনজাতির একজন শুভানুধ্যায়ী হিসাবেই আমরা পেয়েছি। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে সে তার যে কর্তব্য কর্মের পরিচয় দিয়েছে তাতে তাকে পাঠক মন কিছুটা বাঁকা চোখে দেখলেও গজশিমুলের মানুষের জন্য তার আগ্রহের মাত্রা একটু বেশিই। রাজীব গজাশিমুলের লোকসংস্কৃতি খুঁজে বের করে। জনসমক্ষে বসু-শবর জাতির লোকসংস্কৃতির আত্মপ্রকাশ ঘটায়। অর্থাৎ রাজীবকে কেন্দ্র করেই তাদের প্রকাশ ও বিকাশ। আর তারপরেই পাঠক দেখে যে রাজীব একদিন ছিল গজাশিমুলের মানুষের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ ও তাদের জীবনে প্রগতির বাহক, সেই একদিন হয়ে ওঠে খল চরিত্র। গজাশিমুলের সরল সোজা আদিবাসী মানুষগুলির জীবনে হয়ে যায় সবচেয়ে বড়ো শত্রু ও প্রতারক। যে ছিল তাদের কাছে তাদের সংস্কৃতি ও জীবনের মূল কর্ণধার, সেই আদতে হয়ে উঠল চরম প্রতারক ও ঠক। দাস ব্যবসায়ী রঙলালের চেয়েও আরও ভয়ানক। রঙলাল চরিত্র হিসাবে সরল আগাগোড়া একই টাইপ। লোভী, ধূর্ত ও শোষক এক আড়কাঠি। আর রাজীব চরিত্রটি জটিল। তাঁর মধ্যে বহুমাত্রিকতা লক্ষ করা যায়। সে আগাগোড়া একই সমতলে হাঁটে না। সে একজন অধ্যাপক থেকে যথার্থ আড়কাঠি হয়ে ওঠে। তার চরিত্রের এই উত্তরণকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন ঔপন্যাসিক। ডঃ অমিতাভ দাস তাঁর *আখ্যানতত্ত্ব* -এ জানিয়েছেন চরিত্রের সমগ্রতা আনতে বা চরিত্রের হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অতীত জীবনের সূত্রগুলির সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন যাপনের একটা যোগসূত্র তৈরি করে নিতে হয়। রাজীব চরিত্রটির অতীত জীবনের দিকে তাকিয়ে উপন্যাসে তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা গেলে তার চরিত্রের সমগ্রতার বিষয়টি চোখে পড়বে। পারিবারিকভাবে

বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র থাকতে পছন্দ করে রাজীব। রাজীবের মা যে তার ছেলেকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন আর রাজীবের কাছে একটু নিরাপদ শান্তির আশ্রয় চান, সেই অসহায় মায়ের দুর্বোধ্য করুণ চোখের দিকে তাকিয়ে রাজীবের নিজেকে অপরাধী লাগে। বোঝাই যায় রাজীবের এই অপরাধবোধের কারণ আদতে তার মায়ের প্রতি দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া। কর্মসূত্রে বাঁকুড়ায় যেতে হয়েছিল তাকে। তাই মাকে নিয়ে কোলকাতায় ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকবার কথা উড়িয়ে দিয়েছে সে। কিন্তু মাকে তো সে বাঁকুড়ায় তার কর্মস্থলেও তো নিয়ে যেতে পারত। সন্তান হয়ে মায়ের প্রতি সে সুবিচার করেনি। মায়ের অসহায় চোখের দিকে তাকিয়েও মায়ের চোখের ভাষা ও তার চাওয়াকে মূল্যই দেয়নি অধ্যাপক রাজীব। আবার তার প্রেমিকা সুতপার প্রতিও তার দায়িত্ব ও কর্তব্যে সে অবহেলা করেছে। সুতপার পরিবারে রয়েছে রিটায়ার্ড বাবা, শয্যাশায়ী মা ও বেকার দুই ভাই। সদ্য কলেজে চাকরী পেয়ে সুতপা তার সংসারের কিছু দায়-দায়িত্ব পালন করে, অন্তত তার এক ভাইয়ের চাকরী না পাওয়া পর্যন্ত তাকে তার পরিবারে আর্থিক সাহায্য করতে হবে বলে সুতপা জানায়। তারপর সে রাজীবকে বিয়ে করতে চেয়েছে। কথার প্রত্যুত্তরে রাজীব জানায়, বিয়ে করেও সে তার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে পারে কারণ তাকে কেউই কোনো বাধা দেবে না। এক্ষেত্রে সুতপার প্রবল আপত্তি, কারণ তার ধারণা ছেলেরা বিয়ের আগে এক কথা বলে উদারমনস্কতার পরিচয় দেয় আর বিয়ের মালা শুকোতে না শুকোতেই তারাই হয়ে যায় সবচেয়ে বেশি ফিউডাল। সুতপার এই মন্তব্য থেকেই বুঝতে অসুবিধা হয় না রাজীবকে সে প্রথম থেকেই বেশ অনেকটাই বুঝেছিল। সে কিছুটা আন্দাজ করেছিল যে তার মন আর মুখ এক নয়। তারপরে তাদের সম্পর্কের অবনতি লক্ষ করা গেছে। তা অবশ্য রাজীবের কারণেই। সুতপার রাজীবকে পাঠানো একাধিক চিঠির কোনো প্রত্যুত্তর দেয়নি সে। এমনকি অনেক সময় তার ফোনটাও ধরেনি। সুতপা তার সঙ্গে সামনা সামনি দেখা করতে গেলে সে

কাজের অজুহাত দিয়ে সুকৌশলে এড়িয়ে গেছে। রাজীব প্রেমিক হিসাবেও সুতপার প্রতি ন্যায় বিচার তো করেই নি বরং বারংবার অপমান করেছে। আবার উপন্যাসে একটি ঘটনা প্রসঙ্গে নীলনয়না শ্বেতাঙ্গ বিদেশিনী ক্যাথি বার্ডের সঙ্গে রাজীবের অন্তরঙ্গ মুহূর্তে রাজীবের কোনো আপত্তি দেখা যায় না। নীলনয়না বিদেশিনীর প্রতি মোহগ্রস্ত হলেও পাঠকের মনে সংশয় জাগে আদতে রাজীব সুতপাকে সত্যিই ভালোবেসেছিল কিনা। পরে রঙীর শরীর দেখে তার বেসামাল চোখও পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। একইসঙ্গে রাজীবের মা ও সুতপার প্রতি আচরণ দেখে বোঝা গেল তার চরিত্রের এই ধরনের বিশেষ প্রবণতার বিষয়টি। স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা তার মজ্জাগত। এক্ষেত্রে তার জীবনে কেরিয়ারিস্ট হয়ে ওঠাই শেষ কথা। তবে শুধুই আত্মোন্নতি, প্রচার, খ্যাতি, যশই শেষকথা তার জীবনের শেষ কথাটি নয়। এর পিছনে রাজীবের টাকা আয় করবার ধান্দা, অর্থের লোভ। আর তাই সে গজাশিমুল গ্রামের বসু–শবর জনজাতির লোকসংস্কৃতি সর্বোপরি তাদের জীবন নিয়ে নোংরা ব্যবসায় নেমেছে। সমাজের একজন প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক যার উদ্দেশ্য মূলত শিক্ষাদান, তার কাছ থেকে এই ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি মোটেই কাম্য নয়। সরল সোজা মানুষগুলির বিশ্বাস মূল্যবোধ, নৈতিকতা, আত্মমর্যাদা, ধর্মীয় মূল্য, লোকপুরাণ, সংস্কার, মিথ- সব কিছু নিয়ে ব্যবসা করে তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে অর্থ নিয়ে জীবন নিয়ে। লোকসংস্কৃতি প্রচারের নামে নারীর নগ্ন অবস্থায় নৃত্যরতা শরীরের ছবি দেখিয়ে প্রতারণা করেছে। সেই ছবি বিশ্বের বাজারে চড়া দামে বিক্রি করছে পথে ঘাটে। ছাপানো হয়েছে পত্র পত্রিকায়। সেই অর্থ লুঠেছে রাজীব। রঙলাল মানুষ পাচার করে দাস ব্যবসা করত তাই সে আড়কাঠি। আর রাজীব লোকসংস্কৃতি প্রচারের নামে বিশ্ববাজারে নারীদের নিয়ে তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে দেহকেন্দ্রিক নোংরা ব্যবসা শুরু করে যার মাধ্যমে বেশ লাভ করবে রাজীব। আর এই উপন্যাসে ভগীরথ মিশ্র এভাবেই দেখালেন সমাজের এক নামী অধ্যাপকের আড়কাঠি হয়ে

ওঠাকে। চরিত্র নির্মাণে লেখক বাইরের দেখার মধ্যে দিয়ে তৈরি করে দেন চরিত্রের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি।

লোকসংস্কৃতিকে ব্যবসা হিসাবে নিয়ে তাকে ভোগ্যপণ্যে পরিণত করে শিক্ষিত একদল মানুষের বিশ্বময় বাজার তৈরি করার যে চক্র ও ফাঁদ তৈরি করছে মানুষ, তাকে অকপটে বলতে অকুতোভয় ঔপন্যাসিক ভগীরথ মিশ্র। লোকসংস্কৃতির বাজার অর্থনীতির এই নেতিবাচক দিকটিকে দেখালেন তিনি। অথচ আদতে যে মানুষগুলি চিরকালের শোষিত, বঞ্চিত তাদের অবস্থার কোনো উন্নতিই হয় না। রাজ্য উৎসবে পারফরমেন্স করে গজাশিমুলের আদিবাসী মানুষ। অথচ রাজ্য উৎসবে প্রথম হওয়ার মেডেল রাজীবেরই গলায় ওঠে। যারা এই সংস্কৃতির প্রকৃত ও যথার্থ শিল্পী তাদের কাছে অর্থ পৌঁছায় যৎসামান্যই। আর আসলে লাভের অঙ্ক বাড়ায় এই রাজীবের মতো তথাকথিত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিরা, বিদেশিনী ক্যাথি বার্ডের মতো দালালেরা। নেতা, মন্ত্রীদের কাছে থেকে তাদের গ্রামের উন্নতির জন্য সুযোগ-সুবিধার কথা বলতে গেলে দূর থেকে তাদের গাড়ী চলে যায় অথবা তারা ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। ফলত নেতা-মন্ত্রীদের দেওয়া ভাষণে তাদের যে উন্নতির কথা বলা হয়, গজাশিমুলের বসু-শবর জাতির জীবনে তা অধরাই থেকে যায়। তবে ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির এই সমস্যার পাশাপাশি এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথও দেখিয়েছেন। তবে সেই পথের সন্ধান পাবে গজাশিমুল গ্রামের বসু-শবর শ্রেণির আদিবাসী মানুষেরা নিজেরাই। তাদের মধ্যে খুব মৃদু গতিতে হলেও শিক্ষার আলো পৌঁছাচ্ছে। সুচাঁদ, সুনীলেরা তার নজির। তাদের হাত ধরে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা বাঁচিয়ে নিজেদের বিপুল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্বল করে আশার আলো দেখে গজাশিমুল গ্রামের এই মানুষেরা। আড়কাঠি উপন্যাসে আদিবাসী বসু-শবর জাতির এই উত্তরণের স্বপ্ন দেখেছেন লেখক।

আড়কাঠি উপন্যাসটির প্রকাশ সাল ১৯৯৩। উপন্যাসের ঘটনা কাল তবে তার আগের। তবে উপন্যাসটির ঘটনা কাল ও কাহিনিকাল সঠিকভাবে কোনো সময়ের তা লেখক জানাননি। *রহু চণ্ডালের হাড়* -এ যেমনটা আমরা লেখকের বর্ণনার সূত্র ধরেই মিলিয়ে নিতে পারি। এই উপন্যাসে সেরকম কোনো সুযোগ নেই। সর্বজ্ঞ কথক কথা বলছে বর্তমান কালে। রাজীবের বাঁকুড়ায় একটি কলেজে অধ্যাপনা নিয়ে যাওয়া। সেখানে এক প্রত্যন্ত গ্রাম গজাশিমুলকে কেন্দ্র করে সেই অঞ্চলের বসু-শবর জনজাতির লোকসংস্কৃতিকে খুঁজে বের করা। রঙলালের বংশানুক্রমিকভাবে দাসে পরিণত করা থেকে তাদের বাঁচিয়ে তার কর্মকাণ্ড ও শেষ পর্যন্ত তাদের লোকসংস্কৃতি তথা জীবনকে পণ্যে পরিণত করা। শেষে গজাশিমুলের মানুষের কাছে রঙলালের চেয়েও বড়ো আড়কাঠি হয়ে যাওয়া– একের পর এক ঘটনা এগিয়েছে। তবে উপন্যাসের সময় এই সম্পূর্ণ ঘটনাকেন্দ্রিক। তবে এই বর্ণিত ঘটনা যে পরপর এসেছে এমন নয়। কখনো আগের ঘটনা পরে ঘটেছে। আবার কখনো সংলাপের মাধ্যমে ঘটনা এগিয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ট্রেনের কামরার বিবরণ বর্ণনা করছেন সর্বজ্ঞ কথক। গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘের রাজ্য উৎসবে প্রথম হয়ে ট্রেনে ফেরার সময় কামরায় তাদের কথোপকথন, সংলাপ ও বর্ণনা অংশ দিয়ে উপন্যাস শুরু হচ্ছে। এরপর উপন্যাসে আখ্যানের সময়ের বিপর্যস্ত ক্রম লক্ষ করা যায়। পশ্চাত- উদ্ভাস (ফ্লাশ ব্যাক) ও পূর্ব- উদ্ভাস (ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড)। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে সর্বজ্ঞ কথকের কাহিনি বর্ণনা, সংলাপ ইত্যাদির মাঝামাঝি রাজীব তার জীবনের সংকটকালে মনে করেছে তার মায়ের কথা। মায়ের জীবনের কথা, তার সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়ার কথা বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। তার জীবনের অন্তরঙ্গ বান্ধবী তথা প্রেমিকা সুতপার কথা বর্ণনার সময়েও ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ‘ভিলেন নায়ক সংবাদ’ অংশে দশরথ ভক্তার তাদের জীবনের কথা বলায় ঔপন্যাসিক ফ্ল্যাশ ব্যাক ব্যবহার

করেছেন। একেবারে শেষ পরিচ্ছেদে ‘ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে’– সুচাঁদের ও রাজীবের সংলাপে সুচাঁদের কথায় ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ডের বিষয়টি লক্ষ করতে পারি। সুচাঁদ জানায় এখন রাজীবের থেকে তাদের জীবনের পথ আলাদা। তাদের জীবনের পথ তারা নিজেরাই দেখে নেবে। এইভাবে পরের ঘটনা আগে আবার কখনো আগের ঘটনা পরে এসে উপন্যাসটি এগিয়েছে।

উপন্যাসটির সংস্থানের বিষয়টি লক্ষ করলে দেখা যায় সেখানে স্থান–কাল–ঘটনা কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত। উপন্যাসের স্থান বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গজাশিমুল গ্রাম। কাল রাজীবকে কেন্দ্রে রেখে গজাশিমুলের মানুষের পরিণতি ও বিস্তার। রাজীবের উদ্দেশ্য দাসব্যবসায়ী রঙলালের হাত থেকে মুক্ত করে তার নিজের চক্রব্যূহে জড়িয়ে ফেলা। তবে উপন্যাসের পরিণতিতে দেখি রাজীবের নির্মিত চক্রব্যূহের ঢুকবার পথটিতে ভুল করে ঢুকলেও বেরোনোর পথটিও তাদের অজানা ছিল না। বরং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল গজাশিমুল গ্রামের নিরক্ষর, সরল-সোজা মানুষগুলির আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাসের কাছে হেরে গিয়ে রাজীবের জীবনে নিঃসঙ্গতা নেমে এসেছে। এভাবেই উপন্যাসটির স্থান-কাল–ঘটনার কার্য-কারণ সূত্রে রাজীব চরিত্রের ট্রাজিক পরিণতিকে দেখালেন ঔপন্যাসিক ভগীরথ মিশ্র। আর তাই তিনি এই উপন্যাস নির্মাণে সার্থক।

ভগীরথ মিশ্রের তার এই উপন্যাসের নিরীক্ষণে রেখেছেন আড়কাঠিদের হাতে পড়ে প্রান্তিক জনজাতির সরল বিশ্বাস ও দারিদ্র্যকে পুঁজি করে কিভাবে তাদের ও তাদের সংস্কৃতিকে নিয়ে ব্যবসা ফাঁদে আড়কাঠিরা। এই আড়কাঠি হতে পারে তথাকথিত অশিক্ষিত, কখনো বা শিক্ষিত অধ্যাপক, সামাজিক পরিচয়ে যিনি শিক্ষক। তবে শিক্ষক পথভ্রষ্ট হয়ে যখন ভক্ষক হয়ে ওঠেন তখনই সমস্যা তৈরি হয়। আদতে এরাই হয়ে যায় শোষক। এদের

শোষণে জর্জরিত প্রান্তিকের জীবনকে ছিবড়ে করে ছাড়ে এই আড়কাঠিরা। বারংবার তাদের সরল বিশ্বাসকে ভেঙে দেয় এরা। স্বাভাবিকভাবে প্রান্তিকের অবস্থা আরও বিপর্যস্ত হয়। এইভাবে তারা শোষণের জটিলতায় ক্রমে শোষিত ও অত্যাচারিত হতে থাকে। তারা প্রান্তিকই রয়ে যায়। সেই অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির দিশা খোঁজে নিজেরাই।

৩.২.৫ *কলাবতী কথা* :

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের *কলাবতী কথা* উপন্যাসে ঔপন্যাসিক নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে মেয়েদের জীবনকে দেখেছেন। সমাজে প্রচলিত মেয়েদের নিজেদের সম্পর্কের মধ্যে জটিল কুটিল চেহারাগুলি ভাঙতে চেয়েছেন তিনি। এই উপন্যাসে তিনি শাশুড়ি বউমার সম্পর্ক কলুষিত হতে দেননি কখনো। নারীদের নিজেদের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম ও তাদের স্বনির্ভরতাকে দেখাচ্ছেন। একটি আদিবাসী মেয়ের জীবন ও পটশিল্পকে কেন্দ্র করে তার জীবনের পরিবর্তনকে দেখালেন লেখক। একটি জাপানী ছেলের সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্ককে ও বিশ্বময় শিল্পের খাতিরে তাকে পরিণতি দেওয়ার জন্য তার জাপানী ছেলেটির সন্তানের মা হওয়া ও তার ঘরণী হওয়াকে ঔপন্যাসিক নারীর অগ্রগতি বলে মনে করেছেন। সত্যিই কী তাই? এক পটুয়া পরিবারে জন্ম না হয়েও পটশিল্পের প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসায় তাকে নেশা ও পেশা করে পল্লীগ্রামের এক হত দরিদ্র পরিবারের পটশিল্পের হাত ধরে তাদের উত্তরণকে দেখালেন ঔপন্যাসিক ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়।

বাংলাদেশের পল্লীগ্রামাঞ্চলে লোক-দেবদেবীর অন্ত নেই। এঁদেরকে নিয়ে প্রচলিত রয়েছে বৈচিত্র্যময় সব লোককাহিনি আর ব্রতকথা। সেই সব দেবমাহাত্ম্যকে নিয়ে পালনীয় সংস্কার, আচার-আচরণ, প্রথা, উৎসবের শেষ নেই। এই সমস্ত আচার বিচারগুলি নারী সমাজে প্রচলিত আচার বিচার। মেয়েরা নিজেদের সুখী গৃহকোণে বংশ পরম্পরায় পালন

করে আসছে এই সকল আচার-আচরণ। সংসারের শান্তি রক্ষা, স্বামীর কল্যাণ কামনা, সন্তানের মঙ্গল সাধনের জন্য তারা নিয়মিত পালন করে চলেছে ষষ্ঠী ও ব্রতকথা। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার ক্রমেই বাড়ছে। দলুই, সাঁওতাল মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটছে। তাদের মধ্যে শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার প্রতি আগ্রহ মেয়েদেরকে এগিয়ে দিয়েছে যুগের সঙ্গে সঙ্গে। তারা শিল্পচর্চার উপর নির্ভর করে জীবিকা অর্জনের পথ নিজেরা দেখে নেয়। অর্থাৎ তারা স্বনির্ভর হতে চায়। পুরুষের তাদের প্রতি অন্যায় আচরণকে তারা মুখ বুজে সহ্য করে না। তারা পাল্টা উত্তর দিতে শিখেছে। তারা তাদের উপর ঘটে যাওয়া নানা অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে জানে। নিজে মেয়ে হয়ে অন্য মেয়েদেরকেও তারা রক্ষা করেছে ও নিজেদের সুরক্ষিত করতে শিখেছে। আমরা উপন্যাসে লতুর বউমা কনককে দেখি সে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে। দারিদ্র্যকে বরণ করে তাদের নিজেদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দিয়ে তারা দারিদ্র্যকে জয় করেছে। আমরা উপন্যাসে তিনটি নারী চরিত্রকে পাই। প্রথমে আসে লতুর কথা, যে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে মুড়ি বেচে সংসার চালায়। লতুর পরে আসছে তার বউমা কনকের কথা। শাশুড়ি বউমার সম্পর্ক আর পাঁচটা সাধারণ পরিবারের মতো নয়। শাশুড়ি বউমা উভয় উভয়ের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। কনক বংশানুক্রমিক পটশিল্পী নয়। সে মেলায় মেলায় ঘুরে ঘুরে পট দেখেছে। তারপর একদিন সে নিজেই পট তৈরি করে ফেলেছে। নানা ধরনের পুরাণ, লোককাহিনি শুনেছে কখনো বা পড়েছে। সমৃদ্ধ করেছে নিজেকে। তারপর পট এঁকে গান গেয়েছে। তার প্রাপ্য সম্মান পেয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করতে শিখেছে। তবে নারীত্বের অপমান থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলেছে। আর আদিবাসী এক চরিত্র কলাবতী যে জিওন-ঝরনা দলে নাচ করতো তাকেও সমাজ কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচিয়ে নব জীবন দান করেছে। এমনকি তাকে যখন কনক নিজের কাছে এনে রেখেছিল তখনও সে মেয়েটির নারীত্বের অপমানের

প্রতিবাদ করে মেয়েটির হয়ে। পরে মেয়েটির ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজের ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছে। তার দুশ্চরিত্র স্বামীর হাত থেকে রক্ষা করেছে কলাবতীকে। তবে কলাবতী কনকের চেয়ে আরও বুদ্ধিমতী ও প্রত্যুৎপন্নমতি। সে যুগের সঙ্গে মিলিয়ে পটশিল্পের ব্যবসাকে আরও প্রসারতা দিয়েছে। লাভের দিকে তাকিয়ে যুক্ত করেছে জামাকাপড়ে পটচিত্রের প্রিন্টিং। ভেষজ প্রাকৃতিক রঙের বদলে সহজ ও সুলভ ফেব্রিক রঙকে ব্যবহার করেছে তাদের পটচিত্রে। ব্যবসাকে সে ভালোই বোঝে। তবে পৌরুষে অক্ষম স্বামীকে সে মানুষ হিসাবে ভালোবাসলেও তার কাছে তার শারীরিক কামনায় তৃপ্ত হয়নি। কলাবতীর স্বামী রামুও তাকে ভালোবাসলেও সন্তানসুখ দিতে পারেনি। তাই বিদেশী আকিওর কাছ থেকে যখনই সে শারীরিক সঙ্গ ও আকর্ষণ পেয়েছে তখন তার অতৃপ্ত কামনা পূর্ণতা পেয়েছে। সে নিজের উন্নতির কথা ভেবেই মিকির কথায় রাজী হয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। উপন্যাসের সমাপ্তিতে দেখা যায় সে আকিওর ঘরণি। তার আঁকা পটচিত্র বিশ্বের দরবারে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। এরপর তার জীবনে কনক আর রামুর কোনো জায়গা দিতে সে নারাজ। আকিওর সন্তানকেই বড়ো করছে সে। কলাবতী আকিওর মেয়ের নাম দিয়েছে কুসুম। সেও নাকি ছোটবেলা থেকেই ভালো ছবি আঁকে। তবে কলাবতীর কনক ও রামুকে ত্যাগ করা ও কর্মব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে ফিরে না আসাকে কনক আর রামু কীভাবে দেখছে সেকথার উল্লেখ নেই উপন্যাসে। যে কনক কলাবতীকে মায়ের স্নেহ, ভালোবাসা ও চূড়ান্ত স্বাধীনতা দিয়েছে সেই স্বাধীনতাকে নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা করেছে কলাবতী। সে তার মাতৃসমা শাশুড়ি মাকে তার স্বামী রামুর অক্ষমতার কথা জানাতে পারতো। কিন্তু জানায় নি। সে মিথ্যা ছলনা করেছে। কনকের বিশ্বাস ও ভালোবাসাকে কোথাও আঘাত না করে গোপন করে গেছে তার গর্ভে আকিওর সন্তানের প্রসঙ্গ। আর তার পরিণত বয়স্ক স্বামী রামুর

অক্ষমতা ও জৈবিক মিলন বিষয়ে অজ্ঞতা ও অলৌকিক বিশ্বাসকে এযুগে দাঁড়িয়ে কেমন যেন অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়।

ঔপন্যাসিক ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় তাঁর এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তাঁর *কলাবতী কথা* নাকি একটি আদিবাসী মেয়ের পটশিল্পের হাত ধরে উত্তরণের কাহিনি। এছাড়াও এই উপন্যাস নাকি কলাবতীর প্রেম, পরকীয়া ও পজিটিভ উত্তরণের কাহিনি যা মেয়েদের অগ্রগতির কথা বলে। তিনি জানিয়েছেন, কলাবতী রামুর পুরুষত্বহীনতার কারণে মাতৃত্বের স্বাদ পায়নি। অবশেষে সে খুঁজে পেয়েছে জাপানী এক পুরুষকে যার হাত ধরে তার পটচিত্র বিশ্বের দরবারে জায়গা করে নিয়েছে। পাঠক যখন প্রশ্ন করে কলাবতীর ঘর ছাড়া নিয়ে, তখন ঔপন্যাসিক তার শাশুড়ি ও স্বামীর প্রতি অবিচার নিয়ে পাল্টা জবাব দেন একজন পুরুষ যখন ঘর ছেড়ে দিয়ে পরকীয়া ও দ্বিতীয়বার বিবাহ করলে সমাজ যদি প্রশ্ন না তোলে তবে কলাবতী কী শুধুমাত্র মেয়ে বলেই তার দিকে পাঠক সমাজের এই আঙুল তোলা! তবে ঔপন্যাসিকের কলাবতীর প্রতি এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও পক্ষপাতিত্ব সত্যি প্রশ্ন তোলে। যে প্রশ্নটি মনে আসে তা আদতে নারী বা পুরুষের প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটি আদতে মানবিকতার প্রশ্ন। কলাবতীর ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের এই নারীবাদী চিন্তা আপত্তিজনক। প্রশ্নটি কলাবতী নারী বলে তার এই ঘর ও পরিবার ছাড়ার বিরুদ্ধে আপত্তি নয়। যদি কলাবতীর স্থানে রামু বা অন্য কোনো পুরুষ একাজ করতো তবে তার ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন উঠত। রামুর প্রতি তার অন্যায়কে মেনে নেওয়া কঠিন। আর কনক যে তাকে মেয়ের স্থান দিয়েছে তার সরল বিশ্বাসে নাতনিকে ভালোবেসেছে, আগলে রেখেছে আপদে বিপদে তার প্রতি কলাবতী কী আদৌ ন্যায় সঙ্গত আচরণ করেছে! কলাবতী কনককে মায়ের স্থান দিলে সে আকিওর সন্তানের পরিচয় কী সত্যিই গোপন করতে পারতো- এর উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন।

কলাবতী কথা উপন্যাসে মেয়েদের জীবনের প্রগতিকে দেখানোই ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য। আমাদের সমাজে প্রচলিত নানা ধরনের প্রচলিত সম্পর্কের তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলিকে ভাঙতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। তাই লতিকা ওরফে লতু কনক কলাবতী এদের সুসম্পর্ককে দেখিয়েছেন। সাধারণত শাশুড়ি বউমার চিরকালীন তিক্ত সম্পর্কের রূপই আমাদের চোখে পড়ে। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি সৃষ্টির ক্ষেত্রে খুবই সচেতন। তিনি প্রচলিত পরিচিত চেনা সম্পর্কের বাইরে গিয়ে লতিকার সঙ্গে কনকের আবার কনকের সঙ্গে কলাবতীর সম্পর্কের মধ্যে অকৃত্রিম মাতৃ স্নেহকেই দেখাচ্ছেন। আর তাই লতু অষ্টম শ্রেণী পাশ করা ছেলের বউ কনককে বাবুদের বাড়ি কাজ করতে পাঠায় না। তার উপর লতু জানে কনক ভালো গান গাইতে পারে, আবার ভাল ছবিও আঁকতে পারে। লতু নিজের ছেলে নিরঞ্জনের প্রতি রেগে যায় তার অধঃপতনের কারণে। বরং ছেলের প্রতি রাগ করে বউমা কনকের জন্য আক্ষেপ হয় সে যদি কোনো একটা কাজ পেত তবে সারাদিন সেটা নিয়ে থাকতো। আবার কলাবতীকে বিপন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছে কনক। তাকে আশ্রয় দিয়েছে নিজের কাছে। সন্তান স্নেহে কলাবতীকে আগলে রেখেছে। জাতপাতের বিষয়ে প্রাচীনা শাশুড়ির মতের বিপক্ষে গিয়ে নিজের ছেলে রামুর সঙ্গে কলাবতীর বিয়ে দেয়। নিজের স্বামী নিরঞ্জনের কামার্ত লোভাতুর চাহনি দেখে কলাবতীকে সাবধান করেছে। উপন্যাসে কলাবতীও কনকের পরিবারের অনেক দায়িত্ব নিয়েছে। নিজের শৈল্পিক প্রতিভাকে কাজে লাগিয়েছে। তাই বলে মাতৃসমা কনককে ছলনা করেছে। গোপন করেছে অনেক কিছু। একসময় শ্লীলতাহানির কারণে যে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল কনক না বাঁচালে তার জীবনেরই তো কোনো মূল্য থাকত না। সমাজ, পরিবার, এমনকি নাচের দলও তো তাকে ব্রাত্য করেছিল। সেই কনকের প্রতি কলাবতী এরূপ আচরণকে সত্যিই মেনে নেওয়া কঠিন। তবে প্রশ্ন ওঠে উপন্যাসের শেষে কলাবতীর সম্পর্কে কনকের বন্ধন কী আগের

মতোই থাকবে? কনকের মনে তার স্থান কী আগের মতোই থাকবে? পাঠকের মনে এ প্রশ্ন তৈরি হলেও এর উত্তর পাঠকের অজানা। ঔপন্যাসিক আমাদের জানান জাপানী যুবকের সান্নিধ্যে এসে তার শিল্পী জীবনে বদলের সুযোগ আসে। নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের পটচিত্রকে বিশ্বের দরবারে মেলে ধরে। তবে প্রশ্ন এটাই যে কলাবতীর কি অন্য পথ ছিল না? যে মানুষগুলির জন্য তার বেঁচে থাকা, জীবনে বড়ো হওয়া, মোহগ্রস্ত হওয়া, খ্যাতি পাওয়ার লোভে তাদেরকে ঠকিয়ে আকিওর সন্তানধারণ ও শেষে আকিওর ঘরনি হওয়া এটাই কী কলাবতীর কাছ থেকে কনকের কাম্য ছিল? তাই ঔপন্যাসিক কলাবতী ও কনকের সম্পর্কের পরিণতি কী হতে পারে তার আভাস দিলেন পাঠককে। প্রথম দিকে কলাবতীর একটা চিঠি পেয়ে কনক আপ্লুত হলেও দ্বিতীয় চিঠির আশায় ছিল সে। কিন্তু কলাবতীরই কনককে শুধু দ্বিতীয় চিঠি কেন আর কোনো চিঠিরই উত্তর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে লেখক কেন 'হয়ে ওঠেনি' বললেন? কলাবতীর এরপর আর কোনো চিঠি পাঠাবার কোনো ইচ্ছেই হয়নি। তবে স্বভাবতই মনে হয় কলাবতীর মনের কোণে জমে থাকা অপরাধবোধের কারণে কিম্বা কলাবতীর জীবনে তাদের প্রয়োজন ফুরাবার কারণেই কলাবতী কনককে আর কোনো চিঠি লিখতে চায়নি। লেখক উপন্যাসে আধুনিক প্রযুক্তির প্রসঙ্গ এনেছে বেশ অনেকবারই। সেখানে কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ফেসবুক, মোবাইলের প্রসঙ্গও এসেছে। যোগাযোগের এতরকম প্রযুক্তির দিনে চিঠি পাঠালো কেন কলাবতী? কনক ও রামুর প্রতি কনক তাই যথার্থ আচরণ করেনি। বিশ্বময় লোকসংস্কৃতির বাজার অর্থনীতির প্রলোভনকে উপেক্ষা করতে পারেনি আদিবাসী এই মেয়েটিও। তাই তার কাছে কনকদের সম্পর্কের সরলতার সুযোগ নিয়েছে আদিবাসী মেয়ে কলাবতীও। বিদেশী আকিওর রূপ যৌবনে মোহগ্রস্ত হয়েছে সে। মিকিও সেই আন্তর্জাতিক লোকসংস্কৃতি বাজার অর্থনীতির শিকার হয়েছে আর কলাবতীকেও সেই শিকারের ফাঁদে জড়িয়েছে। তাই যারা কলাবতীকে

নব জীবন দিয়েছে তাদেরকেও উপেক্ষা করেছে। এই দিক থেকে কলাবতীও অনেকটা 'আড়কাঠি' উপন্যাসের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী রাজীবের মতো নীতিভ্রষ্ট ও বিবেকশূন্য হয়েছে।

সর্বজ্ঞ কথকের বয়ানে *কলাবতী কথা* উপন্যাসটি বিবৃত হয়েছে। মাঝে মাঝে সংলাপের ব্যবহার হয়েছে। চরিত্রের মুখে সংলাপের মধ্য দিয়ে লেখক পরতে পরতে এনেছেন ব্রতকথা ও বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণের বিভিন্ন ষষ্ঠীর পালনের গল্পগুলি। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে ও গোষ্ঠীজীবনে প্রচলিত নানা ধরনের আঞ্চলিক রান্না ও পুজো পার্বণে পালনীয় আচার, আঞ্চলিক পুরাণ ও ভাষার যথাযোগ্য ব্যবহার করেছেন। স্বাভাবিকভাবে কার্যকারণ সম্পর্কটি যথার্থভাবেই সুরক্ষিত হয়েছে। তবে মাঝে মধ্যে ব্রতকথার কাহিনির উপস্থাপন যেন জোর করেই আনা হয়েছে। উৎসবকে নিয়ে কাহিনির অতিরেখ দেখা গেছে কোথাও কোথাও।

চরিত্রগুলির মধ্যে লতিকা চরিত্রের হয়ে ওঠার বিন্যাসটি কার্য কারণ পরম্পরায় গ্রথিত। উপন্যাসে কনক চরিত্রের বর্ণনায় প্রথম থেকে পারম্পর্য রক্ষিত হয়েছে। একেবারে শেষে কলাবতীর সঙ্গে তার সম্পর্কের পরিণতি কেমন হল তা বলেন নি। আর কলাবতী চরিত্রটিকে নিয়ে প্রতিবাদী নারীর ভূমিকায় দেখিয়েছেন। তার শিল্পকলাকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক কলাবতীর যে অগ্রগতির কথা বলেছেন তা যেন একটু বেশি বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। কলাবতীর কথা তো বাংলায় ছড়িয়ে পড়বেই কিন্তু তার শাশুড়ি কনকের কথা তো কলাবতীর চেয়েও বেশি করে ছড়িয়ে পড়া উচিত ছিল বলে মনে হয়। পুরুষ চরিত্র হিসাবে নিরঞ্জন যথাযোগ্য। তবে রামু চরিত্রটির ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের দুর্বলতা ধরা পড়ে। শিক্ষিত পরিণত বয়স্ক আধুনিক প্রযুক্তি জানা রামুর সন্তান উৎপাদন সম্পর্কে অলৌকিক বিশ্বাসকে ও কলাবতীর উপর অন্ধবিশ্বাসকে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। সন্তান

উৎপাদনের অক্ষমতা থাকলেই যে সেই পুরুষ সব কিছু অদৃষ্ট ও কুসংস্কারের উপর চাপিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে এমনটা কাম্য নয়। রামু চরিত্রের নির্মাণের ক্ষেত্রে এই দুর্বলতাই গোটা উপন্যাসের প্লটটিকেও দুর্বল করেছে। তাই স্থান কালের বিন্যাসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও ঘটনার ও চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে সংস্থাপনের বিষয়টি এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে বেশ দুর্বল হয়ে গেছে।

৩.৩ উপসংহার:

এভাবেই আমার আলোচ্য প্রত্যেকটি উপন্যাসের আখ্যানতাত্ত্বিক গঠন বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি এই অধ্যায়ে। উপন্যাসগুলি প্রত্যেকটি যে আলাদা আলাদা আখ্যানের সংগঠন তা বিশ্লেষণ করে তাদের স্বতন্ত্র ফোকালাইজেশন নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। এখানে এসেছে উপন্যাসগুলির স্বতন্ত্র কথনরীতি। যেখানে লেখকেরা ব্যবহার করেছেন তাদের নিজস্ব মুন্সিয়ানায় কোথাও সর্বজ্ঞ-কথনরীতি, কোথাও বা আত্মকথন-রীতি, কোথাও আবার ভূমিকানুগ কথনরীতির অসাধারন বয়ান। স্থান-কালের সাজুয্য রেখে মূল ঘটনার অন্তর্গত চরিত্রগুলি কীভাবে হয়ে উঠেছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

তথ্যসূত্র:

১. Holub, Robert C(1984). *Reception Theory A critical introduction.* London and New York: Methuen.

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩১৮ বঙ্গাব্দ)। *রবীন্দ্র রচনাবলী(৯ম খণ্ড),* পরিচয়, ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

৩. ভট্টাচার্য্য, নীলাঞ্জনা (২০১৩)। *ঐক্য পত্রিকা,* সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সংখ্যা, মায়ামৃদঙ্গ: একটি বিরল মায়ার উপাখ্যান।

৪. বর্মণ, প্রদীপ কুমার। *সমকালের জিয়নকাঠি, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও আলকাপ: শিল্পী জীবনের এক অনন্য পরিক্রমা*। পৃ. ২৫৬।

৫. শীল, বিকাশ (সম্পাদিত) (২০০৬)। *জনপদপ্রয়াস* অভিজিৎ সেন সংখ্যা। হুগলি।

৬. বিশ্বাস, রঞ্জনা (২০১৭)। *চিন্তাসূত্র,* রহু চণ্ডালের হাড়: বাজিকরের উপাখ্যান। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওয়েবম্যাগ, অক্টোবর ২৪।

৭. সেন, অভিজিৎ(২০১০)। *রহু চণ্ডালের হাড়*। কলকাতা: এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং। পৃ. ১১৪।

৮. পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮৬

৯. পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫২

১০. মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা (২০১৫)। *কলাবতী কথা* । কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ৬২।

১১. পূর্বোক্ত। পৃ. ৮২

১২. পূর্বোক্ত। পৃ. ১০৮

১৩. পূর্বোক্ত। পৃ. ১১০

১৪. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা(২০১৩)। ২ *উপন্যাস সমগ্র, মায়ামৃদঙ্গ* । কলকাতা: দে'জ। পৃ. ২৬২

১৫. পূর্বোক্ত। পৃ. ২৬২

১৬. পূর্বোক্ত।

১৭. পূর্বোক্ত।

১৮. পূর্বোক্ত। পৃ. ৯১

১৯. পূর্বোক্ত। পৃ. ২৬১

২০. পূর্বোক্ত। পৃ. ২৬১

২১. . সেন, অভিজিৎ(২০১০)। *রহু চণ্ডালের হাড়*। কলকাতা: এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং। পৃ ৯ ২২. পূর্বোক্ত। পৃ. ১০

২৩. পূর্বোক্ত। পৃ. ৬২

২৪. পূর্বোক্ত। পৃ. ৬২

২৫. পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৩

২৬. মুখোপাধ্যায়, সুব্রত (২০১৩)। *রসিক*। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ৩৮৬

২৭. মিশ্র, ভগীরথ (১৯৯৩)। *আড়কাঠি*। কলকাতা: দে'জ। পৃ. ১৯১

২৮. মুখোপাধ্যায় তরুণ এবং বন্দ্যোপাধ্যায় সুচরিতা (সম্পাদিত, ২০১১)। *নিম্নবর্গীয় চেতনা : প্রসঙ্গ ও প্রয়োগ, সাহিত্যতত্ত্ব, সৌন্দর্য তত্ত্ব, শৈলীতত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্য,* ঘোষ, প্রসূন। কলকাতা: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

চতুর্থ অধ্যায়

লোকশিল্পনির্ভর উপন্যাসগুলিতে লোকভাষা ব্যবহার

৪.০ ভূমিকা:

মৌখিক পরম্পরা নির্ভর লোকশিল্পগুলির নেপথ্য কাহিনি হাজির হয়েছে লিখিত মাধ্যম উপন্যাসে। ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের স্বকীয় শিল্প মাধ্যমের ছোঁয়ায় লোকশিল্প ও লোকশিল্পীদের প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। তাঁদের এই স্বকীয় শিল্প সজীবতা পেয়েছে লোকশিল্পনির্ভর উপন্যাসের প্রকরণে ও বিন্যাসে। এই বিন্যাস সমৃদ্ধ হয়েছে চরিত্রায়ণ, কথন, আবহ, ফোকালাইজেশন, সময়, সংস্থান ইত্যাদির দ্বারা। প্রত্যেক ঔপন্যাসিকের কথনের নতুনত্ব বা বিশ্বাসযোগ্যতায় উপন্যাসগুলি সাংবাদিকতার স্তরকে অতিক্রম করেছে। এক শিল্পকে নিয়ে তা হয়ে উঠেছে আরেক কারিগরের শিল্পবেদনা। উপন্যাসের ফোকালাইজেশনের অন্তরে যে চরিত্রগুলি কথা বলছে, তাদের দুঃখ, কষ্ট, অনুভূতির মনোবেদনা ঔপন্যাসিক যে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, তা তাদেরই একান্ত ব্যক্তিগত। এই ব্যক্তিগত বিষয়গুলি তাদের সমাজে সর্বজনীন ও চিরকালীন। স্বাভাবিকভাবে লিখিত উপন্যাস পাঠে অলিখিত মৌখিক পরম্পরাগুলি পাঠককুলের সাথে নিবিড় একাত্মতা লাভ করে। ভাষা বয়ানে বা চরিত্র সংলাপে সার্থক লেখক বা পাঠক উপন্যাসের সেতুতে পৌঁছে যান সেই লোকশিল্প ও শিল্পীদের দোরগোড়ায়। ভাষা প্রয়োগের সার্থকতায় বিনোদনের স্তরকে অতিক্রম করে উপন্যাসশিল্পী লোকশিল্পের মর্ম বোঝেন। বুঝিবা পাঠককেও বোঝান।

ভাষার মাধ্যমে এই বোঝানোর সার্থকতায় সফল *রসিক*-এর সুব্রত মুখোপাধ্যায়, *মায়ামৃদঙ্গ*-এর সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। একইভাবে সফল অভিজিৎ সেন তাঁর *রহু চণ্ডালের*

হাড়-এ। ব্যতিক্রম নন ভগীরথ মিশ্র তাঁর *আড়কাঠি*-তেও। তবে ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় *কলাবতী কথা*-য় যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা শিষ্ট চলিত। তিনি আলোচ্য অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের মতোই নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট লোকশিল্পকে উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন। তবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লোকশিল্পকে কেন্দ্রে রেখে লোকশিল্পীদের মুখে যে ভাষা দিয়েছেন তা লোকভাষা নয়, মান্য চলিত বা শিষ্ট চলিত। প্রত্যেক ঔপন্যাসিক আলাদা অঞ্চলের লোকভাষাকে ব্যবহার করেছেন। স্বতন্ত্র লেখকের ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য ও মুনশিয়ানা লোকশিল্পনির্ভর উপন্যাসগুলিকে অনন্য মাত্রা দিয়েছে। *রসিক*-এ সুব্রত মুখোপাধ্যায় মানভূম পুরুলিয়া অঞ্চলের কাহিনিকে পরিবেশন করেছেন। উপন্যাসে আমরা পুরুলিয়ার পানিপাথর, রাঙ্গুডি, পগরোখটঙ্গা, সিরগি গ্রামের উল্লেখ পাই। স্বাভাবিকভাবেই উপন্যাসটির চরিত্রদের মুখে ব্যবহৃত সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষাই উপন্যাসটিকে জীবন্ত করে তোলে। আবার ভগীরথ মিশ্রের *আড়কাঠি* উপন্যাসে বাঁকুড়ার গজাশিমুল অঞ্চলের বসু শবর জাতির ভাষাগত পরিচয় পাওয়া যায়। এই দুই ঔপন্যাসিকই বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া অঞ্চলের উপভাষাকে ব্যবহার করেছেন। দুজনই তাদের উপন্যাসের চরিত্রের মুখে যে আঞ্চলিক ভাষা দিয়েছেন, পাঠক তাদের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করতে পারেন। *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আলকাপ শিল্পের প্রেক্ষাপট হিসাবে পদ্মা-গঙ্গা-অজয়-ময়ূরাক্ষী নদীর তীরবর্তী দুইপারের অঞ্চলের কথা বলেছেন। মুর্শিদাবাদ থেকে বীরভূম, বীরভূম থেকে দুমকা, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, এমনকি সুদূর কালুপাহাড়ি অঞ্চল ও ধনপতনগর, মিঠিপুর, জঙ্গিপুর, বাঘড়ী, কালান্তর গ্রামের আলকাপ শিল্পীদের মুখের ভাষাকে ব্যবহার করেছেন সিরাজ। আলকাপ শিল্পীদের অবস্থান সমাজের তথাকথিত নীচুতলায়। এদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষাগত পরিচয় আমরা পাব এই উপন্যাসে। অভিজিৎ সেনের *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসে রয়েছে বাজিকরদের বাজিকরী শিল্পের খাতিরে যাযাবর-বৃত্তির সচল জীবনে স্থানবদলের

উদাহরণ। আর সেই সূত্রেই তাদের ভাষায় তৈরি হয়েছে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় যে ধর্মগত, শ্রেণিগত ভাষার বিশেষত্ব দেখা যায় তা লক্ষ করার মতো। *কলাবতী কথা*- য় ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় পশ্চিম মেদিনীপুরের বারবেটিয়া, দক্ষিণ গেড়িয়া, মাওয়া হাটতলা, দুজিপুর বাজার, জামনা, পিংলা, নয়াগ্রাম, ময়নাগড়, কুকাই, সালুয়া, কাশীজোড়া ইত্যাদি গ্রামের আঞ্চলিক লোকশিল্পের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন পাঠককে। তবে তিনি মূলত এই উপন্যাসটির কেন্দ্রে রেখেছেন এই সমস্ত অঞ্চলের পটশিল্প ও পটশিল্পীদের প্রসঙ্গ। এই উপন্যাসের লতু চরিত্রের মুখে আর গানের ভাষায় প্রায় যৎসামান্য ভাষাগত বদল দেখা গেলেও উপন্যাসে শিষ্ট চলিতের প্রয়োগই রয়েছে বেশিরভাগ অংশ জুড়ে।

৪.১ কেন্দ্রীয় ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষা ব্যবহার

আমাদের আলোচ্য প্রত্যেকটি উপন্যাসের ভাষাই যে বাংলা তা যদিও বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে, বাংলা ভাষাতেই লেখা প্রত্যেকটি উপন্যাসের চরিত্রের সংলাপের ভাষাতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। লোকশিল্পগুলিকে কেন্দ্রে রেখে বর্ণিত উপন্যাসগুলিতে যে যে আঞ্চলিক পরিসর তৈরি হয়েছে, তা বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে। অখণ্ড বাংলাদেশের যে যে অঞ্চলে লোকশিল্পগুলি প্রচলিত, সামগ্রিকভাবে সেই সমস্ত অঞ্চলের ভাষাকেই ঔপন্যাসিকগণ ব্যবহার করেননি। বরং, যে নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকশিল্প ও লোকশিল্পীদের ঔপন্যাসিকেরা হাজির করেছেন, সেই বিশেষ এলাকার আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহারের ফলে সেই লোকশিল্প সজীবতা পেয়েছে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লোকশিল্পের পরিবেশকদের মুখের ভাষা বাস্তবিক জীবন্ত রূপ পেয়েছে। লোকশিল্পীরাও হয়ে উঠেছেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট শিল্পের বাস্তবসম্মত যথার্থ শিল্পী। স্বাভাবিকভাবে, উপন্যাসগুলি যথাযথই বাস্তবানুগ হয়েছে। পাঠকের বিশ্বস্ততা খুঁজে নিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে

সফলতা এনেছেন প্রত্যেকটি উপন্যাসের ঔপন্যাসিকেরা। সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাদেরই প্রাপ্য। প্রশংসনীয় তাদের ভাষা ব্যবহারের মুনশিয়ানা।

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম ভাষা। আর সেই ভাষায় তো বৈচিত্র্য থাকবেই। আর এই বৈচিত্র্য তৈরি হতে পারে ভৌগোলিক বা অঞ্চলগত কারণে। আবার একই অঞ্চলে ওই ভাষার বিভিন্নতা তৈরি হয় কে বলছে, কোথায় বলছে, কাকে বলছে তার উপর নির্ভর করে। তার সঙ্গে প্রত্যেক ঔপন্যাসিকের নিজের রয়েছে স্বকীয় শৈলী। সেই দিক থেকেও তৈরি হয়েছে ভাষাগত ভিন্নতা। তবে যেভাবেই ভাষা প্রয়োগ হোক না কেন, ভাষাটি একটি ব্যাকরণ অনুসৃত। স্বাভাবিকভাবে এখানে ব্যাকরণগত অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ভাষাবিজ্ঞানের অনুসরণ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে পরিমণ্ডলীয় ভাষাবিজ্ঞানের সমাজ ও শৈলীগত দিক।

আলোচ্য লোকশিল্পনির্ভর উপন্যাসগুলির প্রত্যেকটি উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের ব্যবহৃত ভাষাগত বৈচিত্র্যের বিষয়টি কেন্দ্রীয় ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে তার ধ্বনি ও রূপ বা বাক্যগত একটা ধারণা চলে আসে। সেই সূত্রেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষাগত তারতম্যের কারণে উপন্যাসের ব্যবহৃত ভাষায় যে যে ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য পেয়েছি, প্রত্যেকটি উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেগুলির তুলনামূলক আলোচনা করেছি।

৪.১.১ *মায়ামৃদঙ্গ* :

এরপর আসা যাক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসটিতে। ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে উপন্যাসটিতে সিরাজ তৈরি করেছেন ভাষাগত বেশকিছু বৈচিত্র্য। এই উপন্যাসে যে ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা পাব সেগুলি *রসিক* ও *আড়কাঠি* অপেক্ষা বেশকিছু ক্ষেত্রে আলাদা। সেটাই স্বাভাবিক। আঞ্চলিকভেদ এই তারতম্যের কারণ। সেই

সঙ্গে রয়েছে উপন্যাসটিতে বর্ণিত আলকাপ শিল্পীদের নিজস্ব বাকভঙ্গি। এই ভঙ্গিতে ধ্বনি ও রূপতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ার মতো।

উপন্যাসে চরিত্রদের আঞ্চলিক উচ্চারণে অনেক সময় ‘ও’, ‘উ’ স্বরধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। যেমন– ‘জোটেনি’ ও ‘ওঠ’-র বদলে ‘জুটেনি’ ও ‘উঠ’ হয়েছে। চরিত্রের মুখের ভাষায় ‘দেশ’, ‘কেন’, শব্দগুলির উচ্চারণ হয়েছে ‘দ্যাশ’, ক্যানে’। এখানে ‘এ’, ‘অ্যা’-র মতো উচ্চারিত হয়েছে। ‘শরীর’-এর পরিবর্তে ‘শরীল’ শব্দে ‘র’ ধ্বনির উচ্চারণ ‘ল’ ধ্বনির মতো হয়েছে। ‘ছৈরদ্দি হে...এ...এ!, অমূল্লো ...ও ...ও ...ও’! দূর থেকে ডাকবার জন্য একই স্বরধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণ দেখা গেছে। এক্ষেত্রে প্লুতস্বরের প্রয়োগ দেখা যায়। ‘আমি’, ‘পড়বেন’ শব্দের পরিবর্তে হ-কারীভবনের ফলে ‘হামি’ ও ‘পহড়বেন’ হয়েছে। ‘হ্যাঁচাক’ শব্দের পরিবর্তে ‘হ্যাসাক’ শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এখানে ‘চ’ ধ্বনির উচ্চারণ ‘স’-র মতো হয়েছে। ‘সর্বনাশ’, ‘সুবর্ণ’, ‘মাত্র’, ‘চারটিখান’ শব্দগুলিতে ‘র’ ধ্বনি যথাক্রমে ‘ব’, ‘ণ’, ‘ত’ ও ‘ট’ ধ্বনির প্রভাবে ‘সব্বোনাশ’, ‘সুবণ্ণ’, ‘মাত্তর’, ‘চাট্টিখান’ হয়েছে। এক্ষেত্রে সমীভবন ঘটেছে। ‘জ্যোৎস্না’-শব্দের ‘ৎ’-এর উচ্চারণ ইংরেজি ‘s’ ধ্বনির মতো হয়েছে। ‘ভ’-র উচ্চারণ অল্পপ্রাণীভবনের ফলে ‘ব’-এর মতো হয়েছে। যেমন- ‘ভিজিট’ থেকে ‘বিজিট’। ‘নদী’ শব্দে ‘ল’-এর উচ্চারণ ‘ন’-এর মতো হয়েছে। ‘প্রীতি’ শব্দের উচ্চারণে সংযুক্ত ব্যঞ্জন -এর মধ্যে ‘ই’ স্বরের আগম হয়েছে। একে বিপ্রকর্ষ বলা হয়। চাই বুলি খোট্টাই ভাষায় ‘ব’ শ্রুতিধ্বনির ব্যবহার হয়েছে। যেমন- ‘আ বে, হাম বিভা নেই করিস শালীকো’।[১]

এই উপন্যাসে আলকাপ শিল্পীদের ব্যবহৃত মৌখিক উপভাষায় ঔপন্যাসিক বেশ কিছু লক্ষণকে দেখিয়েছেন যা ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তা রূপতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্যকে চিনিয়ে দেয়। যেমন- সম্বোধন পদে মধ্যম পুরুষে ক্রিয়াপদের পরে ‘হে’ শব্দের ব্যবহার হয়েছে। চাই

বুলিতে খোট্টাই ভাষায় কাউকে নাম ধরে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে বাক্যের প্রথমে ‘আ বে’, ‘জী’ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। অধিকরণ কারকে ‘কোথায়’-এর বদলে ‘কুনঠে’ শব্দের ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। অধিকরণ কারকে ‘এ’-এর বদলে ‘মে’ বিভক্তি লক্ষ করা যায়। যেমন- ‘সাঁঝে’ শব্দের বদলে বসেছে ‘সাঁঝমে’। কর্ম কারকে ‘কে’ বিভক্তির স্থানে ‘ক্যা’ বিভক্তির ব্যবহার করেছেন লেখক। সাপেক্ষ সর্বনাম পদে ‘যেমন’ শব্দের বদলে হিন্দি শব্দ ‘য্যায়সা’ বসেছে। পুরাঘটিত বর্তমান কালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ায় ‘হলাম’ -এর বদলে হয়েছে ‘হনু’। ‘তকতকে’, ‘ফিসফিস’, ‘গুজগুজ’, ‘টুকটাক’, ‘মিটিমিটি’, ‘খিলখিলিয়ে’ ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বা অনুকার অব্যয়ের ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। এগুলিকে ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার অব্যয় বলার কারণ হল এই সকল অব্যয়গুলি বাস্তব ধ্বনির ব্যঞ্জনা দেয়। অসমাপিকা ক্রিয়া ‘বলে’ ও ‘বাড়িয়ে’-এর বদলে ‘কয়ে’ ও ‘বাড়িঞি’ ব্যবহৃত হয়েছে। ‘না’-বাচক শব্দকে খোট্টাই ভাষার ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের পূর্বে বসিয়েছেন ঔপন্যাসিক। যেমন- ‘হাঁ বে ফজল, মন্তরভি নেই পড়িস’ ![২]

মায়ামৃদঙ্গ উপন্যাসে ভাষা প্রয়োগে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সত্যিই অনবদ্য। এই উপন্যাসে ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে সিরাজ আসলে বঙ্গালী উপভাষাকে ব্যবহার করেছেন। স্থানিক প্রেক্ষাপট ও শিল্পের খাতিরে এটা সার্থক। কারণ মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়ে কিছুদূরেই লালগোলার নিকটে পদ্মা। ওপারেই বাংলাদেশ। তাছাড়া মুর্শিদাবাদে বঙ্গালীভাষী মানুষজনের বাস বেশ লক্ষ করবার মতো। তাছাড়া শিল্পের খাতিরেও যদি দেখি, আলকাপ শিল্পটির প্রসার বাংলাদেশে অধিক। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রভাব এদেশের আলকাপে আসবে তা অস্বাভাবিক কিছু বিষয় নয়। সিরাজ খুব সম্ভবত তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণে এগুলিকে এড়িয়ে যাননি। তাছাড়া নিজের শিল্পের স্বার্থে শিল্পটিকে বিশ্বাসযোগ্যতায় নিয়ে যেতে গেলে একজন প্রথম সারির ঔপন্যাসিকের পক্ষে যেটা সম্ভব সেটা সিরাজকে করতে

হয়েছে। তাতে পাঠক যেমন আকৃষ্ট হয়েছে তেমনি আলকাপ শিল্পীদের যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে উপন্যাসটি সার্থক হয়েছে। 'কয়েকখানা কাঠও জুটেনি রে ভাই। পাটকাঠির তো অভাব দ্যাশে'![৩] এখানে 'জোটেনি' ও 'দেশে' শব্দের বদলে 'জুটেনি' ও 'দ্যাশে' শব্দে যথাক্রমে 'ও' ও 'এ' স্বরধ্বনি 'উ' ও 'অ্যা' স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। বঙ্গালী উপভাষার এইরূপ বহু প্রয়োগে সিরাজ উপন্যাসটিকে জীবন্ত করেছে।

আবার, আলকাপের প্রসার বাংলাদেশে বহুল ভারতেও তা কম নয়। তাছাড়া সিরাজের পটভূমি ভারত। ভারতের মুর্শিদাবাদ ও তার সংলগ্ন অঞ্চল খুব সংগত কারণেই এখানে বাংলা তার আশপাশ অঞ্চলের মুখের ভাষায় উঠে এসেছে অধিকমাত্রায়। আঞ্চলিক বাংলা তো বটেই এই উপন্যাসের অন্যতম মুখ্য চরিত্র ঝাঁকসার মুখে বিহারের চাঁই ভাষার ব্যবহার দেখতে পাই আমরা। সিরাজের এই প্রয়োগ যথার্থ। ঝাঁকসু এই চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষ। এই ধরনের ভাষা আদতে বিশেষ গোষ্ঠীর ভাষা। কিন্তু যদিও এখন সে সেই ভাষা না বলে আঞ্চলিক বাংলা ভাষাতেই কথা বলে। তাই তার সংলাপে আঞ্চলিক বাংলার পাশাপাশি চাঁই ও হিন্দি ভাষার প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন- 'কাল সাঁঝমে শালী শান্তিকা সাথ জোড় লাগিস'।[৪] স্বাভাবিকভাবেই, এই উপন্যাসের চরিত্রদের মুখের ভাষায় ক্ষেত্র বিশেষে কখনো আঞ্চলিক বাংলার পাশাপাশি কখনও বঙ্গালী, কখোনো বা চাঁই ও হিন্দি ভাষা, আবার অনেক ক্ষেত্রে মান্য চলিত রাঢ়ি উপভাষার প্রয়োগ করেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। পদ্মাতীরের কালীতলা বাজার, বর্ডারের প্রসঙ্গ এসেছে উপন্যাসে। আলকাপ শিল্পীদলের হিন্দুস্তান পাকিস্তান নিয়ে আলকাপ গান গাওয়ার কথা বলা হয়েছে উপন্যাসে। আলকাপ শিল্পীরা পদ্মাপাড়ে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে পরস্পরকে পাকিস্তান দেখায়। ওস্তাদের গানের ভাষায় সেই হিন্দুস্তান পাকিস্তান বর্ডার অঞ্চলের উপভাষার লক্ষণ দেখা যায়।

হায় রে হায়, কেমনে বাঁচব জান।

হল হিন্দুস্তান আর পাকিস্তান।।

ভাই রাখে না ভাইয়ের মান,

কেমনে বাঁচব জান।। [৫]

এখানে 'কেমনে', 'বাঁচব', 'জান' ওস্তাদের শব্দগুলির উচ্চারণে বঙ্গালী উপভাষার প্রভাব দেখা যাচ্ছে। তিনি মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, পাকুড় অঞ্চলের আলকাপ শিল্পীদের মুখের ভাষায় শুধু আঞ্চলিক উপভাষা বৈচিত্র্যকেই দেখাননি, পাশাপাশি তিনি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মুখের ভাষার বৈচিত্র্যকে দেখিয়েছেন। যেমন- নবীন শিক্ষিত আলকাপ শিল্পী সনাতন, সুধা ও সুধার বরের সংলাপে বেশ কিছুটা মান্য চলিত রাঢ়ি উপভাষার ব্যবহার করিয়েছেন লেখক। আর প্রথাগতভাবে কিছুটা নিরক্ষর ঝাকসাঁর আলকাপ দলের সঙ্গী ফজল। তার মুখের ভাষায় বাঘড়ী অঞ্চলের বুলি দিয়েছেন লেখক। আমরা ফজলকে একসময় বলতে শুনি, 'সেটা আগে বুললেও হত জী- খামাকা শান্তিকে হামি ঢুঁড়ে হয়রান হনু।'[৬]

৪.১.২ *রহু চণ্ডালের হাড়* :

অভিজিৎ সেন তাঁর *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসেও ভাষাগত বেশকিছু বিশেষত্বকে দেখিয়েছেন। উপন্যাসটির চরিত্রগুলির মুখে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা জীবন্ত রূপ লাভ করেছে ঔপন্যাসিকের ভাষাগত প্রয়োগ ও ব্যবহারের উৎকর্ষতায়। আমার আলোচ্য অন্যান্য উপন্যাসগুলির মতো এই উপন্যাসেও বেশকিছু ধ্বনি ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় যা উপন্যাসটির অঞ্চল ও সেই অঞ্চলের চরিত্রদের তাদের আঞ্চলিকতায় বিশ্বাসযোগ্যতা আনে। প্রথমে উপন্যাসটির ধ্বনিগত বিশেষত্ব দেখা যাক। উপন্যাসে চরিত্রদের মুখের সংলাপে যে শব্দ ব্যবহার দেখি সেখানে 'এ'-কার 'অ্যা'-র মতো উচ্চারিত হয়। 'দেশ' হয়ে

যায় ‘দ্যাশ’। ‘এটা’ থেকে ‘অ্যাটা’, ‘কেন’ থেকে ‘ক্যান’ ইত্যাদি। ‘এ’-কার অনেক সময় ‘ই’-কারের মতোও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- ‘সেটা’ থেকে ‘সিটা’, ‘থেকে’-এর বদলে ‘থিকা’, আবার ‘খুঁজে’ এর বদলে ‘খুঁজি’, ‘গেল’ থেকে ‘গিল’, আর ‘ফেরা’ থেকে ‘ফিরা’। ব্যবহৃত অনেক শব্দের ক্ষেত্রে ‘য’-ফলার ব্যবহার দেখা গেছে। যেমন- ‘ঘুরে’ থেকে ‘ঘুর‍্যে’, ‘করে’ থেকে ‘কর‍্যে’, ‘ঠেলে’ থেকে ‘ঠেল্যে’, ‘মাঠে’ থেকে ‘মাঠ্যে’ ইত্যাদি। ‘ন’ অনেক সময় ‘ল’-এর মতো উচ্চারিত হয়েছে। যেমন- ‘নাচানো’ থেকে ‘লাচানো, ‘নাচ’ থেকে ‘লাচ’। আবার ‘ল’ কখনো ‘ন’-এর মতো উচ্চারিত হয়েছে। যেমন- ‘লাথি’ থেকে ‘নাথি’। যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ আয়াস কাটানোর জন্য স্বরবর্ণ আনয়ন করে উচ্চারণ করার প্রবণতা অর্থাৎ স্বরভক্তির বৈশিষ্ট্য এই উপন্যাসের ভাষাতেও লক্ষিত হয়। যেমন- ‘ধর্ম’ থেকে ‘ধরম’ হয়েছে। শব্দের মধ্যে স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির আগম হয়েছে। যেমন- ‘নাচ-গান’ থেকে হয়েছে ‘নাচনা-গাহানা’। অনেক সময় বাজিকরদের মুখের ভাষায় অভিজিৎ সেন স্বতোনাসিক্যীভবন প্রক্রিয়ার ব্যবহার করেছেন। যেমন- ‘উঁচা’, ভঁইস, হাঁই, ভৈঁসী ইত্যাদি শব্দগুলির ক্ষেত্রে স্বতোনাসিক্যীভবন হয়েছে। লেখক অনেক সময় এদের মুখের ভাষায় অপিনিহিতির ব্যবহার করেছেন। যেমন ‘বাইন্ধে’, ভঁইস ইত্যাদি। ‘ই’-এর উচ্চারণ ক্ষেত্র বিশেষে ‘আ’-এর মতো। যেমন ‘মুরগি’ থেকে ‘মুরগা’। ব্যঞ্জনলোপ বাজিকরদের ভাষার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন- ‘রঙ’, ‘রক্ত’ এদের উচ্চারণে যথাক্রমে ‘অঙ’, ‘অক্ত’ হয়েছে। ‘বর্ণ’ শব্দের উচ্চারণ হয়েছে ‘বন্ন’।এখানে পরাগত সমীকরণ বা সমীভবন হয়েছে।

উপন্যাসের চরিত্রদের মুখের ভাষায় এই সমস্ত ধ্বনিগত বিশেষত্বের পাশাপাশি বেশকিছু রূপতাত্ত্বিক লক্ষণও লক্ষ করা যায় যা মান্য বাংলা থেকে অনেকখানি পৃথক। যেমন, অসমাপিকা ক্রিয়াপদে সময় বিশেষে ‘তে’ বিভক্তির বদলে ‘বা’ বিভক্তি হয়েছে। ‘হাঁটতে’-র পরিবর্তে ‘হাঁটবা’। উত্তম পুরুষে ভবিষ্যৎ কালে ‘হাঁটবি’-র বদলে ‘হাঁটতি’

হয়েছে। সম্বোধনে স্বতোনাসিক্যীভবন হয়েছে। যেমন- 'হাঁই বাপু'। মধ্যম পুরুষে 'তোমার', 'তোর' ও 'তুমি'-র বদলে 'তুমার', 'তুর' ও 'তুমু' সর্বনামের ব্যবহার হয়। সকর্মক ক্রিয়া 'নেয়'-এর বদলে 'লয়' এর ব্যবহার হয়েছে। প্রশ্নবাচক সর্বনাম 'কেমন'-এর বদলে 'কেম্‌কা'-র ব্যবহার হয়েছে। আবার, 'কেন'-এর বদলে 'ক্যান' আর 'কিভাবে'-র বদলে 'কেংকা' বসেছে। 'কোথায়' শব্দের পরিবর্তে হয়েছে 'কুথায়'। নির্দেশক পদের বহুবচনে 'ওগুলো'-র বদলে 'ওলা' আর 'এগুলো'-র পরিবর্তে 'এলা' বসেছে। যৌগিক ক্রিয়া 'মিশিয়ে নেয়' -এর বদলে হয়েছে 'মিশাল কর্যে লয়'। কর্ম কারকে 'কে' বিভক্তির পরিবর্তে 'ৎ' হয়েছে। যেমন, 'মাথাকে' পরিবর্তে হয়েছে 'মাথাৎ'। অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তির পরিবর্তে 'ৎ' যুক্ত হয়। যেমন- 'পূবেৎ', 'পশ্চিমেৎ', 'দেশেৎ', 'রাজমহেলৎ', 'কপালেৎ' ইত্যাদি। অভিজিৎ সেন ধ্বন্যাত্মক যৌগিক ক্রিয়া 'টানা হত'-এর বদলে 'টনটনা হত' ব্যবহার করেছেন। অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তির ব্যবহার হয়েছে। যেমন-'ভূঁয়ে'। অধিকরণ কারকে 'ত' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। ভবিষ্যৎ কালে উত্তম পুরুষে 'যাব'-এর পরিবর্তে 'যামো' হয়েছে। অসমাপিকা ক্রিয়ায় 'এ' বিভক্তির বদলে 'ই' বিভক্তি হয়েছে। যেমন- 'থাকলে'-এর পরিবর্তে 'থাকলি' হয়েছে। উত্তম পুরুষে 'আমরা'-র বদলে হকারীভবন হয়ে 'হামরা' হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ করব, এই উপন্যাসে বর্ণিত বাজিকর জাতির জীবনের চলমানতাকে। খাদ্যের সন্ধানে, জীবিকার প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছে তারা। তাদের জীবনযাত্রা, পোশাক পরিচ্ছদ বেশ-ভুশা, কথাবার্তাতেও পড়েছে সেই আঞ্চলিকতার ছাপ। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোর সূত্রে তাদের চলন বলন বিবর্তিত হয়েছে বারংবার। আমরা যদি তাদের বারংবার স্থানগত পরিবর্তনের এই ভৌগোলিক পরিচয় নিই, তবে তাদের ভাষায়ও সেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভাষাগত প্রভাবে তাদের ভাষাগত বদলের রূপটি খুঁজে পাব। ঔপন্যাসিক শারিবা ও লুবিনির কথোপকথনে বাজিকরদের চলমান ভাষার ইঙ্গিত

দিয়েছেন। লুবিনিকে শারিবা বলছে, ‘কেমকা বুলি ক-ছেন তুই নানি, বুঝা পারি না। ওলা কি হামরাদের আগ্‌লা দ্যাশর বুলি’? এর উত্তরে শারিবা জানায়, ‘না রে, শারিবা। এলা বুলি বাজিকর দ্যাশ দ্যাশ ঘুর‍্যে শিখা লয়। যেথায় ঘুরে সিথাকার বুলি ধর‍্যে লয়’।[৭] উপন্যাসে এই চলমানতার স্থানিক বা আঞ্চলিক পরিচয় পাওয়া যায়। কথকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ঘর্ঘরা নদীর এক বিশাল তীরভূমি অঞ্চল একবার ভূমিকম্পে নদীগর্ভে চলে যায়। এতে বাজিকররা তাদের গোরখপুরের বাসস্থানচ্যুত হয়। সেখান থেকে তারা আসে ঘর্ঘরা নদীর আরও উত্তর তীরে। আবার ওখান থেকে গোয়ালাদের অত্যাচারে উৎখাত হয়ে তাদের দলপতি দনুর আদেশে তারা পূবের দেশে বসতির খোঁজে আসতে শুরু করে। সেখান থেকে ডেহরিহাট, তারপর সিওয়ান, সেখানে কয়েক বছর থেকে যথাক্রমে দানাপুর, পাটনা, মুঙ্গের, রাজমহল, আমুনাড়া, পাঁচবিবি, বারহেট, তিনপাহাড়, সাহেবগঞ্জ হাটবাজারের মতো নানা অঞ্চলে যাবাবর জীবন কাটায়। ঘর্ঘরা নদী বর্তমানে নেপালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। ভারতের মানচিত্রের পরিচয় নিলে বেশ ভালোভাবেই বোঝা যায়, এই অঞ্চলগুলি আদতে হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুর, মালদহের কিছু অঞ্চল, ছোটনাগপুর মালভূমি, ও বর্তমান বাংলাদেশের বেশ কিছু এলাকা। স্বভাবতই তাই এই সকল রাজ্য ও বাংলার সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বাজিকরেরা ব্যবহার করে। পূর্বে তারা যে অঞ্চলে বাস করতো সেই ভাষার সঙ্গে নতুন অঞ্চলে বাস করার সুবাদে নতুন অঞ্চলের ভাষাবৈচিত্র্যও তাদের ভাষায় সংযুক্ত হয়েছে। বাজিকরদের ভাষায় নতুন নতুন শব্দের ব্যবহার হয়েছে তাদের এই স্থানিক চলমানতার সুবাদে। তাই *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসে বাজিকরদের মুখের ভাষায় বরেন্দ্রী ও ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এছাড়াও অনেক প্রাদেশিক হিন্দি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। হিন্দি শব্দ ও বাক্য বাজিকরদের মুখের ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন- বরেন্দ্রী উপভাষার একটি বিশেষ

বৈশিষ্ট্য হল পদের আদিতে ‘র’-এর আগম ও লোপ। এই উপন্যাসে বাজিকরদের মুখের ভাষায় ‘রক্ত’ ও ‘রঙ’ শব্দদুটির ক্ষেত্রে শব্দের আদিতে ‘র’ লোপ পেয়েছে। অনেক সময় ‘অ্যা’ ধ্বনির আগম দেখা যায় বাজিকরদের মুখের ভাষায়। আবার ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য শব্দের সঙ্গে ‘য’-ফলা যুক্ত করার প্রবণতা দেখা যায়। একইসঙ্গে এই উপভাষার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য স্বতোনাসিক্যীভবন প্রক্রিয়াটিও আলোচ্য উপন্যাসের বাজিকরদের মুখের ভাষায় দেখা যায়।

এই উপন্যাসে একটি লক্ষ করার মতো বিষয় হল, অভিজিৎ সেনের শব্দচয়ন ও তার ব্যবহার। বাজিকরদের মুখে অভিনব ধরনের এই শব্দ ব্যবহার তাদেরকে যেন আরও জীবন্ত করেছে। উপন্যাসটিতে ববহৃত নতুন যে শব্দগুলি আমরা পেলাম তা হল - মালাকরা, সিক্কা, বুঢ়া, লয়, সোয়াস্তি, গেহুঁর, তর্‌ক, নাঙ্গা, পরখ, নগরু, ঘাগরা, পারা, বন্ন, জন্মবুঢ়া, দাওয়া, থিতু, বেবাক, পাথার, ওলা, মোছলমান, যেশু, পাছু, পচ্ছিমেৎ, ঘুর‍্যে, সিথায়, তুমার, নসিব, হাল্লা, শুয়ার, হিঁদু, ভিখ্‌মাঙ্গা, কেম্‌কা, গাবতান, ভৈঁসী, টাটু জোয়ান, মাকনা, দাঁতাল, লালকুঠি, আগ্‌লা, নাচ্‌না, করম, বহুৎ, কিসিম, হুজুর, ভেজে (ডেকে), ভাল্লু, ভান্‌মতী, লোলচর্ম, কানিপরা, বান্দর, আওরৎ, মরদ, উস্‌মে, চেংড়া, আদমি, শোচ লিজিয়ে, পুতলা, সিগ্‌লা, ফোক্‌লা, এংকা, মুলুক, ভাল্লু, ভঁইস, উঁচা, কুনঠি (কোথায়), মুরগা, ভোয়ানক, বাইন্ধ্যে, টনটনা, হাঁটবা, তুম্‌দা, ধামসা, হাঁসুয়া, হেজে, মোসায়েব, গোমস্তা, কসরৎ, চৌহদ্দি, কোতোয়ালি, মুদ্দফরাস, হেঁসো, তিনসেরি, বিসোরণ, ডুগডুগ, মেহনত, ঝুলি, টাঙ্গাওয়ালা, মাকনা, এংকা, আঁতকে, বজ্জাত, টাপটাপ, নাঙ্গা, লাগাম, ছোকরা, তিলেক্‌, মাধোয়া, ধাইর্‌, ছোটানি, পাট্টা, অন্তরটিপুনি, বেদখল, আচমকা, সেরেস্তা, গোমস্তা, দগদগে, পঢ়োরে, হের্‌ছি, ফক্‌ড়িরে, শুঁড়ি, কয়াল, লুঠ, হুল্লোড়, হড়, কাঁখে, গোঁজা, হাচকা, পেতল, হামেশাই, বেসাতি, আওরত, জড়িবুটি, জনমভর, আঁতিপাতি, বাঘ-বকরি, বানজারা, দানো, বাজিকরনি, ফাঁদ,

ঘায়েল, তোয়াক্কা, খাতক, সওদা, পারগানা, ঝট, গাঁতিদার, ঘাটোয়াল, গোলদার, পত্তনিদার, এদ্দিন, টাঙ্গা, ঘোড়ি, শিহরন, জানোয়ার, অঢেল, খঁড়, মরদ, লহরে, কামাল, আসমান, কচুকাটা, ফারকাটি, ফলা, বল্লম, ধুতি-পাঞ্চি, কুরবানি, ঘোড়া জিন, দানা, ঢিবি, লেজুড়, ভুঁইয়া, তুরি, মাল, মাহালি, লোহার, কোল কামার, খোয়াব, টাঙ্গন, এংকা, আঁতকে, বজ্জাত, টাপটাপ নাঙ্গা প্রভৃতি। এছাড়াও ব্যক্তির নামকরণের ক্ষেত্রেও বেশকিছু অভিনবত্ব দেখা যায়।

ঔপন্যাসিক বাজিকর চরিত্রের যে যে নামাঙ্কন করেছেন ভাষাগত তাৎপর্যে তারা যথার্থই বাজিকর জনজাতি হিসাবে বিশ্বস্ত হয়েছে। অভিনব নামগুলির মধ্যে আমরা ঔপন্যাসিকের ব্যবহারে যেগুলি দেখতে পাই তা হল, দুর্গি, পেমা, হাড়মা, দেদোন, জামির, বদিউল, চেতা, সালমা, পরতাপ, জিল্লু, দুলদুলি, পীতেম, শারিবা, গোকো, বালি, ধন্দু, দনু, পুরা, পালি, ডুমকা, পীথা, পতিত সাউ, পিয়ারবক্স, চেতন মাঝি, রোহীন, বিষেণ ঠাটারি ইত্যাদি। স্থান নামের মধ্যেও ভাষাগত বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ডেহ্‌রিঘাট, সিওয়ান, আনামুড়া, পাঁচবিবি, হিঙ্গল, জামিলাবাদ, বহেরা, দিঘি, গোমানী, ঘোষা, মন্দার পাহাড়, পিয়ালাপুর, পীরপৈঁতি, কাটিহার, বারাউনি, দামিন-ই-কোতে ইত্যাদি স্থান নামগুলি।

৪.১.৩ *রসিক* :

রসিক উপন্যাসের স্থানিক প্রেক্ষাপট সেই উপন্যাসে ব্যবহৃত উপভাষাকে সমর্থন করে তা বাস্তবের ওই অঞ্চল ও ওই অঞ্চলের চরিত্রের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি। এই নৈপুণ্যই সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মুনশিয়ানার পরিচয়। এবার আসা যাক উপন্যাসটির ভাষাগত বিশ্লেষণে। কেন্দ্রীয় ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে উপন্যাসটিতে চরিত্রের মুখের ভাষায় ধ্বনিগত বেশ কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। যা মান্য বাংলা ঘেঁষা নয়। এর মধ্যে রয়েছে তাদের নিজস্ব ভাষাছাঁদ।

এদের ব্যবহৃত বেশ কিছু শব্দ যেমন ‘রসক্যালি’, ‘ছেল্যা’, ‘শ্যাঁষকালে’ শব্দের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ‘অ’ বা ‘এ’ যথাক্রমে ‘অ্যা’-র মতো উচ্চারিত হয়েছে। ‘ধর্না’ শব্দটি ‘ধন্না’-র মতো উচ্চারিত হয়েছে। এখানে পরের ‘ন’ ধ্বনির প্রভাবে তার আগের ‘র’ ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে ‘ন’ হয়েছে। এখানে পরাগত সমীভবন হয়েছে। ‘নাকছাবি’ শব্দটিতে ধ্বনিগত বদল লক্ষ করা যাচ্ছে। ‘নাকচাবি’ শব্দের ‘চ’-র উচ্চারণ ‘ছ’-এর মতো হয়েছে। শিষ্ট চলিতের ‘নাচনি’, ‘নয়’, ‘নিয়ে’, ‘নম্বর’, ‘নিবাস’ শব্দগুলি উপন্যাসের সংলাপের ভাষায় যথাক্রমে ‘লাচনি’, ‘লয়’, ‘লিয়ে’, ‘লম্বর’, ‘লিবাস’ হিসাবে উচ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ ‘ন’ ধ্বনি ‘ল’-ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়েছে। এই উপন্যাসে ‘বেটি’, ‘যে’, ‘সেদিন’, ‘শেখাও’, ‘এখানে’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘বিটি’, ‘যি’, ‘সিদিন’, ‘শিখাও’, ‘ইখানে’ শব্দগুলির ব্যবহার দেখা যায়। এখানে ‘এ’-র উচ্চারণ ‘ই’ হয়েছে। ‘বলিতে’, ‘গেছে’, ‘রাখিবে’, ‘বলিছে’, ‘পয়সা’-প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যস্থিত ‘ই’ ধ্বনি আগে থেকে উচ্চারণের ফলে উপন্যাসের সংলাপে ব্যবহৃত একই শব্দগুলিতে অপিনিহিতির ব্যবহার হয়েছে। স্বভাবতই অপিনিতির প্রয়োগে শব্দগুলি বদলে গিয়ে যথাক্রমে ‘বইলতে’, ‘গেইছে’, ‘রাইখবে’, ‘বইলছে’, ‘পইসা’ হয়েছে। ‘বটে’ শব্দের বদলে ‘বঠে’ শব্দের উচ্চারণে মহাপ্রাণীভবনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ‘ও’ স্বরধ্বনি কখনো ‘অ’-এর মতো, আবার কখনো ‘উ’-এর মতো উচ্চারিত হয়েছে। যেমন- ‘ডোম’, ‘কোনো’, ‘লোক’, ‘চোখ’ রূপান্তরিত হয়ে ‘ডম’, ‘কন’, ‘লক’, ‘চখ’ হয়েছে। আবার, ‘বোনঝি’, ‘ওটি’ বদলে গিয়ে হল ‘বুনঝি’, ‘উটি’। ‘লাথি’ থেকে ‘লাথ’, ‘দিনটা’ থেকে ‘দিনট’ শব্দের ব্যবহারে ‘ই’ ও ‘আ’ লোপ হয়েছে। আদতে এখানে স্বরলোপ হয়েছে। ‘মুখে’ শব্দটি উপন্যাসের সংলাপে ‘মুহে’, ‘কোনো’ শব্দটি ‘কন্‌হ’, ‘গোয়াল’ শব্দটি ‘গোহাল’ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে শব্দদুটির ক্ষেত্রে কোথাও ‘হ’-এর ব্যবহার না থাকলেও ‘হ’-এর আগম ঘটায় ‘হ-কারীভবন’ হয়েছে। শব্দের মধ্যে কোনো নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার ছাড়াই

স্বরধ্বনি যখন আপনা-আপনি আনুনাসিক হয়, তখন তাকে স্বতোনাসিক্যীভবন বলে। উচ্চারণের ক্ষেত্রে এই স্বতোনাসিক্যীভবন প্রক্রিয়াটি এই উপন্যাসের চরিত্রের মুখের ভাষাতেও ঘটেছে। যেমন- 'ডাঁটেছি', 'পাঁয়ে', 'শ্যাঁষকালে', 'বাগায়েঁ', 'লিঁয়ে', 'তুঁ', 'হঁয়ে', 'মাতাইঁ', 'হঁ', ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগে এই ধরনের স্বতোনাসিক্যীভবন প্রক্রিয়া দেখা যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে ঘোষ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন ধ্বনি রক্ষিত হয়েছে। যেমন- 'গোহাল', 'ছোগরা' ইত্যাদি ধ্বনিতে এই ব্যবহার দেখা যায়।

'প্রথম' ও 'ফ্লুট'-এর পরিবর্তে উপন্যাসে ব্যবহৃত 'পরথম' ও 'ফুলুট' শব্দদুটি উচ্চারণের সময় সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মাঝে নতুন স্বরধ্বনি এনে উচ্চারণ করার প্রবণতা দেখা গেছে। 'প্রথম' শব্দে 'অ' ও 'ফ্লুট' শব্দে 'উ' স্বরধ্বনি এনে 'প্র' ও 'ফ্লু' যুক্তব্যঞ্জন দুটিকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে। তাই এটি স্বরভক্তির উদাহরণ। 'শরীর', 'নিয়ে', 'নেশা' ও 'নাচ' শব্দের উচ্চারণ 'শরীল', 'লিঁয়ে', 'লিশা' ও 'লাচ' হয়েছে। এখানে 'র' ও 'ন'-এর উচ্চারণ অনেকটা 'ল'-এর মতো হয়েছে। 'প্রাশ্চিত্ত' শব্দটি 'প্রাশ্চিত্তির' রূপে প্রযুক্ত হয়েছে। 'প্রাশ্চিত্ত' শব্দের 'ই' স্বরধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনিও পরিবর্তিত হয়ে 'ই' স্বরের সঙ্গে সঙ্গতি তৈরি করে 'প্রাশ্চিত্তির' হয়েছে। এইটি স্বরসঙ্গতির উদাহরণ।

আবার, শুধুমাত্র ধ্বনিগত নয়, রূপগত বেশকিছু পরিবর্তন এই উপন্যাসের সংলাপের ভাষায় লক্ষ করা যায়। নঞর্থক শব্দ হিসাবে 'না'-এর পরিবর্তে 'ন'-এর প্রয়োগ দেখা যায়। আর সাধারণ বর্তমানে ক্রিয়ার সঙ্গে নেতিবাচক শব্দ হিসাবে 'নি' এর পরিবর্তে 'নাই' -এর ব্যবহার হয়েছে। 'হবেক', 'বইললেক' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের শেষে 'ক' ধ্বনির প্রয়োগ করা হয়েছে। উত্তম পুরুষের বর্তমান কালে 'পারি' শব্দের বদলে হয়েছে 'লারি'। উত্তম পুরুষে ঘটমান বর্তমান কালে 'বলছি' ক্রিয়াপদের বদলে 'বলত্যেছিলি' বসেছে। অসমাপিকা ক্রিয়ায়

‘নিয়ে’, ‘খেলে’, ‘পেতে’, ‘বানিয়ে’ ক্রিয়ার রূপে ‘লিয়ে’, ‘খাইলে’, ‘পাত্যে’, ‘বনায়েঁ’ হয়েছে। পুরাঘটিত বর্তমান কালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ ‘রেখেছি’-র বদলে হল ‘রাখ্যেছি’। ‘দিলাম’ পরিবর্তিত হয়ে ‘দিল্যম’ হয়েছে।

রসিক উপন্যাসের সংলাপে ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বিশেষত্বের যে সমাবেশ তা সিংভূম–মানভূম অঞ্চলের ঝুমুর শিল্পীদের। ঔপন্যাসিক শুধুমাত্র বর্ণনা বা সাংবাদিকতার আদল নিয়ে তাঁদের জীবনকে হাজির করেননি। একেবারে তাদের কথা তাদের ভাষায় হাজির করলেন। আমাদের দেখা জগতের অন্তরালে আরেকটা যে না দেখা জগত থাকে যা আমাদের চোখের বাইরে অথচ নির্মম সত্য তাকেই যেন হাজির করলেন তিনি। অর্থাৎ ঐতিহাসিক বা সাংবাদিকের থেকে শিল্পীর যেখানে চূড়ান্ত শক্তি সেই শক্তিকেই প্রয়োগ করলেন ঔপন্যাসিক। এই শক্তির অনেকটাই বীজ ভাষায়। তাদের ভাষায় তাদের দুঃখ পাঠককে যেমন বিশ্বাসযোগ্য ও আকৃষ্ট করে তেমনি লেখককে করে শক্তিমান। এর কারণ যদিও ঔপন্যাসিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভাষা জ্ঞান। এই উপন্যাসে তার যথাযথ প্রয়োগ করেছেন শিল্পী। স্বভাবতই ঔপন্যাসিক ও তাঁর উপন্যাস দুইই সার্থক হয়েছে।

৪.১.৪ *আড়কাঠি* :

আড়কাঠি উপন্যাসেও ভগীরথ মিশ্র শিষ্ট চলিতের থেকে সতর্ক থেকেছেন। বাঁকুড়ার গজাশিমুল গ্রামের লোকশিল্পের ও শিল্পীদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে অতিক্রম করেননি। প্রান্তিক ওই মানুষগুলোর মুখের ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন প্রথমে। তারপর তাদের কথাকে, অব্যক্ত বেদনাকে উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন। মান্য বাংলার এই উপন্যাসে প্রান্তিক এই মানুষজনের কথা তিনি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অন্ত্যেবাসীর ভাষাতেই

প্রয়োগ করেছেন। এই উপন্যাসের প্রান্তিক জনজাতির মুখের ভাষা পর্যায়ক্রমে লক্ষ করলে বেশ কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাবে যা মান্য বাংলা তো বটেই এমনকি অপর অঞ্চলের আঞ্চলিকতার সঙ্গে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে।

রসিক-এর মতো এই উপন্যাসেও আঞ্চলিক ধ্বনি বৈচিত্র্য পাই। এখানে আমরা দেখতে পাই গজাশিমুলে প্রচলিত আঞ্চলিক উপভাষা। এই গ্রামের বসবাসকারী জনজাতির উপভাষায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরসঙ্গতির ব্যবহার হয়েছে। যেমন- 'রুক্ষ' থেকে 'রুক্ষু'। 'ও'-এর উচ্চারণ 'উ'-এর মতো হয়েছে। 'কোনো' হয়েছে 'কুনো'। *রসিক*- এর মতো এখানেও অপিনিহিতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন- 'খুঁইজে', 'আইজ্ঞা', 'কইলক্যাতা' শব্দগুলিতে শব্দমধ্যস্থ 'ই' আগে থেকে উচ্চারণের প্রবণতা রয়েছে। 'কেষ্ট' থেকে 'কিষ্টো' ধ্বনি পরিবর্তনে 'এ'-এর উচ্চারণ 'ই'-এর মতো হয়েছে। আগের মতোই স্বতোনাসিক্যীভবন ঘটেছে 'ভুঁয়াশ', 'হুঁক্‌রাচ্ছিল', ভোঁসল ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রে। 'ক' অঘোষ ধ্বনি 'গ' ঘোষ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে 'ছোকরা-ছুকরি' 'ছগরা-ছুগরি'তে পরিণত হয়েছে। এখানে 'ও'- কে 'অ'–স্বরধ্বনির মতো উচ্চারণ করার প্রবণতাটিও দেখা যাচ্ছে। শব্দের সঙ্গে অহেতুক 'য'-ফলা যোগ করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যেমন- 'সেখানে', 'মোদেরকে'-এর বদলে হল 'সিখ্যেনে' ও 'মোদ্যারকে'। অনেক ক্ষেত্রে 'এ', 'অ্যা'-এর মতো উচ্চারিত হচ্ছে। 'পত্র' শব্দটি স্বরভক্তির ফলে 'পত্তর'-এ পরিণত হয়েছে। 'মোরা' থেকে 'মেয়া', 'জিজ্ঞাসা' থেকে 'জিগাও' শব্দের ব্যবহারে একইসঙ্গে স্বরলোপ ও ব্যঞ্জনলোপ হয়েছে। 'ন' আগের মতোই 'ল'-রূপে উচ্চারিত হয়েছে। যেমন- 'নাচ' থেকে হল 'লাচ', 'নিজেদের' হয়ে গেল 'লিজেদ্যার'। আবার 'নতুন' থেকে 'নৈতুন' শব্দ প্রয়োগে 'অ' কখনো কখনো 'ঐ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে। 'উ'-কার 'ও'-কারে পরিণত হচ্ছে। যেমন- যুবতী> যোবতী, কিছু> কিছো। অনেক সময়

উচ্চারণের সুবিধার্থে ব্যঞ্জন লোপ ঘটেছে। যেমন- ‘মুক থুবড়ে’ দুটি শব্দের মধ্যে ‘ক’ লোপ পেয়ে ‘মুথুবড়ে’ একটি শব্দে পরিণত হয়েছে।

এই উপন্যাসের রূপতাত্ত্বিক বিশেষত্বগুলিও বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। ঔপন্যাসিক সংলাপের ভাষার ক্ষেত্রে যে রূপগত বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করেছেন উপন্যাসের শিল্পের খাতিরে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সাদৃশ্যবাচক শব্দে সাধারণ ধর্ম বোঝাতে ‘মতো’ এর পরিবর্তে হল ‘পারা’ শব্দের ব্যবহার *রসিক*-এও লক্ষ করেছি। প্রথম পুরুষের বহুবচনে ‘তাদের’ শব্দের পরিবর্তে ‘তুয়াদার’ শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে। এই ‘তা’ পদের পরিবর্তে ‘তুয়া’ শব্দের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। ঝাড়খণ্ডী উপভাষার উচ্চারণে এই দ্রাবিড় ঘেঁষা শব্দের ব্যবহার ব্যতিক্রমী একটি দৃষ্টান্ত। এক্ষেত্রে উপন্যাসের বসু-শবর নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট ভাষাব্যবহারের প্রবণতার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। মধ্যম পুরুষের বহুবচনে ‘উয়া’ পদটি যুক্ত হয়ে ‘ওদের’ হয়ে যায় ‘উয়াদ্যার’। উত্তম পুরুষের বহুবচনে ‘আমাদের’ হয়ে যায় ‘আমাদ্যার’। উত্তম পুরুষের কর্তা ‘তোমাকে’-এর পরিবর্তে হল ‘তুমাকে’। প্রথম পুরুষের বহুবচনে ‘ওরা’ বা ‘উহারা’-র বদলে ‘উয়ারা’ হয়েছে। অনেক সময় ক্রিয়াপদের শেষে ‘ক’ প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন- ‘চিনবেক্’। ঘটমান বর্তমান কালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়া ‘বলছি’-র বদলে ‘বলতিছি’। অস্ত্যর্থক ‘আছ্’ ধাতুর বদলে ‘বট’ ধাতুর ব্যবহার হয়েছে। ‘হে’, ‘হাই বাপ’ কথার মাত্রা হিসাবে বারংবার এসেছে। যৌগিক ক্রিয়া ‘জিজ্ঞাসা কর’ এখানে একক ক্রিয়া ‘জিগাও’-এ পরিণত হয়েছে। অসমাপিকা ক্রিয়া ‘নিয়ে’, ‘নিলে’ যথাক্রমে ‘লিয়ে’, ‘লিল্যাক’-এ পরিণত হয়েছে।

এই দুটি উপন্যাসের সংলাপের ভাষায় এই বৈশিষ্ট্যগুলি দেখে আমরা বুঝতে পারি এই দুটি উপন্যাসে পৃথক দুই ঔপন্যাসিকের উপভাষার ব্যবহারে কতগুলি মূলগত বিশেষত্ব

রয়েছে। আর এই মূলগত বিশেষত্বগুলি আসলে ঝাড়খন্ডী উপভাষার। আনুনাসিকতার ব্যাপক ব্যবহার, পদান্তে 'ইআ' বা 'অ্যা' ব্যবহার, নামধাতুর ব্যবহার, অস্ত্যর্থক 'বট' ধতুর ব্যবহার ইত্যাদি লক্ষণগুলি ঝাড়খন্ডী উপভাষারই বৈশিষ্ট্য। ভগীরথ মিশ্র ও সুব্রত মুখোপাধ্যায় আলোচ্য দুটি উপন্যাসের চরিত্রের মুখের ভাষায় যে ঝাড়খন্ডী উপভাষা ব্যবহার করেছেন তা যথেষ্টই প্রাঞ্জল ও জীবন্ত। উভয়েই তাঁদের উপন্যাসের চরিত্রদের মুখের ভাষা ব্যবহারে উপযুক্ত বিশ্বস্ততা অর্জন করেছেন। এখানেই এই দুই ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব। তবে মূলগতভাবে উপভাষা প্রয়োগের মিল থাকলেও স্বতন্ত্র দুই ঔপন্যাসিকের দুই সৃষ্টিতে বেশ কিছু সূক্ষ্ম মৌলিক পার্থক্যও দেখা যাবে। এক্ষেত্রে তাদের দুজনের পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীগত বদল থেকে তৈরি হয়েছে এই স্বাতন্ত্র্য। সেই বিষয়টি অবশ্য দুই লেখকের দুই পৃথক ভাষাশৈলী, বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গিগত বদল।

ঝাড়খন্ডী উপভাষাটির নামকরণ করেছেন ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়। কিন্তু সুধীর কুমার করণ এই উপভাষাটিকে বলতে চান 'সীমান্ত রাঢ়ী'। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন এর নামকরণ করেছেন 'সুহ্মদেশীয়' বা 'সুহ্মক' বাঙলা।[৮] তবে ভাষাবিদ পরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *বাংলা ভাষা পরিক্রমা* (১ম খণ্ড)- তে জানিয়েছেন, এই ঝাড়খন্ডী উপভাষা মোটামুটিভাবে রাঢ়ি উপভাষার মতোই। তিনি আরও জানান, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ভাষার সঙ্গে নাকি ওড়িয়া ভাষারও কিছু কিছু মিল বা সাদৃশ্য রয়েছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, *রসিক* ও *আড়কাঠি* উপন্যাসের ব্যবহৃত উপভাষা মূলত ঝাড়খন্ডী হলেও এর ভিতরে ভিতরে রয়েছে রাঢ়ি ও ওড়িশার বেশকিছু ভাষার নমুনা।

৪.২ সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে ভাষাবৈচিত্র্য

সামাজিক স্তরভেদে জনসমষ্টির ভাষায় কিছু পৃথক রূপ গড়ে ওঠে। আমার আলোচ্য প্রত্যেকটি উপন্যাসে স্বতন্ত্র সামাজিক স্তরভেদে বিশেষ বিশেষ জনসমষ্টির ভাষার এই আলাদা আলাদা রূপকে ঔপন্যাসিকেরা দেখিয়েছেন। তাই এবার সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে লোকশিল্পনির্ভর উপন্যাসগুলির ভাষাগত বৈচিত্র্যকে লক্ষ করব। ভাষা এমনই একটা বিষয় যা মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ সাধনের কাজ করে চলেছে নিরন্তর। এ বিষয়ে ভাষাবিদ পবিত্র সরকার সমাজভাষার একজন বিশেষজ্ঞ ফিশম্যানের সমাজভাষা সম্পর্কিত সংজ্ঞাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ফিশম্যানের মতে-

> The sociology of language focuses upon the entire gamut of topics related to social organization of language ugage per se but also language attitudes, overt behaviour towards language and towards language users.[৯]

সমাজ ভাষা আমাদের সামাজিক গঠনগত বিভিন্ন দিকের সঙ্গে সংযুক্ত। মানুষের ভাষা ব্যবহার কোনো ভাষা গোষ্ঠী সম্পর্কে ও সামাজিক মানুষের মনোভাবকে জানান দেয়। আমার নির্বাচিত লোকশিল্পনির্ভর উপন্যাসগুলিতে ভাষার সমাজতাত্ত্বিক নানা দিকের খোঁজ পাওয়া যায়। লোকশিল্প নির্ভর এই উপন্যাসগুলির চরিত্রদের মুখের ভাষা, সংলাপ, কথকের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য, লোকশিল্পের ভাষা থেকে সেই সঙ্গে অন্বিত সংশ্লিষ্ট লোকশিল্পীদের সমাজ, শ্রেণি, মানসিক গঠন, লোকশিল্পের অবস্থান, জাতিগত, ধর্মগত, লিঙ্গগত, নৃতাত্ত্বিক দিক, বয়স, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলি জানা যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে প্রথমেই সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রাথমিক সূত্রটি এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক। সমাজভাষা বিষয়ে আলোচনায় ফিশম্যানের প্রাথমিক সূত্রটিকে এক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে।

জশুয়া ফিশম্যান (১৯২৬-২০১৫) সমাজভাষাকে তিনটি স্তরে বিশ্লেষণ করেছেন।[১০] সেই স্তরগুলি হল- বর্ণনাত্মক (Descriptive), পরিবর্তমান (Dynamic) ও ফলিত (Applied)। সমাজভাষার বর্ণনাত্মক স্তরের মধ্যে রয়েছে বক্তা, শ্রোতা ও উপলক্ষ্যের উপর ভাষার বৈচিত্র্য। ক্ষেত্র, প্রসঙ্গ ও রীতি অনুযায়ী ভাষা ব্যহারের বৈচিত্র্য হল রেজিস্টার।

বর্ণনামূলক সমাজভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সংকেত বাছাই। ভাষার সমাজতত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছেন এমন একজন বিশিষ্ট ভাষাবিদ ফিশম্যান অবস্থা অনুসারে সংকেত পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন। এখানে একাধিক পরিবর্ত উপাদান থাকে। এক্ষেত্রে সাধারণত একটি সংকেতই ব্যবহার করা হয়। বক্তার ইচ্ছে অনুসারে অবস্থা না বদলালেও সংকেত পরিবর্তন করে। ভাষাবিদ গামপার্জ এই পরিবর্তনকে বলেন 'অবস্থানুসারে পরিবর্তন'[১১] (Situational Switching)। এখানে সংস্কৃতি বা সামাজিক অনুষঙ্গও সংকেতের সঙ্গে মিশে থাকে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসে আলকাপদলের লোকশিল্পীদের মুখের ভাষায় এই 'অবস্থানুসারে পরিবর্তনে'র বিষয়টি দেখা যায়। তারা জনসাধারনের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলে সেই প্রত্যক্ষ প্রাঞ্জল ভাষায় আলকাপ দলের সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে কথা বলে না। বাইরের সমাজের কাছ থেকে স্বেচ্ছায় তারা কিছু গোপনীয়তা তৈরি করে। তাদের ভাষায় একধরনের আড়াল তারা নির্মাণ করে। এই গোপনীয়তা তারা কখনোই প্রকাশ্যে বা সর্বসমক্ষে করবে না। অনেকক্ষেত্রে আকারে-ইঙ্গিতে, এমনকি প্রায় ভাষায় (para language) এরা কথা বলে। আলকাপ দলের ঝাঁকসা ওস্তাদকে সেই দলেরই ছোকরা শান্তি কটাক্ষ করে বলছে,

> অত ভক্তি ক্যানে গো ওস্তাদজী? জবাই করবে নাকি মোল্লার মুরগিটা? করো না – গলাটা পেতেই রেখেছি কবে থেকে। [১২]

এই কথায় শান্তির 'চপল চোখের নাচ' আদতে ওস্তাদের ইশারা বা প্রায় ভাষা। এই প্রায় ভাষার বাস্তবানুগ ব্যবহারে সিরাজ সফল। এতে যেমন চরিত্রগুলো প্রাণবন্ত হয়েছে তেমনি উপন্যাসের কাহিনিগত টান বৃদ্ধি পেয়েছে। আরেকটি অন্যরকম উদাহরণে আসা যাক,

> গর্জে উঠেছে হঠাৎ, চুপ, শালার ব্যাটা শালা! ... তারপর ফের হাসি- হো হো হো ![১৩]

আলকাপের ছোকরা সম্পর্কে এরা বলছে 'কালসাপ'।

> ফজল রান্নাঘরের দিকে কয়েক পা এগিয়ে বলে, খিল এঁটে শুয়ে পড়ুক ঘরে। আর বাইরে ক্যানে? পালটা জবাব আসে। ...যে দোজখে যায়, সে যাক। আবার কথা ক্যানে?[১৪]

আসলে না-নারী না-পুরুষ ছোকরাদের নিয়ে আলকাপদলের পুরুষদের মধ্যে সমাজ অনুমোদিত কাজকর্ম ও স্বেচ্ছাচারিতা যে চলে ঔপন্যাসিক তাকেই ইঙ্গিত করেছেন এই গোপন ভাষাগত ইঙ্গিতের মাধ্যমে।

একজন সুদক্ষ আলকাপ শিল্পী হিসাবে এই শিল্প ও সংস্কৃতির একেবারে নিজস্ব পরিভাষার প্রয়োগ করেছেন সিরাজ। যেমন – ধিঙ্গি ছোকরা, কাপ, ধুয়া, দোহারকি, খেমটা, রঙ, সঙ, সঙ্দার, ওস্তাদ, চালান, কপে, পাশকপে, কপেমি, বাবরী চুল, প্যালা তোলা, তবলা ফাঁসানো, পাল্লা ধরা, কম্ফোর্টার, ছ্যাবলামি, ইত্যাদি। আলকাপ শিল্পে ব্যবহৃত এই সমস্ত পারিভাষিক শব্দগুলির মাধ্যমে আলকাপ শিল্পীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পাওয়া যায়।

সমাজভাষা বিজ্ঞানের বর্ণনামূলক স্তরে স্ট্যাণ্ডার্ড (Standard) ও নন-স্ট্যাণ্ডার্ড (Non-standard) ভাষার দু'দিক নিয়ে আলোচনা হয়। মান্য ভাষার (Standard) সাপেক্ষে সেই ভাষার বৈচিত্র্যরূপগুলি বলা হয় নন-স্ট্যাণ্ডার্ড (Non-Standard)। *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসে

কথকের অংশটুকু ছাড়া চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে লেখক সিরাজ নন-স্ট্যাণ্ডার্ড (Non-Standard) ভাষাকেই ব্যবহার করেছেন বেশি। এটা উপন্যাসের সাপেক্ষে খুব জরুরী ছিল। প্রথম সারির ঔপন্যাসিক হিসাবে সিরাজের এই ভাষাজ্ঞান অত্যন্ত প্রখর। আলকাপ শিল্পীদের তথাকথিত শিল্প–সংস্কৃতিময় ভদ্র সমাজে অপাংক্তেয় ও ব্রাত্য বলে পরিগণিত হত। আজও হয়। ভদ্র সমাজের আসরে এদের স্থান হয় না। শোনা যায়, বেলেল্লাপনা করে এই আলকাপ শিল্পীরা। ভদ্র সমাজের চৌহদ্দির বাইরে বহিষ্কৃত এই শিল্পের শিল্পগত ভাষা ও শিল্পীদলের গোপনীয় ভাষা তথাকথিত মান্য উপভাষার সাপেক্ষে অনেক ক্ষেত্রে যেন সম্ভ্রমহীন। তথাকথিত ‘ব্রাত্য’ হিসাবে পরিগণিত আলকাপ শিল্পীগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে ব্যবহৃত স্ল্যাং-এর উল্লেখ রয়েছে এই উপন্যাসে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঝাঁকসা ওস্তাদ ও ফজলের কথোপকথনে কখনো কখনো তারা কিছু স্ল্যাং ব্যবহার করেছে। এই উপন্যাসে ব্যবহৃত মান্য চলিত ভাষার সাপেক্ষে এই ধরনের স্ল্যাং-কে কিছুটা অপভাষা হিসাবে দেখিয়ে সিরাজ আলকাপশিল্পীদের সামাজিক অবস্থানের বাস্তব দিক শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপন করেছেন। আলকাপ দলের ফজলকে ঝাঁকসা বলেছে-

> কাল সাঁঝমে শালী শান্তিকা সাথ জোড় লাগিস। ... হাঁ। কুত্তা-কুত্তীন য্যায়সা হো যায়। ফজলা, উসকী হাম জান মার দেতে।[১৫]

এই কথা শুনে ফজল কানে হাত দিয়ে কান ঢেকে জানায়,

> ...আ ছি ছি! চুপ কর ওস্তাদ। হামার ঘেন্না লাগে, হামার খারাপ লাগে।[১৬]

এছাড়াও সিরাজ অনেক স্ল্যাং শব্দের ব্যবহার করিয়েছেন যা শিল্পীদলের সংলাপের স্বাভাবিক বিষয়। যেমন- ‘শালার ব্যাটা শালা’, হারামী জাত, কুত্তা, শালীকো, মাগমরদ, শালাশালী, ঢ্যামনা সাপ, বাঞ্চোৎ ইত্যাদি।

অনেক সময় এক ভাষার জনগোষ্ঠী অন্য অঞ্চলে কাজ করতে যায়, তখন সেই জনগোষ্ঠীর ভাষা-ভাণ্ডারের গঠনগত পরিবর্তন ঘটে। এক্ষেত্রে গোষ্ঠী বিশেষ পূর্বের অঞ্চলে ব্যবহৃত শব্দকে নতুন অঞ্চলে এসেও বলতে থাকে। একই সঙ্গে তারা নতুন অঞ্চলের মানুষের ব্যবহৃত শব্দও ব্যবহার করে। অভিজিৎ সেনের *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসে বাজিকরদের ব্যবহৃত ভাষায় এই ধরনের ভাষাগত ব্যবহার দেখা যায়। একে সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের ফিশম্যানের মত অনুযায়ী স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা বলা যায়। যেমন- 'ভিখ্ মাঙ্গার কাম', 'বহুৎ কিসিমের', 'নেহি মালকিন', 'আদমি' ইত্যাদি হিন্দি শব্দগুলি বাজিকরেরা গোরখপুরে, রাজমহলে, পাটনায় থাকাকালীন সময়ে অনায়াসে ব্যবহার করতো। কারণ এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষের ব্যবহৃত ভাষা মূলত হিন্দি। স্বাভাবিকভাবে, সেই সমস্ত অঞ্চলে বসতির সুবাদে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের ভাষা হিসাবে হিন্দি শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার দেখা যায় বাজিকরদের ভাষায়। আবার, মালদা, নমনকুড়ি, রাজশাহীতে বাস করার কারণে বাংলা ভাষার উপভাষা বরেন্দ্রীর প্রভাবে তারা কখনো বলে,

> চোখ্‌ত পানি ক্যান বাপ'? আবার কখনো তাদের বলতে শোনা যায়, 'পীতেম হে, পীতেম, পুবের দেশে যাও বাপ। সিথায় তুমার নসিব।[১৭]

এই সমস্ত বাক্য দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বাজিকরদের মৌখিক বাংলা ভাষার ব্যবহারে হিন্দি ভাষার বেশকিছু প্রয়োগ ও প্রভাব এসে পড়েছে। স্বভাবতই বাজিকরেরা পূর্বের ভাষা আর নতুন ভাষা একই সঙ্গে বলে যায়। এইভাবে বাজিকরদের হিন্দি মিশ্রিত বাংলা বুলি তো আদতে স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতাকেই পরিচয় করায়। বাজিকরদের ভাষা মিশ্রণ বা দ্বিভাষিক রূপটির বাস্তবিক চেহারা ঔপন্যাসিকের নজর এড়ায়নি। তিনি তাঁর শিল্পদক্ষতায় বাস্তবের কাহিনির মতো তাদের মুখের ভাষাকেও এভাবে প্রতিস্থাপন করে একেবারে প্রাণবন্ত করে তুললেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অনেক সময় দেখা যায় দুটি ভিন্ন ভাষার সংযোগের ফলে একধরনের মিশ্র জাতীয় বুলির উদ্ভব হয়। ভাষাবিজ্ঞানীরা এই ধরনের মিশ্র ভাষাকে 'পিজিন' বলেছেন। ভাষাবিদ পবিত্র সরকার এই মিশ্র ভাষাকে বাণিজ্যবুলিও বলেছেন।[১৮] *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসে বাজিকরদের ব্যবহৃত ভাষায় মিশ্রণের ফলে এই ধরনের পিজিন জাতীয় মিশ্র শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বাজিকরেরা গোরখপুর, রাজমহল, পাটনা অঞ্চলে থাকাকালীন হিন্দি ভাষাই ব্যবহার করত। কারণ- সর্বজ্ঞ কথক পাঠককে জানিয়ে দেন, বাজিকরেরা যেখানে ঘোরে সেখানকার বুলি শিখে নেয়। এবার পরবর্তী সময়ে যখন তারা বাংলার বিভিন্ন প্রদেশে এসে বসতি গড়ে সেসময় তারা বাংলা ভাষাও আয়ত্ত করে। তবে, বাংলাভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে হিন্দি ভাষার ব্যবহারও পুরোপুরি ছাড়ে না। তাই হিন্দি ও বাংলা মিশ্রিত হয়ে এক ধরনের মিশ্র ভাষা পিজিন তৈরি হয়। থানায় দারোগার সামনে বাজিকরদের যখন বলতে শোনা যায়,

> জী হুজুর, আমরা বাউদিয়া-বাজিকর বটি। জী মালিক, হামার নাম পীতেম বাজিকর। দলে পাঁচকুড়ি পাঁচজনা আদমি আছে। উস্‌মে শোচ লিজিয়ে দেড়কুড়ি মরদ, দেড়কুড়ি আওরৎ আর বাকি সব চেংড়া-বাচ্চা।[১৯]

সমাজভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ভাষা সংযোগ বা Language Contact। এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার মিশ্রণে সমাজভাষার উন্নতি হয়। এই ভাষা সংযোগ হয় মূলত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক গ্রহণ-প্রতিগ্রহণের মাধ্যমে। যেমন- *আড়কাঠি* উপন্যাসের অধ্যাপক রাজীব বাঁকুড়ার গজাশিমুল অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিকে শিক্ষিত মানুষের সামনে তুলে ধরেছিল। লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতির সূত্রে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট লোকশিল্পের পারিভাষিক শব্দের সংযোগ তৈরি হচ্ছে মান্য বাংলা রাঢ়িতে। এখানে এই যোগসূত্র তৈরি হয় রাজীবের হাত ধরে। যেমন- মান্য বাংলায় শিকার নৃত্য, গুঁড়িঝাড়া(ঝিরঝির বৃষ্টি),

পিঁজরা(পাঁজর), সেঁধায়, কটু(কচ্ছপ), কাঁক্‌ড়া, সাদা-কাঁক্‌ড়া ইত্যাদি শব্দব্যবহার করেছে অধ্যাপক রাজীব। সে মান্য চলিত ভাষায় কথা বলে অথচ বসু-শবর জনজাতির ব্যবহৃত শব্দগুলি ব্যবহার করছে। এখানে মান্য বাংলায় ভাষা সংযোগের বিষয়টি তৈরি হচ্ছে।

সমাজ বদলের সঙ্গে সঙ্গে সমানতালে চলে মানুষের মুখের ভাষার বদল। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বদলে ভাষারও বদল হয়। মূলত ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, চলমানতা বা সচলতা ও ধর্মীয় দিক থেকে ভাষার এই বদল দেখা যায়। ভৌগোলিক কারণে ভাষার এই পরিবর্তন আমরা পেয়েছি সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক* উপন্যাসে। পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি অঞ্চলের টিলা, রুক্ষ পাথরে ভর্তি এই ভূপ্রকৃতির ভৌগোলিক বৈচিত্র্য সেই অঞ্চলের মানুষের ভাষাগত বৈচিত্র্য তৈরি করেছে। *রসিক* উপন্যাসের একটি চরিত্র পাণ্ডবকুমারের ঠাকুরদা ভীম মাহাতো তাদের অঞ্চলের বর্ণনা করেছেন-

> উ বনের ভিতরে বাতাস যায়েঁ পাতায় পাতায় ঝাঁঝর বাজাইছেঁ। আর আসর দেইখছ্যে উই পাহাড়, বনের গাছ, ডুংরি-পাথর। তব্যে আর কিসের অভাব ! [২০]

সর্বজ্ঞ কথকের বর্ণনায়ও দেখা যাচ্ছে সেই বৈশিষ্ট্য।

> আরও পিছনে- দূরের আকাশ যেখানে নেমে এসেছে ঠিক সেইখানে মাথা তুলেছে পাহাড় শ্রেণী। বাম দিক থেকে শুরু হয়ে পাহাড় চলে গেছে আধখানি বৃত্ত হয়ে একেবারে দক্ষিণ কোণ বরাবর। অগ্রহায়ণের নিরুদ্বেগ রৌদ্রে পাহাড় ঝলমল করছে। কোথাও বা পাহাড়ের বুকের সামনে ধোঁয়ার বিষণ্ণতা। দূর মাঠে একদল বাগাল ছেলে কাঁড়া– বলদ চরাতে চরাতে হু দিচ্ছে। দূর পাহাড়ের বাতাস খাঁ খাঁ টাঁড়ে - প্রান্তরে এসে পথ হারাচ্ছে।[২১]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসে আলকাপ শিল্পীদের ব্যবহৃত ভাষায় ধর্মের কারণে তৈরি হওয়া বাংলা পরিভাষাকে এনেছেন সিরাজ। যেমন- আজরাইল, মিঞা, খলিফা, মৌলবীসাহেব, ভাইজান, আসসালামু আলাইকুম, কেতাব, খোদার খাসি, বেহেশত,

আজানধ্বনি, মুসাবিদা, গেনে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মূলত মুসলমান ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

আবার, *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসে হাজিসাহেবের মুখে অভিজিৎ সেন যে ভাষা দিয়েছেন তা ধর্মের কারণেই আলাদা হয়ে গেছে। 'হাজিসাহেব কহেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ো, মোছলমানের কিরাকাম মানো, হাদিস মানো, তবিই তুমু সাচ্চা মোছলমান হবা। জাতে উঠবা'।[২২]

বাজিকর ইয়াসিনকে বলতে শোনা যায়,

> তোর বাপই ঠিক বলিছিল, হামরা পাখমারা আর বাদিয়া মোছলমানের মতোই বেজাত মোছলমান হোই গেলাম।[২৩]

চলমানতার কারণে বাজিকরদের ভাষা পরিবর্তনের প্রসঙ্গটি আগেই বলা হয়েছে। সমাজ ভাষার প্রয়োগমূলক দিক নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানী ব্রাইট ও ফিশম্যান এই দুজন ভাষাবিজ্ঞানী আলোকপাত করেন। মূলত ব্রাইট ভাষার চরিত্র অনুযায়ী শ্রেণি বা জাতিভেদ নির্ণয়ের বিষয়টিকে দেখিয়েছেন। তিনি বলদে যাওয়া সামাজিক ব্যবস্থায় বদলে যাওয়া ভাষার স্বরূপ দেখিয়েছেন।

রহু চণ্ডালের হাড় উপন্যাসে শ্রেণিগত অবস্থান অনুযায়ী ভাষাগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন- বাজিকরদের মুখের ভাষা আর চৌধুরী সাহেব, দারোগা, দারোগার ছেলে ও লালকুঠির ম্যানেজার এদের মুখের ভাষা একরকম নয়। কারণ, এদের মধ্যে সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী শ্রেণিগত ব্যবধান রয়েছে। এই শ্রেণিগত, সামাজিক অবস্থানগত তারতম্যকে দেখানোর জন্য ঔপন্যাসিক সামাজিক অবস্থানগত ভাষাবদল ও বৈচিত্র্যকে

দেখিয়েছেন। বা বলা যেতে পারে তাদের মুখের ভাষাই তাদের শ্রেণি অবস্থানকে চিনিয়ে দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

যেমন- দারোগার ছেলের উক্তি, 'আমিও বজ্জাত, দেখা যাক কে বেশি বজ্জাত।দারোগার উক্তি, দেখ, বাজিকর, জানোয়ারটা আমার চাই। পরে পাঠিয়ে দিও।[২৪] বাজিকর দলনেতা দনুর উক্তি, পীতেম হে, পীতেম, পুবের দেশে যাও, বাপ। সিথায় তুমার নসিব'।[২৫]

দরিদ্র মুসলমান তরমুজ চাষি রমজানের ভাষা,

> আলবাৎ খাবা। তবে গাছেৎ কেহ হাত দিয়েন না, বাপেরা। দুটো ছিড়া দিছি, খুশি মনেৎ চলি যান।[২৬]

মাতব্বর গোছের ছোকরাদের উক্তি,

> বুঝলে চাচা? তা যাক্‌গে, অঢেল হয়েছে এবার তোমার, দু-চারটা নষ্ট হলে গায়ে বাজবে না।[২৭]

পোলিয়া জাতির ছেলে আকালু যে পয়সা উপার্জন হাপু গান গেয়ে তার ভাষা, 'তোরাদের আধি জমিগুলান বেহাত হোই যাবে''।[২৮]

অবস্থাপন্ন জোতদার মহিমবাবুর ভাষা-

> আরে জমির অভাব হচ্ছে? পাশের জঙ্গল খালা কর্‍্যে লেও। এলা কি অয়াটা মোকদ্দমা?[২৯]

সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষের শ্রেণিগত অবস্থান অনুযায়ী বাজিকরদের মুখের বুলি, দরিদ্র মুসলমান চাষি, পোলিয়া জাতির ভাষা, অবস্থাপন্ন জোতদার শ্রেণির ভাষায় সমাজ অনুযায়ী আলাদা ধরনের ভাষা ব্যবহারকে দেখিয়েছেন অভিজিৎ সেন। চরিত্র অনুযায়ী, বিত্ত,

জাতি ভেদে ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক যথার্থই সফল। বর্তমান সময়ে আধুনিক সমাজ ও আধুনিক মননে আমরা হয়তো বা অনেকেই সমাজে উঁচু জাত নিচু জাতের, উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্তের মানুষে মানুষে কোনো ব্যবধান রাখি না। কিন্তু সমাজে মানুষের জাতিগত ও বিত্তগত বিভাজন এখনও উঠে যায়নি। উঁচু জাত ও নিচু জাতের ভাষাগত পার্থক্য এখনও রয়েছে। উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের ভাষাগত ব্যবধান আজও অব্যাহত।

সেই পার্থক্যকে নিখুঁতভাবে দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেন তাঁর *রহু চণ্ডালের হাড়*-এ। তাই, সমাজের উঁচু জাতের মুখের ভাষা আর নিচু জাতের মুখের ভাষায় তিনি পার্থক্য আনেন। উচ্চবিত্ত জোতদার ও নিম্নবিত্ত চাষি, মজুরের ভাষাগত সূক্ষ্ম পার্থক্যকে বুঝিয়ে দেন। সমাজে তথাকথিত জাতে না ওঠা যাযাবর বাজিকর ও নিচু জাতির পোলিয়া শ্রেণির ভাষাগত ব্যবধানকে পাঠককে চিনিয়ে দেন ঔপন্যাসিক।

সমাজ ভাষার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল লিঙ্গ অনুযায়ী ভাষা। সমাজভাষাবিজ্ঞানে নারী-পুরুষের ভাষা নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠেছে। মেয়েদের ভাষা নিয়ে আলোচনা সমাজ ভাষার একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। মেয়েদের কথা বলার ক্ষেত্রে যে নিজস্ব একটা স্টাইল আছে তা সব সময় পুরুষদের মতো নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তার আলাদা এক ধরন আছে। নারীর ভাষা নিয়ে অনেক গবেষণামূলক কাজ হয়েছে। নারীর ভাষাকে মূলত সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত শ্রেণি উপভাষা হিসাবেই দেখা হয়। 'নারীর ভাষা' নিয়ে গবেষণার প্রথমেই ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সুকুমার সেনের 'Women's Dialect in Bengali' গবেষণা নিবন্ধের কথা স্মরণে আসে। এরপরেও বিদেশী ভাষাবিদেরা যেমন এডওয়ার্ড সাপির, হান, ফিসার ছেলেদের ও মেয়েদের ভাষা নিয়ে তাদের মধ্যেকার পার্থক্য নির্দেশ করেন। বাংলায় মেয়েদের ভাষা নিয়ে যাঁরা কাজকর্ম করেছেন তাঁদের মধ্যে এগিয়ে

আছে সুকুমার সেনের 'বাংলায় নারীর ভাষা' প্রবন্ধটি। রাজীব হুমায়ুনের *সমাজ ভাষাবিজ্ঞান*-গ্রন্থের (২০০১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ) মেয়েদের ভাষা নিয়ে আলোচনা আছে। মৃণাল নাথ তাঁর *ভাষা ও সমাজ* গ্রন্থে (১৯৯৯, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা) নারীরভাষার প্রসঙ্গটি এনেছেন মূলত লিঙ্গ ও ভাষার বিশ্লেষণের জন্য। ২০০৬ সালে ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী 'নারীর ভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ' গ্রন্থটিতে নারীর ভাষা নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছেন। অতি প্রাচীন কাল থেকেই উন্নত বা অনুন্নত যে সমাজই হোক না কেন নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা ব্যবধান আছেই। তবে পার্থক্য কোথাও কম, আবার কোথাও বেশি। আমার আলোচ্য লোকশিল্পনির্ভর উপন্যাসগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই নারী চরিত্রের মুখের ভাষা থেকে উঠে আসে তাদের প্রকৃত অবস্থান। নারীদের ব্যবহৃত ভাষা-রীতি থেকে অনগ্রসর সমাজে নারীদের অবস্থানগত পরিচয় পাওয়া যায়। পুরুষতান্ত্রিক অনুশাসনকেই এখনও অনেক মেয়েরা ধ্রুবসত্য বলে মেনে নেয়। সেই বন্ধনে নিজেদের আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে। রক্ষণশীলতার নাগপাশ থেকে বেরোতে না পেরে একদিকে যেমন পুরুষতান্ত্রিকতার বলি হয়, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর বাহকও হয়। বিশেষত যে সমাজে এখনও শিক্ষার আলো প্রবেশ করতে পারেনি সেই সমাজের নারী ও পুরুষের অবস্থানগত পার্থক্য রয়েছে। সেই অবস্থানগত ব্যবধানই নির্দেশ করে নারী-পুরুষের ভাষাগত পার্থক্যকে।

আমার আলোচ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে *কলাবতী কথা* উপন্যাসে পটশিল্পকে কেন্দ্র করে পটশিল্পী ও পটগানের ভাষায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আঞ্চলিকতার প্রভাব প্রায় দেখাই যায় না। তবে যেহেতু মেয়েদের দ্বারা লালিত পালিত হয়েছে এই পটশিল্প সংস্কৃতিটি, তাই ঔপন্যাসিক মেয়েদের ভাষার ক্ষেত্রে তাদের আলাদা ধরনের নিজস্ব স্টাইলকে দেখিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে ঔপন্যাসিক নারী চরিত্রদের মুখে যে ভাষা দিয়েছেন তার বেশ কিছু বিচিত্রতা রয়েছে। পুরুষের মুখের ভাষা থেকে এ ভাষার ভঙ্গি বেশ খানিকটা আলাদা। তাদের মুখের

ভাষা নারীসমাজের গোটা জীবন, সামাজিক অবস্থা ও তাদের শ্রেণিগত অবস্থানকে দেখিয়ে দেয়। ঔপন্যাসিকের সেই দেখার চোখ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যেমন, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের *কলাবতী কথা* উপন্যাসের লতু চরিত্রকে বলতে শোনা যায়, 'সোমত্ত মেয়ের আর কী দোষ! ... মাগির বরটা পাগল বলে চড়া সুদে টাকা ধার দেয়'।[৩০] গ্রামাঞ্চলের তথাকথিত নিরক্ষর নারীদের মধ্যে স্ল্যাং ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে নারীরা আদর সম্ভাষণ করেও এই স্ল্যাং শব্দ ব্যবহার করেন। 'সোমত্ত মেয়ে' শব্দটির মধ্যে দিয়ে মেয়েদের রক্ষণশীল মানসিকতাই প্রকাশিত হয়। লতু পুরনো দিনের মানুষ। ষষ্ঠী ব্রত পালন, সামাজিক ধর্মীয় নিয়ম, রীতি-নীতি মেনে চলা, সংস্কারপন্থী লতুকেই বলতে শোনা যায়,

> হ্যাঁ রে বউ, কাল তো সুয্যি ওঠার আগেই পুকুরে গিয়ে চান করে আসতে হবে।[৩১]

আবার উপন্যাসটির অন্যতম প্রধান চরিত্র কলাবতীকে বলতে শোনা যায়,

> সারা জগৎ শোনো, আমি মা হতে চলেছি। আমার বিয়ের পূর্ণতা এত দিনে একটা মাত্রা পেল। আর মাত্র দশটা মাসের অপেক্ষা।[৩২]

জিজ্ঞাসার ভঙ্গি দিয়ে বাক্য শুরু অথবা বিস্ময়ের অনুভূতিসূচক শব্দ দিয়ে বাক্যের শেষ একমাত্র মেয়েদের ব্যবহারেই বেশি। বাক্যের মধ্যে বিবৃতির স্থলেও 'না' বা 'না গো' পদ-বন্ধের ব্যবহারে নারীরা পুরুষের থেকে অনেকখানি সমৃদ্ধ। ঔপন্যাসিক তাকেই ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া ঔপন্যাসিক তাদের ব্যক্তিগত কথার স্থলে এমন কিছু আচরণ আরওপ করেছেন যা নারী মহলে প্রচলিত। এতে যেমন তাদের ভাষা ব্যবহারের পরিচয় মেলে তেমনি নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীরও কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই চোরা ইঙ্গিতকে লেখক দেখিয়েছেন তাঁর শৈল্পিক মুনশিয়ানায়। ঔপন্যাসিক খুব সুনিপুণভাবে দেখিয়েছেন মা

হওয়ার ব্যক্তিগত অনুভূতি। মেয়েদের এ অভিজ্ঞতা একান্তই মেয়েদের নিজস্ব। পুরুষের তা থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। স্বাভাবিকভাবে তা মেয়েদের কথনভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। আবার মেয়েদের সম্পর্কে বিশেষ কতগুলি পরিভাষা যেগুলি শুধুমাত্র মেয়েদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় সেরকম কতগুলি শব্দ এই উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। বাঁজা, পুত্রবতী, রূপসী, পোয়াতি বউ, রমণী, ঘরণী, চুলবুলে, সধবা, বৈধব্য, সৎমা, সোয়ামী সোহাগিনী ইত্যাদি শব্দগুলি। মেয়েদের মধ্যে প্রশ্নসূচক বাক্যের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় এই উপন্যাসের কনককে প্রতিবেশী মেয়েদের প্রশ্ন-

> তোমার বউটা আবার বাঁজা নয়তো গো দিদি? আদিবাসীরা আবার শেকড়-বাকড় খাইয়ে বাচ্চাকাচ্চা বন্ধ করে রাখে দেখো আবার তেমন কিছু কি না।[৩৩]

এই বাক্য দুটিতে প্রশ্নসূচক বাক্যের পাশাপাশি লগ্ন প্রশ্নও রয়েছে। এখানে কনকের প্রতিবেশীদের মন্তব্যে একপ্রকার মেয়েদের রক্ষণশীল মানসিকতাই প্রকাশ পায়। আবার *রসিক* উপন্যাসে নিরাপত্তাহীনতার কারণে দুলালীর মধ্যে তৈরি হয় গভীর সংশয়। দুলালীকে কাঁপা গলায় বলতে শোনা যায়, ‘কথা যাব’? আর সেই সংশয় থেকেই তৈরি হয় নারীর অন্যের প্রতি অবিশ্বাস। রক্ষণশীলতার কারণেও অনেক ক্ষেত্রে বাড়ির বয়স্ক নারীদের ভাষার আরেকটি প্রবণতা হল- কথার মধ্যে মধ্যে প্রবাদের ব্যবহার। বংশ পরম্পরায় মৌখিকভাবে এই প্রবাদ ব্যবহারের রীতি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। *কলাবতী কথা* উপন্যাসে ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় বয়স্ক লতু ও মাঝবয়সী কনক- এই দুই নারী চরিত্রের মুখের ভাষায় প্রবাদের ব্যবহার করিয়েছেন। যেমন- ‘মিছরির ছুরি’ (আপাতমধুর কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী কথা), ‘হরির লুঠ কুড়ানো’ (বিলিয়ে নষ্ট করা, উড়ানো), ‘লগ্নে রাহু গলা কাটা, সাথে চলে শতেক ব্যাটা’ (কপাল দোষ বা ভাগ্যদোষ), ‘হর্তা-কর্তা বিধাতা’ (সর্বেসর্বা), ‘জল ঘোলা’ অহেতুক সরল বিষয়কে জটিল করে তোলা), ‘শিবরাত্তিরের সলতে’ (একমাত্র বংশধর),

'মাথায় বাজ পড়া' (হঠাৎ বিপদ বা আকস্মিক বিপদে হতবুদ্ধি হওয়া), 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর' (বিশ্বাস অনুযায়ী গ্রহণ করা) ইত্যাদি। আবার, সুব্রত মুখোপাধ্যায় তাঁর *রসিক* উপন্যাসেও এই ধরনের ব্যবহার দেখা যায়। এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র নিশারানী নামে এক বয়স্কা নারীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 'লক লজ্জায় হাসি আর দরিয়ার মাঝে ভাসি' (লোকলজ্জায় উপায়ান্তর হয়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হওয়া), আবার ভরত সর্দারের মা ফণীবালা জীবনের উপান্তে দাঁড়িয়ে নিজের সম্পর্কে মন্তব্য করে 'আমার তিন কাল যাঞা এককালে ঠেকক্যাছে, (বার্ধক্যে পৌঁছে গেছে বা একেবারে বুড়ো হয়ে গেছে) আমি এখুন মনস্তাপ করে কি করব্য রে ছেল্যা'।

শুধুমাত্র নারীদের মধ্যে ব্যবহৃত বিশেষ একধরনের ভাষা ব্যবহার আমরা *রসিক* উপন্যাসেও পাব। 'রাখনি', 'নাচনি' শব্দদুটি স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ। শব্দগুলি পুরুলিয়ার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিশেষ সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত। আদিবাসী জনজাতি সাঁওতাল মেয়েদের মুখের ভাষার মধ্যে দিয়ে আমরা পাব কিছু মহিলা ঝুমুর শিল্পীর জীবনের চালচিত্রকে। নাচনি ও রাখনি প্রথার মতো নারীদের বাস্তবজীবনের অত্যন্ত কঠিন বৃত্তিকে। তাদের মুখের ভাষাই তাদের বৃত্তিকে চিহ্নিত করছে। ঔপন্যাসিক সেই চিহ্নকে প্রতিফলিত করেছেন সঠিক পর্যবেক্ষণে। তাকেই হাজির করেছেন সুনিপুণভাবে। পুরুষের মতো নিত্য নতুন শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে নারীদের প্রবণতা থাকে অনেক সময় বেশ পুরোনো বা প্রাচীন শব্দ ব্যবহারের প্রতি। *রসিক* উপন্যাসে নারী চরিত্রদের মুখেও সেই প্রাচীন কিছু শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন- ঢুঁড়লাম, নুনু বিটি, পারা, ডিবা, বিটা, জাড়, ডাগর, ফুলকচি, ডিঙ্গ চাটান, খুড়া, কদ্যাল পাশা, করকৈচা মাটি, বাইগন, শিকনি, বাস, টুকুন, অগ্নিশালঅ, বহাল, পয়দা, টাগরা, বাটরি, সাপটে, ভ্যানতাড়া, উবু, ঢোলক, খোড়াই, দোনো, বাহার, ঝাঁপ, খুঁট, আখর, কলিজা ইত্যাদি।

মায়ামৃদঙ্গ উপন্যাসে আলকাপদলের ছোকরাদের মেয়েলিপনার বর্ণনা দেওয়ার সময় সিরাজ শুধুমাত্র নারীদের মধ্যে ব্যবহৃত কিছু শব্দেরই ব্যবহার করেছেন, যাতে এই শব্দগুলির মাধ্যমে বিশেষত মেয়েদের মেয়ে-সুলভ আচরণকেই বোঝায়। যেমন- মেয়েলি ভঙ্গি, বেণী, নাটুকেপনা, নাচনকোঁদন, মায়াবী, মোহিনী, নাচিয়ে, কোমরদোলানী ইত্যাদি শব্দগুলি নারীসমাজকেই নির্দেশ করে। আবার শব্দের পাশাপাশি গোটা বাক্যও ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। এই বাক্যটি একান্তভাবে নারীকেই নির্দেশ করছে। যেমন- 'কুলটা নারী সাক্ষাৎ সাপিনী, ... রূপের ফাঁদ পেতে যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সে এক রাক্ষসী'।[৩৪]

৪.৩ শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ: উপন্যাসগুলির ভাষা ব্যবহার

ব্যাপক অর্থে ভাষার শৈলী নির্ধারণ করা শৈলীবিজ্ঞানের প্রধান কাজ। ভাষার এই শৈলীনির্ধারণ বিষয়টি কখনও কখনও অবস্থা অনুযায়ী আবার কখনো বা ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তৈরি হয়। মৌখিক সাহিত্য বা লিখিত সাহিত্য যে কোনোও ক্ষেত্রই হোক না কেন, ভাষাই তার প্রকাশের মাধ্যম। আর ভাষার কাজ হল নিজেকে প্রকাশ করা ও অন্যের সঙ্গে সংযোগ সাধন করা। সাহিত্যের কাজও একই। সাহিত্যের শৈলী নির্ধারণ করা আদতে ভাষার শৈলী নির্ধারণ করা। তাই একই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা সাহিত্য ভিন্ন লেখকের হাতে পড়ে স্বতন্ত্র রূপ পায় ও আলাদা শৈলী তৈরি করে। এক্ষেত্রে একই বিষয় নিয়ে লিখলেও ভিন্ন দুই লেখকের স্বতন্ত্র ভাষার প্রকরণের ভিন্নতায় তৈরি হয় তাদের পৃথক পৃথক নির্মাণ শৈলী। আমাদের আলোচ্য লোকশিল্প নির্ভর উপন্যাসগুলি আলাদা আলাদা সময়ে লেখা। আবার ভিন্ন ভিন্ন লেখকের মৌলিকত্ব পাঠক আস্বাদন করেন। এঁদের ভিন্ন ভিন্ন স্বর ও ভাষাগত প্রকরণের উপস্থাপনের তারতম্য তাঁদের পৃথক ভাষাশৈলীকে প্রকাশ করে। আমরা শৈলী ভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে উপন্যাসগুলিকে বিশ্লেষণ করব।

শৈলীবিজ্ঞানের কাজ ভাষাকে বিশ্লেষণ করা। ভাষাবিজ্ঞান নির্ভর শৈলী অনুসন্ধানের বিষয়টি প্রধানত আমাদের সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বিষয়ীর আত্মপ্রক্ষেপকেই চিনিয়ে দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী প্রাণিবিদ বুফোঁ জানিয়েছেন, স্টাইল ও ব্যক্তি একই। পশ্চিমি শৈলীতত্ত্বে অনেকের মতাদর্শগত তফাৎ ঘটে। ফ্রিম্যান এর মতে 'স্টাইল হল একটি আদর্শ থেকে বিচ্যুতি' আবার একটু অন্যভাবে বললে *স্টাইল হল একই ধরনের বিন্যাসের পুনরাবৃত্তি বা সমাহার* । এই সমস্ত তত্ত্বের মূলে রয়েছে 'নির্বাচন'(Style as choice)।

৪.৩.১ বিচ্যুতিবাদ(Deviation Theory):

গদ্যশৈলী বিশ্লেষণের কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। আমার আলোচ্য উপন্যাসগুলির শৈলী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রথমেই দেখতে হবে যে প্রত্যেকটি উপন্যাসই গদ্য শৈলীতে লেখা। সুতরাং গদ্য শৈলী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রথমেই দেখে নেব 'বিচ্যুতিবাদ' বা 'Deviation Theory'। এই তত্ত্বটির প্রবক্তা আইয়ান মুকারোভস্কি (১৮৯১-১৯৭৫)। তিনি গদ্যের ভাষা থেকে পদ্যের ভাষাকে আলাদা করতে গিয়ে এই তত্ত্বটি তৈরি করেছেন। তিনি মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে তুলনা করেছেন সাহিত্যের ভাষার। বিশেষত কাব্যের ভাষার। তাঁর মতে, মান্য চলিত বা স্ট্যান্ডার্ড ভাষা আর কাব্যের ভাষা আলাদা। স্ট্যান্ডার্ড ভাষাই তাঁর মতে নর্ম বা আদর্শ। আমরা জানি যে ব্যাকরণের সূত্র অনুযায়ী যে ভাষা ব্যবহার করা হয় সেটিই হল ভাষার নর্ম বা আদর্শ গঠন রূপ। ভাষার এই আদর্শ গঠন রূপের পরিবর্তন ঘটিয়ে তৈরি হয় সাহিত্যের ভাষা। ভাষার সেই আদর্শ গঠন রূপের সঙ্গে তুলনা করে সাহিত্যের ভাষার আদর্শ গঠন রূপের পরিবর্তনই বিচ্যুতি। আমার আলোচ্য লোকশিল্পনির্ভর উপন্যাসগুলির প্রত্যেকটির ব্যবহৃত ভাষাতেই ঔপন্যাসিকগণ বাংলা ভাষার আদর্শ গঠন রূপের সাপেক্ষে কমবেশি

পরিবর্তন করেছেন। নিচে প্রত্যেকটি উপন্যাস থেকে এই বিচ্যুতির উদাহরণ দেওয়া হল। তার সঙ্গে সঙ্গে দেখানো হল প্রত্যেকটি বাক্যের বিচ্যুত রূপের সাপেক্ষে আদর্শ রূপকে।

বিচ্যুত রূপ — আদর্শ রূপ

- অল্প তফাতে বসে তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছে সে। < সে তন্ময় হয়ে অল্প তফাতে বসে বাজাচ্ছে। (আড়কাঠি)
- ভুরু কুঁচকে তাকায় ক্যাথি। (আড়কাঠি) < ক্যাথি ভুরু কুঁচকে তাকায়।
- আজ সে কলকাতা গেছে শিল্পগ্রামের কাজে। < সে আজ শিল্পগ্রামের কাজে কলকাতা গেছে। (কলাবতী কথা)
- শীতকালের বিকিকিনিতে খুব মজা লতুর। < লতুর শীতকালের বিকিকিনিতে খুব মজা। (কলাবতী কথা)
- আজ মা রান্না করেছে চমৎকার। (রসিক) < মা আজ চমৎকার রান্না করেছে।
- বিজুলি শূন্য চোখে তাকায় সতীরানীর মুখে। < বিজুলি শূন্য চোখে সতীরানীর মুখে তাকায়। (রসিক)
- মঞ্জু এসে দাঁড়ায় তার সামনে। (রসিক) < মঞ্জু তার সামনে এসে দাঁড়ায়।
- রাত্রি হয়ে উঠেছে জীবনের মত বিচিত্র। (মায়ামৃদঙ্গ) < রাত্রি জীবনের মত বিচিত্র হয়ে উঠেছে।
- কিন্তু এতদিন সে শুধু ছিল নিতান্ত উপমা। < কিন্তু এতদিন সে শুধু নিতান্ত উপমা ছিল।(মায়ামৃদঙ্গ)
- তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ফ্রকপরা মেয়েটি। < ফ্রকপরা মেয়েটি তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। (মায়ামৃদঙ্গ)
- চমকে ওঠে সনাতন। (মায়ামৃদঙ্গ) < সনাতন চমকে ওঠে।
- কেমন নিস্তেজ হয়ে ছেড়ে দেয় সে। (মায়ামৃদঙ্গ) < সে কেমন নিস্তেজ হয়ে ছেড়ে দেয়।
- উত্তেজনায় সে উঠে দাঁড়ায়। (রহু চণ্ডালের হাড়) < সে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়।
- ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসে তির। (রহু চণ্ডালের হাড়) < তির ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসে।
- কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ বসে থাকে। (রহু চণ্ডালের হাড়) < সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে।

- তারপর ধীরে ধীরে শক্ত হয় রমজান। (রহু চণ্ডালের হাড়) < তারপর রমজান ধীরে ধীরে শক্ত হয়।
- কিছু টাকা পায় লুবিনি। (রহু চণ্ডালের হাড়) < লুবিনি কিছু টাকা পায়।

বিচ্যুতিবাদের মধ্যে দিয়ে উপরের বাক্যগুলির আদর্শ গঠনরূপের পরিবর্তে বিচ্যুত গঠনরূপের মাধ্যমে আমরা সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠার বিষয়টি দেখলাম।

৪.৩.২ প্রমুখন (Foregrounding):

এই বিচ্যুতির সঙ্গে যুক্ত থাকে প্রমুখন বা Foregrounding এবং গুরুত্বদানের (Focussing) বিষয়টি। বাক্যের আদর্শ বা স্বাভাবিক রূপ থেকে যখন বিচ্যুতি ঘটছে তখন সাহিত্যিক একটি বিশেষ শব্দ বা তথ্য বা বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে চাইছেন। তার উপর নির্ভর করে ফোকাসিং ঘটছে। আর এই গুরুত্বদানের মাধ্যমেই প্রমুখন ঘটছে। এই গুরুত্বদানের বিষয়টি হল বাচনের মধ্যে অবস্থিত একটি শব্দ যেটির মাধ্যমে লেখক পাঠকের কাছে কোনো বার্তা পৌঁছে দেন। এর মধ্যে দিয়ে পাঠক লেখকের এই শব্দটি ব্যবহারের অভিপ্রায় বুঝতে পারে। এই ক্ষেত্রে যে সমস্ত শব্দ বা পদগুচ্ছকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, সেই সমস্ত শব্দ বা পদগুচ্ছের বিষয়টি বাক্যের অন্বয়গত বৈচিত্র্য তৈরি করে। তাই বাক্যের মধ্যে বা পিছনে অবস্থিত শব্দকে গুরুত্বদানের মাধ্যমে সামনের দিকে টেনে নিয়ে আসা হয়। একেই প্রমুখন (Foregrounding) বলা হয়।

আমার আলোচ্য লোকশিল্পনির্ভর উপন্যাসগুলি থেকে সংগৃহীত বাক্যগুলির আদর্শ গঠনগত রূপের সাপেক্ষে বিচ্যুত রূপকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বলা বাহুল্য উপরের প্রত্যেকটি উদাহরণই গদ্যভাষার। নর্ম বা আদর্শ বাক্যের গঠনের সঙ্গে এই উপন্যাসের গদ্যভাষায় তৈরি হওয়া বিচ্যুতির মাধ্যমেই তৈরি হল সাহিত্যের ভাষা। আসলে এই গদ্যভাষার বিচ্যুতিতেই তৈরি হল উপন্যাসের ভাষার কাব্যময়তা। আদর্শ মান্য বাংলা ভাষার

স্বাভাবিক ক্রম বা আদর্শ গঠনগত রূপ হল SOV অর্থাৎ কর্তা (Subject) কর্ম (Object) ক্রিয়া (Verb)। আমার আলোচ্য উপন্যাসের ঔপন্যাসিকেরা আদর্শ মান্য বাংলার এই আদর্শ গঠনগত রূপের সাপেক্ষে তাঁদের ব্যবহৃত বাক্যগুলির বিচ্যুতি ঘটিয়েছেন। উপরে সেগুলির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বাক্যের মধ্যে অবস্থিত যে সমস্ত শব্দের উপর তারা গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন বাক্যের সেই সমস্ত উপাদানকে তাদের নিজস্ব অবস্থান থেকে সামনে সরিয়ে এনে বিচ্যুত ক্রম তৈরি করেছেন। এইভাবেই তাঁদের ব্যবহৃত প্রত্যেকটি বাক্যের ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে প্রমুখন। বৃক্ষচিত্রের সাহায্যে প্রমুখনের একটি সাজিয়ে দেখালে তা এইরকম হবে –

আজ মা চমৎকার রান্না করেছে। (আদর্শ বাক্য)

আজ মা রান্না করেছে চমৎকার। (উপন্যাসে বিচ্যুত বাক্য)

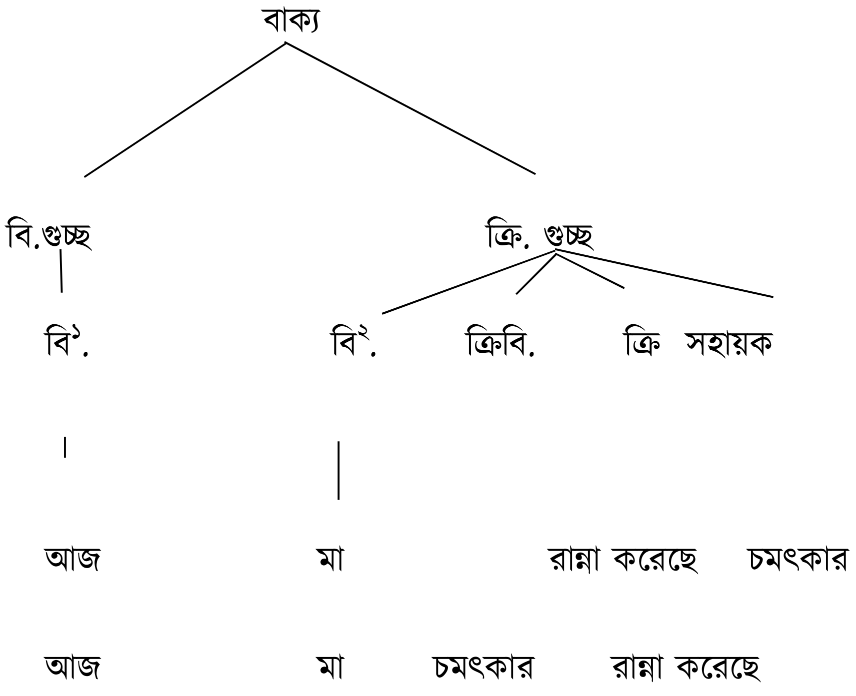

উপরের আদর্শ বাক্যের ‘আজ’ বিশেষ্য পদটি ও ‘রান্না করেছে’ ক্রিয়াপদগুচ্ছ তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে বিচ্যুত বাক্যে।

আদর্শ বা মান্য বাংলার গঠনগত রূপের সাপেক্ষে বিচ্যুতির আরেকটি ধরন হল আলফা স্থানান্তরণ বা $\alpha -$ movement। এটি একপ্রকারের স্থানান্তরণ। বাক্যের মধ্যেকার যে কোনো ধরনের উপাদানের স্থান বদলই হল α – Movement (Alpha-Movement) বা আলফা স্থানান্তরণ। উপরের *রসিক* উপন্যাস থেকে সংগৃহীত বাক্যটির উদাহরণের ক্ষেত্রে আদর্শ বাক্যের সাপেক্ষে বিচ্যুত বাক্যের গঠনে ‘মা’ ও ‘আজ’ বিশেষ্য পদগুলি পরস্পরের অবস্থান বদল করেছে। এটি একটি আলফা স্থানান্তরের উদাহরণ। এটিও একধরনের বিচ্যুতি। উপরে বিচ্যুতির যে যে উদাহরণ দেখিয়েছি সেখানেও এই আলফা স্থানান্তরণ জাতীয় বিচ্যুতি ঘটেছে।

৪.৩.৩ সমান্তরালতা(Parallelism):

আমার আলোচ্য লোকশিল্পনির্ভর উপন্যাসের শৈলী বিশ্লেষণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সমান্তরালতা বা Parallelism। ‘Parrallelism’ শব্দটি প্রথম অ্যারিস্টটল অলংকার শাস্ত্রে ব্যবহার করেছিলেন। এটি হল সমগঠনের পুনরাবৃত্তি ও সমান্তরালের সমগোত্রীয় একটি বিষয়। একই ধরনের কথা বলার নীতি এবং একই ভাব গভীরতা যুক্ত শব্দ ব্যবহারের পদ্ধতি হল সমান্তরালতা। বাংলায় এ বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেছিলেন ভাষাবিদ শিশিরকুমার দাশ। তাঁর মতে, ‘Parrallelism’ ‘Principles of equivalence’ ও ‘Repeatation of same structural pattern’। সুতরাং সমান্তরালতা হল প্রায় একই গঠনের যেকোনো আন্বয়িক উপাদানের বার বার ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট সৌন্দর্য। অর্থাৎ বাক্যের মধ্যেকার দুটি সমগঠনের আন্বয়িক উপাদান হল সমান্তরালতা। শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

তাঁর *কবিতার অন্বয় : সাংগীতিক প্রতিভাস* গ্রন্থের ‘সমান্তরালতা: কাব্যতত্ত্ব’ প্রবন্ধে সমান্তরালতা নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। সমান্তরালতা আসলে সাহিত্যের শৈলীবিশ্লেষণের অন্যতম একটি উপায় বা পদ্ধতি। পরবর্তীকালে উদয়কুমার চক্রবর্তী তাঁর *ভাষাবিজ্ঞান* গ্রন্থে এই সমান্তরালতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন পুনরুক্তি আর সমান্তরালতা - এই দুটি এক বিষয় নয়। তিনি সমান্তরালতার গঠনগত দিক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এই তত্ত্বের ক্ষেত্রে আব্রাহাম নোয়াম চমস্কির ‘Government and binding’ পদ্ধতির ‘Principles and Parametre’-এর প্রসঙ্গ এনেছেন। এছাড়াও Ken Safir-এর প্রবর্তিত ‘Parrallel Constraint of Operation Binding’ (PCOB) তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে একটি সূত্র তৈরি করেছেন। এখানে ‘Constraint’ হল উপাদান বা শ্রেণি। ‘Operator’ হল ‘চালক’। আর ভ্যারিয়েবেল (Variable) হল ‘চল’। আর কতগুলি চলকে আবদ্ধ করবে চালক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যেমন ‘x’ যদি ‘চালক’ হয় এবং ‘y’ যদি ‘চল’ হয় তবে ‘x’ চালক ‘y’ চলকে আবদ্ধ করবে। আমার আলোচ্য উপন্যাসগুলির মধ্যেও এই ধরনের সমান্তরালতার উদাহরণ পাওয়া গেছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসে এই ধরনের সমান্তরালতার উদাহরণ পাওয়া যায়। “আর কয়েক পা বাড়ালে শেষ মাঘের শান্ত স্তব্ধ নদী-জেলার ভূগোলে লেখা আছে ভাগীরথী, লোকে বলে গঙ্গা। পতিতপাবনী কলুষবিনাশিনী সুরেশ্বরী-জননী জাহ্নবী”।[৩৫]

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক* উপন্যাসে পাওয়া একটি সমান্তরালতার উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হল। ‘একদল ছাতারে পাখি উঠানে এসে নামে। ডানা ঝাপটে ধুলা ওড়ায়। ক্যাঁচর ম্যাচর কথা বলে। তারপর ঝাঁ করে উড়ে যায়’।[৩৬]

সমান্তরালতার আরও অনেক নমুনা পাওয়া যায় ভগীরথ মিশ্র রচিত *আড়কাঠি* উপন্যাসেও। একটি উল্লেখ করছি। ‘ছেলেটাকে ক’দিন ধরেই রাজ্যমেলায় দেখেছে রঙী। কোঁকড়ানো চুল, একমাথা। ভাসা ভাসা চোখ। সারা মুখে শিশুর সরলতা’। [৩৭]

অভিজিৎ সেনের *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসে ব্যবহৃত বাক্য বিন্যাসে সমান্তরালতার নমুনা খুঁজে পেয়েছি। যেমন- ‘ধাবমান জানোয়ারকে তিরবিদ্ধ করা, আক্রমণোদ্যত জন্তুকে সাহসের সঙ্গে ঘায়েল করা এক বিরাট অভিজ্ঞতা। এইসব কাজে মানুষ নিজেকে চিনতে পারে, বুঝতে পারে মানুষের জন্মের কারণ এবং জীবনের অর্থ’।[৩৮]

‘চালক’ ও ‘চল’ কে নির্দেশ করে আমি আমার নির্বাচিত উপন্যাসগুলি থেকে সমান্তরালতার গঠনগত রূপটিকে বুঝতে চেষ্টা করব।

চালক		চল
জেলার ভুগোলে লেখা আছে ভাগীরথী		[y] পতিত পাবনী
লোকে বলে গঙ্গা। [x]	⟶	[z] কলুষবিনাশিনী
		[a] সুরেশ্বরী
		[b] জননী
		[c] জাহ্নবী

এখানে ‘গঙ্গা’ হল চালক। সে ‘পতিত পাবনী’, ‘কলুষবিনাসিনী’, ‘সুরেশ্বরী’, ‘জননী’, ‘জাহ্নবী’ চলগুলিকে আবদ্ধ করে সমান্তরালতার গঠন তৈরি করেছে।

চালক　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　চল

একদল ছাতারে পাখি [x] ⟶ [y] উঠানে এসে নামে।

[z] ডানা ঝাপটে ধুলা ওড়ায়।

[a] ক্যাঁচর ম্যাচর কথা বলে।

[b] তারপর ঝাঁ করে উড়ে যায়।

এখানে 'একদল ছাতারে পাখি' হল চালক। সে 'উঠানে এসে নামে', 'ডানা ঝাপটে ধুলা ওড়ায়', 'ক্যাঁচর ম্যাচর কথা বলে', 'তারপর ঝাঁ করে উড়ে যায়' চলগুলিকে আবদ্ধ করে সমান্তরালতার গঠন তৈরি করেছে।

চালক　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　চল

ছেলেটাকে ক'দিন ধরেই রাজ্যমেলায়

দেখেছে রঙী। [x]　　　　　　　　　　　　[y] কোঁকড়ানো চুল, একমাথা।

[z] ভাসা ভাসা চোখ।

[a] সারা মুখে শিশুর সরলতা।

এখানে 'ছেলেটাকে' হল চালক। সে 'কোঁকড়ানো চুল, একমাথা', 'ভাসা ভাসা চোখ', 'সারা মুখে শিশুর সরলতা' চলগুলিকে আবদ্ধ করে সমান্তরালতার গঠন তৈরি করেছে।

চল — চালক — চল

চল	চালক	চল
ধাবমান জানোয়ারকে তিরবিদ্ধ করা, আক্রমণোদ্যত জন্তুকে সাহসের সঙ্গে ঘায়েল করা	→ এক বিরাট অভিজ্ঞতা। ←	এইসব কাজে মানুষ নিজেকে চিনতে পারে, বুঝতে পারে মানুষের জন্মের কারণ এবং জীবনের অর্থ।

রহু চণ্ডালের হাড় উপন্যাসে ব্যবহৃত এই বাক্যগুলির বিন্যাসের গঠন দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে এটি সমান্তরালতার উদাহরণ। এখানে 'চালক' হল 'এক বিরাট অভিজ্ঞতা'। এই চালক একই সঙ্গে একই গঠন যুক্ত 'ধাবমান জানোয়ারকে তিরবিদ্ধ করা', 'আক্রমণোদ্যত জন্তুকে সাহসের সঙ্গে ঘায়েল করা' এই চলদুটিকে আবদ্ধ করেছে। আবার, 'এক বিরাট অভিজ্ঞতা' সেই একই চালক অন্যদিকে 'এইসব কাজে মানুষ নিজেকে চিনতে পারে', 'বুঝতে পারে জন্মের কারণ ও জীবনের অর্থ' সমগঠনযুক্ত ও একই ধরনের ভাব গভীরতাযুক্ত এই চল দুটিকে আবদ্ধীকরণ করেছে।

৪.৪ উপসংহার:

আমাদের আলোচ্য উপন্যাসগুলি থেকে পাওয়া বিচ্যুতি ও সমান্তরালতার বেশ কয়েকটি উদাহরণ থেকে আমরা প্রত্যেক লেখকের স্বতন্ত্র সত্তা ও শৈলীকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি মাত্র। এই ধরনের বাক্যবিন্যাস তৈরি করে আমার আলোচ্য উপন্যাসের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকেরা তাদের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিলেন। তাঁদের প্রতিভার স্বকীয়তায় উপন্যাসের ভাষা মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি পৌঁছেছে। চরিত্রদের বাস্তব ও জীবন্ত

রূপে গড়ে তুলতে ঔপন্যাসিকেরা এই ধরনের সাহিত্য শৈলীর বিশেষ উপায়কে আশ্রয় করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাশৈলী তাদের মৌলিকতা ও নিজস্বতাকেই চিহ্নিত করে। এভাবেই মানুষের মুখের ভাষাকেই জীবন্তভাবে সাহিত্যে ব্যবহার করে স্বতন্ত্র সাহিত্য শৈলী নির্মাণ করেন তারা। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিচ্যুতির মাধ্যমে বাক্য ব্যবহারের দক্ষতা লেখকের নির্মাণকে পাঠকের হৃদয়বেদ্য করে তোলে। বাক্যের সমান্তরালতা বিন্যাসও পাঠক চিত্তকে আকৃষ্ট করে। তবে ঔপন্যাসিকেরা তাদের উপন্যাস শিল্প সৃষ্টির সময় হয়তো বা সর্বদা সাহিত্য শৈলীর এই সমস্ত তাত্ত্বিক দিকগুলিকেই খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে উপন্যাসের ভাষা নির্মাণ করেন না। তবে সাহিত্যের ভাষা শৈলী বিশ্লেষণ করে সাহিত্যের শৈলী নির্ণয় করলে সাহিত্যিকের অভিপ্রায়টিকে অনেক ক্ষেত্রেই যথার্থভাবে অনুধাবন করা যায়। আমার আলোচ্য উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রেও সেই অভিপ্রায়কেই অনুসন্ধান করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়, পরেশচন্দ্র (১৯৭৭)। *বাঙলা ভাষা পরিক্রমা (প্রথম খণ্ড)*। কলকাতা: দে'জ, । পৃষ্ঠা. ১৬১

২. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা (২০১৬)। *মায়ামৃদঙ্গ* । কলকাতা: দে'জ। পৃ. ৩৯, ৪০

৩. পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৯, ৪০

৪. পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৩

৫. পূর্বোক্ত। পৃ. ৪০

৬. পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৪

৭. পূর্বোক্ত। পৃ.৪০

৮. সেন, অভিজিৎ(২০১০)। *রহু চণ্ডালের হাড়*। কলকাতা: এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং। পৃ: ১০।

৯. Giglioli, Pier Paolo(1982). *The Sociology of Languag. Language and Social Context*, Penguin Books. p. 45

১০.সরকার, পবিত্র (১৪০৫ বঙ্গাব্দ)। *ভাষা, দেশ, কাল*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ। পৃ. ১৫৬

১১. চক্রবর্তী, উদয়কুমার (২০১৯)। *ভাষাবিজ্ঞান* । কলকাতা: দে'জ। পৃ. ২৪৫

১২. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা (২০১৬)। *মায়ামৃদঙ্গ* । কলকাতা: দে'জ। পৃ. ৪০

১৩ পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪

১৪. পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪

১৫. পূর্বোক্ত। পৃ. ৪০

১৬. পূর্বোক্ত। পৃ. ৪০

১৭. সেন, অভিজিৎ(২০১০)।*রহু চণ্ডালের হাড়*। কলকাতা: এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং।পৃ: ১৩

১৮. সরকার, পবিত্র (১৪০৫ বঙ্গাব্দ)। *ভাষা, দেশ, কাল*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ। পৃ. ১৬২

১৯. সেন, অভিজিৎ(২০১০)।*রহু চণ্ডালের হাড়*। কলকাতা: এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং।পৃ: ১০

২০. মুখোপাধ্যায়, সুব্রত(২০১৩)।*রসিক*। কলকাতা: আনন্দ। পৃ: ৫৩২

২১. পূর্বোক্ত।পৃ: ৫৩১

২২. পূর্বোক্ত। পৃ:২৬২

২৩. পূর্বোক্ত।

২৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ১৫

২৫. পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩

২৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ১৬৭

২৭. পূর্বোক্ত।

২৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ১৯০

২৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ১৯১

৩০. মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা(২০১৫)। *কলাবতী কথা*। কোলকাতা: আনন্দ। পৃ. ১০

৩১. পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭

৩২. পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪৭

৩৩. পূর্বোক্ত। পৃ. ৮২

৩৪. পূর্বোক্ত। পৃ. ৩১

৩৫. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা (২০১৬)।*মায়ামৃদঙ্গ*। কলকাতা: দে'জ। পৃ. ৯

৩৬. মুখোপাধ্যায়, সুব্রত (২০১৩)। *রসিক*। কলকাতা: আনন্দ। পৃ: ৩৬

৩৭. মিশ্র, ভগীরথ(২০১৯)। *আড়কাঠি*। কলকাতা: দে'জ। পৃ. ১৪।

৩৮. সেন, অভিজিৎ (২০১০)। *রহু চণ্ডালের হাড়*। কলকাতা: এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং।

পঞ্চম অধ্যায়

উপন্যাসে লোকশিল্পের প্রতিগ্রহণ: লিঙ্গগত বৈষম্য ও শিল্পীদের অবস্থান

৫.০ ভূমিকা:

আমার আলোচ্য স্বাধীনতা পরবর্তী লোকশিল্পনির্ভর নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসগুলিতে ঔপন্যাসিকেরা প্রত্যেকেই তাদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতাকে নিজেদের সাহিত্যের উপাদান করেছেন। তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশিয়েছেন কল্পনাকে। ঔপন্যাসিকের চোখে দেখা বাস্তব ও কল্পনার মিশেলের ফল তাদের সাহিত্য। এই উপন্যাসগুলিতে নারী ও পুরুষের অবস্থানের তারতম্য লক্ষিত হয়। এই অবস্থানের ক্ষেত্রটি তৈরি হয় সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর নির্ভর করে। আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে ভিড় জমানো যেসব নারীদের আমরা পাই, তাদেরকে আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অচেনা লাগে। সচরাচর তারা কেউই আমাদের চেনা জগতের মানুষ নন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, আলোচ্য উপন্যাসগুলির নারীরা নানা ভাবে অত্যাচারিত ও অবহেলিত। বিভিন্ন রকম সামাজিক, পারিবারিক সুযোগ সুবিধা থেকেও তারা বঞ্চিত। কন্যা সন্তানের প্রতি এখনও অনেক বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। আর সে যদি প্রান্তিক নারী হয়, তবে তো তার জীবনে আসে মানসিক ও শারীরিক নানা ধরনের নিপীড়ন। মেয়ে বলে তার জন্মকাল নথিভুক্তকরণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সে নানান ধরনের সামাজিক নিপীড়নের শিকার হতে থাকে। সামাজিক নিরাপত্তা সে তো পায়ই না, বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধে থেকেও সে বঞ্চিত হয়। সে ঘর সংসারের যাবতীয় কাজ করবে। অথচ মা বাবার কাছে নারী সন্তান নাকি বোঝা। আবার, বাবা মা কন্যা পণ নেওয়ার লোভে মেয়ের বিয়ে দেন অথচ পাত্র নির্বাচনের

ক্ষেত্রে পাত্র লম্পট, বৃদ্ধ, মদ্যপ হলেও তাদের কিছু আসে যায় না। অনেক সময় পণের বিনিময়ে পুরুষটি মেয়েটিকে বিয়ে করার বদলে তাকে কিনে নেয়। মেয়েটির ভাগ্যে নেমে আসে নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক পীড়ন। মেয়েটি পুরুষটির যৌন লালসার শিকার হয়, অথচ সে সামাজিক কোনো সম্মান বা স্বীকৃতি পায় না। এছাড়াও মেয়েরা এখনও নানারকমের সামাজিক প্রথার শিকার হয় বিভিন্ন সময়ে। আমার আলোচ্য স্বাধীনতা পরবর্তী নির্বাচিত উপন্যাসগুলিতে বাস্তব সমাজের নারীরা হুবহু না এলেও ঔপন্যাসিকদের কলমে তাদের জীবন কথার সিংহভাগটাই আমরা জানতে পারি। সেক্ষেত্রে লেখকেরা কতটা বাস্তবকে রেখেছেন আর কতটাই বা কল্পনাকে টানলেন সেটা আলোচনার থেকেও বেশী জরুরি উপন্যাসগুলিতে বর্ণিত প্রান্তিক নারীদের জীবনকে জানা। লোকশিল্প নির্ভর উপন্যাসগুলির কেন্দ্রীয় লোকশিল্পের প্রায় প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে নারী শিল্পীরা মুখ্য ভুমিকায়। *রসিক* উপন্যাসের ঝুমুর, *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসে বাজিকরী শিল্প, *আড়কাঠি* উপন্যাসের অন্যতম জলকেলি লোকনৃত্য, *কলাবতী কথা* উপন্যাসের পটশিল্প– এই লোকশিল্পেগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই দেখা গেছে মূলত নারীদের দ্বারাই সম্পাদিত হয় এই লোকশিল্পগুলি। যদিও পুরুষের প্রসঙ্গও এসেছে কিন্তু নারীরা যেন শিল্পগুলির মূল চালক। তবে, *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসে আলকাপের শিল্পী হিসাবে এসেছে আরেক ধরনের মানুষ, যারা না-নারী না-পুরুষ তাদের কথা। অর্থাৎ যারা দেহে পুরুষ অথচ মনের দিক থেকে মেয়ে তাদের জীবনকে আমরা পেলাম। তবে, এই উপন্যাসেই ঢপকীর্তন গাইয়ে নাচিয়ে এক নারীর জীবনকে আমরা পেয়েছি।

এই সমস্ত নারীরা মূলত প্রান্তিক সমাজের। শিক্ষার আলো থেকে তারা আজও অনেক পিছিয়ে। তাদের সমাজে রয়েছে লিঙ্গগত বৈষম্য। আর এই লিঙ্গগত বৈষম্য তাদের সামাজিক উন্নয়নের পথে বড়ো বাধা। এই সমস্ত নারীদের জীবন, আর্থ-সামাজিক অবস্থান

জানতে গেলে প্রথমেই এক ঝলক দেখতে হয়, আলোচ্য উপন্যাসগুলির প্রকাশ সাল। **১৯৭২** সালে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *মায়ামৃদঙ্গ* -এর প্রকাশ। **১৯৮৫** সালের মাঝামাঝি প্রকাশ পেয়েছিল অভিজিৎ সেনের *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসটি। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক* উপন্যাসের প্রকাশ **১৯৯১** সালে। ভগীরথ মিশ্রের *আড়কাঠি* প্রকাশিত হয়েছে **১৯৯৩** সালে। ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের *কলাবতী কথা* প্রকাশিত হয়েছে **২০১৫** সালে। মোটামুটিভাবে উপন্যাসগুলির সময়কাল অনুযায়ী গোটা বিশ্বের দিকে তাকালে এই সময় নারীর নিজের অধিকার আদায়ের দাবী ঠিক কেমন ছিল? সেই নিরিখে আলোচ্য উপন্যাসগুলির বঞ্চিত নারীদের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করতে গেলে নারীবাদের উদ্ভব, সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, নারীবাদের তিনটি ঢেউ ও নারীদের অধিকার আদায়ের ইতিহাস সম্পর্কে জানা দরকার। তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসাবে ভারতের তথা বঙ্গ নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রকৃত পক্ষে কিরূপ সেটাই আমার আলোচনার বিষয়। আর নারীর সেই অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আমার নির্বাচিত উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণ করাই এই অধ্যায়ের লক্ষ্য।

৫.১ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নারীদের অধিকার আদায়ের ইতিহাস ও প্রান্তিক নারীদের অবস্থান:

নারীবাদকে নির্দিষ্ট কোনো একটি অভিধায় অভিহিত করা সত্যিই অসম্ভব। নারীবাদ সম্পর্কে জানতে হলে তার প্রাথমিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। সেই ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, পশ্চিম ইউরোপে বুর্জোয়া শ্রেণির সূচনাতেই লুকিয়ে আছে নারীবাদের বীজ। শ্রমবিভাজনের উপর নির্ভর করে নারী পুরুষের ভেদাভেদের বিষয়টি তৈরি হয়েছিল। বুর্জোয়া শ্রেণি তৈরি হয়েছিল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে। পুরুষের জন্য নির্ধারিত হত বাইরের জগতের কিছু উৎপাদনমুখী কাজ। আর সেই সঙ্গে

মেয়েদের কাজের প্রকৃতির ভিন্নতা তৈরি হয়েছিল। মেয়েদের ভূমিকা হল প্রধানত প্রজননমুখী। সন্তান ধারণ, পালন ও পরিচর্যাই তাদের কাজ। শ্রমকে কেন্দ্র করে এই ধরনের সমাজব্যবস্থা উদ্ভবের প্রায় একশো পঞ্চাশ বছর পরে ১৯৪৯ সালে ফরাসি দার্শনিক সিমোন দ্য বোভোয়া(১৯০৮-১৯৮৬) প্রতিবাদের স্বরে নারীদের সামাজিক অবস্থানকে দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত (Second Sex) বললেন।[১] আঠামরো শতকের দুজন খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী মেরী উলস্টোনক্রাফট ও উনিশ শতকে জন স্টুয়ার্ট মিল প্রতিবাদ করলেন। তিনি মেয়েদের শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত করে অন্দরমহলে আটকে রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। এঙ্গেলস সামন্ততান্ত্রিক নারীবাদের গোড়াপত্তন করেন। বিশ শতকের ষাটের ও সত্তরের দশকে ইউরোপ ও আমেরিকাতে নারীবাদের জোয়ার আসে। মানুষের চেতনায় নারীদের সম্পর্কে সচেতনতা বাড়তে থাকে। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মেয়েদের অবস্থা তখন বেশ সংকটময়। একদিকে ধনতন্ত্র যখন সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য আনতে মরিয়া অন্যদিকে তখন মেয়েরা নিদারুণ বৈষম্যের শিকার। দেখা গেল সমাজে নারীর স্বীকৃতি ক্রমশ কমছে। ইতিহাসে তাদের ভূমিকার কোনো উল্লেখ নেই। সাহিত্যের নারী চরিত্রদের প্রায়শই পুরুষের যৌনতার শিকার হতে দেখা যায়। মেয়েদের সঙ্গে অন্যায়ভাবে হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ চলতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বাজারী সভ্যতার বাহক যে গণমাধ্যম সেখানে মেয়েদের ভূমিকা ক্রমশ কমে পুরুষের লালসাকে বাড়িয়ে দেয়। স্বাভাবিকতার মুখোশ পরে অত্যাচার করা হয় নারী ও শিশুদের। অনেক সময় নারীরা নিজেরাও নিজেদের অত্যাচারের কারণ হয়। তারাও হয়ে যায় পুরুষতান্ত্রিকতার বাহন। সাহিত্যে এ উদাহরণের সংখ্যা ভুরি ভুরি। বিভিন্ন ধরনের নারীবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উদারনৈতিক নারীবাদ, সমাজবাদী নারীবাদ, র‍্যাডিকাল নারীবাদ।[২] গোটা বিশ্বে নারীবাদী আন্দোলনের তিনটি ঢেউ আসে। প্রথম ঢেউয়ের সূচনা মোটামুটিভাবে উনিশ শতক থেকে বিংশ শতাব্দী। দ্বিতীয় জোয়ার মোটামুটিভাবে ১৯৬০ সাল

থেকে ১৯৯০ সাল অবধি। আর তৃতীয় ঢেউ ১৯৯০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। নারীরা পুরুষের সমান কাজে সমান মজুরি পেতে শুরু করলো। ভোটের অধিকার পায়। নিজেদের শরীরকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মেয়েরা অনেক বেশি মুক্তি ও স্বাধীনতা পেল। ১৯৬০ এর পরে অনেক মেয়েরা পিলের ব্যবহার শুরু করলেন। যৌনমিলনে ভয় কেটে গেল মানুষের মনে। যৌনমিলন সুখের হল। সমাজ ও রাষ্ট্রের অনুমোদন পেয়ে ভারত ও চিনের মতো জনবিষ্ফোরণের দেশগুলি জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পিলের ব্যবহারকে সরকারি পরিষেবার মধ্যে নিয়ে এলো। সমাজের চেহারাতেও পরিবর্তন আসতে শুরু করলো। পুরুষ যেখানে বিবাহ না করেও সারাজীবন ধরে নিরাপদ যৌনজীবন উপভোগ করতে পারে। স্পার্ম ব্যাঙ্ক তৈরি হয়ে যাওয়ায় মেয়েদের নিজেদের ইচ্ছেমতো মা হওয়াতে বাধা নেই। সমাজে একক মায়ের ধারণা এল। নারীবাদী আন্দোলনের ঢেউ নানাভাবে আঘাত করলো সমাজে শেকড় গেড়ে বসা প্রচলিত ধর্মমতগুলিকেও। পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও নানা অধিকার অর্জন করলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে থেকে শুরু হলেও কেউ কেউ মনে করেন মধ্যযুগের শেষদিকের লেখক ক্রিসটাইন দে পিজান নারীবাদের প্রথম প্রবক্তা। পশ্চিম ঐতিহ্য অনুসারে এরকমটাই মনে করা হয়। এই আন্দোলনের পথিকৃৎদের যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন লেডি মেরী ওয়র্টলে মনটাগু ও মাকুইস দে কনডোরসেট। এঁরা নারীশিক্ষার কথা বলেন। উনিশ শতকে পুরুষের বক্তব্য ও লেখনীর মধ্যে নারী আন্দোলন গতিবেগ পেতে থাকে। এই শতকের বিশ্বব্যাপী সংস্কার আন্দোলনের মধ্যেই নারী আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়। এই শতকের মধ্যভাগে জন স্টুয়ার্ট মিলের সহধর্মিণী হ্যারিয়েট টেলরের(১৮৩১-১৮৫৮) প্রভাবে নারী মুক্তি আন্দোলন নিয়ে লেখালেখি করেন। এর সমকালীন উল্লেখযোগ্য নারীবাদীরা হলেন মার্গারেট ফুলার(১৮১০-১৮৫০), এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যানটোন(১৮১৫-১৯০২), মার্গারেট সেনার(১৮২১-১৮৯৯), দামে ইথেল মেরী স্মিথ(১৮৫৮-১৯৪৪), এমা

গোল্ডম্যান(১৮৬৯-১৯৪০) প্রমুখ। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে পুরুষ সংখ্যা কমে যাওয়ায় তাদের জায়গায় মেয়েরা আসতে শুরু করেন। যন্ত্রপাতি তৈরির কলকারখানা, যুদ্ধের অস্ত্র তৈরির সামরিক কারখানা ইত্যাদিতে মেয়েদের শ্রমকে কাজে লাগানো হত। এধরনের কাজে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও যে সমান পটু বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা প্রমাণিত হয়। মেয়েদের শ্রমের চাহিদাকে কাজে লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা ছেলেদের সমান অধিকারের দাবি চেয়ে আন্দোলনে পথে নামেন। সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্র ও চিন, কিউবায় নানা ধরনের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধে পায় মেয়েরা। তবে নাৎসি প্রশাসন ও ফ্যাসিস্তরা নারীমুক্তি আন্দোলনকে নির্মম ভাবে দমন করে।

১৯৬০ এর পরে নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় ঢেউ আসে। নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম তরঙ্গে নারীরা তাদের নিজেদের জন্য আইনি স্বীকৃতি আদায় করে নেওয়ার পর দ্বিতীয় তরঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকারের দাবীতে পথে নামেন। তাদের প্রধান দাবি ছিল গর্ভনিরোধ (Contraception) ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার। মেয়েরা তাদের যৌন আচরণ বিধিতেও বেশ কিছু পরিবর্তন চাইলেন। তারা ভাবতে শুরু করলেন, সামাজিক মানুষ হিসাবে একজন পুরুষ যেভাবে তাঁর যৌন প্রয়োজনীয়তা মেটানোর ব্যাপারে নারী বদল করেন, ঠিক সমানভাবে নারীরাও নিজেদের যৌন চাহিদা মেটানোর জন্য পুরুষ বদল করতেই পারেন। নারীবাদীরা এই বিষয়টিকে সেক্সুয়াল লিবারেশন (Sexual Liberation) আখ্যা দিলেন। এই ভাবনা থেকেই নারীবাদীরা প্রকাশ্যেই তাদের পার্টনার বদল করতে থাকেন। নারীবাদীদের এই সমস্ত নতুন নতুন ভাবনা সমাজে প্রবল বিতর্ক তুলল। ১৯৮০ সালের পর থেকে আগের থেকে মেয়েরা অনেক বেশি স্বাধীন। এরা মুক্ত যৌনতা বা সেক্সকে বেছে নিলেন। এক্ষেত্রে তারা কোনো লজ্জা বা ট্যাবুকে মানলেন না। প্রধানত পশ্চিমি সমাজে ও বিশ্বায়নের পরিবেশে পৃথিবীর সবদেশের কসমোপলিটন শহরগুলিতে মুক্ত

যৌনতাকে পছন্দ করেন অনেক মহিলা। এর পরবর্তী সময়ে দেখা যাচ্ছে, মুক্ত যৌনতাকে বেছে নেওয়ার কারণে যৌনতার ধারণায় যাবতীয় আড়াল রাখছেন না নারী পুরুষেরা। পর্ণগ্রাফিকে তখন অনেকেই আর লুকিয়ে পড়ছে না। বরং দেখা যাচ্ছে, মেয়েদের যৌনতাকে নিয়ে আগের তুলনায় অনেক বেশি করে পণ্য তৈরি করা হচ্ছে। এর উপভোক্তা হলেন পুরুষ।

১৯৯০ সালের পর থেকে দেখা দিল নারীবাদী আন্দোলনের তৃতীয় তরঙ্গ। নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় তরঙ্গ ছিল মূলত মেয়েদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই নিয়ে। এখান থেকে তৈরি হল মেয়েদের একটি সার্বজনীন আইডেনটিটি। দেখা গেল, এই তৃতীয় জোয়ারে গরীব, প্রান্তিক, অন্য বর্ণের ও গে মেয়েদের কোনো স্থান নেই। নারীবাদী আন্দোলনের এই তৃতীয় ঢেউকে কেন্দ্র করে দেখা গেল নানা বৈচিত্র্য। তবে, এই বৈচিত্র্য তৈরি হল নারীবাদীদের মধ্যেকার ভিন্ন শাখার মহিলাদের মধ্যে। তাদের আলাদা মত ও আলাদা পথ।

বর্তমান কালের নারীবাদী আন্দোলন সমাজে মেয়েদের ওপর নেমে আসা বিভিন্ন ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব। আজও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মেয়েরা অনেক পিছিয়ে আছে। পুরুষের সম পরিমাণ কাজে মেয়েদের পুরুষের তুলনায় পারিশ্রমিক কম। অর্থনৈতিক দিক থেকে আজও যেমন পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে, ঠিক তেমনই রাজনৈতিক দিক থেকে মেয়েরা অনেক পিছিয়ে। নারীবাদীরা এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে সরব। নারীবাদীদের অভিমত, আজও সমাজের নানা স্তরে তাদের বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক, সামাজিক সংস্কারের বশবর্তী হয়ে জীবন কাটাতে হয়। প্রথাগতভাবে, লিঙ্গভিত্তিক ধ্যান ধারণা ও আধিপত্যের শিকার হয়ে অনেক কিছু মেনে চলতে হয়। স্বভাবতই বিভিন্ন ধরনের চাপের মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হয় তারা। তারা জীবনের

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যাচারিত হতে থাকে। ভাবতে অবাক লাগে আমরা যদিও আজ একবিংশ শতাব্দীর দুই দশক পেরিয়ে গেছি অথচ আজও নির্বিচারে বধূহত্যা চলছে, প্রতিনিয়ত কন্যা ভ্রূণ নষ্ট করা হচ্ছে। চলছে নারীপাচার, ডাইনী অপবাদ দিয়ে নিষ্ঠুর নারীহত্যার মতো ঘটনা। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে একটু খোঁজ খবর নিলেই আমরা জানতে পারি আমাদের দেশে প্রতি চুরাশি মিনিটে একটি করে শিশুকে ধর্ষিতা হয়। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর কেন, পঁচাত্তর বছর পেরিয়ে এসেও পুরুষের প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মেয়েদের মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারার মতো ঘটনাও ঘটে চলেছে আকছার। সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে মেয়েদের উপর নানান অত্যাচার চালানো হয়। আজও আমাদের প্রচার মাধ্যমগুলোর দিকে তাকালে আমরা অনুধাবন করতে পারি সমাজ মানুষকে কীভাবে ঠকাচ্ছে। ডিটারজেন্ট, বাসন মাজার সাবান, শ্যাম্পু এমনকি সিমেন্টের বিজ্ঞাপনেও স্বল্পবসনা নারীকে পুরুষের আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ব্যবহার করা হয়।

তারা মনে করেন, সমাজে নারীর উপর নেমে আসা যাবতীয় অত্যাচারের মূল কারণ ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ। নারীবাদী আন্দোলনের তৃতীয় জোয়ারে অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ আলোড়িত হয়েছে, একথা সত্যি। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নারীরা ডিভোর্সের ক্ষেত্রে সমান অধিকার চান। তারা ধর্ষণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা চান, যৌন হয়রানির হাত থেকে মুক্তি চান। কিন্তু বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে গোটা বিশ্বের সব প্রান্তের নারীদের অবস্থান ঠিক এরকম নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা নানাভাবে সমাজের দ্বারা অত্যাচারিত হয়। নীরবে মুখ বুজে সহ্য করে যান তাদের উপরে নেমে আসা যাবতীয় অত্যাচার। প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা তারা একজন মেয়ে হয়েও নিজেরাই হয়ে যায় অন্য একটি মেয়ের জীবনে অত্যাচারিত কারণ। অনেক নারীবাদীরা মনে করেন, পুরুষ শাসিত সমাজে প্রায় সব নারীই আদতে প্রান্তিক সে যতই তিনি উচ্চবর্ণের বা নিম্নবর্ণের নারী হোন না কেন। ইতিহাসের পাতা

ওলটালেও যেমন আমরা দেখতে পাব, তাতে নারীর অবস্থান সে সময়েও খুব উন্নত তো নয়ই, বরং চরমভাবে উপেক্ষিত। তারা পুরুষের কাছে শুধুমাত্র যৌন চাহিদা পূরণের একটা মাধ্যম। ঘরে বাইরে নারীর প্রয়োজন এর বাইরে কিছু নয়। আধুনিক নারীবাদী তাত্ত্বিক মনোজ নস্কর বলছেন,

> ...বারবনিতার গৃহে গিয়ে অর্থের বিনিময়ে নারীর যৌনতা উপভোগ করতে হয়, তাই সেক্ষেত্রে পুরুষের মধ্যে নারীর যৌনতাকে নিংড়ে নেবার প্রযত্ন দেখা যায়। কিন্তু ঘরের স্ত্রীর কাছে প্রত্যাশিত যৌন আচরণের সঙ্গে অর্থের কোনো যোগ সাজশ থাকে না। তাই সেক্ষেত্রে পুরুষের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি মানসিক চাপ সৃষ্টি করে, বা বলপ্রয়োগ পূর্বক শারীরিক অত্যাচারের মাধ্যমে নিজের যৌন চাহিদা পূরণ করার মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়।[৩]

বর্তমানেও এই অবস্থানের খুব একটা হেরফের হয়নি। ঘরের হোক বা বাইরের নারী তারা আসলে ব্যবহৃত হয়। এই ব্যবহারে ঘাটতি দেখা দিলে বা নারীর কণ্ঠ স্ফুরিত হলে সেখানেই তার গলা রুদ্ধ করা হয়। কখনো তাদের নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। কখনও বা ধর্ষিতা হতে হয়েছে। আবার কখনো পেয়েছে ডাইনি অপবাদ। কখনও বা তাদের প্রতিবাদী ভূমিকায় দেখলে জিভ টেনে ছিড়ে নেওয়া হয়েছে। এতো গেল সারা বিশ্বে নারীদের বাস্তব অবস্থা ও অবস্থানের চিত্র। তবে, লোকশিল্প নির্ভর উপন্যাসের ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থানের চালচিত্রের স্বরূপ কিছুটা তো ভিন্ন হবেই। তৃতীয় বিশ্বের প্রান্তিক নারীদের অবস্থান বিশ্বের সাধারণ নারীদের থেকে আরও অনেক নিচে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা আজও গৃহপালিত পশুর মর্যাদাও পায় না। ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে নারীদের অবস্থান আরও নগণ্য। আমার গবেষণায় স্বাধীনতা পরবর্তী নির্বাচিত লোকশিল্প নির্ভর উপন্যাসগুলিতে লোকশিল্পী হিসাবে যে নারীচরিত্রদের খুঁজে পাই, তারা অন্যের নির্মাণ

হিসাবে আমাদের সামনে উঠে আসে। গায়ত্রী স্পিভাকের 'সবার উপর নিম্নবর্গ সত্য' এইরকম সূক্ষ্ম বিপক্ষে দাঁড়িয়ে রণজিৎ গুহ বিষটিকে যেভাবে দেখলেন তা আরও তাৎপর্যবাহী। অধ্যাপক গুহ বলেছেন,

> হাজার আওয়াজের ভিতর থেকে নিম্নবর্গের নিজস্ব কণ্ঠস্বর আলাদা করে বের করে আনার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। ইতিহাসের দলিলে যে-কণ্ঠস্বরই শুনি না কেন, তা নিম্নবর্গের কথা নয়, অন্যের নির্মাণ। এই নির্মাণের সামাজিক পদ্ধতিগুলি কী, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে তা তৈরি হয়, কোনো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তা ব্যাপক সামাজিক স্বীকৃতি পায়, সে-সব প্রক্রিয়াগুলো আবিষ্কার করাই নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাঁদের কাছে সেটাই সবচেয়ে বাস্তব প্রত্যাশা।[৪]

আমরা যদি এই লোকশিল্পীদের জীবন সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি তবে দেখব, ইতিহাসের পাতায় এদের স্থান নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের নিজেদের মুখ থেকে তাদের নিজেদের জীবন কথা জানা যায় না। তারা নিজেদের কথা বলতে পারে না বলেই মুখ বুজে তাদের সব কিছু সহ্য করতে হয়। অন্যের নির্মাণ হিসাবে তাদের কথা আমরা জানতে পারি। সাহিত্যিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক* উপন্যাসে ঝুমুর গাইয়ে নাচিয়ে নাচনিদের যে জীবন ইতিহাসকে পেয়েছি, তা সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নিজের নির্মাণ। ইতিহাসে তাদের জীবনের শিল্পময় দিকগুলির কথা লেখা থাকে। কিন্তু নাচনি জীবনের সামাজিক অবস্থান, তাদের জীবনের ইতিবৃত্ত এবং সর্বোপরি তাদের নাচনি হয়ে ওঠার কাহিনির কোনো স্থান নেই ইতিহাসের পাতায়। সুব্রত মুখোপাধ্যায় তাঁর *রসিক* উপন্যাসের একটি অন্যতম মুখ্য চরিত্র বিজুলিবালার নাচনি হয়ে ওঠা ও তার জীবনের পরিণতিকে যেভাবে হাজির করেছেন, সেখানে বিজুলিবালার নাচনি পরিচিতির আড়ালে লুকিয়ে থাকা যে অত্যাচার, নির্যাতনের করুণ কাহিনিকে আমরা জেনেছি, তা আদতে সুব্রতবাবুর স্বনির্মাণ। বাস্তবের

বিজুলিবালাদের নিজেদের বয়ানে বলা তাদের মুখ থেকে শোনা নিজস্ব জীবন কথা নয়। তবে সাহিত্যিকের কাজ বাস্তবের দেখা ঘটনাকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে দেওয়া। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও সেই কাজটিই করেছেন। তাই তাদের এ পরিচয় তো আদতে বাস্তবিক পরিচয়ই। আমরা এই চরিত্রগুলি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারি মাত্র। এ দেখা যদি আংশিক দেখাও হয়, তবেও নেহাত ক্ষতি নেই। সাহিত্যিকের কলমে যে বাস্তব ধরা দেয় তা নিখাদ বাস্তব যদি না হয়, তবুও বাস্তবের প্রতিফলন তো বটে। আর আমার নির্বাচিত উপন্যাসগুলিতে ঔপন্যাসিকেরা যেভাবে নারী-পুরুষের জীবনকথাকে এনেছেন সে জীবনও খুব সহজ তো নয়ই, বরং খুবই কঠিন ও মর্মন্তুদ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিশ শতকের মাঝমাঝি থেকে প্রায় শেষের দশক পর্যন্ত সময় কালে লোকশিল্প নির্ভর আমার নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের টানাপোড়েন, নানান ধরনের জটিলতা থেকে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বিশ্বে সাধারণ মেয়েদের দাবী, তাদের অধিকারবোধ, আন্দোলনের সাপেক্ষে একটি তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের বাসিন্দা হিসাবে এই উপন্যাসগুলির লোকশিল্পী নারীদের বাস্তব অবস্থানটি আদতে কোথায়। বিশেষত মেয়েদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই। তবে এই লোকশিল্পীদের জীবনের সুখ-দুঃখ, মানসিক জটিলতা, সংস্কার, শিল্পগত জীবন, পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিগত জীবন এই সমস্ত কিছুর পরিচয় থেকে তাদের জীবনের লিঙ্গগত রাজনীতির স্বরূপ আমরা বুঝে নিতে পারি। আলোচ্য উপন্যাসগুলির প্রধান প্রধান নারী চরিত্রগুলির লিঙ্গগত রাজনীতির আলোচনা থেকে আমরা বিষয়টিকে বিশদভাবে অনুধাবন করতে চেষ্টা করবো।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী একটি বাংলা উপন্যাস তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কবি* (১৯৪২) তে আমরা বসন নামে একটি নারী চরিত্রকে পেয়েছি যে সমাজে প্রান্তিক এক ঝুমুর গাইয়ে ও নাচিয়ে। পেটের দায়ে সে বেশ্যা বৃত্তি গ্রহণ করেছে। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর

উপন্যাসের একটি জায়গায় উল্লেখ করেছেন, সে পুরুষের ‘লোলুপতার নখর দন্ত’ থেকে পালিয়ে আসে একটু আশ্রয়ের জন্য নিতাই কবিয়ালের ঘরে। লেখক তার নির্বাচিত শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বসনের উপর পুরুষের অত্যাচারের মর্ম যন্ত্রণাটিকে বুঝিয়েছেন।

৫.২ *মায়ামৃদঙ্গ* :

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে আলকাপ। শিল্পীদের কাছে এই আলকাপ শিল্প তাদের ভালোবাসা। ঔপন্যাসিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আলকাপ শিল্পকে আশ্রয় করে এক স্বতন্ত্র বয়ান নির্মাণ করেছেন। আলকাপ শিল্পীদের শিল্প জীবনের ও বাস্তব জীবনের নানান জটিলতাকে তিনি বিচিত্র বিভঙ্গে দেখিয়েছেন। নারী পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাত্রাকে বর্ণময় করে তুলেছেন।

মানুষ সামাজিক জীব। কতগুলি সামাজিক ঘেরাটোপের মধ্যেই তাকে বাস করতে হয়। সামাজিক জীব হিসাবে কতগুলি নিয়ম নীতি তাকে পালন করতে হয় তাকে। শিশুর জন্মগ্রহণের পরমুহূর্ত থেকেই শুরু হয় সেই প্রক্রিয়া। তবে মানুষের মন খুবই সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়। সে সর্বদাই যে সমাজ, পরিবার এমনকি তার নিজের মধ্যেকার আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হবে এমনটাও নয়। নানান ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, নিজের মনের ভিতরকার আলোড়ন- সবটাই যে তার ব্যাখ্যাযোগ্য এমনটাও নয়। সেসব ক্ষেত্রে অনেক সময়েই কোনো যুক্তি কাজ করে না। সামাজিক মানবিক সম্পর্কগুলির পরিচিত চেনা সুতো ছিঁড়ে ফেলে অনেকে চায় নতুন সুতোর বাঁধনে একে অপরকে বাঁধতে। প্রচলিত চেনা সমাজ তাকে মেনে নিতে পারে না। মানুষের আন্তরিক টানকে আত্মতাকে অনুভব করেন কেউ কেউ। ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক এই সব তর্ক জালের জটিলতায় যাওয়াই বৃথা। এক্ষেত্রে উপেক্ষা করা হয় জাতপাতের বাচবিচার, শ্রেণিগত বিভেদ ও লিঙ্গগত পরিচয়ের বেড়াজালকে।

মায়ামৃদঙ্গ উপন্যাসে সিরাজ এইরকম ধরনের অনেক চরিত্রকে হাজির করেছেন। একসময় আলকাপ শিল্পে নারী শিল্পীদের কোনো স্থান ছিল না। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসে এই বিষয়টি আমরা পাই। এই উপন্যাসে গঙ্গামণি নামে একটি নারী চরিত্রের সংলাপটি এ প্রসঙ্গে মনে আসে।

ছাগল দিয়ে গরুর কাজ কেন?[৫]

গঙ্গা ঝাঁকসু ওস্তাদকে এমনটাই অনুরোধ করেছিল। তার দাবী দলে তো মেয়ে রেখেই কাজ চালানো যায়। আলকাপের ওস্তাদরা পুরুষকে দিয়েই নারীর পারফরমেন্স করান। এক্ষেত্রে পুরুষের নিজের অভ্যস্ত জীবন যাপন প্রণালীকে ভাঙতে হয়। একজন পুরুষ সাধারণত পুরুষসুলভ নিজের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। নারীসুলভ ব্যবহারকে শিখে পুরুষের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হতে হয়। ঝাঁকসু ওস্তাদকে একজন পুরুষ মানুষকে গড়ে তুলতে হয় নারীরূপে। এই উপন্যাসে তাই আলকাপ দলের ওস্তাদ ঝাঁকসু বয়ঃসন্ধি পর্বের কোনো এক কিশোর বা ছোকরাকে নির্বাচন করেন নারী চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ করানোর জন্য। নরম কাদামাটি দিয়ে ছাঁচ গড়ার মতো এই বয়ঃসন্ধি পর্বের ছেলেদের দিয়ে মেয়ে গড়ার কাজটি এই অনেকটা সহজ হয়। তবে তাদের শিল্প জীবনের পাশাপাশি নারীর ভূমিকায় অভিনয়ের প্রস্তুতি পর্বটি চলতে থাকে বাস্তব জীবন যাপনেও। ঝাঁকসু ওস্তাদ তারই দলের ছোকরা শান্তির প্রতি অতিমাত্রায় সচেতন। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সর্বদাই নিজেকে নারীরূপে ভাবতে শেখান শান্তিকে। দেহের কোমলতা পেলবতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে শান্তিকে ঝাঁকসু পুরুষের পরিশ্রমের কাজ করতে বারণ করেন। এমনকি তাকে ওস্তাদ জামাকাপড় কাচতেও বারণ করে দিয়েছেন। ঝাঁকসু মনে মনে ভয় পান এত কাজ করলে তার অঙ্গের রূপলাবণ্য কমে যাবে। দৈহিক গড়ন নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। যদিও ঝাঁকসুর এই সচেতনতা আলকাপ শিল্পেরই স্বার্থে।

তবে, ঝাঁকসুর শিল্পের ক্ষেত্রে বাস্তবের নারীর কোনো প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও তার জীবনে এ প্রয়োজন ছিল। বিবাহের সূত্রেই তার জীবনে আসে দুই নারী। প্রথম স্ত্রীর ছিল চারটি সন্তান। আর দ্বিতীয় স্ত্রী বাজা। তাদেরকে মাসিক টাকাপাঠিয়ে দিয়েই ঝাঁকসু তাদের জীবনের সমস্ত দায় দায়িত্ব মিটিয়ে দিত। এরপরে তার জীবনে আসে আরেকটি নারী। ঝাঁকসুর জীবনে এই নারীর স্থান তৃতীয়। সে এক খ্যামটা[৬] নাচিয়ে ঢপওয়ালী[৭]। তার নাম গঙ্গামণি। ঝাঁকসু ওস্তাদের আলকাপ শিল্পের উপস্থাপন দেখে ঢপওয়ালী তার প্রেমে পড়ে। ঝাঁকসুর ভালবাসায় ভুলে তার সঙ্গে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখে ঢপওয়ালী তার পিতৃগৃহ ছেড়ে সে বেরিয়ে আসে। ঝাঁকসুও তাকে সাদরে গ্রহণ করে। এই মেয়েটি জাতিগত দিক থেকে গেণে সম্প্রদায়ভুক্ত। সমাজ এই ঢপওয়ালী গেণে সম্প্রদায়ভুক্ত গঙ্গামণিকে ভালোভাবে মেনে নেয় না। গঙ্গামণিকে নিয়ে সে গঙ্গার পাড়ে ঘর বাঁধে সমাজকে একপ্রকার উপেক্ষা করেই। এই গঙ্গামণিকে ঝাঁকসু আদর করে ডাকে ছোটকী। আর এই ছোটকীর প্রতি ঝাঁকসুর সবচেয়ে বেশি টান আর সবথেকে বেশি ভালোবাসা। এরকমটাই ছিল ঝাঁকসুর বাস্তব জীবন। এই জীবন প্রসঙ্গে শক্তিনাথ ঝা তাঁর *ঝাঁকসু* গ্রন্থে জানিয়েছেন,

> নানা বৈপরীত্য ছিল ঝাকসুর চরিত্রে। একাধিক বিবাহ, বহু সন্তান ছিল ঝাকসুর। কিন্তু সংসার বা সন্তানাদির বিষয়ে তিনি খুব আসক্ত ছিলেন না। খুব খেয়ালি ছিলেন, কল্পনাপ্রবণ ছিলেন। আবেগে চলতেন। মজা করতে ভালবাসতেন।[৮]

আসলে ঝাঁকসুর কাছে এই পারিবারিক জীবনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল তার শিল্প জীবন। আলকাপদল ওস্তাদের কাছে যেন তার সন্তান বিশেষ। তার বাস্তবজীবন ও শিল্পজীবন যেন কোথাও মিলে মিশে যায় একসাথে। ওস্তাদের কাছে ঘর আর আসর একই অর্থ তৈরি করে। ঘর আর আসর যেন তার কাছে একটি অন্যটির প্রতিবিম্বের মতো। আলকাপের স্বার্থে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঘরের বাইরে থাকতে হয়। আসরে

আসরে গান গেয়ে দিন কাটায় তারা। শিল্পের টানে তারা ঘরকে করে পর। তবে, কখনো কখনো ঝাঁকসুর ছোটকীর থেকেও বেশি ভালোবাসা দেখা যায় আলকাপ দলের ছোকরা শান্তির প্রতি। মুহূর্তের ব্যবধানে তাকে চোখে হারায়। এই শান্তি আলকাপ দলে ছোকরা চরিত্রে অভিনয় করে। শারীরিক গঠনে সে পুরুষ হলেও মানসিক দিক থেকে ঝাঁকসু তাকে প্রতি মুহূর্তে মেয়ের মতো করে গড়ে তুলতে চাইছেন। আলকাপে সেসময় খুব বেশি মেয়েরা অভিনয় করতো না। মেয়েদের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য যদিও তাদের এই প্রস্তুতি। তবে বাস্তবিক দিক থেকেও এই ছোকরা চরিত্রের প্রতি এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করেন ঝাঁকসা ওস্তাদ। তিনি তাদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন এক অদ্ভুত মায়ায়। শান্তি চরিত্রটির প্রতি তার এই আকর্ষণবশত তাকে নিজের মতো করে গড়ে পিটে নেয় ঝাঁকসু। তাকে গান শেখায়। এই চেষ্টা বাস্তবিক। লোকনাট্যের শিল্পীরা শিল্পের প্রয়োজনে কতটা আন্তরিক ছিল তা শক্তিনাথ ঝা এর আলকাপ প্রসঙ্গে এক আলোচনায় জানতে পারি। অধ্যাপক ঝা তাঁর *ঝাকসু* গ্রন্থে লিখছেন,

> কৃষি বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট শিক্ষিত এবং নব্য তপশিলি হিন্দু ইসলামি সমাজের কেউ কেউ প্রচুর টাকা এবং জমি বিনিয়োগ করেন। আলকাপ অপেরায়। ঝাকসু যেমন কাঞ্চনীকে জমি দিয়েছিলেন, তেমনই পরবর্তীকালে অনেক ক'জন ছোকরা এবং কাপ অভিনেতাকে তিনি বাড়িতে রাখতেন। আলকাপ ছিল তার নেশার মতো। এজন্য অভিনয় পাগল অনেক গ্রাম্য ধনী দরিক্দ্র হয়েছে। রানিনগরের সমৃদ্ধ পরিবারের সমীরুদ্দীন সরকার স্কুল ফাইনাল পাশ ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত ছোকরা নাচিয়ে ইন্দুদাশ বৈরাগ্যকে চার বিঘা জমি দিয়ে স্থায়িভাবে দলভুক্ত করেন।[৯]

আদরে বিহ্বলতায় নেশায় সে বার বার দেখেছে তার নিজের হাতে গড়ে তোলা এই শান্তিকে। তাকে সে পাশে বসিয়ে খাওয়ায়। আঁচাবার সময় কখনো বা হাতে জল ঢেলে দেয়। শান্তিকে বলেছে, সে যদি বাগদি সন্তান হয়ে না জন্মাতো তবে তার এঁটো পর্যন্ত সে

খেতো। একথা শুনে শান্তি ওস্তাদজীর তার প্রতি অত ভক্তির কারণ জানতে চায়। তার কটাক্ষ ঝাঁকসুকে যে সে মোল্লার মুরগিটাকে অর্থাৎ শান্তিকে জবাই করবে নাকি? শান্তি জানায় ঝাঁকসুর কাছে জবাই হওয়ার জন্য সে তার গলাটা বাড়িয়েই রেখেছে। তাদের ভিতরকার সম্পর্কের ইঙ্গিতটি পাঠকের বুঝতে বাকি থাকে না। তাদের নিজেদের মধ্যেকার এই সমস্ত হেঁয়ালিপূর্ণ কথাবার্তা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় নিচুজাতির মধ্যেকার উচ্চমন্যতার বেড়া। জাতি-বৈষম্যকে তুচ্ছ করে হিন্দু মুসলমানের ছোঁয়াকে এড়িয়ে এক পুরুষ অন্য পুরুষকে চায়। দেহে পুরুষ হয়ে ও মনের দিক থেকে নারী হয়েও শান্তি অন্য একটি পুরুষের সঙ্গ কামনা করে। সে অন্য পুরুষের ভোগ্য হতে চায়। প্রচলিত সমাজের চোখে তা ঠিক বিধিসম্মত আচরণ নয়। তবে শান্তি নিজেকে নারী মনে করে পুরুষের ভোগের শিকার হতে চায়। তারা নিজেদের জাতিগত বৈষম্যকে উপেক্ষা করে। শারীরিক দিক থেকে তারা যে পুরুষ হয়েও মানসিক দিক থেকে নারী। মানসিক নৈকট্যকে প্রধান করে লিঙ্গগত ব্যবধানকে ভুলে যায়। তুলসীচরণ মণ্ডল তাঁর *আলকাপ সম্রাট ঝাকসু* গ্রন্থে জানান, ‘আলকাপে যারা ছোকরা সাজে লম্বা চুল রাখে এবং নাকে নথ কানে দুল বাস্তব জীবনেও তাদের পরে থাকতে দেখা যায়।’[১০]

শিল্প জীবনের এই শান্তি তাই বাস্তব জীবনে যত অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের মেয়েদের মতো সুদীর্ঘ কেশ আর হাতে থাকে চুড়ি। দেহের গড়ন নিটোল আর মসৃণ মুখখানি। ঠিক রাতের শোভা যেমন চাঁদ, তেমনি আলকাপের শোভা এই ছোকরা। তারা পুরুষ হয়েও ঠিক পুরুষও নয়, আবার নারী হয়েও ঠিক নারীও নয়। দেহে কণ্ঠে মনে তারা একেবারে নারীসুলভ। ঝাঁকসা শান্তির নেশায় বিভোর হয়ে যায়। স্বপ্নেও সে শুধুই শান্তির পরশ চায়। সে একই সঙ্গে একদিকে পুরুষদেহী শান্তির নারীমনের ভালোবাসা পেতে চায়। আর অন্যদিকে তার প্রিয়তমা ছোটকী অর্থাৎ ঢপওয়ালীর নারী শরীরটিকে চায়। বাস্তবে

শারীরিক দিক থেকে নারীকে না পেলেও বাস্তবের এই অপূর্ণতাকে সে স্বপ্নে পূরণ করে। সে শান্তিকে কাছে পায়। তাকে ভোগ করে। তাকে ভালোও বাসে। তার শান্তির প্রতিই প্রাণের যত টান। কিন্তু শান্তি তো তা নয়। সে ঝাকসার চাওয়াকে পূরণ করতে চায়। পারে না। বাস্তবের পরিস্থিতিতে ধাক্কা খায় সে নিজেই। তার শরীর এবং মন দুই পথেই এগোয়। মেলেনা কিছুই। কী দেহে পুরুষ ও মনে নারী শান্তিদের জীবনে অশান্তি তাই শেষ হয় না। এ লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা জারিত। তানিয়া গোলদারের *লোকনাট্যে নারীশিল্পীরা* গ্রন্থে সিরাজের এই ধরনের চরিত্রের সমর্থন আমরা পাই। সেখানে ছোকরা চরিত্র নিয়ে তিনি যা বলেন-

> ঐসব পুরুষরা কণ্ঠস্বর মেয়েদের কণ্ঠস্বরের মতো করার চেষ্টা করে।এবং তারা বাস্তব জীবনেও ঐরকম মেয়েলি কণ্ঠস্বরেই কথা বলে। এই পুরুষ অভিনেতারা অনেক সময়ই নাকে নথ এবং কানে দুল পরে ঘুরে বেড়ায়।পুরুষ অভিনেতাদের চুল মেয়েদের মতো বড়ো হয়।পুরুষদের অঙ্গভঙ্গিগুলোও মেয়েদের মতো হয় এবং তাদের আচার-আচরণের মধ্যে নারীসুলভ ভাব লক্ষ্য করা যায়।[১১]

অন্যদিকে সমস্ত জগৎকে পিছনে ফেলে যে ঢপওয়ালী গঙ্গামণি ঝাঁকসার জন্য জীবন সমর্পণ করেছিল তার জীবনের ভালোবাসার কোনো মূল্যই দেয়নি ঝাঁকসু। গঙ্গামণির মানসিক ও দৈহিক কোনো আশাই পূরণ করে না সে। গঙ্গামণির জীবনেও শুরু হয় চূড়ান্ত টানাপোড়েন। শান্তিকে কেন্দ্র করে গঙ্গামণির যত ঈর্ষা। তাই তার মনে ঝাঁকসুকে কাছে পাওয়ার সুপ্ত বাসনাটি রয়েই গেল। সে মনে মনে ভাবে সে গঙ্গামণি না হয়ে যদি শান্তি হত! গঙ্গামণি ঝাঁকসার কাছে ভালোবাসা পায়নি। মনে ও দেহে সবেতেই গঙ্গামণিকে ঝাঁকসা বঞ্চিত করেছে। এবারে তাই গঙ্গামণি ঝুঁকেছে ঝাঁকসুর ভালোবাসা শান্তির দিকে। শান্তির মধ্যে কী আছে তা জানতে চায় গঙ্গামণি। এ চাওয়া তার না পাওয়া থেকে। এ অনেকটাই ঈর্ষা বশত। শান্তি যে আদতে পুরুষ, গঙ্গামণি তার সেই বিস্মৃত সত্তাটিকে কামনার দ্বারা

উত্তেজিত করে শান্তির ভেতরকার পুরুষ শরীরটাকে চিনিয়ে দেয়। গঙ্গামণির এই আচরণের কারণটা কি? এই ঘটনা থেকে আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না গঙ্গার এই চাওয়া তো শান্তিকে ভোগ করতে চাওয়া নয়। তবে! এ কী প্রতিহিংসা থেকে জাগ্রত? এই জটিল প্রশ্নের উত্তরে পাঠক যতই বিভ্রান্ত হোক না কেন, গঙ্গার এ কাজের পিছনে রয়েছে ঝাঁকসা ও শান্তির সম্পর্ককে নষ্ট করার উদ্দেশ্য। ঘটনাক্রমে আমরা দেখেছি ঝাঁকসাও শান্তি ও গঙ্গামণির এই মাখামাখিকে মেনে নিতে পারে না। এরপরে শান্তি পালিয়ে গেছে ঝাঁকসার কাছ থেকে। গঙ্গামণি ভেবেছিল শান্তি পালালে সে হয়তো শান্তি পাবে। ঝাঁকসা ওস্তাদ তার ছোটকিকে নিয়েই বাঁচবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। শান্তি আর গঙ্গামণির নষ্টামিকে দেখে ঝাঁকসার অনুমান শান্তিকে পেতেই বুঝি বা ঝাঁকসার গঙ্গার তার কাছে আসা। দেখা যায় ঝাঁকসার মনের মানুষ শান্তির পালিয়ে যাওয়ায় তার অবস্থা যেন 'মণিহারা ফণী'। যদিও শান্তির প্রতি ভালোবাসাকে কি নামকরণে বর্ণনা করবে বা ব্যাখ্যা করবে তা জানা নেই ঝাঁকসার। সে ঘর ও আসরকে মিশিয়ে ফেলে বলে-

> "...ঘরে ছিল রাজপুত্র- রূপবান। শয়তান মাগী তাকে ভুলাল- পুত্রসমকুমারকে ...তা'পরে কিনা...
>
> ফজল একটু ভেবে বলে, পুত্র?
>
> ক্যানে, ধরুন যদি অন্য কেউ হয়- ক্ষতি কি? পুত্র হওয়াটা...[১২]

দলের এই একান্ত কাছের মানুষটির উপর ঝাঁকসার গর্জন বর্ষিত হয় অশ্লীল গালিগালাজের সঙ্গে। ঝাঁকসু আর শান্তির সম্পর্কের রসায়নটা ধাঁধা তৈরি করে ফজলের মনে। শান্তি পালানোর পরও গঙ্গামণি ঝাঁকসার ভালোবাসা তো একেবারেই পায়নি। বরং ঝাঁকসা সেই গঙ্গামণি ও শান্তির সেই ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের দৃশ্য দেখে একদিনের জন্যও গঙ্গামণির কাছে যায়নি। আলকাপের আসরই তার কাছে হয়েছে ঘর সংসার। আর সেই শিল্প

সংসারের আসরেই সে মেতেছে। ঝাঁকসু তার খোঁজ পর্যন্ত নেয়নি। আসরে বসেই তার সন্দেহ গঙ্গামণি নিশ্চিত পালিয়েছে। সে নিজের মনকে বোঝায় ‘কুলটা নারী’ যদি চলে যায়, যাক। সে মনে করে যদি গঙ্গামণি তার জীবন থেকে চলে যায় তবে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। এমনকি তার সিদ্ধান্ত সে আর ফিরবে না তার ঘরে। ঝাঁকসা কখনোই নারী মনকে বোঝেনি। আগের দুই স্ত্রীর প্রতি সে শুধু টাকা মিটিয়েই সে তার সমস্ত কর্তব্য শেষ করেছে। গঙ্গামণির ক্ষেত্রে সে প্রথম দিকে কিছুটা টান অনুভব করলেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের কোনো মূল্যই সে দেয়নি। এর কারণটি গঙ্গামণিও বোঝে। আর এ কারণেই গঙ্গার প্রতি ঝাঁকসার ভালোবাসায় ঘাটতি ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবেই ঝাঁকসাকে ভালোবেসেই যে গঙ্গা সমস্ত কিছু ত্যাগ করে তার কাছে ছুটে এসেছিল, ঝাঁকসার ভালোবাসার আশ্রয় না পেয়ে সে বেছে নিয়েছে আত্মহত্যার পথ। এভাবেই সিরাজ নারী-পুরুষ মনস্তত্ত্বের জটিলতার নানা ডাইমেনশনকে দেখিয়েছেন।

আলকাপের আসর চলাকালীন একদিন আচমকা প্রসন্নের মুখে ঝাঁকসা শুনতে পায় ঢপওয়ালী গঙ্গামণির আত্মহত্যার খবর। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সে কিছুক্ষণ প্রসন্নের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ঝাঁকসুর আলকাপ দলের সাকরেদ ফজল ঝাঁকসুকে কখনো কাঁদতে দেখেনি। গঙ্গামণির মৃত্যুর খবরে ওস্তাদের চোখের জল ফজলের দৃষ্টি এড়ায় না। হঠাৎ ঝাঁকসাকে বলতে শোনা যায়-

> কাঁদছি না ফজল। যদি বা কাঁদি এতো আমার আনন্দের কাঁদন। ফজল, ঢপওয়ালীর বদলে যদি আমার শান্তি বিষ খেয়ে মরত, তাহলে কেমন করে বেঁচে থাকতাম! সে কথা ভেবেই আমি কাঁদছি।[১৩]

ঝাঁকসার এই বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি মৃত্যুর পরেও ঢপওয়ালীর জন্য কোনো সহমর্মিতা নেই তার। এমনকি গঙ্গামণির মৃতুতেও গঙ্গার জন্য তার একফোঁটা

চোখের জল পড়েনি। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে তাকে শেষ দেখার ইচ্ছে পর্যন্ত হয়নি ওস্তাদের। ঝাঁকসার মনে মনে এই গঙ্গামণির প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা। গঙ্গামণির প্রতি ঝাঁকসার এই অমানবিক আচরণকে শেষ অবধি মেনে নিতে পারেনি ফজল। মানবিকতার খাতিরে কর্তব্যের টানে সে ধনপতনগরে পৌঁছেছে। এক সমাজ পরিত্যক্তা গেণে সম্প্রদায়ের নারীর মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থানও যে কতটা মর্মান্তিক হতে পারে সিরাজ সেই ভয়ংকর দৃশ্যের সাক্ষী করিয়েছেন ফজলকে। এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের নিষ্ঠুর সমাজের তথা ব্যক্তিক, জাতিগত কারণে নির্লিপ্ত থাকার মানবিক, সামাজিক দূষণকে দেখালেন সিরাজ।

> এলোমেলো অনেকটা চুলের নীচে- মুখের দুটো পাশে মাংস নেই, বড়ো বড়ো দাঁত- নাকটায় গর্ত, চোখে গর্ত, আধখানা দেহ, একটা পচা স্তন...
> মাটি থেকে টেনে তুলছে শেয়ালগুলো। শকুনের ঝাঁক যাচ্ছে ঝাঁপিয়ে। তীক্ষ্ণ চিৎকারে ডানার ঝাপটায় কানে তালা ধরে যায়। দুর্গন্ধে বমি চলে আসে। ঢিল মানে না, হাঁকডাক গ্রাহ্য করে না – একগাল ক্ষুধার্ত রাক্ষস কী কাণ্ড না করছে।[১৪]

ফজলের কাজ আলকাপে সঙ সাজিয়ে লোক হাসানো। সেই ফজলের হৃদয়ও বাঁধ মানেনি গঙ্গামণির মৃত্যুতে। চোখ ফেটে জল এসেছিল তার। আপশোশ, অসহায়তায় গুমরে গুমরে কেঁদে সে এই মানবজন্মকে ধিক্কার দিয়েছিল। মানবজীবনের এই অসহায় পরিণতিকে কিছুতেই সে মেনে নিতে পারছিল না।

একজন খ্যামটা নাচিয়ে নারীর জীবনের এই মর্মান্তিক পরিণতির দায় ঠিক কার? এ প্রশ্নের উত্তরে ঝাঁকসুর কথাই মনে আসে একেবারে প্রথমে। জীবনে কিছু না পাওয়া এই ঢপওয়ালী ঝাঁকসুর মতো একজন শিল্পী মানুষকে নির্ভর করেছিল। সে তার কাছ থেকে নির্ভরতাও চেয়েছিল। কিন্তু সে জীবনে কিছুই পেল না। তার এ জীবনের মূলে রয়েছে ঝাঁকসা, শান্তি ও গঙ্গামণির জীবনের ত্রিকোণ সম্পর্কের জটিল মনস্তত্ত্ব। আর তারই পরিণাম

এই গঙ্গামণির আত্মহত্যা। গঙ্গামণি বেঁচে থাকাকালীন সময়েও ঝাঁকসা তার প্রতি সুবিচার করেনি। আর মৃত্যুর পরেও সে একজন প্রেমিকের যেটুকু দায় থাকা উচিত তা এড়িয়ে গেছে। প্রচলিত সমাজও গঙ্গার প্রতি সাধারণ সৎকারের কোনো ব্যবস্থা করেনি। জাতপাতের ব্যবধানের কারণে মৃতদেহ সৎকারের সমস্ত দায় দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে।

পতিতা গেনে ঢপওয়ালীর লাশ হিন্দুও ছোঁয় না, মুসলমানও ছোঁয় না ঘেন্নায়। আর সেই কারণেই কাঠ তো দূরের কথা, পাটকাঠিও জোটে না তার। সৎকারের জন্যও কেউ এগিয়ে আসে না। ঝাঁকসুর গঙ্গামণির সঙ্গে এহেন অন্যায় আচরণের কারণে ফজল তাকে দোষারোপ করে। ফজল ঝাঁকসার উপর রেগে গিয়ে তাকে বলেছে ঝাঁকসা কেমন যেন মানুষ নয়। সে নাকি একটা 'আজরাইল'।[১৫]

কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি নতুন আলকাপ দলের প্রসঙ্গ আসে। এই নতুন দলটি রাঢ় অঞ্চলের একটি শিক্ষিত আলকাপ দল সনাতনের দল। রাঢ় অঞ্চলের শিক্ষিত আলকাপ দলের ওস্তাদ সনাতনের বাল্য যৌবনের শুভাকাঙ্ক্ষী একটি মেয়ে। তার নাম সুধা। ঝাঁকসার সঙ্গে পালা দিতে আসা আলকাপের আসরের মেলা প্রাঙ্গণে আবাল্য সহচরীর সঙ্গে সনাতনের বহুদিন পরে দেখা হয়। ছেলেবেলায় তারা শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা করেছে একই ওস্তাদের কাছে। পারিবারিক চাপে এক বৃদ্ধ পণ্ডিতের সঙ্গে সুধার বিয়ে হয়। মনে মনে সে ভালোবাসতো সনাতনকে। সুধার সংগীত চর্চাকে কখনোই মর্যাদা দেয় নি বৃদ্ধ পণ্ডিত। বহুদিন সনাতনের সঙ্গে সুধার কোনো যোগাযোগ ছিল না। বহুদিনের ব্যবধানে সনাতনের সঙ্গে দেখা হয়ে সুধার মন সনাতনের হৃদয়ের কাছে ধরা দেয়। সনাতন আনিসের আলকাপ দলের ওস্তাদ। সুবর্ণ নামে এক ছোকরা তার দলেও উপস্থিত। বছর সতেরোর মেয়েলি চেহারার তরুণ পুরুষ সুবর্ণ। সনাতন তাকে প্রথম দিনের পরিচয়ে মেয়ে বলে ভুল

করেছিল। মাঝে মাঝেই সে সুবর্ণকে রঙ্গিন চুড়ি, চুলের ক্লিপ কিনে দেয়। অনেক সময় সে নিজে হাতে করে সাবান মাখিয়ে দেয়। স্নান করিয়ে দেয়। সুবর্ণও সচেতন সনাতনের বিষয়ে। তাকে সে শ্রদ্ধাও করে আবার ভালোও বাসে। সনাতনও এক অদ্ভুত মায়ার টানে তাকে জড়িয়ে ধরে। ঠোঁটে চুম্বন করে। সুধা সনাতনের আলকাপ দলে যুক্ত হওয়াকে মন থেকে মেনে নিতে পারে না। সুধা, সনাতন ও সুবর্ণের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণকেও লক্ষ্য করে। সুধা আলকাপের কিশোরের নাচ গান সম্পর্কে ভর্ৎসনা করে 'মিঙ্গেনাচানো' কথাটা বলে। এই একই ধরনের কথার সুর আমরা পেয়েছিলাম গঙ্গামণির মধ্যে। এই প্রয়োগ সনাতনের মৌমাছির দংশন জ্বালার মতো বিঁধতে থাকে। এ কথায় তার শিল্পী সত্তা আরও বেশি করে আহত ও অপমানিত হয়। সনাতনকে সুধা বলে ফেলে সুবর্ণকে তার কেমন যেন সতীনের মতো লাগে। আমরা অনুমান করতে পারি, সুবর্ণ ও সনাতনের সম্পর্ককে সুধা মেনে নিতে পারে না। এক পুরুষকে কেন্দ্র করে একজন নারীর অপর এক নারীর প্রতি এই আচরণ সঙ্গত। কিন্তু সুবর্ণ তো পুরুষ। তবে? সনাতনের সুবর্ণের প্রতি এই আকর্ষণ কেন হয় তা সে বোঝে না। সুধার প্রতি তার আকর্ষণের ব্যাখ্যা তার জানা। তাই সে সুবর্ণর প্রতি টানকে মাঝে মাজেই ধিক্কার দেয়। সুবর্ণকে গালিগালাজ করে। আমরা ঝাঁকসাকেও এমনটাই করতে দেখেছিলাম। অকথ্য গালিগালাজ করে সে পরক্ষণেই সব কিছু ভুলে সুবর্ণকে বুকে টেনে নেয়। সুধা আদি ও অকৃত্রিম সনাতনকেই ভালোবাসে। একদিন সে তার পারিবারিক সমস্ত বাধাকে ছিন্ন করে সনাতনের কাছে চলে আসে। পরিচিত জনসমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে সনাতনের সঙ্গে নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস বড়োই নিষ্ঠুর। আলকাপ দলের দুই শয়তানের চক্রান্তে সুবর্ণ ও সনাতনের অগোচরে ধর্ষিত হতে হয় তাকে। এরপর তাকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে রেখে তারা চলে যায়।

জীবন বড়ো বিচিত্র। এই উপন্যাসে দেখলাম একদিকে গঙ্গামণিরা, সুধারা যেমন অসহায়, অন্যভাবে অসহায় শান্তি ও সুবর্ণরাও। শান্তি ও সুবর্ণরা শারীরিক দিক থেকে পুরুষ। কিন্তু মনোগত দিক থেকে তারা নারী। আর নারী মনে অভ্যস্ত হওয়া এই পুরুষের প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে তাদের দেহেও আসে নারী সৌষ্ঠব। তারাও বোঝে যে তারা নারী। তাই এখন তাদের ভালোবাসা পুরুষের উপর। আলোচ্য *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসে শান্তি ও সুবর্ণরা তাই ঝাঁকসু ওস্তাদ ও সনাতন ওস্তাদের উপর অধিকার থেকে নিজেদের বঞ্চিত করতে চায়নি। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে শিল্পী ঝাঁকসু ও সনাতনও। নিজেদের শিল্পের খাতিরে এই ধরনের ছোকরা চরিত্রকে কাজে লাগিয়েছে। আর তাদের নারী মনে নিজেদের পুরুষত্বকে সঁপে দিয়ে এক অমর্ত্য মায়ায় বেঁধে রেখেছে নিজেদেরই প্রয়োজনে। কারণ এই সমর্পণ যদি আন্তরিক হত তবে কী বিপরীত লিঙ্গের নারীর সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হতে পারত ঝাঁকসু? আবার প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহের পরও কী সে পারত গঙ্গামণিকে তৃতীয় স্ত্রীর মর্যাদা দিতে? এই ধরনের চেষ্টা তো শান্তির ক্ষেত্রে দেখি না। অথচ তাকে দেখি মাঝরাতে শান্তির সঙ্গে রোমান্টিক বিলাস করতে। যদি বা শান্তির সঙ্গে তার এই আচরণ নিখাদ হবে তবে গঙ্গামণি নষ্ট হলে তার এত সমস্যাটি ঠিক কোথায়! তবে কী শান্তির প্রতি তার এই আকর্ষণ প্রয়োজনের তাগিদে! শিল্পের স্বার্থে ! যদি তা না হবে তবে নিজের স্ত্রীর প্রতি তার এতো অমর্যাদা কিসের? প্রথম, দ্বিতীয় স্ত্রী তো বটেই তৃতীয় স্ত্রীর প্রতি তার এতো অবহেলা কেন ! নাকি নারীরা তাদের জীবনের প্রয়োজনের সামগ্রী? যখন যেমন প্রয়োজন তখন তাদের সেই মতো ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে দেহ-মনের নারী তো বটেই পুরুষদেহী নারীদের সঙ্গেও তাদের প্রতারণা। সুবর্ণকে আশা জাগিয়ে সুধার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে সনাতনের কৃতিত্ব কোথায় বোঝা যায় না। সুধার শেষ পরিণতিতে সনাতনের বৈরাগী সিদ্ধান্ত অমানবিকতারই নামান্তর। কিছুক্ষণ আগেও যার সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্ন সে

দেখেছিল, তার খুনের বিহিত করা সে থামিয়েছে শিল্পের দোহাই দিয়ে। শিল্পীর কাছে শিল্পই বড়ো। এটা মেনেও বলা যায়, তবে কী সুধাকে সে পুরোটা দেয়নি যতটুকু একজন প্রেমিকের কাছে একজন প্রিয় আশা করে! এই পুরুষেরা সুবর্ণদের লালসা দেখায়। সুধা, গঙ্গামণিদেরও কাজে লাগায়। আর নারী মনকে পণ্য করে শিল্পের স্বার্থেই।

জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষ আনন্দ ও সুন্দরের প্রতীক। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক নানা জটিলতার কারণেই মানুষের আনন্দের ও সুন্দরের চেতনার উপর আস্তরণ জমে যায়। যারা শিল্প রসিক তারা সত্ত্ব ও রজ গুণের ধারক ও বাহক। যথার্থ শিল্প মানুষের ভিতরকার জটিল আস্তরণকে সরিয়ে রসবোধকে জাগায়। অন্যান্য শিল্পের মতো আলকাপেরও সেই একই কাজ। কিন্তু এই শিল্পের যারা অধিকারী, সেই শিল্পীদের মধ্যে সহিষ্ণুতার পরিবর্তে যখন নোংরামি এবং পাশবিকতা ঢুকে যায়, তখনই শিল্প কলুষিত হয়। পর্যুদস্ত হয় শিল্পী জীবন। সনাতনের আলকাপ দলেও এসেছে এরকমই দুর্নীতি, অবিশ্বাস, হিংস্রতা আর নির্লজ্জ কামনার লালসা। অসঙ্গতিপূর্ণ সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কৌতুকের আড়ালে দর্শককে আনন্দ দান করাই যাদের কাজ, তাদের কাছ থেকে তো এমনটি কাম্য নয়। এই নারীমাংসলোভীরা নিজেদের যৌন লালসাকে পরিতৃপ্ত করে নিজেদের বিকৃত আনন্দকে পান করতে গিয়ে। এই বিকৃত ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তারা একটি তরতাজা প্রাণকেও কেড়ে নিতে পিছপা হয় না। আলকাপ যা লোকশিক্ষার মাধ্যমে সমাজের নানারকমের ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতিকার করে সমাজকে বাঁচানোর কথা বলে, সেখানেও তবে কী নারীরা আশ্রয়হীন? ঠিক যেমনটি ঘটে সমাজেও। তাই আলকাপ দলে এই কদর্যতার অনুপ্রবেশের পর তাদের মধ্যে শিল্পগত একতা নষ্ট হতে থাকে। ভেঙ্গে যেতে থাকে অনেক দল। তবে যাঁরা আলকাপের যথার্থ শিল্পী, মনে-প্রাণে যারা শিল্পরসিক ও আনন্দের পূজারি তারা তাদের গানকে বাঁচিয়ে রাখে শাশ্বতকালের জন্য। তাই সৈয়দ মুস্তাফা

সিরাজ উপন্যাসের সমাপ্তি টানেন শিল্পজগতের সব রকমের কুরুচিকর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মুক্ত আনন্দ পিপাসু সনাতন ও সুবর্ণের পথ চলায়। যে পথের শেষে মিলবে 'আলকাপের সূর্য' ঝাঁকসুর সাক্ষাৎ।

৫.৩ *রহু চণ্ডালের হাড়* :

এই আলোচনায় খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে যায় অভিজিৎ সেনের *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসটি। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। উপনিবেশোত্তর চেতনার আলোকে প্রতিকায়িত এই উপন্যাসটি। উপন্যাসটি আসলে উত্তরবঙ্গের বাজিকরশ্রেণির মানুষের চলমান জীবনের অবসান ঘটিয়ে স্থিতির বা ঘরের অনুসন্ধান। এ আসলে যাযাবর জীবনে ভূমির অনুসন্ধান। তাদের কাছে জমির অর্থই স্থিতি। আর এই স্থিতির অর্থ পরিপূর্ণ সুখ। পাঁচ পুরুষ ধরে তাদের ভূমির টানে স্থিতির সন্ধানে বাজিকরদের এই পথচলা। বাজিকরদের দেড়শো বছরের জীবন ইতিহাসকে বর্ণনা করেছেন লেখক অভিজিৎ সেন। সেই পথচলায় ধরা পড়েছে তাদের গোটা জীবন। ঔপন্যাসিক আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানকে বর্ণনা করেছেন। তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, চাওয়া-না পাওয়া, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি, জীবিকা, সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কে বিবৃত করেছেন ঔপন্যাসিক। বাজিকরদের পেশা ও নেশা মূলত তাদের বাজিকরী বৃত্তি ও ভানুমতীর খেলা। এই খেলা দেখিয়েই মূলত তাদের বেঁচে থাকা। তবে তাদের জীবনের ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি সবটাই আবর্তিত হয়েছে বাজিকরদের জীবনবৃত্তের পরম্পরায়। তাদের অবস্থান সমাজের মূল স্রোতের বাইরে। তারা নিজেরাই জানে তাদের কোনো জাত নেই। তাদের নেই কোনো ধর্ম। তাদের গ্রহণ করে না হিন্দু। মুসলিমরাও তাদের জাতে তোলে না। নমঃশূদ্ররাও তাদের মেয়েকে বাজিকরদের হাতে তুলে দিতে চায় না। বাজিকর মেয়ে ও অন্য সমাজের ছেলের ভালোবাসা বা প্রেমের

সম্পর্ক তৈরি হলেও তা পরিণতি পায় না। তারা স্থায়ী জমির সন্ধান করে কিন্তু বাস্তবে কোনো জমিতেই তাদের স্থায়ী বসত হয় না। তারা পায় না সামাজিক কোনো সম্মান। জমি দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বা প্রলোভনের লোভ দেখিয়ে বাজিকরদের দিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয় কিছু মানুষ। কিন্তু কাজ মিটে গেলেই তাদের ভাগ্যে জোটে অপমান আর অবজ্ঞা। উপন্যাসের শেষে লেখক শারিবা আর মালতীর নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখার কথা বলে চলমান বাজিকরদের স্থিতিশীল হওয়ার কথা বলেন। এই বাজিকরেরা আসলে সমাজ ব্রাত্য। তাদের না আছে কোনো সামাজিক স্বীকৃতি, না আছে কোনো মর্যাদা। মূল সমাজের মানুষ প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে তাদেরকে নানা ভাবে কাজে লাগান কোনো কিছু পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। কিন্তু মানুষ কাজ ফুরালেই পাজি। তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা তারা নিজেরাই ভুলে যায়। আর বাজিকরেরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থাকে। তাদের এই অবস্থা পাঁচ প্রজন্ম ধরে। এভাবেই বহমান তাদের জীবন। প্রান্তিক বাজিকরদের অন্যায় ভাবে খাটিয়ে নেওয়ার মতো তাদের উপর অন্যায় দাবীগুলি লেগেই থাকে। কখনো তাদের বসতিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। কখনো চলে নারীদের উপর অকথ্য নির্যাতন। নারীদেরকে ধর্ষিতা হতে হয় একাধিকবার। নির্বিচারে তাদের উপর খুন, জখম, অত্যাচার চলতে থাকে। আর যেখানে প্রান্তিক বাজিকর নর-নারীদের এই অবস্থা, সেখানে প্রান্তিক নারীদের অবস্থান যে আরও কতটা ভয়ংকর হতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তারা অত্যাচারিত হয় দুভাবে। একদিকে তারা যেমন নিজেদের সমাজের পুরুষের দ্বারা অত্যাচারিত হয়, পাশাপাশি উচ্চবর্গের মানুষেরাও তাদেরকে শোষণ করে নানাভাবে। প্রেমহীন যৌনতার নির্মম ও নির্দয় সত্যের মধ্যে দিয়ে তাদেরকে ব্যবহৃত হতে হয়। সপ্রেম যৌনতার সংশ্লেষ তাদের ভাগ্যে থাকে সোনার পাথর বাটির মতো। সাহিত্যিক মিহির

সেনগুপ্ত তাঁর 'অঙ্গ অনঙ্গ'[১৬] প্রবন্ধে যে অনভিপ্রেত অমোঘ সত্যের কথা বলেছেন তার ছাপ যেন সাহিত্যিক অভিজিৎ সেনের বয়ানে পেলাম আমরা।

এই উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলিকে লক্ষ্য করলেই বিষয়টি পাঠকের কাছে আরও সুস্পষ্ট হবে। বাজিকরেরা যে পথে চলে সে পথ খুব সহজ নয়। তারা পথ চলতে চলতে ভাঙে তবুও না থেমে তারা সেই পথেই এগিয়ে যায়। দেড়শো বছরের বাজিকর জীবনের পরম্পরায় তারা একের পর একটা স্তর পার করে আর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এই দেড়শো বছরের সময়ের বদলের সঙ্গে সঙ্গে যেমনভাবে বাজিকর জীবনেও পরিবর্তনের জোয়ার আসে, ঠিক তেমনভাবে তাদের উপর নেমে আসা শোষকবর্গের নির্মম অত্যাচারের চালচিত্রের কোনো পরিবর্তন হয় না। তাদের মতো শোষিত জীবনে প্রতিকারহীন লাঞ্ছনা ও অপমানের কোনোরূপ বদল হয় না। যাযাবর নারীরা নারী বলেই অনেক বেশি করে অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হয়। বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশে পরিবর্তন যতই আসুক, শিকড় চ্যুত প্রান্তিক যাযাবর বাজিকর গোষ্ঠীর জীবনে সেই পরিবর্তনের জোয়ার খুব বেশি একটা লাগেনি। উপন্যাসের পরতে পরতে আমরা অনেকগুলি সম্পর্কের বুননকে পাই। সে বুননের টান তৈরি হয়েছে মানবিক সম্পর্কের গাঢ়ত্বের বন্ধনে। আর এই বন্ধন আছে বলেই তারা মাটি ও স্থিতির সন্ধান করে।

রহু চণ্ডালের হাড় উপন্যাসের একটি অন্যতম নারী সালমা। আমরা দেখব, সালমার সঙ্গে পীতেমের এক গোপন ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। বাজিকরদের অন্যতম পূর্বপুরুষ দনুর যেমন বিয়ে করা স্ত্রী ছিল তেমনই পাশাপাশি অতিরিক্ত নারী হিসাবে তার জীবনে এসেছিল সালমার মা। সালমাই তার প্রথম সন্তান। সালমার মা সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন দনুর সাহায্যে সে পরপর দুবার গর্ভবতী হলেও প্রথম বারে সালমার প্রকৃত পিতা কে এ নিয়ে

সালমার মায়ের মনেই সংশয় ছিল। দ্বিতীয়বার সন্তান হতে গিয়ে সন্তানসহ সে নিজেই মারা যায়। লেখকের এই তথ্য থেকেই আমাদের জানতে অসুবিধা হয় না যে বাজিকর জনজাতির মধ্যে একটি নারী অনেক পুরুষের সঙ্গে মিলিত হত। সে হতে পারে মেয়েটির নিজের ইচ্ছেয় বা কখনো বাধ্য হয়ে। সালমার মা তার পিতার পরিচয় সঠিকভাবে দিতে পারেনি। তাই দনুর সন্তান পীতেমের সঙ্গে সালমার প্রকৃত সম্পর্ক কী হতে পারে তা নিয়েও পীতেম ও সালমার মনে গভীর সংশয় ছিল। কারণ তাদের পূর্বপুরুষ পুরা ও পালি জীবনের পরিণতি তাদের জীবনে এক জটিল সংকট তৈরি করে। দনুর সংসারেই সালমা মানুষ হয়। পীতেমের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই সালমার বেশ সখ্যতা ছিল। পীতেম সালমার উপর নির্ভর করত। সে যুবক পীতেমের উপর দুর্বার আকর্ষণ বোধ করে। পীতেমের অনেক আগে বিবাহ হয়। বাজিকরের দলে ও দলের বাইরে তার পাণিপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল অনেক। পুরুষের কাছে তার এই কদর দেখে সে নিজেকে দাম্ভিক মনে করে। যার সম্পর্কে এই ধরনের স্তুতি করা হয় তার নিজের সম্পর্কে উন্নাসিকতার কারণে বিবাহের সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হয়। শেষ অবধি তার আর বিয়ে করাই হয় না। একসময় যার পুরুষের কাছে এত কদর ছিল, শেষে তার সেই প্রেমিকেরা হতাশ হয়ে সংখ্যায় কমতে থাকল। তার নিজের প্রতি দম্ভ তাকে এই ব্যাপারে সতর্ক করায় নি। তার পরে একসময় সে নিজেকে নিঃসঙ্গ দেখেছিল। যৌবনের প্রবল আকর্ষণ ছিল যার উপর সেই পীতেম ও তার স্ত্রীর দাম্পত্য সুখ ও মত্ততা তাকে আরও নিঃসঙ্গ করেছিল। এই নিঃসঙ্গতা আর পীতেমের স্ত্রীয়ের প্রতি ঈর্ষা থেকে পীতেমের স্ত্রীকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে শুরু করে। এরপরে একসময় যখন পীতেমের বউ রোগগ্রস্ত হয়, সেই সময় সালমা তার উপর আরও বেশি করে মানসিকভাবে অত্যাচার শুরু করে। একসময় পীতেমের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। দনু তার সন্তান পীতেমকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেও পীতেম আর সেই প্রস্তাবে রাজী হয় না। তবে পীতেমের এই বিয়ে না করার কারণ

এমনটা নয় যে সালমা তার জীবনে অপরিহার্য ছিল। আসলে সালমার নিঃসঙ্গ জীবন পীতেমকেও পীড়িত করত। এই সময় যদি কখনো পীতেম ও সালমার বিয়ের প্রসঙ্গ উঠতো তবে তারা উভয়েই শিউরে উঠতো এই ভেবে যে তাদের ধমনীতে একই রক্ত বইছে কিনা। কারণ তারা এ বিষয়ে একেবারে সংশয়শূন্য ছিল না। আর পুরা ও পালির স্মৃতি ও সংস্কার তাদের জীবনেও ক্রিয়া করেছে বারংবার। ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যে নারী পুরুষ তাদের জীবনের সংরাগকে উপেক্ষা করতে পারেনি। তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পঙ্গুত্ব ও দেবতাদের কুপিত দৃষ্টির প্রভাবে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলার মিথ ভাবিয়েছিল সালমা ও পীতেমকেও। পীতেমের জীবনের সংকটের দিনগুলিতে সালমা তার পাশে থেকেছে। নানা সমস্যা থেকে তাকে রক্ষা করেছে। পীতেমকে যুগিয়েছে মানসিক বল। পীতেমের বাজিকর জীবনে স্থিতির জন্য এগিয়ে চলা সালমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। জমিদার বদিউল ইসলামের কাছ থেকে সালমার জীবনের পরিবর্তে বাজিকররা পেয়েছিল কয়েক বিঘা জমি। আর এই জমি পাওয়ার কারণে সালমা পীতেমের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। তবে যে বাজিকরদের স্থিতির কথা ভেবে সে বাজিকর জীবন ত্যাগ করেছিল সেই বাজিকরদের হাতেই তাকে খুন হতে হয় নিরাপত্তাহীন অবস্থায়। পীতেমের কাছ থেকে সে সঙ্গ চেয়েছিল। আর এই নিয়ে সালমার মনে পীতেমের প্রতি প্রচ্ছন্ন অভিমান ছিল। পীতেম যদি জমি বা স্থিতির বদলে একবার বলতো সে সালমাকেই চায় তবে সে বদিউলের কাছে যেত না। তবে স্থায়িত্বের খোঁজ পীতেমের জীবনে ও তাদের বাজিকর শ্রেণির কাছে বেশি গুরুত্ব পেল। পীতেম ছিল মানসিকভাবে দুর্বল প্রকৃতির। জীবনের বিভিন্ন অভিঘাতে সালমা পীতেমের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মানসিক শক্তি যুগিয়েছে। বিপদে আপদে সেই হয়ে উঠেছে পীতেমের মানসিক আশ্রয়। তবে একসময় দারোগা জানকীরামের হাত থেকে পীতেমকে বাঁচাতে সালমা তার নিজের দেহকে ব্যবহার করেছে। পীতেমের উপর নেমে আসা

অত্যাচারকে সালমা মেনে নিতে পারে না। পীতেমকে বাঁচাতে সে দারোগার উপর বলপ্রয়োগ করে, ইশারা ইঙ্গিত করে। সে পীতেমকে দারোগার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তার পা ধরে ক্ষমা চায়। এতেও শান্ত না করতে পেরে ক্রুদ্ধ সাপের মতো উত্তেজিত সে নিজের দেহ দিয়ে দারোগাকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে অসুস্থ পীতেমকে বাঁচাতে। পীতেমকে দারোগাদের হাত থেকে বাঁচাতে সে নিজে দারোগার কামুক চোখের লালসার শিকার হতেও আপত্তি তোলে না। অভিজিৎ সেনের বর্ণনায়-

> সালমা শুধু তার মুখকে আঘাত থেকে আড়াল করার চেষ্টা করছিল। তারপর যখন দেখে দারোগা তাকে সম্পূর্ন বিবস্ত্র করার প্রয়াস পাচ্ছে, সে আর বাধা দিল না। সে বুঝতে পারে, এবার জানকীরামের নেশা ধরে গেছে। পুরুষ চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা গভীর। সে এই ভেবে স্বস্তি পায় যে আপাতত ক্রুদ্ধ দানবীয় মানুষটাকে পীতেমের উপরে আঘাত করা থেকে নিরস্ত করতে পেরেছে[১৭]

এইভাবে আমরা দেখলাম, বিভিন্ন সময়ে নানা বিপদের হাত থেকে সালমা পীতেমকে বাঁচিয়েছে। আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না পীতেমের প্রতি সালমার ভালোবাসা। জীবনে যে শুধুমাত্র সালমার জন্যেই যে জীবনে বেঁচে আছে সেই পীতেম সালমার ভালোবাসার মূল্য দেয়নি। পীতেমের বাজিকরদের জন্য স্থিতির অনুসন্ধান করা তার কাছে সালমার জীবনের থেকেও হয়তো বা বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। বদিউলের কাছ থেকে পীতেম সালমার জীবনের বিনিময়ে বাজিকরদের জন্য কয়েক বিঘা জমি পেয়েছিল। জমিকে পাওয়ার বদলে সালমা পীতেমের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। এই জন্যই তার মনে জেগেছিল পীতেমের প্রতি প্রচ্ছন্ন অভিমান। আর এই অভিমানের কোনো মূল্যই দিল না পীতেম। পীতেম যদি সালমাকে একবার বলতো যে তার জমির দরকার নেই আর সালমা বদিউলের কাছে না গিয়ে বাকি জীবনটা তার কাছেই থাক, তবে সালমা হয়তো বদিউলের কাছে যেত না। কিন্তু

পীতেমের কাছে সালমার মতো এক নারীর থেকেও বাজিকরদের স্থিতির গুরুত্ব বেশি। যে সালমা নিজেকে দারোগার কাছে বিবস্ত্র করেছে পীতেমকে তার অত্যাচার থেকে নিরস্ত্র করতে, সেই পীতেমের কাছে তার জীবনের গুরুত্ব না থাকায় সে মন থেকে পীতেমের এই ব্যবহারকে মেনে নিতে পারেনি। সেই কারণেই হয়তো সালমা আর তার বাকি জীবনে পীতেমের খোঁজ নেয়নি। অথচ সালমার প্রতি এরকম আচরণের পরেও দেখা যায় পীতেমের মৃত্যুর সময়েও হয়তো বা সে যেন সালমার ভালোবাসাকেই কোথাও যেন পেতে চাইছে। তার অন্তিম জীবনের শেষ ইচ্ছাটি সঠিকভাবে বোঝা যায়নি। সালমার জীবনে পীতেমের মৃত্যু সংবাদ বেশ খানিকটা প্রভাব ফেলেছিল বলে আমাদের মনে হয়। এই খবরটিতে সালমা কাঁদেও না আবার চিৎকার করে শোকপ্রকাশ করে না। তার চোখে ভাসতে থাকে অতিপ্রাকৃত সব দৃশ্য আর অনির্দিষ্টতা। বাজিকরদের প্রতি তার রাগ আরও বাড়তে থাকে। আর বদিউলের কাছ থেকে বাজিকরেরা যে ভূমি পেয়েছে তার বদলে সালমা থেকে যায় বদিউলের কাছে। বৃদ্ধ বয়সে একাকিত্বের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই সালমার সাহচর্য চায় সে। যদিও বদিউল তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি। তার জন্য নতুন ঘর তৈরি করে দিল। মাসোহারারও ব্যবস্থা করে দিল। গাই মোষ কিনে দিল বেশ কয়েকটা। এভাবে একা নিরুপদ্রব জীবন কাটিয়ে সে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হল। এভাবে একদিন সে পীতেমের কথা, জামিরের কথা ভুলে গেল। তার কিছুদিন পরে বদিউল মারা যায়। যে ব্যক্তির কারণে সালমার জীবনে সম্মান জুটেছিল, সেই বদিউলের মৃত্যুর পর সালমা নিজের প্রকৃত অবস্থান আরও ভালো ভাবে বোঝে। সালমাকে কোনো দিনও বদিউলের কাফেনের ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সালমা তার জানলায় দাঁড়িয়ে বদিউলের শবদেহ দেখেছিল। আদতে সে সমাজে কী পরিমাণে অবাঞ্ছিত এবার তা টের পেয়েছিল। আসলে বাউদিয়া রমণীর অবস্থানটি সে বদিউলের অনুপস্থিতিতে টের পেয়েছিল। তার যতই পয়সা, সম্পত্তি থাক না

কেন সে বুঝেছিল প্রকৃতপক্ষে সে কোনোভাবেই সম্ভ্রান্ত তো নয়ই, সে আদতে এক পশুপালিকা বৃদ্ধা। বদিউলের ধর্ম যে মুসলিম তা আমরা বুঝেছি, কিন্তু বাউদিয়া মেয়ে সালমা আদতে বাজিকর মেয়েই থেকে গেল। সে বদিউলের মৃত্যুর পর একদিকে যেমন মুসলিম বদিউলের পরিবারের দিক থেকে অত্যাচারিত ও অপমানিত হল, অন্যদিকে আমরা দেখব উপন্যাসে সে তার বাজিকর জাতির দ্বারাও পেয়েছে শুধু অপমান, ঈর্ষা আর অত্যাচার। এমনকি তাকে শেষ অবধি বাজিকরদের হাতেই ছুরিবিদ্ধ হয়ে খুন হতে হয়েছে। অথচ বাজিকরদের ভূমিদান করা হয়েছিল তার জীবনের বিনিময়েই। আমরা দেখতে পাব এক প্রান্তিক বাজিকর নারী হিসাবে সালমার জীবনের মূল্য সে অর্থে কেউই দেয়নি তাকে। বাজিকরদের আশ্রয় ভূমির যোগান দিয়ে জীবনের শেষ পর্বে একাকিত্বের মধ্যে কাটিয়েছে সে। পীতেমের কাছ থেকে যে সাহচর্য সে আশা করেছিল তার অন্তিম জীবনে তা সে পেল না। আবার বদিউল যতই তাকে ভালোবাসার খেলা দেখাক তা আদতে হয়তো বা খেলাই ছিল। আর তাই সে তাকে তার স্ত্রী-এর সম্মান দেয়নি। বদিউলের মৃত্যুর পর সালমা তা অনুধাবন করেছিল। আসলে সে যেমন একদিকে বাজিকর শ্রেণির দ্বারা অত্যাচারিত ও অবহেলিত, তেমনি মুসলিম সমাজের দ্বারাও নির্যাতিত এক নারী। তার নারী জীবনের পিছনে আছে এক শুধুই বঞ্চনা আর উপেক্ষা।

রহু চণ্ডালের হাড় উপন্যাসে আমরা পেমা নামে আরেকটি নারীকে পাব যে সামাজিকভাবে ক্ষমতাবান এক উচ্চবিত্ত পুরুষের লালসা ও ভোগের শিকার হয়েছে। তবে পেমার এই জীবনের জন্য সে নিজেও অনেকটাই দায়ী। বাজিকর ধন্দুর ছোট বোন পেমা। আরওহী দারোগা পুত্র আনন্দরাম লাস্যময়ী ও রহস্যময়ী নারী পেমার যুবতী শরীরের নেশায় মাতে। যাযাবর যুবতী নারীর শরীরের মোহনীয়তায় আকৃষ্ট হয়ে যেন তেন প্রকারে তাকে ভোগ করতে চায়। যাযাবর বাজিকরী নারীদের রূপের লাবণ্যে তারা চিরকালের গর্বিত।

সালমার মধ্যেও আমরা এই বিষয়টি দেখেছি। সেও ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল দারোগাপুত্র আনন্দের সঙ্গে। আনন্দের দেহের বলিষ্ঠ গঠন পেমাকে মুগ্ধ করেছে। আনন্দ প্রাথমিক আকর্ষণে পেমাকে অনেক সুখস্বপ্নে ভুলাতে চেষ্টা করেছে এবং পেরেছেও। সালমা জীবনের ও বয়সের অভিজ্ঞতায় অনেক বেশি অভিজ্ঞ। পেমার সঙ্গে কী হতে চলেছে তা বুঝতে পেরে সালমাকে সাবধান করতে চেষ্টা করেছে। আনন্দের রূপ ও যৌবনে ভুলে গিয়ে সে তার নিজের অবস্থানকে ভুলে গিয়েছিল। এরপরে আমরা দেখছি পেমা আনন্দের সঙ্গে পালিয়েছে। পেমা সালমার কাছে তার ভাগ্যগণনা করেছে। সে আনন্দের জীবনে ঘোড়ি হয়ে থাকতে চেয়েছে তাকেই ভালোবেসে। কিন্তু সালমা বাজিকরের জীবনের সার কথাটি বলেছে পেমার কাছে। বাজিকর জাতটাই নাকি যে কোনো ছুতোয় বাঁধা পড়তে চায়। সালমা পেমার শরীরের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করে পেমা অন্তঃসত্ত্বা। এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে সালমা পেমার জীবনের ভবিষ্যৎ ভেবে আশঙ্কিত হয় এই ভেবে যে পেমার জীবনে কী ঘটতে চলেছে। সালমার পেমার জীবনের কথা ভেবে তার প্রতি করুণা হয়েছে। পেমা তার ভালোবাসার দিক থেকে সৎ। সে আনন্দকে তার সন্তানের কথা জানায় নি। পেমা ভাবে সত্যি তার ভালোবাসার মানুষ আনন্দ যখন পেমার গর্ভে থাকা আনন্দের সন্তানের কথা জানতে পারবে তখন সে তার এই রাখনি ও সন্তানকে অস্বীকার করবে। সালমার জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক। তাই সে জানে, আনন্দের পেমার শরীরের নেশা কেটে গেলে তাকে মেরে তাড়িয়ে দেবে। এ সত্য সবাই জানে। কিন্তু পেমা এই সত্যকে মানবে কেন? কারণ, সে তো আনন্দকে সত্যিই ভালোবাসে। আর একদিন সালমা তাকে জানিয়েছিল বাজিকর নারীদের স্থান সমাজের চোখে বেশ্যার সমান। অর্থাৎ এই কথাটির থেকে বোঝা যাচ্ছে বাজিকর মেয়ে হিসাবে পেমার স্থান আর আনন্দের জীবনে রাখনি পেমার স্থান আদতে এক। তবে পেমার যত গর্ভ সঞ্চার হয় ততই তার কাছে আনন্দের যাতায়াত কমতে থাকে। আনন্দের জীবনে

পেমার প্রতি আনন্দ ক্রমশ দমিত হতে থাকল। আর শেষ পর্যন্ত একদিন পুরোপুরিই তার ঘরে আনন্দের যাতায়াত বন্ধ হল। আনন্দ যখন তার কাছে বেশীক্ষণ সময় কাটাতে চায় না, তখন পেমার অপমানবোধ আরও বাড়তে থাকল। সালমার তার জীবন সম্পর্কে বলা সাবধানবাণীই শেষ অবধি সত্য হল। আনন্দের প্রতি সে খুব অপমানিত বোধ করে। একসময় তাকে পরিচারিকার দ্বারা বিতাড়িত হতে হয়েছে। এ ধরনের অপমান বাজিকর যুবতী হিসাবে পেমার অহংবোধে প্রবলভাবে আঘাত করেছে। সে ক্রমশ হয়ে উঠেছে প্রতিহিংসাপরায়ণ। অপমান থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করতে এবং আনন্দের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতা থেকে পেমা আনন্দের দিকে ছুরি নিক্ষেপ করেছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সে ছুরি বিদ্ধ করে আনন্দের ঘোড়াকে। সেই ঘোড়াটির চাটের বাড়িতে আনন্দ খুন হয়। রাতের অন্ধকারে পেমা ফিরে এসেছে বাজিকরের ছাউনিতে। যে সমাজকে উপেক্ষা করে পেমা আনন্দের সঙ্গে সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল, সেই ভালোবাসার মানুষটির কাছ থেকে সে পেল না কোনো মর্যাদা। পেল না স্ত্রীর অধিকার, মর্যাদা। পেমা যে ভালোবাসার প্রতি বিশ্বাসে নিজের জাতি কুল ত্যাগ করেছিল আনন্দ তার সেই ভালোবাসা আর বিশ্বাসকে বুঝতেই চেষ্টা করেনি। সে শুধু ভোগ করতে জানে। ভোগের ফলের দায় সে নিতে নারাজ। তাই পেমা যতদিন তার কামনার চাহিদাকে মিটিয়েছে ততদিনই তার মূল্য। কিন্তু যখনই সে তার কামের চাহিদা মেটাতে পারেনি তখন তার প্রয়োজন নেই। আনন্দের ঔরসে পেমার যে গর্ভের সন্তান তার দায় পেমার একার নয়। তাদের দুজনেরই। জীবন অভিজ্ঞ সালমার পেমাকে করা সাবধানবানীকে একসময় পেমা কিছুতেই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। আনন্দ খুন হওয়ার ঘটনায় পেমার জীবনে ঘনিয়ে এল চরম দুর্ভোগ। দারোগাপুত্র সামাজিকভাবে প্রচণ্ড ক্ষমতাবান। তার মৃত্যুতে অত্যাচারের মাত্রা চরমে উঠল। পুলিশ পেমা সমেত আরও অনেক বাজিকরদের থানায় নিয়ে গেল। পেমার উপর নির্যাতনের মাত্রা দ্বিগুণ হল। যারা সমাজকে

তথা মানুষকে শাসন করছে তারাও নির্বিচারে সমর্থন করে চলেছে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের অন্যায়কে ও প্রশ্রয়কে। প্রকৃত অন্যায়টি আসলে কার সঙ্গে হয়েছে, প্রকৃতই বা কে দোষী এ সত্য সর্বসমক্ষে আসে না। থানায় পেমার প্রতি চলে অকথ্য নির্যাতন। একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীর প্রতি এই যে অত্যাচার প্রতি মুহূর্তে হয়ে চলেছে তার কোনো উপযুক্ত বিচার নেই। থানায় পেমার প্রতি চলতে থাকে অকথ্য অত্যাচার। এই নৃশংস অত্যাচারের পর পেমা ও তার সন্তান উভয়েই মারা যায়। এদিকে স্থিতির সন্ধানী পীতেম ও তার দলের অনেকে তারা পেমার ফিরে আসাকে ভালোভাবে নেয়নি। পেমাকে এ অবস্থায় ফেলে যেতে দেখে বাজিকরদের অনুশোচনা তো হবেই। তাই তারা মনে মনে পেমার মৃত্যু হোক এমনটাই চেয়েছিল।

১৯৮৫ সালে যখন অভিজিত সেনের এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হচ্ছে, তার ঘটনাকাল কিছুদিন আগের হলেও বাজিকরদের জীবনের অবস্থান খুব একটা বদলায়নি। সামাজিক স্বীকৃতি, সম্মান তারা কোনোদিনই সেভাবে পায় নি। আর বাজিকর রমণী হিসাবে যে সালমা ও পেমার জীবন বৃত্তান্ত আমরা জানতে পারলাম সে জীবনের পথটিও খুব সুগম নয়। বরং তাদের জীবনের বাঁকে বাঁকে জোটে শুধুই অপমান আর অত্যাচার। তাই তারা জীবনে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতেও পারে না। তাদের মৃত্যুগুলিও কোনো স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। কখনো উচ্চ ক্ষমতাবান মানুষের অত্যাচারকে নীরবে মেনে নিতে হয়। আর প্রতিবাদ করলে নৃশংসভাবে খুন হতে হয়। সমাজে, গোষ্ঠীতে, পরিবারে কোথাও তারা সুবিচার পর্যন্ত পায় না। প্রান্তিক নারী বলে সমস্ত কলঙ্কের বোঝা তার উপরেই চাপানো হয়। আবার কখনো বাজিকরদের নিজেদের গোষ্ঠীর মানুষের দ্বারাই খুন হতে হয় বাজিকর নারীকে। যার জীবনের বিনিময়ে তারা স্থিতির জন্য জমি পেয়েছিল তাকেই তারা খুন করলো। একাধারে তারা উচ্চবর্গের ও প্রান্তিক পুরুষের অত্যাচারে জর্জরিত। তদের জীবনে ভালোবাসা,

বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই। প্রান্তিক পুরুষের জীবনে প্রান্তিক নারী হিসাবে সালমার অবদানের কোনো মূল্যই নেই। এখানে প্রান্তিক নারীদের জীবনের এই সংকটকেই দেখিয়েছেন লেখক। উপন্যাসে আমরা দেখেছি, বাজিকর যুবতীরা যখন অন্য পুরুষের সঙ্গে সংসার করার স্বপ্ন দেখেছে তখন তা স্বপ্ন হয়েই রয়ে গেছে। আর এর কারণ তাদের সামাজিক অবস্থান। তাই বাজিকরের ছাউনিতে সমাজের গণ্যমান্য ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের বারংবার যাতায়াত লক্ষ্য করা যায়। তাদের উদ্দেশ্যটি যে যুবতী সুন্দরী বাজিকরী রমণী তা আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না। নির্বিচারে তাদের ধর্ষিত হতে হয়। কিন্তু তাদের শারীরিক ক্ষুধা নিবৃত্তির পর তারা তাদের নোংরা-আবর্জনার মতো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আশ্চর্যের বিষয় এই নোংরা তাদের গায়ে মাখে না। বাজিকরী মেয়েদের দেহ থেকে সেই নোংরা উঠতে চায় না। এ সমাজ বড়োই একপাক্ষিক। তার বিচারটাও সেরকমই। আর তারই ফল ভোগ করছে বাজিকর প্রান্তিক নারীরা। সেই কারণেই তাদের জীবনের এই সংকট।

৫.৪ *রসিক* :

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে **১৯৯১** সালে প্রকাশিত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক* উপন্যাসের নর-নারীকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক চাপান উতোর পর্ব চলে, সেটি আমদের অন্য আরেক ধরনের বাস্তবতাকে তুলে ধরে। সেই সঙ্গে লেখক দেখিয়েছেন ঝুমুর গাইয়েদের নাচনি রাখবার প্রথাকে। আবার একই সঙ্গে অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে রসিকের নিজের স্ত্রী ও নাচনিকে নিয়ে সংসার চালানোর মধ্যে দিয়ে তাদের এই ত্রিকৌণিক জীবনের জটিল আবর্তের টানাপোড়েনকে দেখিয়েছেন লেখক। অভাবের তাড়নায় নিষ্পাপ ফুলের মতো মেয়ে বিজুলিবালার তরতাজা প্রাণ কীভাবে পুরুষের ছোবলে প্রথমে 'রাখনি', ক্রমে 'নাচনি'র পর্যায়ে পৌঁছায়, তার ভয়াবহ একটি দলিল *রসিক* উপন্যাসটি। ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের

দেশে রসনাবালার মতো মায়েরা আজও আছে। খবরের কাগজ বা বাস্তবের জ্বলন্ত উদাহরণ এরা। *রসিক* উপন্যাসে রসনাবালা নিজের মাতৃত্বকে বিসর্জন দিয়েছে। পেটের সন্তান বিজুলিকে বিক্রি করেছে। যার হাতে মেয়েকে বিক্রি করেছে সেই ভরত সর্দার চেহারায় মানুষ কিন্তু আসলে একজন নারী খাদক। নারী তার কাছে ভোগ্য বস্তু। ভারতবর্ষের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে প্রান্তিক শ্রেণির রসনাবালার মতো মায়েরা আদতে হয়ে যায় পুরুষের মনোবাঞ্ছা পূরণের দরজা। এরা নারীদেরকে অত্যাচার করে নারীদেরকে কাজে লাগিয়েই। মেয়েদেরকে পুরুষের হাত থেকে প্রতিহত করা বা বা পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, রসনাবালার মতো মেয়েরা ক্ষমতা প্রদর্শন করে পুরুষের অন্যায়ের পথকে সুগম করতে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তাই পুরুষের পাশাপাশি কোথাও নারীরা নিজেরাও হয়ে যায় নিজেদের অত্যাচারের কারণ। বাস্তব জীবনে নিম্নবর্গের মধ্যে নারীর উপর পুরুষ যে কত অমানবিকভাবে আগ্রাসন চালাতে পারে তার অন্যতম উদাহরণ সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক* উপন্যাসটি। *রসিক*- এ রয়েছে পুরুলিয়ার ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের আদিবাসী মানুষের জীবনকথা। লেখকের কলমে ধরা পড়েছে সেই অঞ্চলের বর্ণিত মানুষের জীবনধারা। টিলাময় ভূপ্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট মানুষের জীবন। এহেন মানুষগুলির প্রাণের সংস্কৃতি ঝুমুর। ঝুমুর সংস্কৃতির মধ্যে সম্পৃক্ত রয়েছে একাধারে ঝুমুর নাচ ও গান। এই অঞ্চলের লোকজীবনের আত্মায় রয়েছে তাদের এ সংস্কৃতি। দারিদ্র্য তাদের জীবনের নিত্য সঙ্গী। আর এই দারিদ্র্যের সঙ্গে মিশেছে নারী পুরুষের জীবন সংগ্রাম ও তাদের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের নির্মম বাস্তবতা।

রসিক উপন্যাসের কাঠামো দুটি সমান্তরাল কাহিনিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। একদিকে রয়েছে বিজুলিবালা ও পাণ্ডবকুমারের কাহিনি, অন্যদিকে এই কাহিনির পাশাপাশি সমান্তরালভাবে চলেছে দুলালী ও তরণীসেনের আখ্যান। মূল এ দুটি কাহিনিকে ঘিরে

এসেছে অনেকগুলি উপকাহিনি ও বিচিত্র ধরনের চরিত্রেরা। আখ্যানের গঠনে প্রান্তিক সমাজের বর্ণময় নারী চরিত্ররা ভিড় করেছে *রসিক*- এ। উপন্যাসের শুরুতেই এক হতদরিদ্র পরিবারের কথা। পরিবারের সদস্য বলতে মা ও মেয়ে। মায়ের নাম রসনা আর মেয়ে বিজুলিবালা। তাদের অবলম্বন বলতে মায়ের কাছে মেয়ে ও মেয়ের কাছে মা। তারা কোনো পুরুষ শক্তির ছত্রছায়ায় আশ্রিতা নয়। কিন্তু খিদের জ্বালা সেই মা ও মেয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের গ্রন্থিতে ফাটল ধরিয়ে দেয়। আর প্রান্তিক সমাজের পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য সেই ফাটলকে ক্রমে মহীরুহে পরিণত করেছে। বিজুলি তার পিতা বিন্দা মাঝির অবর্তমানে মা রসনাবালাকেই জীবনের মূল অবলম্বন করেছিল। কিন্তু হতদরিদ্র স্বামীহারা রসনাবালা সমাজের দ্বারা নিষ্পেষিত হয়ে মাতৃত্বকে বিসর্জন দিয়েছে। তার কাছে মেয়ের জীবনের থেকেও বেশি গুরুত্ব পায় তার নিজের জীবন। নিজের খাওয়া, পরা, বেঁচে থাকায় নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তা পেলেই সে ধন্য। তবে, সে এই নিরাপত্তা পেতে চায় তার পেটের সন্তান বিজুলিকে নিরাপত্তাহীন করে। বিজুলির জীবনের বিনিময়ে তার এই চাওয়া। আর তাই নিজের সন্তান বিজুলি হয়ে গেছে তার কাছে পণ্য। সে নিজের মেয়ে বিজুলিকে বিক্রি করছে সামন্ততান্ত্রিক প্রভু যৌন লালসার প্রতিমূর্তি ভরত সর্দারের কাছে। পাড়াতুতো সম্পর্কে সম্পর্কিত বিজুলির দুই মাসিকে ঘুষ দিয়ে রসনা বিজুলির বিক্রির প্রক্রিয়াটিকে সম্পাদন করে। মিথ্যে মেলা দেখতে যাওয়ার অভিনয় করে তারা বিজুলিবালাকে নারীমাংসভোগী ভরত সর্দারের চৌকাঠে পৌঁছে দেয়। চৌকাঠ পেরোলেই ভরত সর্দারের পুরী। কুৎসিত নরকের অধীশ্বর ভরতের মতো নারীমাংস-খাদকের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায় বিজুলিবালার মতো তরতাজা মেয়েটি। সেখান থেকে পালাবার কোনো পথ ও উপায় পায় না সে। তার অসহায় ফুলের মতো হৃদয় গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে। ভেতরে ভেতরে তার প্রবল আক্রোশ তৈরি হয় নিজের মা ও পাড়াতুতো মাসীদের প্রতি। তীব্র ঘৃণা, ক্রোধ ও ধিক্কারে ফেটে পড়ে সে।

কিন্তু তাদের জন্য তো কোনো প্রতিবাদের আদালতই তৈরি হয়নি, তাই তার বিচার করবে কে? এখানে মা রসনা ও তার পাড়াতুতো বোনেরা প্রত্যেকেই নিজেরা নারী হয়ে অন্য আরেকটি নিষ্পাপ মেয়ের অত্যাচারের কারণ হয়ে যায়। আদতে প্রান্তিক সমাজের এই নুন আনতে পান্তা ফুরানো এই মা ও মাতৃসমা মাসীরা সকলেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বাহক। এদের সমাজে নাড়ীর সম্পর্ক মা ও মেয়ের বন্ধনটি যেন বড়োই আলগা। মেয়ে হয়ে জন্মালে এই জীবনের এই পরিণতি তাদের কাছে অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। বরং মা রসনার কাছে এটি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু মেয়ের কাছে এ জীবন তো মৃত্যুর সমান। বিজুলির কাছে তাই এ তো মৃত্যু যন্ত্রণা। তবে, জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থেকে এ যন্ত্রণাকে সহ্য করার লড়াইটা আরও ভয়ানক। মাতৃত্ব তাই রসনার আছে মুল্যহীন। আর একটি নারীখাদকের কাছে নিজের সন্তানের জীবনকে বিসর্জন দেওয়া নিতান্তই পিশাচ সুলভ। আর নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এই পাড়াতুতো মাসীদের এ কাজ নিতান্তই অমানবিক। এরা বিজুলিবালাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে আদতে নিজেদের নারীত্বকেই অপমান করেছে।

অন্যদিকে আমরা দেখেছি ভরত সর্দারের নিরুপায় স্ত্রীকে, যে ভরত সর্দারের নারীমাংস ভক্ষণের ক্ষেত্রে যেন বারুদে অগ্নিসংযোগ করছে। সে ভরত সর্দারের মতোই পুরুষতান্ত্রিক ভোগ্যব্যবস্থার এক নারী সংস্করণ। ভারতীয় পতিব্রতা নারীর আর্কেটাইপে স্বামীর একমাত্র স্ত্রী হয়ে থাকবার অধিকারটুকু নেই তার। সে যে ভরত সর্দারের অগ্নিসাক্ষী করা স্ত্রী এই খবরটি যখন সে গর্বের সঙ্গে যখন বিজুলিকে জানায়, তখন নারী সমাজের উপর পুরুষ আগ্রাসনের রূপটি আরও বেশি করে প্রকটিত হয়। বিজুলি জানে যে ভরতের স্ত্রীর তবুও ভাত কাপড়ের অধিকারটুকু আছে। কিন্তু ভরত সর্দারের ভোগের বস্তু বিজুলিবালাদের মতো রাখনিদের কোনোরকম সামাজিক অধিকারটুকু নেই। ভরত সর্দারের মতো মানুষেরা যেখানে নিজেদেরই কোনো সম্মান রাখতে পারে না, সেখানে অন্যের সম্মান

সে কিভাবেই বা রাখবে? তার উপর আবার স্ত্রীদের? ভরতের স্ত্রী এক সময় তার যৌবনের ক্ষুধা মিটিয়েছে। সেসময় ভরত সর্দারের জীবনে তার স্ত্রীর ভূমিকা ছিল পতিব্রতা স্ত্রীর যৌনচাহিদা মেটানো। তখন আদতে সে ছিল ভরতের সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বিশেষ। এখন সে বিগত যৌবনা। স্বামীর কাছে আজ তাই তার আর কোনো কদর নেই। এখন সে পতিব্রতা স্বামীর যৌনতা মেটায় নিজের শরীর দিয়ে নয়। তারই কন্যাসম তরতাজা মেয়েদের শরীরকে ক্ষুধার্ত স্বামীর লালায়িত ক্ষুধার বিষয় করে। তাই সে তার স্বামীকে পারতো তারই কন্যাসম মেয়েদের ভোগ থেকে বিরত করতে। বরং সে তার বিপরীত করে। সে তার স্বামীর লালসাবৃত্তি চরিতার্থ করতে এভাবেই সে ভুলে যায় নিজের সম্মান। একই সঙ্গে নষ্ট করে বিজুলির সম্মান। এভাবেই সে ক্ষুণ্ণ করে নারীত্বের সম্মান।

ভরত সর্দারের স্ত্রী তো বটেই এমনকী তার বৃদ্ধা মাও তার ছেলের এই নারীমাংস লোলুপ লালসার প্রবৃত্তিকে সমর্থন করে নিরুপায়ভাবে। তার উচিত ছিল নিজের ছেলেকে শাসন করা। আর লজ্জা, শরম, বিবেক বর্জিত হয়ে ভরতের কী উচিত ছিল না তার মায়ের সামনে এধরনের বিকৃত অপরিশীলিত যৌনতার থেকে নিবৃত্ত থাকা। কিন্তু সে সেকাজ করেনি। মায়ের মাতৃত্ব তো মায়ের সম্মানকে যেমন বাড়ায়, তেমনি অন্য নারীকেও সম্মান করতে শেখায়। মাও তার কাছে আর পাঁচটি মেয়ের সমান। মা ও ছেলের মানবিক সম্পর্কটিও পুরুষতান্ত্রিক আগ্রাসনের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

বিজুলিবালা ভরত সর্দারের সমস্ত আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করছে তার সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করে। একদিকে সে তার আপনজনের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার। অন্যদিকে এই অসহায় মেয়েটি ভরত সর্দারের পাশবিক অত্যাচারের মুখোমুখি। প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে না পেয়ে নিজেকে বাঁচানোর জন্য বিজুলি নিজের নখকে ছুরির কাজে লাগিয়েছে।

ভরত সর্দারের মতো ব্যাঘ্রশক্তির কাছে শেষ অবধি সে কোনোদিনই পেরে ওঠেনি। পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেও সফল হয়নি। পুরুষতান্ত্রিক অত্যাচারের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি চেয়েছে। তবে, সমাজে শুধুই ভরত সর্দারদের মতোই মানুষ নেই। কিছু ভালো মানুষের বাসও আছে। পাণ্ডবকুমার, জর্ঠু সহিস, ভীম মাহাতোর মতো মানুষকে পাশে পেয়ে বিজুলি ভরত সর্দারের নরক থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। তবে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল গুলিতে এখনও যে মেয়েদেরকে বাধ্য করে রাখনিতে পরিণত করা হয়, তাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা থাকলেও অধিকংশ ক্ষেত্রেই তাদের আর কোনো সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হয় না। তাই বিজুলি ভরতের কবল থেকে মুক্ত হয়ে প্রবেশ করেছে আরেক জীবনে। এতদিন ভরতের কাছে বিক্রি হয়ে সে ছিল রাখনি। এখন সে প্রবেশ করলো নাচনি জীবনে। সে নাচনি পরিচয়ে পাণ্ডবকুমারের জীবনে এল। 'রাখনি' ও 'নাচনি' শব্দদুটি বাহ্যত আলাদা হলেও স্বরূপত একই। রসিক পাণ্ডবকুমারের নাচগানের মাধ্যম বিজুলিবালা। এই বিজুলি পাণ্ডবকুমারের স্ত্রীর মর্যাদা কোনোদিনই পাবে না। সে বেঁচে থাকবে শুধুমাত্র রসিকের ভোগের সামগ্রী হয়ে। যৌবনকে পণ্য করেই এই বিজুলিবালাদের মতো নাচনিদের বেঁচে থাকা।

বিজুলিবালা পাণ্ডবকুমারের নাচনি হয়ে পাণ্ডবকুমারের পরিবারের আশ্রিতা হিসাবে স্থান পায়। তবে পাণ্ডবকুমারের স্ত্রী, পুত্র বর্তমান। আর বিজুলিবালা তার অগ্নিসাক্ষী করা স্ত্রীর সম্মন কখনোই পাবে না। আবার নাচনির কোনো সন্তান জন্ম দেওয়ার অধিকার নেই। নাচনীর গর্ভে যদি কখনো সন্তান আসে এবং সে যদি এই পৃথিবীর আলো দেখে তবে সে সন্তানও সমাজ পতিত হিসাবে গণ্য হবে। তার না থাকবে কোনো পিতৃ পরিচয় না থাকবে কোনো পরিবার। অর্থাৎ নাচনি হল শুধুমাত্র রসিকের নাচ গানের একটি মাধ্যম বিশেষ। সে একার্থে রসিকেরও ভোগেরই সামগ্রী। নাচনিদের মতো মেয়েদের যৌবনকে পণ্য করেই

রসিকের জীবিকা। আসলে রসিকের ঝুমুর শিল্পের উপার্জনের মূল মাধ্যম হল নাচনি। বিজুলিদের মতো মেয়েদের বেঁচে থাকতে হয় তাদের যৌবন বিকিয়েই। যৌন আবেদন মূলক নৃত্যগীত পরিবেশনের মাধ্যমে দর্শকের মন জয় করে আসর জমানোই তার কাজ। কোনোদিন সন্তানের মুখ থেকে মা ডাক শোনার সৌভাগ্য হবে না বিজুলির। সে কখনো পরিবার পাবে না। পাবে না পরিবারের ভাতের হাঁড়ি স্পর্শ করার অধিকার। পরিবারে মানুষের ভালোবাসা পাবে নিজের গুণে। কিন্তু পরিবারের সদস্য হয়ে উঠবে না সে কোনোদিন। সে চিরদিনই থেকে যাবে আশ্রিতার ভূমিকায়। তার কদর ততদিন, যতদিন তার রূপ যৌবন আছে। আবার যখন পরিবারে কোনো যুবতী নাচনি প্রবেশ করে তখন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক নাচনির কদর কমে যায়। শিল্পজীবনের মতো বাস্তব জীবনেও দেখা যায় একই চিত্র। অপেক্ষাকৃত প্রবীণ রসিকের আকর্ষণ কমে যায় বয়স্কা নাচনির উপর। প্রবীণ রসিকের লোলুপ দৃষ্টি যায় যুবতী নাচনির প্রতি। এই উপন্যাসে প্রবীণা নাচনি কুস্‌মির রসিক ধ্রুবকুমারের লালায়িত ক্ষুধার চোখ কুস্‌মিকে ছেড়ে যুবতী বিজুলির দিকে যায়। কুস্‌মির কাছে বিজুলিবালা সন্তানতুল্য। সে একজন নাচনি হয়ে সেই জীবনের যন্ত্রণাকে মর্মে মর্মে বোঝে। সে নিজেকে যেমন সম্মান করে তেমনি সে অন্য মেয়েকেও সম্মান করতে জানে। আর এই আত্মসম্মানবোধ আছে বলেই সে ক্ষোভে, দুঃখে, যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়। বিজুলির প্রতি এই অন্যায় আর তার নিজের সঙ্গে হওয়া অন্যায়কে সে মেনে নিতে পারে না। তাই সে প্রতিবাদ করে তার জীবন দিয়ে। দুঃখে, অভিমানে, যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে সে জানিয়েছে- নাচনি কারো মা নয়, কারও পরিবার নয়, কোনো মানুষ নয়। সে অনেকটা মানুষের মতো। পাথরের ঢেলা। তাই উপন্যাসটিতে কুস্‌মির আত্মহত্যা আসলে একটি নাচনি মেয়ের নাচনি জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তার এই প্রতিবাদ গোটা সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে প্রান্তিক একটি মেয়ে যে প্রথাগতভাবে সাক্ষর নয়, সেও তার

নারীত্বের এই অপমানকে তো মেনে নেয়নি। পাশাপাশি সন্তান সম অন্য একটি মেয়েকে তার জীবন দিয়ে বাঁচিয়েছে। এই বিশ্বের নারীদের অধিকার লড়াইয়ের গল্প তার জানা নেই। তবে সে তার গোটা জীবন থেকে যে সমাজকে চিনেছে। সেখানে সে নিরন্তর তার সঙ্গে শুধু নানা ধরনের অন্যায়কেই ঘটে যেতে দেখেছে। তার ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছে তার নীরবতা অস্ত্রকে হাতিয়ার করে। নিজের জীবনের অন্যায়কে সে মুখ বুজে সহ্য করে নিলেও সে তার নতুন প্রজন্মকে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন হতে শিখিয়েছে। আমরা দেখলাম, এখানে রক্তের সম্পর্কের মা তার নিজের সন্তানের সঙ্গে অন্যায় করেছে। অথচ একজন সমাজ পতিতা প্রান্তিক নাচনি যার কখনও নিজের সন্তান হবে না, সে সন্তানের যথার্থ মর্ম বুঝেছে। বিশেষত তাদের এই প্রান্তিক সমাজে দাঁড়িয়ে নারী সন্তানের মর্ম যন্ত্রণাকে সে অনুভব করেছে। একজন মা সন্তান জন্ম দিয়ে মাতৃত্বের যে যন্ত্রণাকে বোঝেনি, অন্যদিকে প্রান্তিক নাচনি কুস্‌মি, যে বিজুলিকে জন্ম দেয়নি কিন্তু বিজুলীর সত্যিকারের মা হয়ে উঠেছে। এখানে রক্তের সম্পর্ক শেষ কথা নয়, নারী পুরুষের ঊর্ধ্বে কুস্‌মির মানবিকতাই প্রধান হয়ে উঠেছে। এখানে লেখক সুব্রত মুখোপাধ্যায় সে সত্যকেই পাঠকের চোখে আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দিলেন।

তবে, মৃত্যুর পর এই নাচনিদের জীবনের পরিণতি আরও মর্মন্তুদ। কুস্‌মির মৃত্যুর ঘটনাকে লেখক অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে পরিবেশন করেছেন। মৃত্যুর পর তার দেহকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি এই নিষ্ঠুর সমাজ। এমনকি নাচনি যে পরিবারের আশ্রিতা, সেই পরিবারের রসিকও পর্যন্ত তার সৎকারের ব্যবস্থা করে না। ডোমেরা এসে তার দেহ নিয়ে যায়। তারা মৃতদেহের হাত পা দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে ফেলে দেয় কোনো ভাগাড়ে বা নদীতে। শিয়াল কুকুরে ছিন্ন ভিন্ন করে তাদের মৃতদেহ। মানব জীবনের প্রাপ্য সম্মানটুকুর অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। পুরুষশাসিত সমাজে প্রান্তিক নারীর বাস্তব অবস্থানটি আদতে ঠিক

কোথায় তা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না আমাদের। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে লেখা *কবি* উপন্যাসে বসনের গা থেকে গহনা খুলে নেওয়ার দৃশ্যে যে নৃশংসতার ছবি পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও প্রায় একই চিত্র দেখা যায় *রসিক* উপন্যাসের কুস্‌মি চরিত্রের ক্ষেত্রে। প্রান্তিক নারীদের উপর চলে আসা নির্যাতনের মাত্রা স্বাধীনতার আগে যেমন ছিল একই আছে। কিন্তু এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে আগে নারীরা ছিল একেবারেই নীরব। *রসিক* উপন্যাসের কুস্‌মী কিন্তু নীরবে সব অন্যায়কে মেনে নেয়নি। সে অপর একটি নারীর জীবনকে রক্ষা করেছে তার নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী। আর তার নিজের বিরুদ্ধে হওয়া অপমানের বিরোধিতা করেছে আত্মহত্যার মাধ্যমে। *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসের গঙ্গামণির আত্মহত্যাও যেন পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধে বঞ্চিত নারীর প্রতিবাদ। তাদের এই প্রতিবাদ প্রচলিত সমাজের সংস্কার, বর্ণ, লিঙ্গ সব গণ্ডির ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে গেছে। তারা যেন এই প্রতিবাদের মধ্যে দিয়েই খুঁজে নিতে চাইছে নিজেদের মুক্তির দিশা।

তবে জন্মদাত্রী মা না হলেও তারই জন্য জীবন উৎসর্গ করা কুস্‌মি মায়ের কাছ থেকে জীবনে পথচলার যে শিক্ষা বিজুলি পেয়েছিল তা তার জীবনের পাথেয়। সে সমাজকে তোয়াক্কা করেনি। কুস্‌মির মৃত্যুর পর বিজুলি তার মায়ের সঙ্গে হওয়া সমাজের অবিচারকে মেনে নেয়নি। গোটা পরিবার বা সমাজ যখন কুস্‌মির মৃতদেহকে ছুঁয়েই দেখেনি সেখানে বিজ্‌লি তার এই মাকে স্পর্শ তো করেছেই। এমনকি মৃত কুস্‌মিকে তার নিজের মনের মতো করে সাজিয়েছে। নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়ার আগে পর্যন্ত তার কাছে থেকেছে। সামাজিক নানা বিধিনিষেধের টানাপোড়েনে বিধ্বস্ত বিজুলির এই ক্রিয়াকলাপ আদতে তাদের মতো নাচনি জীবনের সঙ্গে ঘটে চলা সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। লেখক আভাসে তার বিজুলি নামকরণে সেই ব্যঞ্জনারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কুস্‌মীর মৃত্যুর পর বিজুলিবালা

সত্যিই বিজুলি হয়েই জ্বলে উঠেছে। বিজুলিবালা, কুস্‌মিদের মতো নাচনিদের সংখ্যা সমাজে নিতান্তই কম নয়, আমদের চারপাশে আজও ছড়িয়ে আছে এই বিজুলিবালারা। এই কুস্‌মিরা।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক* উপন্যাসে মালতী নামে একটি মেয়েকে পাওয়া যায়, যে অনেকটা বিজুলির বিপরীতমুখী এক চরিত্র। আমরা দেখব, লেখক এই উপন্যাসে এমন এক নারীর কথা উল্লেখ করেছেন, যে নিজে থেকে বিক্রি হতে চায়। তরণীসেন মালতীর মায়ের কাছে বায়না নিয়ে যায় মালতীকে নাচনি করার জন্য। কিছুদিন পর দেখা যায় তরণীসেন তার মত পাল্টায়। সে আর মালতীকে কিনতে চায় না। তরণীসেনের এই প্রস্তাবে মালতীর যেখানে খুশি হওয়ার কথা সে তা না হয়ে বরং উলটে তরণীসেনের উপর রেগে যায়। বিক্রি না হতে পারায় তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সে নিজের জীবন সম্পর্কে হাহুতাশ করে। তার নিজের পণ্য সত্তায় আঘাত লাগে। তবে এই মেয়েটি ভেবেছিল সে বিক্রি হলে তার মায়ের জীবনের দারিদ্র্যের কিছুটা সুরাহা হবে। তাই সে তরণীসেনের নাচনি হয়ে বাকি জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে চেয়েছিল। নাচনিদের সঙ্গে ঘটা সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়েও স্বেচ্ছায় এই জীবনকে বেছে নিতে চায় মালতী। সেও তার জীবনের কঠিন দারিদ্রের হাত থেকে মুক্তি পেতেই তরণীসেনের নাচনি হওয়ার স্বপ্ন দেখে। তরণীসেনের স্ত্রী হতে চাওয়ার দুঃস্বপ্ন সে দেখে না। টাকার বিনিময়ে নিজেকে পণ্য করলে মাকেও সে আর্থিক দিক থেকে নিশ্চিন্ত করতে পারবে। আর নিজেও পাবে আর্থিক সুরাহা। এ তো পুরুষ আধিপত্যবাদের আরেক রূপ। যা নারীর মধ্যেও প্রকাশিত। এ নারী বাহিত পুরুষের আগ্রাসনের আরেক রূপ। তাদের জীবনে ঘটে চলা হেজিমনির আরেক ধরন। প্রবল দারিদ্র্যের চাপে প্রান্তিক মেয়েদের এই ধরনের অসহায়ত্বকে দেখিয়েছেন সুব্রতবাবু। প্রান্তিক

ঝুমুর শিল্পী নারীদের এই কঠিন জীবনে ঘটে চলা নানা ধরনের ঘাত-প্রতিঘাতের নানা রূপকে দেখিয়েছেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

রসিক উপন্যাসেই আমরা পেয়েছি আরেকটি নারী চরিত্রকে। সে হল দুলালী। তরণীসেনদের পাড়ার মেয়ে সে। সে বিবাহিত। তার স্বামী তাকে ভালোবাসে। অথচ সে তার স্বামীকে ভালোবাসতে পারে না। আর তাই সে তার স্বামীর ঘরও করে না। তার বাপের বাড়িতেই সে ফিরে এসেছে। তার বাবা মৃত। ঘরে থাকে তার রুগ্ন দাদা। এছাড়া রয়েছে তার মা। এই সংসারে আয়ের একমাত্র উপায় দুলালীর শরীর। সে দেহব্যবসাকেই গ্রহণ করেছে উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে। তার উপার্জনেই তাদের সংসার চলে। চলে তার দাদার চিকিৎসা। দুলালীর উপার্জনের অর্থে তাদের গোটা সংসার চললেও দুলালীর এই উপার্জনের পথটাকে কেউ মানতে পারেনা। তার পরিবার, চারপাশের সমাজ তাকে ঘৃণার চোখে দেখে। তাকে প্রতিমুহূর্তে করে অপমান। হয়তো বা মায়ের কাছে কখনো সে পায় এক নিরাপদ আশ্রয়। সুব্রত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,

> কোনো কোনো গভীর রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে যখন কাঁদে কিংবা কাতরায় বিধবা মায়ের শীর্ণ আঙ্গুল তার সারা দেহে ঠাণ্ডা চন্দন বুলিয়ে দিয়ে যায়। মেয়ের দুধহীন বিশাল স্তন দুটিতে নখের আঘাত, পায়ের পাঁক- মায়ের নখহীন ছোঁয়ায় জুড়িয়ে যায়। দুলালী আচমকা টের পায় অন্ধকার ঐ হাতখানি তার স্তনপীড়ন করছে না। সে মটকা মেরে পড়ে থাকে। মাকে জানতে দেয় না তার জ্বালা জুড়ানো কথা। মনে মনে বলতে চায় ওগো মা জননী, তোমার ঐ বুকের দুধ যখন খেয়েছি, তখন আমার কত রাত্রি জেগে থাকার ফোঁটা ভাগ তো তোমায় নিতেই হবে। না হলে পথে বিপথে রাত্রি পার করতে করতে হয়তো ভুলেই যাবো তোমার দুধের ঘ্রাণ কেমন। তাই তুমি জেগে থাক মা- তোমার ঘেঁটু ফুলটিকে বুকে চেপে ধরে। আমি নিশ্চিন্তে ঘুম যাই।[১৮]

তবে দুলালী একমুখী। সে নিজে যা ভাবে তাই সে কাজেও করে। সে তার পরিবার ও সমাজের অপমানকে পাত্তা দিতে নারাজ। যাদের জন্য জীবনপাত করা তাদের কাছ থেকে অপমানে জর্জরিত হয়ে সে তার এই বাপের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো একদিন। তরণীসেনের প্রেমে পড়ে তাই ঘরনি হতে চাইল সে। তরণীসেনের দেখা পেতে তরণীসেনের ওস্তাদ প্রভঞ্জনের বাড়িতে সে আশ্রয় নিয়েছে। আশ্রয়দাতা বদনের ভোগের শিকার হতে হয় তাকে। তবে এই ক্ষেত্রে দুলালীর নিজেরও যে একেবারে প্রশ্রয় ছিল না তা নয়। দুলালীকে লেখক যেভাবে দেখিয়েছেন যে সে প্রান্তিক সমাজের মেয়ে হয়েও সে সমাজ তাকে পরিচালিত করতে পারেনি, সে সামাজিক পারিবারিক নিয়মকে অগ্রাহ্য করেছে। সে নিজে যা চেয়েছে, জীবনে পথচলায় সেরকমটাই করেছে। সে স্বাধীনভাবে চলেছে। বরং যাকে স্বামী হিসাবে সে পেয়েছিল তার কাছ থেকে ভালোবাসা পেলেও তাকে তার সঠিক জীবন সঙ্গী হিসাবে বলে তার মনে হয়নি। সে জীবনে পুরুষের স্বাদ বদল করতে ভালোবাসে। একই পুরুষে সমর্পিত থাকার ধারণাতে সে বিশ্বাসী নয়। তবে, সে মিথ্যা ছলনা করেনি তার স্বামীর সঙ্গে। একারণেই হয়তো বা তার স্বামীর ঘর থেকে পালিয়ে আসা। আর দেহব্যবসায়ে যোগদান। তবে তার জীবনে নিজের পরিবারের প্রতি কর্তব্য, দায়িত্ববোধের কমতি নেই কোথাও। দেহব্যবসার আয়টুকু সে ব্যয় করেছে নিজের সংসারে। মুমূর্ষু দাদার চিকিৎসায়। তবে যখন সে এত কিছু করা সত্ত্বেও তার নিজের খুব কাছের মানুষগুলির কাছ থেকে আঘাত পেয়েছে তখন সে সেখান থেকে সরে গিয়েছে। তরণীসেনকে সে জীবনে চেয়েছিল বটে তবে তাকেও যথার্থ ভাবে নির্ভর করতে পারেনি। আবার বদনের প্রতিও তার একপ্রকার নেশা ধরে যায়। সে একই সঙ্গে তরণীসেন ও বদন এই দুই পুরুষকেই আকর্ষণ করেছে অথচ সে কারো কাছেই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ধরা দেয়নি। আসলে সে নারী জীবনে নানা ধরনের সামাজিক নিয়ম নীতির গন্ডীতে আবদ্ধ থাকতে চায় না। বরং সে মুক্তি চায়।

এক প্রান্তিক নারী হয়ে এই মুক্তির আস্বাদ পেতে চাওয়া নিতান্ত কম কথা নয়। যেমন অপ্রত্যাশিত তার আগমন তেমনই অপ্রত্যাশিত ভাবেই দুলালীর পলায়ন। এই চরিত্রটি বেশ রহস্যময়ভাবে ধরা দেয় পাঠকের কাছে। সে প্রচলিত ঘেরাটোপের বন্ধনে নিজেকে বেঁধে ফেলেনি। বারে বারেই সে তাই মুক্তি চেয়েছে। তাই সে একই ধরনের মানুষ, একই ধরনের জীবনের পরিবর্তে নবজীবন চায়। সে জানে এই প্রান্তিক সমাজে নারীর কোনো সম্মান নেই। এই সমাজে বাঁচতে গেলে আত্মসম্মান খোওয়াতে হবে। আর এই কাজটি সে কিছুতেই করে না। বরং সে সমাজ ত্যাগ করে। তবুও নিজের সম্মান খোয়াবে না। এক প্রান্তিক নারী হয়ে এই ধরনের মানসিকতাও তো আদতে আমাদের পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের সঙ্গে ঘটে চলা অন্যায়ের বিরোধিতা।

ঔপন্যাসিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় রসিকদের স্ত্রীদের জীবনের চালচিত্রও বর্ণনা করতে ভোলেননি। এই সমাজে রসিকের স্ত্রীদের অবস্থা ঠিক নাচনিদের মতো ততটা করুণ না হলেও তারাও আবার অত্যাচারিত হয় আরেকভাবে। রসিকের কাছে অর্থাৎ তাদের অগ্নিসাক্ষী করা স্বামীর কাছে তাদের শাঁখা সিঁদুরের অধিকারটুকু আছে। তাদের ভাত কাপড়ের অধিকারটুকু আছে। নাচনিদের সেটুকুও ছিল না। কিন্তু ঐ সামান্যই। তাদের জীবনে তাদের ভালোবাসা, মন, সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া কোনো কিছুই থাকতে নেই। তাদের পতিব্রতা হতে হবে। অথচ পুরুষের ক্ষেত্রেই যত রকমের অন্যায়ের সুযোগ ও ছাড়। তাদের অন্য নারীর প্রতি আসক্তি সমাজ অনুমোদিত। অথচ দোষ হয় শুধু মেয়েদের বেলায়। তাই শিল্পের সংগতকার হিসাবে রসিকের জীবনে থাকতে পারে নাচনি। আর তাদের স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও। বিবাহিত রসিকের স্বামীর নাচনি রাখার চিরাচরিত প্রথাটিও সমাজ স্বীকৃত। এই ব্যবস্থাটিকে মেনে নেয় রসিকের স্ত্রীরা। মনের মধ্যে নানা ধরনের ঘাত-প্রতিঘাত চলতে থাকলেও তারা প্রকাশ্যে বিছু বলতে পারে না। সব কিছু সহ্য করে মুখ

বুজে। রাতের পর রাত পরনারীর সঙ্গে নিজের স্বামীকে সঁপে দিতে মন কিছুতে মানতে চায় না। অথচ তাদের স্বামীরা নির্বিকার। রসিকেরা একমুহূর্তের জন্যে সেকথা ভাবে না। এরকমই এক নারী হল লতা। সে পাণ্ডবকুমারের বিবাহিত স্ত্রী। তার মানসিক টানাপোড়েনকে দেখিয়েছেন লেখক। নাচনি রাখার প্রথাটি তার শ্বশুরবাড়ির পারিবারিক প্রথা। বিজুলিকে লতা কখনোই মন থেকে মেনে নিতে পারে না। অন্তরে তার প্রতি এক তীব্র ঈর্ষা। আর সেটাই তো স্বাভাবিক। তবে তার মনের এই বেদনা মনেই থেকে যায়। জানতে পারে না পাণ্ডবকুমার। লতার বিজুলির প্রতি কোনোরকম ঈর্ষা সে পাণ্ডবকুমারের সামনে প্রকাশ করে না। প্রকাশ্যে তাই বিজুলিকে তার স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী করতে পাঠায়। কিন্তু আড়ালে ফেলে চোখের জল। তার মন চায় পাণ্ডবকুমার ফিরে আসুক। কিন্তু বাস্তবে তা পূরণ হয় না। স্বামীসঙ্গের সাহচর্য পেতে চেষ্টা করে পুরোনো দিনের সুখ-স্মৃতিচারণার মধ্যে দিয়ে। নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে। রসিক পাণ্ডককুমারের জীবনকে কেন্দ্র করে ও তার নাচনি হিসাবে বিজুলিবালাকে মেনে নিতে লতার জীবনে এক অদ্ভুত টানাপোড়েনকে হাজির করেছেন ঔপন্যাসিক।

এইভাবে সমাজ কথিত অভিজাত শ্রেণি যেখানে চোরাস্রোতে নারীকে প্রতিনিয়ত শোষণ করে চলেছে সেখানে প্রান্তিক লোকশিল্পী সমাজও যে আরেক ধাপ এগিয়ে যাবে এতে আর আশ্চর্য কী! প্রান্তিক নারী হয়েও বিশ্বের নারী আন্দোলনের ইতিহাস, দাবী, অধিকার সম্পর্কে কোনোকিছু না জেনেও এরা নিজেদের কথা নিজেরা বলতে শিখছে। যুগ যুগ ধরে তাদের বিরুদ্ধে ঘটে চলা অন্যায়কে আজকের প্রান্তিক সমাজের অনেকেই নীরবে মেনে নিতে নারাজ। তারা পাথরের মূর্তি নয়। তারাও রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। তাদেরও মন আছে। চাওয়া-না পাওয়া আছে। আছে সুখ-দুঃখ, অভিমান। আর পুরুষেরা আজও অন্ধকারেই। তারা জানে না যে, পাখি এক ডানায় ভর করে ভালো করে কখনোই উড়তে

পারবে না। সেরকম পুরুষের মধ্যেও মনুষ্যত্ব বোধের প্রকাশ দরকার। হয়তো বা কারো কারো ক্ষেত্রে সুপ্ত ভাবে সেই চেতনা জাগছে। যেমন পাণ্ডবকুমারের ঠাকুরদা ভীম মাহাতো। সে লতা ও বিজুলির মন পড়তে চেষ্টা করেছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রান্তিক সমাজ এর বেশি এগিয়ে যেতে পারেনি। কারণ তারা আজও মনে করেন পুরুষ বাঁকা হলেও সোনা। তাই পুরুষেরা কোনো দোষ করতে পারে না। আমরা যেমন এই উপন্যাসের ভরত সর্দারকে পেয়েছি। তাদের লালসা আসলে পুরুষত্ব। আর আমরা এখনও অনেকেই মনে করি পুরুষত্বই সমাজের বুনিয়াদ। আর সেই বুনিয়াদের বিনোদনকারী পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও। মীরজাফর আজও আছে। আর নারীরা নিজেরাই একাজে পুরুষের সহায়ক। ইতিহাস তার সাক্ষী। আর যুগ যুগ ধরে ঘটে চলা সেই ইতিহাসকেই অন্যরূপে দেখিয়েছেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও প্রান্তিক মেয়েদের অবমাননার বাস্তবিক চেহারাকেই পাঠকের সামনে হাজির করলেন লেখক।

সমগ্র পৃথিবীর দিকে তাকালে আমরা এখনও সমাজের নানা ধরনের বিভাজনকে লক্ষ করি। এই বিভাজন শুধুমাত্র লিঙ্গগত দিক থেকে নয়। বর্ণ-গত, বিত্ত-গত, জাতি-গত, বর্গ-গত এই বিচিত্র দিক থেকে বিভাজন। তবে এই বিভাজনের নানান ধরনের চিহ্নগুলি সবথেকে আঘাত করেছে সমাজে নারীদেরকে। ভারতীয় সমাজ ছিল মূলত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। সেই সমাজে মেয়েদের স্থান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খুব উঁচুতে নয়। আজও যে কোনো সমাজে তারাই সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত, অবহেলিত। প্রান্তিক সমাজে তাদের এই সমস্যা আরও অনেক বেশি। আর প্রান্তিক সমাজের মানুষ যেখানে বিভিন্ন দিক থেকে অবহেলিত ও অসম্মানিত হয় সেখানে মেয়েদের সংকট আরও অনেক বেশি। নারীকে মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করে তার অবস্থানটি আজও বুঝিয়ে দেন অনেক মানুষ। আজও ভারতের কোনো কোনো সমাজে একটা পাখি, একটা বেজি, একটা কালোসাপ আর একজন শূদ্র আর

একজন নারীর অবস্থান এক করে দেখা হয়। আজও একজন প্রান্তিক নারীর জীবনের কোনো মূল্য নেই সমাজে। এখনও তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উচ্চবর্গের পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা ও লালসার শিকার। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসেও আমরা কাহার মেয়েদের উপর উচ্চবর্গের বাবুদের এহেন অত্যাচারকে পেয়েছিলাম। তবে যে ভারতের রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দের মতো মনীষীরা নারীজাগরণের কথা বলেছেন, সেখানে ভারতের এই প্রান্তিক ভূমিকন্যাদের এ কী দুর্দশা? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ছিয়াত্তর বছর পেরিয়েও আমরা প্রকৃতই কি স্বাধীন হয়েছি? যে সময়ে ও সমাজে মেয়েদের এইরকম অবস্থান সেখানে স্বাধীনতা অনেকটাই এক পাক্ষিক বলে আমাদের মনে হয়।

৫.৫ *আড়কাঠি* :

নির্দিষ্ট একটি লোকশিল্পের হাত ধরে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর *মায়ামৃদঙ্গ*- উপন্যাসে নারী-পুরুষ জীবনের জটিল চালচিত্রকে দেখিয়েছেন। ভগীরথ মিশ্রের *আড়কাঠি* উপন্যাসে লোকশিল্পের প্রসঙ্গ এসেছে। তবে, কাহিনির কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে নয়। এই উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম বাংলার পটভূমি। বাঁকুড়ার গজাশিমুল অঞ্চলের বসু শবর জনজাতির মানুষের জীবন কথা লিখতে গিয়ে ভগীরথ মিশ্র হাজির করলেন তথাকথিত 'লোকসংস্কৃতি-প্রেমী' ফোক ব্যবসায়ীদের। যারা আপাতদৃষ্টিতে লোকশিল্প ও লোকশিল্পীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তাদের অসহায়তার সুযোগ নেয়। তাদের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নেয়। গজাশিমুল গ্রামের সরল সোজা নিরাপত্তাহীন মানুষগুলির বিপদের সময় পাশে দাঁড়িয়ে তাদের বিশ্বাস অর্জন করে এহেন মানুষগুলি। এক ধূর্ত আড়কাঠি রঙলালকে এককালীন নগদ বেশ মোটা অঙ্কের টাকা পাইয়ে দিয়ে গজাশিমুলের মানুষকে বংশপরম্পরায় দাসবৃত্তির

পেশা থেকে মুক্ত করে। দাদনের অত্যাচার থেকে বাঁচায়। তবে, তাদের এই মানবিকতা ও উদারতার আড়ালে থাকে নিজের স্বার্থ। আর সেই লোভেই তার গজাশিমুল গ্রামের বসু শবর জনজাতির জীবনে সূঁচ হয়ে ঢোকে আর তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে একেবারে ফাল হয়ে বেরোয়। লোকশিল্প প্রচারের নামে এহেন বিদেশী সংস্থাগুলি এদেশের একশ্রেণির শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে লোভ দেখিয়ে তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে চেষ্টা করেছে। তাদের মোহগ্রস্ত করেছে অর্থ, নাম, যশের লোভ দেখিয়ে। সফলও হয়েছে। তারই এক উদাহরণ এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র রাজীব চৌধুরী, পেশায় অধ্যাপক। বাঁকুড়াতেই তার কলেজ। সে লোকসংস্কৃতিপ্রেমী। কর্মসূত্রেই সে গজাশিমুল গ্রামের জনজাতির লোকশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে পরিচিত হয় 'ইস্ট-ওয়েস্ট ফোক ফাউণ্ডেশন'- এর পূর্ব- ভারতীয় শাখার ডিরেক্টর এবং 'দ্য ফোক' পত্রিকার সর্বভারতীয় করেসপন্ডেণ্ট বিদেশিনী ক্যাথি বার্ডের সঙ্গে। তার হাতছানিতেই মোহগ্রস্ত হয় রাজীব। বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জনের স্বার্থে আন্তর্জাতিক লোকসংস্কৃতিচর্চার বিদেশী সংস্থার এক কঠিন চক্রে জড়িয়ে পড়ে সে। ক্যাথি বার্ড ও রাজীবের এই সমস্ত সংস্থাগুলির বড়ো বড়ো কর্মকাণ্ড চলতে থাকে আদিবাসী জনজাতি বসু শবরদের লোকজীবন ও লোকশিল্পকে ব্যবহার করে। এই কাঁচামালকে ব্যবহার করে, প্রয়োজনে স্থানোপযোগী ও সময়োপযোগী করে পরিচালনা করাই রাজীবের কাজ। এভাবে রাজীবের কর্মকাণ্ড ক্রমেই চলে আসতে থাকে প্রচারের আলোয়। একের পর এক রাজ্য পরিক্রমা, বিদেশ ভ্রমণ, সেমিনার, বিপুল অর্থ, সুখ, যশ, বৈভবের নেশায় মেতে ওঠে রাজীব। এ নেশা তাকে প্রায় পাগলের মতো তাকে পেয়ে বসে। রাজীব যাদের নিয়ে এ অনুষ্ঠান করে সেই লোকশিল্পীরা পারিশ্রমিক পাবে যৎসামান্য। রাজীব ও ক্যাথি নেবে সিংহভাগ। একসময় গ্রামের আড়কাঠি রঙলালের দাদনের অত্যাচার, আসামের চা বাগানে কুলি চালান দেওয়া ও মানুষ পাচারের কবল থেকে বসু শবরদের বাঁচিয়েছিল যে রাজীব,

তারই গড়ে তোলা লোকসংস্কৃতি প্রচারের সংগঠনটি হয়ে উঠল তাদের মতো সরল সোজা মানুষগুলিকে শোষণের আরেকটি ফাঁদ। গজাশিমুল গ্রামের বসু শবরদের লোকসংস্কৃতি তাদের প্রাণের সম্পদ। এ সম্পদের ঐতিহ্য ও সম্মান তাদের জীবনে অনেকখানি। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাদের বিশ্বাস ও সংস্কার। স্বভাবিকভাবেই যারা এই সম্পদের চর্চা করেন অর্থাৎ সেই লোকশিল্পীদের জীবন বড়োই যন্ত্রণাময়। দারিদ্র্য তো তাদের নিত্যসঙ্গী। সে কষ্টকে তারা খুব বেশি একটা ভয় পায় না। তারা ভয় পায় মানুষকে। যে মানুষের হাতে তাদের বারংবার ঠকতে হয়। সমাজে রঙলালদের মতো মানুষেরা তো রয়েছেই। তাদের শোষণ ও অত্যাচারের ধরন গজাশিমুলের মানুষের চেনা। কিন্তু যে রাজীবকে গজাশিমুলের মানুষ হয়তো বা কোনো এক স্বর্গীয় দূত বলে বিশ্বাস করেছিল, সে একসময় চরম বিশ্বাসঘাতক হয়ে গজাশিমুলের সরল মানুষগুলির মান, ইজ্জত ধুলোয় মিশিয়ে দিল। যাকে তারা তাদের খুব কাছের মানুষ মনে করত, তার কাছ থেকে এতবড়ো আঘাত, অপমান পেয়ে যে মানসিক যন্ত্রণা তারা পেল, তা প্রকাশের আর কোনো ভাষা থাকে না।

তবে, এই বসু শবর জনজাতির লোকশিল্পকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে যারা বাণিজ্যিক ফাঁদ গড়েন, সেই সমস্ত লোকশিল্পব্যবসায়ী বাণিজ্যিক সংস্থার মূল ফোকাস মূলত মেয়েদের উপর। লোকশিল্পের নামে নারীদের নৃত্যরতা অভিনব কোনোও দেহভঙ্গিমা বাজারে চলবে তা বুঝে নিয়ে গজাশিমুল গ্রামের বসু শবর জনজাতির লোকশিল্পের অনুসন্ধান চালায় রাজীব। এই জনজাতির বিশেষ কৌলিক সংস্কৃতি জলকেলি নৃত্য, যার সঙ্গে এই জনজাতির কৌলিক সংস্কার ও ঐতিহ্য মিশ্রিত, সেই বিশেষ সংস্কৃতিকে বিশ্বের মানুষের সামনে আনতে চায় রাজীব। যে নৃত্যের দর্শক হিসাবে কোনো পুরুষের স্থান নেই, একমাত্র কানাইশর জিউ বা কৃষ্ণই তার দর্শক হতে পারেন, সেই নৃত্যকে মঞ্চে পরিবেশন করে বিশ্বের সামনে লোকশিল্পের অভিনবত্ব দেখাতে চেয়েছিল রাজীব। কিন্তু এই মহতী উদ্দেশ্যের আড়ালে

লুকিয়ে ছিল রাজীবের আসল ধান্দাবাজি। জলকেলি নৃত্যে যেহেতু মেয়েদের শরীরে পোশাকের কোনোরকম আব্রু থাকে না তাই সেটাই বাজারে চলবে বেশি। আন্তর্জাতিক বাজারেও সেই জলকেলি নৃত্যের ছবির চাহিদা বেশি হবে এটা রাজীব বেশ ভালোই বোঝে। আর এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে এই জলকেলি নৃত্যরতা নারীর উদোম শরীরের ছবি বিশ্ববাজারে ছেড়ে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা কামিয়ে নেয় রাজীব। প্রচুর লাভবান হয় ক্যাথি বার্ডেরা। বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে লোকশিল্প পরিবেশনের দর দাম ঠিক হয় নারী শরীরের বুকের গড়ন দেখিয়ে। আমরা রাজীবের সঙ্গে বাজোরিয়ার কথোপকথনের সময় দেখেছিলাম, রাজীবের মতো একজন লোকশিল্প ব্যবসায়ী অধ্যাপক একটা ডব্‌কা ছুঁড়ির এক- একখানা বুক আঠারো হাজার টাকায় বিক্রি হওয়ার কথা বলছে। মেয়েদের শরীরকে নিয়ে এ ধরনের নোংরামি একজন অধ্যাপকের কাছ থেকে আশা করা যায় না। অধ্যাপক আদতে তো মানুষ গড়ার কারিগর। আর সেই মানুষ গড়ার কাজে নিমগ্নতা যাদের কাজ তারা কিভাবে মেয়েদের মান, ইজ্জত নষ্ট করে তাদের সর্বস্বান্ত করে জীবনে পথে বসাতে পারে তারই করুণ কাহিনি এই *আড়কাঠি* উপন্যাসটি। শুধুমাত্র অর্থের নেশায় তার এই বেইমানি আর বিশ্বাসঘাতকতাকে মোটেই মেনে নেওয়া যায় না। এ আসলে লোকসংস্কৃতি প্রচারের নামে নারীদেহকেন্দ্রিক ব্যবসা। যার শিকার হয় রঙীদের মতো মেয়েরা। রঙলালেদের মতো আড়কাঠিরা যারা দাসব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাদের দাদনের জালে জড়িয়ে পড়া গজাশিমুলের মানুষকে উদ্ধার করেছে রাজীব। নারীপাচারের হাত থেকে রাজীব রঙীকে বাঁচিয়েছে। তবে রঙীকে রঙলালের হাত থেকে বাঁচিয়ে কি রাজীব তাকে তার কেনা গোলামে পরিণত করতে চেয়েছে? রাজীব আসলে মেয়েদের সম্মান করতেই শেখেনি। তাই মায়ের সঙ্গে, নিজের প্রেমিকা বলে দাবী করেছিল যে সুতপাকে, তার প্রতিও সে সঠিক সম্মান করেনি। বরং সম্পর্ক নষ্ট করেছে তার নিজের কারণেই। সুতপাকে সে দিনের পর দিন

অবহেলা করেছে। তার ভালোবাসার কোনো মূল্যই সে দেয়নি। অর্থই তার জীবনের এ ধরনের অনর্থের মূল কারণ। রঙীকে রঙলালের কাছ থেকে বাঁচিয়ে সে নিজে যেন কিনে নিয়েছে। বিদেশে রাস্তায় রাস্তায় রঙীর নগ্ন শরীরের ছবি বিক্রি হতে শুনে মুহূর্তের জন্য স্থির থাকতে পারেনি সুচাঁদ। রঙীর প্রতি এই অন্যায়কে সে মেনে নেয়নি। আমরা দেখলাম, গজাশিমুল গাঁয়ের বসু শবর জাতির নারীদের জীবন একদিকে যেমন ধূর্ত গ্রাম্য আড়কাঠিদের দ্বারা বিপর্যস্ত, তেমনি অন্যদিকে শহুরে শিক্ষিত ডিগ্রীধারী বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা প্রতারিত। সব মিলিয়ে গজাশিমুল গ্রামের এই বসু শবর জনজাতি তথা এই জনজাতির মেয়েরা চরম নিগ্রহের শিকার হয়েছে। তবে, সুচাঁদ প্রথাগতভাবে হয়তো বা তত ডিগ্রীধারী নয়, তবে 'মানুষ' শব্দের 'মান' ও 'হুঁশ' শব্দের অর্থটি বোঝে। মনুষ্যত্ববোধ আছে। সে জানে মানুষকে সম্মান করতে। সর্বোপরি নারীকে সম্মান করতে। একজন তথাকথিত শহুরে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক হয়ে রাজীব রঙীর প্রতি যে অন্যায় ও অসম্মান করেছে, একজন গ্রাম্য তথাকথিত নিরক্ষর মানুষ হয়ে সুচাঁদ তার প্রতিবাদ করেছে। তাই রাজীবেরাও হয়ে উঠেছে একদিক থেকে রঙলালদের মতো আরেক ধরনের আড়কাঠি। আমরা রঙলালকে উপন্যাসের প্রথমদিকে তাজা কাঁচামালের বিক্রেতা হিসাবে পেয়েছিলাম। আর রঙলালের এই তাজা কাঁচামাল হল গজাশিমুল গাঁয়ের তরতাজা জোয়ান মদ্দ মেয়েরা। একদিকে রঙলালের মতো মেয়ে পাচারকারীদের অত্যাচার আর অন্যদিকে রাজীবের মতো মানুষদের নারীদেহ ব্যবসার মতো যাতাকলে গজাশিমুল গ্রামের নারীদের জীবন ওষ্ঠাগত। রঙলালেরা মেয়েদের ভালো থাকার কথা শুনিয়ে আদতে ফিমেল স্লেভ–হান্টিং করছে। এই আড়কাঠিরা একসময় খুব ভয়ংকর ছিল। গজাশিমুলের মানুষের কানে ডুংরি-টুংরি আর জঙ্গলে ঘেরা ডিপুঘর থেকে ভেসে আসত মেয়েদের করুণ আর্তনাদের আওয়াজ। এই গ্রামের মেয়েরা নিঃসঙ্গ, নিরস্ত্র জীবন ও জীবিকার দায়ে যখন খাবার সংগ্রহ, জ্বালানীর কাঠ আনা অথবা গরু চরাতে জঙ্গলে

যেত, আড়কাঠিরা সুযোগ বুঝে হানা দিত সেই নির্জন পথে। মুখে কাপড় গুঁজে, হাত পা বেঁধে রাতের গভীর অন্ধকারে মেয়েদের ধরে এনে ডিপুঘরের অন্ধকারে আটক করে রাখা হত। তারপর পর্দা ঢাকা দেওয়া এক গাড়িতে করে রাতের আঁধারে এদের টেনে নিয়ে যাওয়া হত পুরুলিয়ার কোনো এক বড়ো আড়কাঠিদের ঘাঁটিতে। সেখান থেকে এদের পাচার করা হত আসাম মুলুকে। তাদের এই যাওয়া একেবারে চিরকালের জন্য চলে যাওয়া। সেখান থেকে তাদের এ জন্মভূমিতে আর ফেরা হত না। মধুপুরের ডহর মাণ্ডি নামে এক খেটে খাওয়া মানুষ একবার ডিপুঘরে খুঁজতে এসেছিল তার সন্তানের হারিয়ে যাওয়া মাকে। 'রাধী রে' বলে সে খুব জোরে হাঁক ছাড়ে। সে শুনেছিল ডিপুঘর থেকে ভেসে আসা রাধীর আর্তনাদ 'বাঁচাও'। ঠিক পরমুহূর্তেই বাদ্যের কঠিন শব্দে গভীর অরণ্যে হারিয়ে যায় সেই আর্তনাদ। পাহারাদারেরা ডহর মাণ্ডিকে মারতে মারতে আধমরা করে ফেলে। ডহর মাণ্ডী তার বউকে আর ফিরে পায়নি। এই ডিপুঘর থেকে কোন্ অচেনা জগতে হারিয়ে যায় এই ডহর মাণ্ডির স্ত্রী। এরকমভাবে আড়কাঠিরা একসময় লক্ষ লক্ষ মানুষকে চালান করেছে চা-বাগানের কুলির কাজে। তারা আর তাদের দেশগ্রামে ফেরেনি। তবে এখন আড়কাঠিরা ঠিক আগের মতো আর নেই। তারা বদলে ফেলেছে তাদের কর্মপদ্ধতি। ছোকরা অবস্থায় বিহারের আরা জেলা থেকে অনেক তল্লাশি করে গজাশিমুল গ্রামে ঢুকেছিল এই রঙলাল। সে বিলাতি মদ দিয়ে গজাশিমুলের মানুষের মন জয় করে তাদের ভোলাতে চায়। সে গল্পের ছলে সাধারণ মানুষকে অনেক রঙিন দেশের কাহিনি শোনাতে থাকলো। বাঁকুড়ার এই রুখা প্রকৃতির পরিবর্তে তাদের বারোমাস সবুজ প্রকৃতির লোভ দেখাল। সেটি হল চা বাগিচার দেশ। সে দেশে কোম্পানির মকান্ আছে। কোম্পানী রেশন দেয় প্রতি সপ্তায়। চাল, গম, আটা, ময়দা, কেরোসিন সব কিছু দেয়। সেখানে শুধুই সুখ। অঢেল পয়সা। খিদের জ্বালায় জর্জরিত এই গজাশিমুলের মানুষেরা রঙলালের কথায় বিশ্বাস করে। স্বপ্নের রাজ্যে পাড়ি

দেয় তাদের মন। সেদিকে বেশি পয়সা, মজুরী আর সেই সঙ্গে খাদ্য। দলে দলে মানুষ পাড়ি দেয় আসাম মুলুকে রঙলালের হাত ধরে। রঙলালের লাল খাতায় সে গজাশিমুলের মানুষের সঙ্গে হিসেব পত্র সেরে নেয়। দাদন পাতি নেওয়া হয়। হাতে নগদ টাকা পেয়ে খুব খুশি হয় গজাশিমুলের মানুষ। গজাশিমুলের মেয়ে-মদ্দ সব মিলিয়ে প্রায় শ'খানেক মানুষ পাড়ি দেয় আসাম মুলুকে চা-বাগিচার কাজে। আগের থেকে দাদন পাতি নিয়ে বসে আছে তাদের পরিজনেরা। রঙলাল খুব মিহি গলায় তাদের খুব ভালো থকবার বিষয়টা তাদেরই পরিবারের কাছে শুনিয়ে রাখে। তার লাল খাতার মোট বত্রিশটি পাতায় পুরো গাঁয়ের সমস্ত মানুষকে বেঁধে রাখে। লাল খাতা গজাশিমুলের মানুষকে দিয়ে টিপ সই করিয়ে নেয়। সেখানকার মানুষেরা তাদের পরিজনদের ফিরবার অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু তারা আর ফেরে না। রঙলালকে জিজ্ঞাসা করলে সে রেগে যায়। কখনো কখনো নেশায় চুর হয়ে থাকে সে। দু'চার দিন তাদের গ্রামে থাকে। আর শুরু হয় নতুন কিস্তিতে কারা যাবে তাদের লিস্ট তৈরির কাজ। লাল খাতায় সে নাম তোলে আর পুরোনো দাদনের পরিবর্তে নতুন দাদন চড়ায়। কিন্তু চা-বাগিচায় যাওয়ার কথা ভাবলে গজাশিমুলের মানুষের আতঙ্ক হয়। তাদের যে আর কখনো এই জন্মভূমিতে ফেরা হবে না এ আশঙ্কায় বুকটা আনচান করে। এভাবে রঙলাল বংশ পরম্পরায় নিজের তৈরি নিয়মে দাদনের অঙ্কের পরিবর্তন করে। রঙলালের মুখোশটি ক্রমেই গজাশিমুলের মানুষের কাছে খুলে যায়। রঙলালের মতো আড়কাঠিদের এই সময়োপযোগী এই নতুন রূপের অত্যাচারের মাত্রাটিও নিতান্ত কম ভয়ানক নয়। সে গজাশিমুলের বসু শবর জনজাতির লোকসংস্কৃতিকে নিয়ে কাজ করাকেও বাঁকা চোখে দেখে। রঙলালকেও আমরা কখনো মেয়েদের প্রতি কোনো সম্মান প্রদর্শন করতে দেখিনি। রাজীবকেও সে সন্দেহ করেছে। আর সে সন্দেহের বীজ ঢুকানোর চেষ্টা করেছে গজাশিমুলের মানুষের মনে। সে বুঝেছে রাজীব গজাশিমুলের মানুষকে ভুলিয়ে ভালিয়ে

তাকে তাড়াতে চায়। চায় গজাশিমুলের মানুষকে তাদের দাদনের বোঝা থেকে মুক্ত করতে। সে রাজীবের ঘরে গ্রামের মেয়েদের ছেড়ে দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে গ্রামের মোড়ল দশরথ ভোক্তার কাছে। সে ভেবেছে রাজীবের লোকসংস্কৃতি চর্চার নাম করে মেয়েদেরকে বিভুঁইয়ে ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজীবের নামে দুর্নাম রটালে হয়তো বা তার নিজের গুরুত্ব বাড়বে। কারণ এমনিতেই গজাশিমুলের মানুষেরা তার কুকীর্তি কিছুটা ধরে ফেলেছিল। আর রাজীবের সংস্পর্শে আসার পর এই গ্রামের মানুষের কাছে তার প্রভাব যেন আরও কমে গেল। নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে মেয়েদেরকে মিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করতে তার মোটেও বাঁধেনি। মেয়েদেরকে সে প্রকৃতই কোনো সম্মান করতে জানে না। তাই সে কখনো 'ডব্‌কা লেড়কি' কখনো আবার 'ছগরী -মেয়া' বলেছে। তবে রঙলালের মতো মানুষকে শুরুতেই হয়তো বা কিছুটা চেনা সহজ হয়েছে। কিন্তু রাজীবদের মতো আড়কাঠিদের চিনতে পারা আরও কঠিন। এরা আরও ভয়ংকর। মেয়েদের সঙ্গে সুযোগ বুঝে তাদের অজান্তেই তাদেরই শরীর বিক্রির বিশ্ববাজারী এক ফাঁদচক্র গড়ে তোলে। এভাবেই আড়কাঠিরা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এসে সাধারণ গ্রামীণ সরল সোজা মানুষগুলিকে ঠকিয়ে নিজেদের আখের গুছায়। আর এই ধরনের শোষণ ব্যবস্থার শিকারে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গজাশিমুলের বসু শবর জনজাতির নারীজীবন। নারীদের নিয়ে যে ধরনের অন্যায় কার্যকলাপ চলে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গেও তার কোনো পরিবর্তন হয় না।

৫.৬ *কলাবতী কথা:*

পটশিল্পকে কেন্দ্রে রেখে ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের *কলাবতী কথা* উপন্যাসে নারীশিল্পীদের যে জীবনকে দেখানো হয়েছে, সেখানে একদিকে যেমন মেয়েদের পুরুষ সমাজের ভোগ লালসার শিকার হতে হয়েছে তেমনি অন্যদিকে এই পুরুষসমাজের অত্যাচারের প্রতিবিধান

করতে নারীর প্রতিবাদী সত্তাকেও দেখানো হয়েছে। একজন প্রান্তিক নারী লোকশিল্পীকে পুরুষের আগ্রাসনের শিকার হতে দেখে অন্য এক নারী সেই লাঞ্ছনার নীরব দর্শক হয়ে থাকেনি বরং এগিয়ে এসেছে। চরম বিপদের সময় তার পাশে দাঁড়িয়েছে ও তাকে নতুন জীবন দান করেছে। সমাজ পরিত্যক্তা মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়েছে। কাজের সঙ্গে যুক্ত করে তাকেও বাঁচতে শিখিয়েছে। কনকের মতো এক সাধারণ স্বামী পরিত্যক্তা গ্রাম্যবধূ যেভাবে অকথ্য পরিশ্রম করেও মাথা উঁচু করে থেকেহে এবং নিজের আয়ের পথ নিজেই গড়ে তুলে নিজের সন্তান ও শাশুড়িকে রক্ষা করেছে তার শিল্পিত কাহিনি এই *কলাবতী কথা*। তানিয়া গোলদার তাঁর *লোকনাট্যের নারীশিল্পীরা* গ্রন্থে নারীশিল্পীদের প্রসঙ্গে যে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তা উপন্যাসের কনকের জীবনের ক্ষেত্রে যেন খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। গোলদার লিখছেন,

> তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায়ের মেয়েরা একদিকে যেমন সংসার সামলেছে অন্যদিকে তেমনই তাদের লোকসংস্কৃতিতে অংশগ্রহণ করেছে। এভাবেই দেখা যায় ছোট থেকে তার কোলের সন্তানটিও ঐ সংস্কৃতির মধ্যে বড়ো হতে থাকে। তাই তো বংশ পরম্পরায় নারী চরিত্রগুলো বেঁচে আছে।[১৯]

ক্লাস এইট পর্যন্ত সে পড়াশুনা করেছে। কনকের পড়ায় আগ্রহ দেখে তার স্কুলের দিদিমণি তার দাদাকে অনুরোধ করে, বাপ-মা মরা কনককে অল্প বয়সে বিয়ে না দিতে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! সে যাত্রায় বোনটিকে বিদেয় করতে পারলে কনকের দাদা নিজেকে ঝামেলা মুক্ত মনে করে। আর কনকের জন্যে দাদার দেখা পাত্রটিও ছিল মদ্যপ ও নারী আসক্ত। যাই হোক, পইঠা নামে একটি পটশিল্পের সংস্থা কনক নিজে হাতে করে গড়ে তুলেছে। তবে তার জীবনের এই কঠিন সংগ্রামের ক্ষেত্রে স্বামীকে সঙ্গে না পেলেও পাশে পেয়েছে তার শাশুড়িকে। তার শাশুড়ি লতুও গ্রামে গ্রামে মুড়ি বিক্রি করেছে। তার ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে আগলে রেখেছে পুত্রবধূকে। পুত্রবধূর লড়াইকে সেও সমর্থন করেছে। নিজস্ব

সামাজিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে প্রান্তিক শিল্পীর এই লড়াই একেবারেই বাস্তবানুগ। উপন্যাসের কল্পনায় কনকরা যে কল্পনার মায়ায় নির্মিত হয়নি তা পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্রকরদের দিকে তাকালে বোঝা যায়। 'বীরভূমের পটচিত্র ও চিত্রকর'[২০] প্রবন্ধে লোকসংস্কৃতি গবেষক অগ্নিমিত্র ঘোষ এ নিয়ে বিস্তারিত বর্নোনা দিয়েছেন। উপন্যাসেও সেই বর্ণনার শিল্পিত বয়ানকে দেখতে পাওয়া যায়। ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের *কলাবতী কথা*-য় সেই শিল্পী মনের যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবন যাপনকে দেখতে পাওয়া যায়।

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে দেখাচ্ছেন, শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে কুরুম্ভেরা মেলার দিনে কুকাই গ্রামে একটি মেলার আয়োজনকে। সেখানে বিভিন্ন লোকশিল্পীরা তাদের নিজ নিজ সৃষ্টি সম্ভারের পসরা সাজিয়ে বসেছেন। কনকও তার পটশিল্পের সম্ভার নিয়ে সেই মেলায় বসেছিল। লোকশিল্পের সমাদর করতে সরকার থেকে দূর-দূরান্ত থেকে আসা লোকশিল্পীদের জন্য অনেক রকমের ব্যবস্থা করেছিল সরকার। যেমন- তাদের জন্য থাকবার ব্যবস্থা, খাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি। নাচগানের আসর বসেছিল সেই শিল্পমেলায়। নাচগান শেষ করে কুরুম্ভেরা দুর্গের মধ্যে প্রত্যেক শিল্পীর জন্য আলাদা আলাদা থাকবার ব্যবস্থা করেছিল সরকার। কনকের জন্য নির্দিষ্ট থাকবার ঘরে প্রবেশের সময় সে হঠাৎ একটি মেয়ের কান্নার আওয়াজ শুনতে পায়। দুর্গের চোরাকুঠুরির ভুলভুলাইয়া পথে কান্নার শব্দকে অনুসরণ করে কনক একটা ঘরে প্রবেশ করে একটি মেয়েকে কাঁদতে দেখে। মেয়েটির অবিন্যস্ত কেশ ও বেশভুষা দেখে সে মেয়েটির কাছে এসে দাঁড়ায়। তার কান্নার কারণ খুঁজতে গিয়ে সে জানে মেয়েটিকে কিছুক্ষণ আগে শ্লীলতাহানি করেছে এক লম্পট যুবক মদ্যপ অবস্থায়। পেটের যন্ত্রণার কারণে অসুস্থতা বোধ করায় ঘরে শুয়ে ছিল কলাবতী। কলাবতী টুডুর বয়স আঠারো। সে জিওন-ঝরনা দলের হয়ে নাচ করতে এসেছিল এই মেলায়। সবাই যখন প্রোগ্রামে নাচ-গান নিয়ে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় মুখ ঢাকা এক মদ্যপ যুবক কলাবতীর ঘরে

ঢুকে তার উপর চড়াও হয়। তার পরনের শাড়ি ব্লাউজ ছিঁড়ে দেয়। অল্পবয়সী নারী লোকশিল্পীরা পেটের দায়ে নৃত্যশিল্পকে বেছে নিয়েছে। শিল্পচর্চা করতে এসে তাকে পুরুষের এই আক্রমণ সহ্য করতে হয়। প্রথমত কলাবতী ভয় পেলেও পরে নিজেকে কোনোরকমে সামলে নেয়। সেই মাতাল লোকটিকে প্রতিহত করতে সে সজোরে কিল, ঘুষি, থাপ্পড় মারতে থাকে। লোকটা কলাবতীকে শাসিয়ে গেছিল এই শ্লীলতাহানির কথা কাউকে কিছু না জানাতে। যদি সে জানায়, তবে দুর্গের বাইরে গেলেই পার্টির ছেলেদের দিয়ে তাকে হাত পা বেঁধে তুলে নিয়ে যাওয়ার ভয় দেখিয়েছিল। কনক কলাবতীর কান্নার শব্দে তার কাছে ছুটে এসে তাকে আশ্বস্ত করে। তারপর মঞ্চের কাছে এসে মাইক্রফোন হাতে নিয়ে সকলের উদ্দেশ্যে কলাবতীর উপর মাতালের অত্যাচারের কথা শোনালো। একজন মেয়ে হয়ে অন্য এক এক মহিলার ইজ্জত নিয়ে এইরূপ কদর্যতাকে কনক কিছুতেই মেনে নেয়নি। সে প্রতিবাদের সুরে দর্শক ও মেলার উদ্যোক্তাদের জানায়- প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি হোক। সে মহিলা শিল্পীদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। শিল্পের মেলা হয় যেখানে, সেখানে শিল্পীদের যোগদান করার প্রকৃত উদ্দেশ্য তো একে অপরকে আনন্দ দেওয়া ও নেওয়া। সেই আনন্দের মেলায় শিল্পের সাধনা করা হচ্ছে যেখানে সেখানে নারীদের মান ইজ্জত নিয়ে এই দূষণকে একজন মেয়ে হয়ে কনক মোটেই মেনে নিতে পারে না। তাই সে প্রশ্ন তুলেছে তাদের সুরক্ষিত রাখবার দায় ও দায়িত্বটি আদতে কার? আসরে সকলের সামনে কনক এরকম একজন সৎ ও সাহসী লোককে থানায় ডায়েরি করার জন্য এগিয়ে আসতে বলেছিল। কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না দেখে সে আরও চিৎকার করে প্রতিবাদ জানালো। কিন্তু তাকে জোর করে থামিয়ে দিল কিছু পুরুষ। কারণ লম্পট অন্যায়কারী যুবকটি পার্টির নেতা মন্ত্রীর ঘরের লোক। এরা তো সব কালেই ও সকল সমাজেই অন্যায় করেও পার পেয়ে যায়। তাদের কোনো শাস্তি হয় না। কনক কলাবতীর এই অবস্থায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে তার দুঃখ কষ্টকে

বুঝতে চেষ্টা করেছে। প্রত্যেকের ঘরেই তো মা, বোনেরা রয়েছে। তাদের জীবনের এই সংকটের কথা ভেবে সে আতঙ্কিত হয়েছে। অন্য কাউকে পাশে না পেয়ে সে এই কলাবতীর জন্য একাই লড়ে গেছে। সারারাত সেই ভয়ার্ত মেয়েটিকে পাহারা দিয়ে নিজের কাছে রেখেছে। কলাবতী এই গ্রামীণ মেলায় এইভাবে অত্যাচারিত হয়ে যার কাছে একটু আশ্রয় পেয়েছিল সে এই কনক। সমাজে বিশেষত প্রান্তিক সমাজের চোখে এই মেয়েটির গায়ে যে কলঙ্কের দাগ লেগেছে সে বুঝেছে সমাজে তার কোনো স্থান হবে না। মেয়েটির সামনে যখন জীবনের সব আলো নিভে গেছে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। তবে কনক তাকে নিজের সন্তানের আসন দিয়েছে। কনকদেরই যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা সেই পরিবারে কলাবতী টুডুকে আশ্রয় দিয়েছে। তার ছেলে রামুর সঙ্গে কলাবতীর বিয়ে দিয়েছে। তাকে পটশিল্পের কাজ শিখিয়ে স্বনির্ভর করে তুলেছে। প্রান্তিক নারী হয়ে মেয়েদের সঙ্গে ঘটে চলা এই ধরনের চরম অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেনি এই কনকেরা। সমাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে নিজ নিজ ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে। এরা জানে না কোনো নারীবাদী আন্দোলনের কথা। এরা নিজেদের অস্তিত্ব দিয়ে নিজেকে বুঝেছে। নিজেরা অনুভব করেছে এ সমাজে তাদের হয়ে কথা বলার আজও কেউ নেই। তারা নিজেরাই এই পুরষতান্ত্রিক অন্যায়কারী সমাজের প্রতিপক্ষ হয়ে লড়ে গেছে। নিজে বেঁচে অপরকে বাঁচতে শিখিয়েছে। আর তাই আমরা দেখতে পেলাম আমার নির্বাচিত প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসেই ঔপন্যাসিকেরা নারীর মুখে দিয়েছেন সেই প্রতিবাদী স্বর। তাই সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক* উপন্যাসের কুস্মিরা আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ করে। বিজুলিরা কুস্মিদের মতো আত্মহত্যা করে না বরং রুখে দাঁড়ায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আর ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের *কলাবতী কথা* উপন্যাসের কনকেরা আত্মনির্ভর হয়। অন্য একটি মেয়েকে মৃত্যুর অন্ধকার থেকে বের করে জীবনের পথ দেখায়। জীবনে স্বনির্ভর হতে শেখায়। আর এই চেতনা কোনো নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর

প্রতিফলন নয় বরং মানবিকতার দিক থেকে সবকিছুকে দেখা। তাদের এই চেতনা নিতান্তই আন্তরিক একটি বিষয় যা তাদের এই অগ্রগতির মূল কারণ।

৫.৭ উপসংহার:

উপন্যাসগুলিতে আলোচিত শিল্পীদের জীবনের বাস্তবিক অবস্থান এখানে উঠে এসেছে। নারী, পুরুষ আবার কখনো না-নারী না-পুরুষের জীবনের সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, ঘাত-প্রতিঘাত ইত্যাদি নানান বিষয় তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে আলোচিত হয়েছে। লোকশিল্প নির্ভর উপন্যাসগুলির বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় কেন্দ্রীয় লোকশিল্পের প্রায় প্রত্যেকটির পরিবেশনে নারীরাই অগ্রণী ভূমিকা নেয়। আমার আলোচ্য উপন্যাসে লোকশিল্পের পরিবেশন পুরষের দ্বারা সম্পাদিত হলেও নারীরাই সেই শিল্পের কেন্দ্রে। কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক থেকে নানা ধরনের কু-সংস্কারের কথা বলে সেই নারী শিল্পীদের উপর চলে নানা ধরনের অত্যাচার। কখনো পুরুষতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, কখনো ভূস্বামী ব্যবস্থার শোষণের শিকার হতে হয় মেয়েদের। চলে নারী পাচার। এই লোকশিল্পীরা লিঙ্গগত দিক থেকেও প্রান্তিক। এই পিছিয়ে পড়া অভাবের কারণে তো বটেই, সেইসঙ্গে লিঙ্গগত দিক থেকেও। সংখ্যার বিচারে তারা বহু, কিন্তু মর্যাদায় একা। শিক্ষার আলো থেকে তারা আজও অনেক পিছিয়ে। লিঙ্গগত বৈষম্যে তারা অসহায়। লিঙ্গগত ক্ষেত্রে এই অসাম্যকে ঔপন্যাসিক কীভাবে তুলে ধরলেন তা আলোচনা করেছি। প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে গোটা বিশ্বে নারীর নিজের অধিকার আদায়ের দাবীটি ঠিক কেমন ছিল সেই দিকটি। আলোচ্য উপন্যাসগুলিতেই বা তার প্রভাব কতখানি পড়েছে সেই বিষয়টি। লিঙ্গগত বৈষম্যে তারা ঘরে বাইরে অসহায়। স্বাধীনতা লাভের পর আমরা বেশ কিছু বছর পার করতে চলেছি। গোটা বিশ্বের নারীরা

যখন নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন সেখানে আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের নারী শিল্পীরা সেই স্বাভাবিক অধিকার বা নারী প্রগতি থেকে অনেক দূরে।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১. বোভোয়ার, সিমোন দ্য(১৯৪৯)। সেকেণ্ড সেক্স। আজাদ, হুমায়ুন(অনুবাদক,২০১২)। *দ্বিতীয় লিঙ্গ* ।ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

২. উদারনৈতিক নারীবাদের মূল বক্তব্য ছিল রাজনীতিতে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার ও আইন সংস্কার। যার দ্বারা নারী ও পুরুষ উভয়কক্ষই সমান হয়ে উঠবে। বিক্তিগত উদ্যোগ ও লেখা লেখির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এদের আন্দোলন।

র‍্যাডিকাল নারীবাদী আন্দোলনে পুঁজিবাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে জোর দেওয়া হল।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা মূলত সামাজিক ক্ষেত্রে সমানাধিকার চাইলেন। মর্যাদার দিক থেকে পুরুষ অপেক্ষা তারা কম কিছু নয় বুঝিয়ে দিছিলেন তাদের আন্দোলনের মাধ্যমে।

মাজী, বিপ্লব। *ইকোফেমিনিজম নারীবাদ ও তৃতীয় দুনিয়ার প্রান্তিক নারী.*। কলকাতা: অঞ্জলী পাবলিশার্স। পৃ. ৬৮

৩. নস্কর, মনোজ। *প্রসঙ্গ যৌনতা: প্রান্তবাসীর আত্মকথা* । দাস, শকুন্তলা(সম্পাদনা, ২০১৯)। *নারী প্রগতি নানা ভাবনায়।* কলকাতা: এবং মুশায়েরা। পৃ. ৮৩

৪. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস। ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ(সম্পাদনা, ১৯৯৮)। নিম্নবর্গের ইতিহাস। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ১৭

৫. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা। *২ উপন্যাস সমগ্র, মায়ামৃদঙ্গ*। কলকাতা, দে'জ, ২০১৩। পৃ. ১৬৬।

৬. 'খেমটা উত্তর ভারতীয় 'বাঈজী' নৃত্যের হীন বিকল্প। গ্রীবা সঞ্চালনে, কটি চালনায় ও ভ্রূভঙ্গীতে শৃঙ্গার রসের আধিক্য। খেমটা নৃত্য এক সময়ে পল্লী বাংলায়, শহরে এবং শহর ঘেঁষা পল্লী অঞ্চলে ধনী ও জমিদারদের বৈঠকখানায় ও অন্তঃপুরে আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। তবলা, হারমোনিয়াম, সারঙ্গী সহকারে সারা রাত ধরিয়া নৃত্য চলিত। খেমটা বাঈ(নর্তকী) গানের কলি গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী ও ভ্রূভঙ্গী করিয়া গানের পদার্থ ও ভাবার্থের ব্যঞ্জনা দিত। হস্তস্থিত রুমাল বা বসনপ্রান্ত, কখনও বা ঘাগরার অঞ্চলপ্রাপ্ত এক হস্তে উর্ধ্বে তুলিয়া নর্তকী বিভিন্ন পাদচারীতে নৃত্যস্থল মণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করিত। দর্শকেরা খুশি হইয়া টাকা কড়ি রুমালে বাঁধিয়া ছুঁড়িয়া দিত'।

ভারতকোষ (তৃতীয় খণ্ড, ১৯৬৪)। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। পৃ. ৪৩

৭. ঢপকীর্তন পরিবেশনকারী নারীশিল্পীকে *মায়ামদঙ্গ* উপন্যাসে ঢপওয়ালী বলা হয়েছে। এর উৎস ঢপকীর্তন। খগেন্দ্রনাথ মিত্র জানিয়েছেন, মধুসূদন কান নামক একজন গায়ক এর পরিপুষ্টি দান করেন।

মিত্র, খগেন্দ্রনাথ(১৩৫২ বঙ্গাব্দ)। *কীর্তন*। *বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী। পৃ. ৩৩

৮. ঝা, শক্তিনাথ(২০০০)।*ঝাকসু*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি অ আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। পৃ. ৪৮

৯. পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৯

১০. মণ্ডল, তুলসীচরণ(২০১৪)। *আলকাপ সম্রাট ঝাকসু* । মুর্শিদাবাদ: মুর্শিদাবাদ সাহিত্য আকাদেমি। পৃ. ৯

১১. গোলদার, তানিয়া(১৪২২ বঙ্গাব্দ)। *লোকনাট্যের নারীশিল্পীরা* । বীরভূম: 'রাঢ়। পৃ.৩৫

১২. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা। *২ উপন্যাস সমগ্র, মায়ামৃদঙ্গ*। কলকাতা, দে'জ, ২০১৩। পৃ. ১৭৪

১৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ১৮৮

১৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ১৯৩

১৫. আজরাইল> হরণকারী, ফিরিশতা। মালেক-উল-মৌত-যমদূত। আজরাইল এর অর্থ মৃত্যু দূত। ধার্মিকদের দৃষ্টিতে এরা পাপীর কাছে ভয়ংকর স্বরূপ এবং পুণ্যবান ব্যক্তিদের কাছে সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

হক, কাজী রফিকুল(সম্পাদনা, ২০০৪)। *বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দি উর্দু শব্দের অভিধান* । ঢাকা: বাংলা একাডেমী। পৃ. ১১

১৬. সেনগুপ্ত, মিহির। *অঙ্গ অনঙ্গ* । আচার্য, অনিল ও সাহা অর্ণব(সম্পাদনা, ২০০৯)। *যৌনতা ও বাঙালি* । কলকাতা: অনুষ্টুপ। পৃ. ১৫৬

১৭. সেন, অভিজিৎ(২০১০)। *রহু চণ্ডালের হাড়*। কলকাতা: জে এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং। পৃ. ৮৩

১৮. মুখোপাধ্যায়, সুব্রত(১৯৯১)। *রসিক* । কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ১৯২

১৯. গোলদার, তানিয়া(১৪২২)। *লোকনাট্যের নারীশিল্পীরা*। বীরভূম: 'রাঢ়, পৃ. ৪৫

২০. ঘোষ, অগ্নিমিত্র। *বীরভূমের পটচিত্র ও চিত্রকর*। ভট্টাচার্য, অশোক(সম্পাদনা, ২০১৭)। *পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্র*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। পৃ. ২৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

তুলনামূলক আলোচনায় শিল্পীমনের জীবনশিল্প

৬.০ ভূমিকা:

আমাদের নির্বাচিত লোকশিল্পকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির প্রত্যেকটির ঔপন্যাসিকেরা নানাভাবে স্বকীয়তায় ও স্বাতন্ত্র্যে তাদের উপন্যাসগুলিকে শিল্পসম্মত করে রূপদান করেছেন। এদিক থেকে তারা প্রত্যেকেই তাদের মুনশিয়ানায় অনন্য।

নির্বাচিত উপন্যাসগুলির প্রত্যেকটি লোকশিল্পকেন্দ্রিক হয়েও ভিন্ন ভিন্ন ঔপন্যাসিকের কলমে স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহার, শব্দচয়ন, বর্ণন কৌশল, আখ্যান নির্মাণ পরিকল্পনা, বিশেষ ধরনের লোকশিল্পকে ব্যবহার করে উপন্যাসের আঙ্গিক প্রয়োগে নতুনত্ব সত্যিই কৃতিত্বের দাবী রাখে। ঔপন্যাসিকেরা লোকশিল্পের হাত ধরে লোকশিল্পীদের সৃষ্টিশীল জীবনের বিশদে আলো ফেলেছেন। এই ঔপন্যাসিকেরা লোকশিল্পীদের শিল্পময় জীবনকে হাজির করেছেন বিচিত্র সুরে। উপন্যাসে হাজির হওয়া এই লোকশিল্পীরা উপন্যাসের চরিত্র হয়ে তাদের শিল্পকে পরিবেশন করেন। পাঠক পায় বিনোদনের আনন্দ। উপন্যাস শিল্পের বুননে লোকশিল্পীদের শিল্পময় উপস্থাপনে পাঠক পায় মনের আরাম। দর্শককে বা পাঠককে আনন্দ দানের পাশাপাশি তারা নিজেও পান সৃষ্টির আনন্দ। তবে, তাদের এই আনন্দ ক্ষণিকের। কারণ দারিদ্র্য তাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী। বাস্তবিক জীবনে প্রতি মুহূর্তেই চলে তাদের বেঁচে থাকার লড়াই। অভাব-অনটনে, জীবনের নানা ধরনের জটিলতায় জর্জরিত তাদের জীবন বড়োই ঘাত-প্রতিঘাতময়। লোকশিল্প তাদের প্রাণের সম্পদ। একে নিয়েই তাদের বেঁচে থাকা। কিন্তু এই লোকশিল্পের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হতে তাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিল্পীজীবনের সংঘাত ঘটেছে বারংবার। লোকশিল্পকে নির্ভর করে তারা তাদের জীবনের আয়ের পথ বেছে নিলেও অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পীদের এমন কিছু আয় হয় না। শুধুমাত্র এই

শিল্পকে পেশা করে তাদের জীবন চলে না। চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে লড়তে লড়তে তাদের এগিয়ে যেতে হয়। কখনো কখনো এই আর্থিক অনটন এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে কোনো কোনো লোকশিল্পী এই পেশার পাশাপাশি অন্য পেশাকে বেছে নিতে বাধ্য হন। আমার আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে ঔপন্যাসিকদের কলমে শুধুমাত্র বিনোদন হিসাবেই লোকশিল্প আসেনি, সেই সঙ্গে উঠে এসেছে তাদের জীবনের এই বাস্তবিক সংকটের কথা। তবে অনেক শিল্পী আবার এই লোকশিল্পকেই তাদের জীবনের মূল অবলম্বন করেছেন। আর এ শিল্পকে নিয়েই তাদের বাঁচা মরা। তাই উপন্যাসগুলিতে সেই সমস্ত দিকও এসেছে খুব স্বাভাবিকভাবেই। লোকশিল্পের বিনোদনের আড়ালে লোকশিল্পীদের বাস্তব জীবনের এই দিকগুলিও ঘুরে ফিরে এসেছে। লোকশিল্পীদের হাত ধরে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যে লোকশিল্পগুলি প্রদর্শিত হতে থাকে তা দীর্ঘকাল ধরে একই ধারায় চলতে থাকে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তনও ঘটে। আমার আলোচ্য উপন্যাসগুলির সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লোকশিল্পগুলি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, জীবিকা, সুখ- দুঃখ, আনন্দ, সমস্যা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকশিল্প ও লোকশিল্পীদের এই পরিবর্তনকেও বাদ দেননি আমার আলোচ্য উপন্যাসের ঔপন্যাসিকেরা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লোকশিল্পীদের জীবনের এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা।

এই অধ্যায়ে আমার আলোচনার মুখ্য বিষয় হিসাবে উঠে আসবে আমার আলোচ্য লোকশিল্পনির্ভর উপন্যাসগুলির লোকশিল্পীদের শিল্পময় জীবনের সেই বাস্তব সংকটের দিক গুলি। এই শিল্পীদের বাঁচা মরা যে শিল্পকে আঁকড়ে ধরে, যে শিল্প তাদের জীবনে ক্ষণিকের জন্য না হয়ে জীবনভর তাদের আনন্দের রসদ যোগাতে পারত, অথচ সেই শিল্পকে আঁকড়ে বাঁচলে জীবনে চূড়ান্ত দারিদ্র্যের সম্মুখীন হতে হয়। তাই শিল্পীমনের শৈল্পিক ক্ষুধা সঙ্গতি

বিধান করতে পারে না বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে। তাই লোকশিল্পীদের শিল্পময় জীবনের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে নিরন্তর। উপযুক্ত পারিশ্রমিক ছাড়াই তারা শিল্পের চর্চা করেন। আমার আলোচ্য উপন্যাসগুলির ঔপন্যাসিকেরা তাদের কলমে লোকশিল্পীদের শিল্পময় জীবনের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির সেই দ্বান্দ্বিক চালচিত্রকে কিভাবে নির্মাণ করেছেন সেই বিষয়কে আলোকপাত করতে চেষ্টা করব।

৬.১ *মায়ামৃদঙ্গ* :

এরপরেই, আসা যাক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসের প্রসঙ্গে। এই উপন্যাসে সিরাজ শিল্পীমনের জীবন শিল্পকে দেখিয়েছেন একটু অন্যভাবে। এখানে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মূলত এনেছেন আলকাপ গাইয়েদের জীবন প্রসঙ্গকে। এই উপন্যাসে আলকাপ শিল্পীদের শিল্পজীবনের সঙ্গে তফাৎ ঘটেছে তাদের বাস্তব জীবনের। এই দুই জীবনের মেলবন্ধন ঘটাতে গিয়ে তাদের মনেও তৈরি হয়েছে নানা দ্বন্দ্ব। দারিদ্র্য তো তাদের জীবনের নিত্যই সঙ্গী। কিন্তু আলকাপ কুশীলবদের অভিনয় জীবন ও বাস্তব জীবন অবস্থার মধ্যে তৈরি হওয়া নানান জটিল সংকটকে দেখালেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। সিরাজ তাঁর এক লেখায় বলেছেন,

> ১৯৫০ সালের শেষ দিকে একটা বাঁশের বাঁশি ফিরিয়ে নিয়ে গেল গ্রামীণ মিথের সুপরিচিত জগতে। কাটতে থাকল দিনরাত্রি গাঁয়েগঞ্জে হাটে বাজারে মেলায়-মেলায়। অজস্র মানুষ দেখলাম- বিচিত্র, বিস্ময়কর সব চরিত্র। মুর্শিদাবাদ বীরভূম মালদা সাঁওতাল পরগণা দুমকা ঘুরে বেড়াই আলকাপ দলে। আড়াই হাজার রাত- ষাট হাজার ঘন্টা কেটে যায় সৌন্দর্য ও যন্ত্রণার মধ্যে। মেয়েদের হৃদয় ও মুখমন্ডলবিশিষ্ট তরুণ পুরুষের শরীরে কিংবদন্তীর গ্রামপরীরা কীভাবে অনুপ্রবেশ করে, দেখেছি। আলকাপ দলের 'ছোকরা'-র

প্রেমে পড়েছি। অচরিতার্থ কামনায় জ্বলে মরেছি। ঝাকড়মাকড় চুল নাড়া দিয়ে দোহারকিরা আগুনের হল্কার মতো লোকগাথার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।[১]

রসিক উপন্যাসে সুব্রত মুখোপাধ্যায় শিল্পীদের জীবনের সংকটময় যে যে দিকগুলিকে দেখিয়েছেন, তা মূলত তৈরি হয়েছে অর্থনৈতিক সংকট থেকে। কিন্তু *মায়ামৃদঙ্গ*-এ শিল্পীদের সংকট তাদের অভিনয় ও বাস্তব জীবনকে নিয়ে তাদের শারীরিক ও মানসিক কারণে তৈরি হওয়া। আর আমরা উপন্যাসে দেখেছি, কোনো একটি আসরে আলকাপের দল যে উপস্থাপন করে আর তার বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পায় তা খুবই সামান্য। আলকাপ শিল্পীদের দল চালানোর ক্ষেত্রে এত অল্প টাকা পারিশ্রমিক পেয়ে সব শিল্পীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার পর ওস্তাদের আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট থাকে না। ওস্তাদ ছাড়া অন্যান্য শিল্পীদের পারিশ্রমিকের পরিমাণও খুবই কম। আলকাপ শিল্পীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমাজের অত্যন্ত সাধারণ ঘরের খেটে খাওয়া মানুষ। গ্রামের ধনী ভদ্র লায়েক মানুষদের চন্দ্রমোহন জুয়াড়ি টাকা দিয়ে বশ করেছে। চন্দ্রমোহনবাবু দাবী করেছেন এ আসরে ঝাঁকসা বেশি করে রঙ চড়াক। এ আসর হবে একেবারেই চন্দ্রমোহনবাবুর রুচি অনুযায়ী। একেবারেই চ্যাংড়ামিতে ভরপুর। এ আসরটিতে উপস্থিত থাকবে সব বেলেল্লা মানুষেরা। এ আসর ভদ্রজনদের জন্য নয়। এ আসর কোনো গৃহস্থ মেয়েদের জন্য নয়। চন্দ্র জুয়াড়ী জানিয়ে দেন আসরে যদি ঝাঁকসা রঙ ঠিক মতো ঢালতে না পারে তবে মেলায় তার লোকসান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। তখন তার অনেক টাকা লোকসান হয়ে যাবে। মেলায় লোক হবে না। অর্থাৎ আসরে কি পরিবেশিত হবে তা ঠিক করে দেবেন চন্দ্রমোহন বাবু যিনি পেশায় একজন জুয়াড়ি। তিনি ঝাঁকসার শিল্পী সত্তাকে আঘাত করেছেন তার নিজস্ব রুচি অনুযায়ী।

লোকমনের অন্তরের ফসল আলকাপ। সেখানে থাকে সাধারণের নিজস্ব বয়ান। উঠে আসে নিজেদের দুঃখের কথা এবং সুখের স্মৃতি। এ স্মৃতি যেমন তাদের হাসায় তেমনি

কাঁদায়ও অনেক। সুখ ও দুঃখের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেন তাঁরা তাঁদের শিল্পে। সাধারণ দর্শক তাতে আনন্দ পায়। চমৎকৃত হয় অব্যক্ত আনন্দে। সেই আনন্দে শিল্পী জীবন ও শিল্পী মনের স্বার্থকতা। নিজেদের নিরপেক্ষ শিল্পী সত্তা সেখানেই ধন্য মনে করে। আর্থিক ক্ষতিকে স্বীকার করেও এটুকুর জন্য তাঁদের বেঁচে থাকা। যেখানে টিকে থাকার চেষ্টা নেই। সম্মানের সঙ্গে বহু হয়ে যাওয়ার আনন্দে তাঁরা আপ্লুত। কিন্তু এটাও গ্রাস করতে চায় জুয়াড়ি চন্দ্রমোহন বাবু। তাদের কাছে শিল্প নয়- চটুল বিনোদনই মূল। অর্থ সেখানে শেষ কথা। কিন্তু এটাই তো শিল্পী মনের অনর্থের মূল। এটা তাঁদের কাছে খুব ধাক্কার। এবং কষ্টেরও বটে। তাই ঝাঁকসা তাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন, তার দল যদি আসর জমাতে না পারে তারা তখনই চলে যাবে। চন্দ্র জুয়াড়ি চা খাওয়ানোর প্রলোভন ঝাঁকসাকে দমাতে পারেনি। ঝাঁকসা ওস্তাদ উঠে পড়ে চন্দ্র জুয়াড়ির সামনে থেকে। চন্দ্রজুয়াড়িদের মতো লোকেরা নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে মানুষকে ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করে দিতে সর্বদা প্রস্তুত। এদের উপর নির্ভর করে আলকাপ শিল্পীদের অর্থনৈতিক অবস্থা। আলকাপের শিল্পীরা অনেক সময়েই এই চন্দ্র জুয়াড়িদের মতো মানুষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভীষণভাবে। ফজলের কথায় আমরা জানি, একজন আলকাপ শিল্পী আলকাপকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে সামান্য একটি ভিটে সে রাখতে পেরেছে। গানের টাকাতেই তার সংসার চলে কোনোরকমে। আলকাপ গেয়ে সে যৎসামান্য যেটুকু উপার্জন করে, খাওয়াতেই তার সবটুকু চলে যায়। চালের টালি পর্যন্ত দিতে পারেনি সে। তার উপর আবার শরীর খারাপ হয় মাঝেসাঝে। আবার তার বউটারও খুব খরচের হাত। মিতব্যয়ী হলে হয়তো বা সে কিছু টাকা রাখতে পারত। একজন দক্ষ আলকাপ শিল্পী হিসাবে সে চায় টাকাকড়ি আর নাম যশ।

ঝাঁকসার আলকাপ দলের আরেকজন শিল্পী খোলী বা তবলচি বাঘা মিঞা। শিল্পী হিসাবে তার চাহিদা খুবই কম। এই বাঘা মিঞা শুধু টাকা চায় আর তার হাতের অভ্যাস

চালিয়ে যেতে চায়। তার বয়স হয়েছে। ভুরুর চুলে তো পাক ধরেছেই, পাশাপাশি হাড়গুলিতেও যেন পাক ধরেছে। তবু সে অবিরাম তার কাজ করে চলেছে। তাকে বিশ্রাম নিতে দেখা যায় না। আগে তার পেশা ছিল বিড়ি বাঁধা। তবে বিড়ি বাঁধার থেকে এই পেশা অনেক ভালো বলে সে মনে করে। প্রতি রাত পিছু ওস্তাদ ঝাঁকসা তার পারিশ্রমিক বাবদ সাত টাকা দেয়। এই টাকাই তার কাছে অনেক। এই কাজটিকেও সে ভালোবাসে।

ঝাঁকসার দলের আরেকজন শিল্পী পঞ্চানন। শিল্পী হিসাবে সে সুরের মর্ম বোঝে। হারমোনিয়াম বাজানোয় সে সুদক্ষ। মিষ্টি হাতে সুর তুলতে সে অত্যন্ত পটু। কিন্তু তার গলায় সুরের পরিবর্তে যেন অসুর বাসা করেছে। তাই কণ্ঠ দিয়ে যে সুর সে প্রকাশ করতে পারে না, সেই সুর প্রকাশ করে অত্যন্ত ক্ষিপ্র হাতে হারমোনিয়াম বাজিয়ে। শুনে মনে হয় এ যেন হারমোনিয়াম নয়, অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজছে। ঝাঁকসা ওস্তাদের আলকাপ দলে যোগ্য লোকই রাখে। সে চায় তার দলের প্রতিটি লোকেরই যেন দরকার হলে আসরে ওঠার পারদর্শিতা থাকে। লোক হাসানোর সামর্থ্যও যেন থাকে। কিন্তু সেরকম শিল্পী খুঁজে পায়নি ঝাঁকসা। তার দলের তিন দোহারকি নাসির, উদ্ধব আর বটো। তারা দোহারকি হিসাবে আলকাপে সঙ্গত করে। তারা দ্রুত তালে উত্তালভাবে কত্তাল বাজায় আর ধুয়ো গায়। ঝাঁকসার মতে, তাদের যোগ্যতা খুব কম। এধরনের গায়েন ও বাদকেরা কিছুদিন অন্তর দল থেকে পালায়। আলকাপের আসরে ঝাঁকসা তাদের ভূমিকা আর নিজের জায়গা দুটিই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চালিয়ে যান। নাসির, উদ্ধব মণ্ডল আর বটোর পারিশ্রমিক বলতে কিছুই জোটে না। এদের প্রত্যেকেই মোটামুটি পয়সাওয়ালা বাড়ির সন্তান। ওদের প্রত্যেকেই পান আর খাওয়া পেলেই সন্তুষ্ট। তারা আর যেটি পেলে খুশি সেটির খবর জানে ওস্তাদ। সেটি হল মোহিনী ছোকরার সঙ্গে অল্প ঢলাঢলি আর গা মাখামাখি। শান্তির কাছ থেকে তাদের যা

যা আকাঙ্ক্ষিত তার কোনোটাই দিতে অস্বীকার করেনি শান্তি। বরং সবই পুষিয়ে দিয়েছে তাদেরকে।

এই আপাত তুচ্ছ অথচ সাধারণ এই কথাগুলো তুলে এনেছেন বাস্তবতার খাতিরে। জীবনের প্রয়োজনে এই সাধারণেরা কত মাটির কাছের তার যেন জীবন্ত আলেখ্য সিরাজের অসাধারণ এই উপন্যাস। উপন্যাসের ঘটনাগুলি এবং সেই ঘটনার অন্তর্গত চরিত্রগুলিকে তিনি তুলে এনেছেন চোখে দেখা জগতের নিরিখে। বাস্তব জীবনের যাপনে তারা সরল। এই সরল জীবনে তাদের মধ্যে যেটুকু অসততা উঁকি দেয় অভাবের তাড়নায়। দারিদ্র্যের অভাব দরিদ্রের স্বভাবে কীভাবে ছাপ ফেলে নিপুণ শিল্পী সিরাজ তাঁকে এড়িয়ে যাননি। বাঘা মিঞা বা পঞ্চানন তার রচনায় তাই বিশ্বস্ত। তারা কখনও শিল্প বাঁচায় কখনও নিজেকে। এ পর্যন্ত তাদের সুখ দুঃখ একরকম। তৃতীয় ব্যক্তির সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তা তাদের তাদের জীবনে দুর্বিপাক নিয়ে আসে আরেকরকম করে। নিজেদের মধ্যেকার সু-সম্পর্কগুলো বিকিয়ে যায় দালাল ব্যবসায়ীদের জটিল ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ফাঁদে।

ঝাঁকসা ওস্তাদ ও গোপালের আলকাপ দলের মধ্যে তুলনা করতে শুরু করে চন্দ্রমোহন জুয়াড়িরা। তারাই নির্ধারণ করে দেয় আলাদা আলাদা আলকাপ দলের রেট। ঝাঁকসার নামডাক আছে বলে চন্দ্র জুয়াড়িরা তাদের বেশি টাকা দেয়। কিন্তু গোপালেরা সে টাকা পায় না। চন্দ্র জুয়াড়ি তাদের দেবে ত্রিশ টাকা। গোপাল তাই চন্দ্রমোহনকে জানায় তাদের দলের অবস্থা সম্পর্কে। জাগুকে গোপাল হায়ার করে এনেছে। সে নেবে প্রতি রাত দশ টাকা। সে নিজের পয়সা কড়ি কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেবে। তার আবার নিজের সেটের লোকজনকেও কিছু টাকা দিতে হবে। এছাড়া আছে তবলচি খরচ। হারমোনিয়ামের জন্য দুটাকা। ছোকরা চরিত্রে অভিনয় করে মধুকেও আসর প্রতি কিছু টাকা দেয় গোপাল। তার

মজুরি পাঁচ টাকা। চারজন দোহারের চার টাকা করে। মোট চব্বিশ টাকা শুধু দলের লোকই পেল। ত্রিশ টাকার মধ্যে বাকি রইল ছ'টাকা। আর এদিকে দেখা যাচ্ছে দলের ছোকরার অভিনয়ের জন্য তার সাজ পোশাক রয়েছে। তার হাত খরচা রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে পেন্ট করার তৈজসপত্রের জন্য খরচা। আলকাপ শিল্পী হিসাবে গোপাল খুব প্রথিতযশা শিল্পী নয়। তবে চন্দ্রমোহন বাবুদের কাছে এই ধরনের অনামি শিল্পীরা যদি রাত প্রতি ত্রিশ টাকা পায় তবে দলের সবাইকে পারিশ্রমিক দেওয়ার পর তার জন্য কী অবশিষ্ট থাকবে? এই টাকায় তাদের কি করে চলবে? গোপালদের মতো সাধারণ মাপের শিল্পীদের জীবনের অর্থনৈতিক সংকটকেও দেখিয়েছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। চন্দ্র জুয়াড়িরা আলকাপের দলের শিল্পীদের নিয়ে চালায় প্রতিযোগিতার লড়াই। শিল্পীদের শিল্পত্ব বিচারের ভার চলে যায় চন্দ্রমোহনদের মতো জুয়াড়িদের হাতে। তারা তাদের রুচি অনুযায়ী আলকাপের এক ধরনের বিশেষ শ্রেণির দর্শকেরা যা চায় সেই স্থূল রুচির মন মাতানো বিষয়কেই চায়। যা দিয়ে আলকাপ শিল্পের প্রকৃত শিল্পত্ব বিচার চলে না। চন্দ্রমোহন জানায় ঝাঁকসাকে রাত প্রতি সত্তর টাকা দিতে হচ্ছে, অথচ ঝাঁকসার গান তার পছন্দ হচ্ছে না। তার মনে হচ্ছে, গোপালের দল যতটুকু জমাক সেটা নেই মামার চেয়ে যেন কানা মামার মত স্বস্তির বিষয়। আলাদা আলাদা এই আলকাপ দলগুলির মধ্যে রেষারেষির লড়াই লাগিয়ে দিতেও এরা প্রস্তুত। এরা আলকাপ শিল্পের মতো বিষয়গুলি নিয়েও জুয়ো খেলে। আদতে এরা আলকাপ শিল্পীদের শিল্পত্বকে অনুভব করতেই পারেন না। টাকা দিয়েই এরা শিল্পকে বিচার করতে চায়।

কিন্তু কোথাও চন্দ্রমোহন বাবুরা তাঁদের লাভ ক্ষতির ব্যবসাকে আরও ধারালো করে ফেলেছে নিজেদের ব্যবসাকে আরও শানিত করতে। এখন আর কোনো নির্দিষ্ট আলকাপ গোষ্ঠী নয়- পুরো আলকাপ শিল্পটাই তাদেঁর কাছে প্রতিপক্ষ। যতক্ষণ শিল্পটা তাঁদের পুঁজি

আনতে সক্ষম ততক্ষণ তাদের বিচার। যখন তা পারে না সেটা মূল্যহীন। প্রয়োজনে শিল্পীদের মধ্যে ও শিল্পদলগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগাতে মরীয়া। যা ওই শিল্পটিকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট। এই কারণে জুয়াড়ি চন্দ্রমোহন কখনও ঝাঁকসাকে নিন্দা করে। কখনও গোপালদের। ধীরে ধীরে তারাই মূল নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে বাজারের। শিল্পটিকে তারা বাজারের পণ্য করে তোলে শিল্পীদের অভাবকে কাজে লাগিয়ে। এ শুধু উপন্যাসের কল্পনা নয়। বাস্তব সমস্যাই উপন্যাসের বিষয়। শক্তিনাথ ঝা তাঁর *ঝাকসু* গ্রন্থে জানিয়েছেন,

> আদিতে এ সমস্ত লোকাভিনয় হত মোড়লদের বাড়িতে অথবা ধর্মীয় উৎসবে, মেলায়। পথ খরচ এবং খাবার পেতেন শিল্পীরা। আলকাপ ব্যবসায়ীক উদ্দেশ্যে টিকিট বিক্রয় করে হোত না। ক্রমশ মেলার/ উৎসবের কর্তৃপক্ষ অথবা জুয়াড়িরা আলকাপের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রক হন।[২]

আলকাপ শিল্পে এইধরনের অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি তৈরি হয় অন্য আরেকটি সংকট। যেটি তৈরি হয় শিল্পীর অভিনয় জীবন ও তার বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করে। আলকাপ শিল্পে ছেলেরা মেয়ে সেজে অভিনয় করে। আলকাপে ছোকরা চরিত্রদের দিয়ে এরকম অভিনয় করানো হয়। অভিনয়ের সময় একজন পুরুষ মেয়েদের সাজ পোশাকে সজ্জিত হয়ে অভিনয় করে। অভিনয় শুরুর আগে একজন পুরুষ কুশীলবকে মেয়েদের কোমলতা, পেলবতা এককথায় মেয়েলি ভাব আয়ত্ত করে অভিনয় করতে হয়। এর জন্য অভিনয় শুরু করার আগে ও অভিনয় চলাকালীন একজন পুরুষ কুশীলবকে অভিনয়ের স্বার্থে মানসিক দিক থেকে একজন নারী হয়ে উঠতে হয়। অভিনয়কালে সে শরীর ও মনে যথার্থ নারী। এই সময় কুশীলব হিসাবে নারীসুলভ আচরণের কোনোরকম খামতি দেখা গেলে শৈল্পিক অপারঙ্গমতায় তার ভাগ্যে জুটবে শুধু দর্শকদের সমালোচনা। দক্ষতার অভাবে আলকাপ শিল্পীর ছোকরা চরিত্রের ভাগ্যে জুটবে পরিহাস। কিন্তু অভিনয় শেষ হলে তাকে

ফিরে আসতে হয় পুরুষ সত্তায়। আর বাস্তবে চলার পথে যদি নারীসুলভ কোনো আচরণ প্রকাশ পায় তবে শিল্পীর ভাগ্যে জোটে সমাজের পরিহাস। সমাজের চোখে এ একধরনের হাস্যকর বিষয় হিসাবে চর্চিত হলেও কুশীলবদের জীবনে এ এক বড়ো সংকট তৈরি করে। এভাবে শারীরিক দিক থেকে পুরুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য আর শিল্পের খাতিরে শিল্পীর মনোগত নারীসুলভ আচরণের মধ্যে তৈরি হয় এক বৈপরীত্য। এইভাবেই আলকাপ শিল্পের ছোকরা চরিত্রের নারী হয়ে ওঠা পুরুষের মানসিক ও দৈহিক গঠনের মধ্যে তৈরি হয় এক ধরনের টানাপোড়েন। ঝাঁকসার দলের প্রধান ছোকরা ভানুর বর্ণনা দিতে গিয়ে আলকাপ গান ও অভিনয়ের শেষে সাজঘরে তার দুলতে দুলতে প্রবেশ, অবহেলা ভরে শাড়ি ব্লাউজ খুলে ছড়িয়ে দেওয়া, রঘুকে জলের বালতির জন্য হুকুম করা, হাতের চেটোয় সাবান দিয়ে পেন্ট ধুয়ে ফেলার যে বর্ণনা সিরাজ দিয়েছেন সেখানে মুহূর্তে অভিনয়ের জগৎ থেকে বাস্তব জগতে প্রবেশের প্রেক্ষাপটকে তৈরি করেছেন। নটী সেজে অভিনয়ের সাজ সজ্জা ভেঙে ফেলে বাস্তবের পুরুষ শরীরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন লেখক। অভিনয়ের বেশ খুলে ফেলার পরেও ভানুর চাল চলনের যে বর্ণনা পাই তাতেও দেখা যায় পুরুষসুলভ আচরণের বদলে নারীসুলভ আচরণ। এই ধরনের ছোকরা চরিত্র ভানুদেরকে নিয়ে ব্যবহার করে পুষিয়ে নিতে বাদ যায় না। বাদ যায় না চন্দ্রমোহন জুয়াড়ির মতো লোকেরাও। ভানু চঞ্চল পায়ে চন্দ্র জুয়াড়ির ঘরে গেছে। ভানুর চলার ছন্দে মেয়েলি ভাব। তার সঙ্গে ইয়ারকি মেরেছে। পয়সা আদায় করেছে তার কাছ থেকে। চন্দ্রমোহনের চিবুকে ঠোনা দিয়ে তার সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করেছে। সঙালকে বলেছে হাত বাড়াতে কারণ সে সঙালের হাতে বালিশ করে শোবে। এই ধরনের ছোকরাদের নিয়ে আলকাপ দলে কেচ্ছার অন্ত নেই। সিরাজ বর্ণনা করেছেন, ঝাঁকসার আলকাপ দল খোলা মাঠে চট বিছিয়ে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। একজন পুরুষের উরুতে মাথা রেখে শুয়েছে ছোকরা ভানু। আর লোকটা তার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে।

‘ধিঙ্গি’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন ছোকরা ভানুর বিশেষণ হিসাবে। এদের নিয়ে আলকাপের সমাজে চলে এই ধরনের ব্যভিচার। আরেকটি আলকাপ দলের ওস্তাদ সনাতন মাস্টারের ছোকরা সুবর্ণ। সুবর্ণ পুরুষ। কিন্তু সনাতন তাকে কোনোভাবেই পুরুষ ভাবতে পারে না। সে বাস্তবে সুবর্ণের পুরুষ অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। সনাতনের চোখে অভিনয় কালের বাইরেও সুবর্ণকে মনে হয় যেন সে এক ‘সদ্য যৌবনবতী মেয়ে’। তার চোখে সুবর্ণর মুখশ্রীতে ও দেহের পরতে পরতে মেয়েলি গড়ন। তার কমনীয় নিটোল আর সুঠাম চেহারার খাঁজে খাঁজে মেয়েলি আদল। এমনকি তার কণ্ঠস্বরও নারীসুলভ। সনাতন বাঁশি বাজায় আর সুবর্ণ নারীসুলভ স্বরে গান গায়, নাচে। একটি নারীর প্রসাধনের জন্য যা যা প্রয়োজন যেমন সাবান, স্নো, চুলের ফিতে, পাজামার ছিট, কানের দুল ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিসপত্র সনাতন বাজার থেকে কেনে সুবর্ণের জন্য। সনাতন মাস্টার এই ছোকরাকে নারীবেশেই চেয়েছে। কিন্তু এই ছোকরাদের তাদের নিজেদের সম্পর্কে মতামত কী? সুবর্ণের জন্য সনাতনের মেয়েদের সাজগোজের জিনিস কিনে আনায়, সুবর্ণের মনে খুব সঙ্গত একটি প্রশ্ন এসেছে। এই দুল পরবে কে? সে নাকি চুড়ি পরেছে কবজি গোল থাকবে বলে। সুবর্ণ সনাতনের কাছ থেকে দুল নিয়ে নিজের কাছে রেখে দেয়। সে জানে একমাত্র অভিনয়ের সময় ছাড়া সে অন্য সময়ে এ দুল পরে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়। তাই, তার এই মেয়েলি সাজগোজকে আড়াল করতে হয়। আর তা না করলে, লোকে বলবে কী? তার বক্তব্য, আসরে তো দুল জোড়া পরা যাবে। তার এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় সুবর্ণ অভিনয়কালে নারীর ভূমিকা করলেও সে বাস্তবে পুরুষই থাকতে চায়। সুবর্ণ যখন মেয়েদের চরিত্রে অভিনয় করে তখন তার আলতা মাখা টকটকে লাল ঠোঁট, আঁকা ভ্রূ, পদ্মকলির ফোঁটা দেখে সনাতন তাকে কিছুতেই পুরুষ মনে করতে পারে না। সে তখন মেয়ে নটী। সনাতন এক অদ্ভুত মায়ায় মোহিত হয়ে ভাবে এ শুধু মেয়ে! কোনোভাবেই পুরুষ নয়। কিন্তু আলকাপের ছোকরা চরিত্র

সুবর্ণের নিজের মনের মধ্যে চলতে থাকে নিরন্তর দ্বন্দ্ব। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার নটীজীবনের অভিজ্ঞতাও বাড়তে থাকে। আলকাপের অভিনয় চলাকালীন সুবর্ণ নিজেকে নারী ধরে নিয়ে সনাতন ওস্তাদকে তার নাগর হিসাবে ভেবে নেয়। তাদের অভিনয়কালে তাদের নিজেদের পরস্পরকে নারী-পুরুষ ভাবায় বিন্দুমাত্র দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। সনাতন জানে সুবর্ণ কিশোর পুরুষ। আর সনাতন যে যুবাপুরুষ তাও জানে সুবর্ণ। তবুও সনাতন সুবর্ণকে নারী হিসাবে ভেবে নিচ্ছে, সুবর্ণও নিজেকে নারী ভেবেই আত্মপ্রকাশ করছে। এটাই আলকাপ শিল্পীদের অভিনয় জীবনের সংকট। সিরাজ ঝাঁকসার মুখ দিয়ে আলকাপ শিল্পীদের জীবনের এই চরম সত্য কথাটিকে প্রকাশ করিয়েছেন। শারীরিকভাবে যে পুরুষ সেই পুরুষের নিজেকে নারী ভাবা ও অন্যের তাকে নারী ভেবে নেওয়াটাই আলকাপ শিল্পীদের তথা ওস্তাদদের এক ধরনের মজা। কখনো কখনো এ অভ্যাস তাদের রক্তের ভিতর, তাদের বোধের জগতে সত্য হয়ে ওঠে। এভাবে আলকাপ শিল্পীরা তাদের অভিনয় জীবনকে কখনও কখনও তাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে ফেলেন।

পঞ্চাশোর্ধ কালাচাঁদ একসময় আলকাপের ছোকরা সাজত। সে একসময় আলকাপের ছোকরা সাজতে সাজতে নিজেকে নারীই মনে করত। তার দলের ওস্তাদ তাকে নারীদের সঙ্গে মেশামেশি করতে দিত না। কারণ নারী অঙ্গ ছুঁলেই সর্বনাশ। ওস্তাদের আশঙ্কা তার পুরুষ সত্তা জেগে উঠবে। কালাচাঁদেরও নিজের মনের মধ্যে অভ্যাস তৈরি হয়েছিল নিজের পুরুষত্বকে চাপা দেওয়ার। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনে অভিনয়কে কেন্দ্র করে তার পুরুষ ও নারীর দ্বৈতসত্তায় দ্বন্দ্ব তৈরি হল। তখন তাকে চুল কাটতে হল। হাতের চুড়ি খুলতে হল। তখন সে বাস্তবটাকে বুঝতে পারলো। তার মনে হতে লাগলো এ পৃথিবী বড়ো নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। প্রচণ্ড রাগে অভিমানে সে প্রতিজ্ঞা করলো ইহজীবনে সে আর মেয়েদের দিকে তাকাবে না। নারী অঙ্গ স্পর্শ করবে না। ছোকরা সেজে অভিনয়েরও আর কোনো

উপায় নেই। কোনো রোজগার পাতি নেই। এদিকে বাস্তব জীবনে আর্থিক অনটনের কারণে পণ দিতে না পারায় তার বিয়েও হল না। নিজের উপর নিজের প্রচণ্ড বিদ্বেষ তৈরি হল। নিজে থেকে আলকাপ দলে মিশতে গেলেও তাকে আর কেউ নেয় না। ছোটবেলা থেকে সে যে ধরনের অভিনয় শিখেছে সেটাই সে করতে জানে। কিন্তু আলকাপে এই বেশি বয়সী ছোকরা চরিত্রের কোনো কদর বা প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিকভাবে একজন আলকাপ শিল্পী হিসাবে এই ছোকরা চরিত্রের বাস্তব জীবন সংকটটি খুবই ভয়ানক। জীবনের এক বিশেষ পর্বে তাকে গ্রাস করে এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা বোধ ও একাকিত্ব। সে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে সে কী পুরুষ নয়? তবে তার জন্য কেন বিধাতা কোনোও জোড় দিলেন না! তার এ জীবনে কী শুধুই অভিশাপ? জীবনের প্রায় শেষ পর্বে এসে তার শরীর ভেঙেছে, দাঁত পড়েছে, চুল পেকেছে। তবুও আর জীবনের সাধ মেটেনি। কাতর কালাচাঁদ মনে মনে বলে, ‘আহা শরীল, এই শরীলটা কী শত্তুর দ্যাখো! মনে মনে এখনও যে সে একজনা পায়ের জং খোলেনি, দীঘল কেশ কাটেনি, শাড়ি-ব্লাউজ খুলে চলে যায়নি সাজঘরে। এখনও তার আসর হয়নি শূন্য’।[৩] সিরাজ আলকাপের শিল্পী ছোকরা চরিত্রের জীবনের এই চরমতম নিঃসঙ্গতার অনুভূতিকে বলিয়েছেন কালাচাঁদের মুখ দিয়ে। পঞ্চাশ বছর আগে শেখা একটি গানের কলি গুনগুন করতে থাকে কালাচাঁদ- ‘বালুচরে ঘর বানাইলাম ভেসে গেল জলে হে...’।[৪] এও সিরাজের আরেক বাস্তব অভিজ্ঞতা। তিনি একজায়গায় বলছেন,

> এই সেদিন ফেবরুয়ারিতে গ্রামে গিয়ে শুনে এলাম, সাগরদিঘীর সুধীর মাস্টারের দলের ‘টিকিট কেটে’ গান হয়েছে। রাত তিন শো টাকা বায়না। ওস্তাদ সিরাজের জয়ধ্বনি দিয়েছে ওরা। সুধীর ছিল এক আশ্চর্য প্রতিভাধর শিল্পী। ১৯৫০-এ তার বয়স ছিল চৌদ্দ-পনের। অপূর্ব মুখশ্রী ও দেহের গঠন। ওকে ছেলে বলে চেনা কঠিন ছিল। আমার প্রথম বিভ্রম সে। সেই ভালোবাসা কোনো মেয়েকে দেওয়া যায় না। কারণ তার সবটাই ছিল

মনের এবং শুদ্ধতার। তার শারীরিক নটেগাছ মুড়িয়ে যায় না- এক দীর্ঘ মিথে সে বেঁচে থাকে। যে একে হোমো-সেক্সের কলুষ ভাবে, সে মূর্খ চণ্ডাল। এই প্রেম নান্দনিক উৎকর্ষ। সুধীরকে আমি *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছি। সে এখন বয়স্ক এবং নিছক পুরুষ। আর তার 'কেশ' নেই, হাতে নেই চাঁদির চুড়ি। হয়তো শুধু কপালের ভাঁজে বড়ো বড়ো দুই চোখের রেখায় এখনও জেগে আছে এক হারিয়ে যাওয়া গ্রামপরীর কিছু স্মৃতি। সে গ্রামপরী তার ভালবাসা নিয়ে এখনও স্বপ্নে আসে। মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে যায়। সে কী কষ্ট![৫]

সিরাজ একজন ঔপন্যাসিক। তাঁর কলমে শুধুমাত্র সমাজ জিজ্ঞাসা থাকবে এমন তো কথা নয়- সেই সমাজের মানুষের কথাও থাকবে। এ কথা যেমন তাদের বহিরঙ্গের তেমনি অন্তরঙ্গেরও। সমাজে পুরুষ আছে, আছে নারীও। কিন্তু না-পুরুষ এবং না-নারীরও যে আরেক জগত আছে তাকেই চেনালেন সিরাজ। দেখালেন শিল্পের প্রয়োজনে সে শিল্পী কিন্তু ওই শিল্পীর প্রয়োজনে সমাজে পড়ে আছে শূন্য। সেই একার জগত কত নিষ্ঠুর পরিহাসময় উপন্যাসে সিরাজ তাকে সুন্দর করেই হাজির করলেন নিজের মুনশিয়ানায়।

৬.২ *রহু চণ্ডালের হাড়* :

এরপর আসি, অভিজিৎ সেনের *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসের প্রসঙ্গে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে এসেছে বাজিকরী শিল্পের প্রসঙ্গ। বাজিকরদের নানান ধরনের পারফরমেন্সগুলি হল বাঁদর নাচানো, ভালুক নাচ, পিচ্‌লু-বুঢ়া, পিচ্‌লু–বুঢ়ির কাঠের পুতুল নাচানো, ভানুমতির খেলা দেখানো, বাঁশবাজি, দড়িবাজি, নররাক্ষসের মতো কাঁচা মাছ, মাংস কড়মড় করে খাওয়া, নাচ, গান ইত্যাদি। বাজিকরেরা দর্শকদের সামনে এই ধরনের বাজিকরী খেলা দেখায়। এই খেলাগুলিই তাদের জীবনের মূল পেশা। তবে, এই ধরনের ভিক্ষাবৃত্তির কাজে তাদের পেট চলে না। জীবনে বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই অন্যান্য পেশাকে

একপ্রকার বাধ্য হয়েই গ্রহণ করতে হয়। তাদের স্থায়ী জমি না থাকা ও চলমানতার কারণে তারা চাষবাস করতে জানে না। জমি উর্বর করে ফসল ফলাতে জানে না। তবে বাজিকরদের জীবিকার অন্যান্য আয়ের পথ যখন বন্ধ, তখন আতান্তরে পড়ে তারা নানা ধরনের জীবিকাকে গ্রহণ করেছে বাধ্য হয়ে। পাট তাদের জীবনের এরকমই কঠিন পরিস্থিতিতে বাঁচার দিশা দেখিয়েছিল। জমি না থাকলেও পাট গরীবের বেশ সহায়। পাট পচানো আর পাট ধোয়ার কষ্টসাধ্য কাজটাকে তারা একসময় বাধ্য হয়ে গ্রহণ করেছিল। ভাদ্র আশ্বিনের গুমোট পচা গরমে চড়া রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে এককোমর জলে পাট ধুতে হয়। সেই সঙ্গে ওই পচা জলে থাকে বিষাক্ত ধরনের পোকামাকড়। এক বছর এই কঠিন কাজটিও তাদের হাতে ছিল না। সালটি ছিল ইংরেজি ছেষট্টি সাল। সেই বছর দুর্ভিক্ষ লেগেছিল। বৈশাখ থেকে শুরু হয়েছিল বিরামহীন বৃষ্টি। এই কঠিন পরিস্থিতিতে একমাত্র আশা ভরসা পাট। একটানা বৃষ্টিতে পাট চারার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতের মাটিতে বেড়েছে ঘাসচারাও। মাটিতে শুধুই থকথকে কাদা। বাজিকর মেয়েদের আমানির বাটি ছিল ‘ফুল্লরার গর্তের মতোই অকরুণ!’[৬] ফসল অতিবৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। তখন বাজিকরেরা যেকোনো ভাবে ক্ষুন্নিবৃত্তি করার জন্য চুরি করা ও ভিক্ষাবৃত্তি করার মতো কিছু অস্বাভাবিক পেশাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। সমাজ তাদের এতটাই পদদলিত করে রেখেছে যার জন্য এক ধরনের হেগেমনি কাজ করছে তাদের ভিতরে। তাই তারা মনে করে তারা কোনো ‘কাম’ করে না। তারা বাজিকরী খেলাগুলি দেখিয়ে ভিখ্ মাঙ্গে। ভিখ্ মাঙ্গাটা তাদের কাছে কোনো ‘কাম্’ হিসাবে গণ্য হয় না। খেতের কাজ, কলের কাজ, কামার-কুমোরদের কাজ, চাষিদের কাজগুলো আদতে এক একটি কাজ। আর বাজিকরেরা তাদের বাজিকরী শিল্পকে কোনো ‘কামে’র মধ্যেই ধরে না। তারা বাজিকর হয়ে জন্মেছে তাই তাদের ওই কাজগুলি করতেই হবে। বাঁশবাজি, দড়িবাজি, সাপ খেলা দেখানো ইত্যাদি

বাজিকরী খেলাগুলির কোনোটিকেই কাজের মধ্যেই ধরে না। বাজিকর গোষ্ঠীর প্রায় প্রত্যেকেই বাজিকরী খেলার সঙ্গে যুক্ত। সেই সূত্রে দলের সবাই যুক্ত এই খেলার সঙ্গে। বাজিকরী শিল্পীদের আলাদা করে কোথাও নামের উল্লেখ নেই। বিশেষত খেলা দেখানোর সময় তাদের নিজস্ব কিছু খেলা রয়েছে। যেমন মুলুক ঘুরে বাঁদর নাচ বা ভাল্লুক নাচানো, দড়িবাজি, বাঁশবাজির মতো অদ্ভুত ধরনের খেলা। সেই খেলা দেখানোর সময় তারা অদ্ভুত ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ পরে থাকেন। দয়ারামের কাছে ভান্‌মতির খেলা দেখায় সালমা নামে এক বাজিকর। দয়ারামের শারীরিক বহিঃপ্রকাশ দেখে সালমা বুঝে নেয় তার দম্ভ, লোভ ও দাপট। দয়ারাম সালমার কাছে তার জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সবটা জানতে চান। সালমা তার ভান্‌মতীর খেল দেখানোর আগেই দুটি টাকা আগাম চেয়ে নেয়। সালমা আসলে মানুষের মনের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে লোকঠকানোর ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। বাজিকরের এই ধরনের লোক ঠকানোর প্রবৃত্তি, টাকা আদায়ের কৌশল তাদের জীবনের স্বভাবগত। বিনা পারিশ্রমিকে বাজিকরদেরকে কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রবণতায় অভ্যস্ত সাধারণ মানুষ। তাদের পারিশ্রমিকের কোনোরকম কোনো মূল্য নেই মানুষের কাছে। আর তাই জীবনে বঞ্চনা পেতে পেতে এই ধরনের জোর জুলুমের বিষয়টা তারা রপ্ত করেছে। জোর করে আদায় করে না নিলে বাজিকরদের নিজেদের করা উপার্জনটা পর্যন্ত তাদের হাতে তুলে দেবে না কেউ। এই বাস্তব সত্যটি ভানুমতীর খেলায় পারদর্শী সালমাও খুব ভালোভাবে জানে। দয়ারামকে লোক পাঠাতে বলে দয়ারামের দাওয়াত আনতে বলে। এভাবে সালমা নিজের কদর বাড়ায়। এভাবেই প্রতিমুহূর্তে পাওনা গণ্ডা বুঝে নিয়ে পথ চলতে হয় বাজিকরী শিল্পীদের। প্রতি মুহূর্তে নিজেরা ঠকতে ঠকতে তাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তাই লোক ঠকানোর বিদ্যেটাকে খুব ভালোভাবেই রপ্ত করে নিয়েছে

বাজিকরেরা। তাই লোক ঠকানোতেই আজ তার অহংকার। সে গ্রহণ করেছে বিচিত্র ধরনের ভিক্ষাবৃত্তি যাতে একবিন্দু সংকোচ নেই তার।

তাদের বাসস্থানগুলিও বড়ো অদ্ভুত। কোনোরকমে নিচু করে তৈরি দাওয়া, তালপাতা দিয়ে বেড়া দেওয়া ঘরই তাদের মাথা গুজবার ঠাঁই। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়- 'সরকারি ফরেস্ট থেকে চুরি করে আনা শনের চালা। সেই নিচু গুহার মতো ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘন তরলতায় জমে থাকে'।[৭] তাদের কোনো নিজস্ব জমি নেই। তারা কোনো একটি জায়গায় বেশিদিন স্থায়ী হয় না। তাদের এই জীবনের পরতে পরতে নেমে আসে নানান ঝড় ঝাপটা। মাঝে মধ্যেই ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত হয়েছে এই মানুষগুলির জীবন। তার উপর আছে সমাজের উপর তলার মানুষের অত্যাচার। তাদের কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম নেই। তাদের নেই কোনো নির্দিষ্ট জাত। লুবিনি ও শারিবার কথোপকথন থেকে তাদের জীবনের এই চরম সংকটটি অনুধাবন করা যায়। শারিবা তার নানি লুবিনিকে বলেছে, 'হিন্দুর ভগবান আছে, মোছলমানের আছে আল্লা, খিস্টানের যেশু তো হামরার বাজিকরের রহুই সি ভগবান, কী আল্লা, কী যেশু। লয়'?[৮] শারিবা তার নানিকে পরখ করে দেখতে চায় তার নানি কী উত্তর দেয়। কিন্তু প্রবীণা নানি লুবিনিও শারিবার প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পায় না। রূপা বাজিকর ইয়াসিন বাজিকরকে খুব দুঃখ করে জানিয়েছে, যদিও সে নিজে হিন্দু হয়েছে কিন্তু হিন্দুরা তাকে গ্রহণ করে না। আর তাই তার বিশ্বাস হারিয়ে গেছে মানুষের উপর। ইয়াসিন মুসলমান হতে চাইলেও কোথাও যে মুসলিমরাও তাকে তাদের জাতে তুলবে না একথা জানে রূপা বাজিকর। হাজিসাহেবের কাছে হানিফের প্রশ্ন ছিল মুসলমান হলে কি কোনো নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে স্থায়ী হতে পারবে সে? রূপা বাজিকর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই বিষয়টা বেশ ভালোই বুঝেছে যে তারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে চলছে তো চলছেই। তাদের কোনো

সামাজিক স্থিতি নেই। পথই তাদের সহায়। তাই বাজিকরেরা নিজেরা তাদের মনের ভাবনায় নিজেদেরকে যতই হিন্দু বা মুসলমান মনে করুক না কেন তারা আদতে সেই বাজিকরই আছে। তাদের অবস্থানগত কোনো পরিবর্তন নেই। উপরতলার হিন্দু বা মুসলিম কোনো ধর্মের মানুষেরা কোনোদিনই তাদের জাতে তুলবে না। উঁচু জাত হিন্দু বা মুসলমান হিসাবে মান্যতাও দেবে না। তারা জানে, মুসলমানের আছে আল্লা, খ্রিস্টানের আছে যিশু আর হিন্দুর আছে ভগবান। বাজিকরদের আল্লা, যিশু, ভগবান কি সেই রহুই? এই প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পায় না বাজিকরেরা। শারিবার মাকে রূপা বাজিকর বলেছে এর কারণ আসলে তাদের নিজেদেরই পাপের ফল। উপরতলার পদলেহনে পদদলিত হয়ে হয়ে তাদের এই জীবন অভিজ্ঞতা তাদের বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। তাদের পাপের ফল বলে নিজেদের প্রতি জন্মগত দোষারোপ আসলে এক ধরনের হেগেমনি। পীতেম বাজিকরের শৈশবের একটি ঘটনা যা প্রায় উপন্যাসের কাহিনি কালের থেকে ষাট সত্তর বছর আগেকার ঘটনা। বাজিকরের দলও সে ভয়ংকর ঘটনা দেখে পালিয়েছিল। কিছু সমাজচ্যুত মানুষ তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নির্দিষ্ট সময়ের বেশি শ্রম দিয়ে ফসল ফলিয়েছিল। আর শোষক শ্রেণি প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষের সর্বস্ব লুঠ করেছিল। তাদের মতো এই ধরনের নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতাকে বাজিকরেরা দ্বিতীয়বার আর দেখেনি। দেখতেও চায়না তারা। কারণ এই শোষিত মানুষগুলোকে খাজনা দিতে না পারার জন্যে বড়ো অত্যাচারিত হতে হয়েছে। বাজিকরের স্থানও এর থেকে খুব একটা আলাদা নয়। অত্যাচারিত মানুষগুলি পতঙ্গের মৃত্যুর মর্যাদাও পায়নি। খাজনা দিতে না পারায় মানুষকে কখনো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে গাছে। কখনো চুনের গুদাম ঘরে আবদ্ধ করা হয়েছে। অনেক সময় বিষ্ঠা খাওয়ানো হয়েছে জোর করে। কখনো তাদের বস্তায় পুরে জলে মগ্ন করা হয়েছে। এছাড়াও আরও অশ্লীল কদাচার ও শাস্তি দেওয়া হয়েছে। পীতেম বাজিকরের নানার নানা তার দলের লোকজনকে এতকিছু

দেখে শুনে পালাতে বলেছিল। কারণ তারা জানে মানুষের আদিম রক্ষণশীলতার বন্ধন। সমাজ বন্ধনহীন বাজিকর জাতও এই অত্যাচারের কবল থেকে কখনো মুক্তি পাবে না। তারা দয়ারামকে লক্ষ্য করেছিল যে সে নিজের ঘোড়ায় উঠবার সময় একজন ভৃত্য নিজের ঘাড় পেতে দিয়ে প্রভু দয়ারামকে ঘোড়ায় উঠতে সাহায্য করে। তারা জানে সালমার পরিচিত এক ক্রীতদাসীর কথা, যে রমণীকে প্রতি রাত্রে দয়ারামকে উত্তেজিত করবার নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হয়। এই সব কিছু দেখে শুনে বাজিকরেরা ভয় পায়। সমাজের যাবতীয় নিয়ম কানুনকে ভয় পায় পীতেম বাজিকর। দেবতার শাপগ্রস্ত তাদের শিকড়হীন জীবনে অভ্যস্ত বাজিকর এখন তার সবদিকে এক ঝুরি নামানো বটবৃক্ষের শিকড়ের পথ রোধকে দেখে। বাজিকরদের বাইরের অস্তিত্বেও থাকে বিপন্নতা আর ভিতরেও থাকে এক অনিশ্চিত জীবন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই বদলাচ্ছে। শ'য়ে শ'য়ে রেলগাড়ি পথের দূরত্বকে কমিয়েছে। বাড়িয়েছে মানুষের সময়। সময়ের গুরুত্বও মানুষ বুঝতে পারছে। জলপথেও বড়ো বড়ো মালবোঝাই নৌকো দ্রুতগতিতে এগোয়। টেলিগ্রামের তার শহর ছাড়িয়ে গ্রামে, আবার গ্রাম ছাড়িয়ে নতুন নতুন শহরের দিকে ছুটছে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে কে নেবে বাজিকরের সওদা? কর্মব্যস্ত, সদাচঞ্চল মানুষের দুদণ্ড দাঁড়িয়ে বাজিকরদের নাচ, খেলা দেখার যে আর সময় হবে না এ সত্য অনুধাবন করতে পারছে বাজিকরেরা। সাহেবদের নিত্যনতুন উত্তেজক জিনিসের জাঁকজমক দেখে তারা বোঝে যে তাদের ঘাগরা পুঁতির কারুকার্য দর্শকের চোখ আর আগের মতো ঠিক ততটা ধাঁধাবে না। বাজিকরী শিল্পের চরিত্র বদলেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। শিল্পীরা সময় ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী বদলে ফেলেছে নিজেদের। পীতেম বাজিকরেরা হাটে বাঁদর ভাল্লুক, নাচায়, রহু চণ্ডালের হাড়ের ভেলকি দেখায়, বাঁশবাজি, দড়িবাজির খেলা দেখায়। কিন্তু এখন দর্শকের রুচি পালটে যাওয়ায় মানুষ একই খেলা দেখে ঠিক আগের মতো আর বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায় না। ধন্দু বাজিকরের

ছোটবোন পেমা একবার বাজিকরী খেলা দেখাতে দেখাতে ভিড়ের মধ্যে সওয়ার সহ ধন্দুর ঘোড়াকে দেখে মাতোয়ারা হয়ে যাযাবরী শিষধ্বনি ছুড়ে দেয়। ঘোড়াটি সওয়ারের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে তোয়াক্কা না করে ধাবমান হয় পেমার দিকে। পেমার মতো সুন্দরী বাজিকর মেয়েরা পুরুষের প্রলোভনের শিকার হয়। দারোগাপুত্র আনন্দের ভোগের উপকরণ হয়ে তার রক্ষিতা হয়ে থাকতে হয়। তার না জোটে সম্মান, না জোটে স্বীকৃতি। এভাবে চলতে চলতে একসময় আনন্দের ভোগের কলঙ্ককে বয়ে বেড়ায় পেমা। পেমা গর্ভবতী হয়ে যায়। এবার আনন্দের পেমার উপর আকর্ষণ ক্রমশ ফুরিয়ে যেতে থাকে। তখনই জোটে যত লাঞ্ছনা। শুরু হয় পেমার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। পেমার শেষ পরিণতি মৃত্যু। এভাবেই কখনো কখনো বাজিকরী নারী শিল্পীরা ক্ষমতাবান পুরুষের অত্যাচারের শিকার হয়েছে। সালমাও একবার তার শরীরকে ব্যবহার করেছে পীতেম বাজিকরকে জানকীরামের অত্যাচার থেকে নিরস্ত্র করতে। জানকীরামের অত্যাচারের আগ্রাসন থেকে রেহাই দিতে সালমার সুগঠিত আকর্ষক নারীদেহকে ব্যবহার করা হয়েছে। বাজিকর পুরুষের জীবন বাঁচাতে বাজিকর নারীদেহকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা যায় খুব সহজেই। আর একাজে কোনো কোনো নারীই নিজেকে এগিয়ে দেয় পুরুষ তথা দলের স্বার্থে। উঁচুতলার সমাজের কাছে যেমন বাজিকরদের কাজের কোনো মূল্য নেই, তেমনি বাজিকরদের জীবনেরও কোনো মূল্য নেই। তাদের যেমন বিনা পারিশ্রমিকে খাটিয়ে নেওয়া যায়, তেমন তাদের নারীদের উপরেও যেন উপরতলার পুরুষদের ভোগের ক্ষেত্রেও মেলে পুরুষের অবাধ স্বধীনতা। তাদের জীবনের কোনো মূল্য নেই। মহাজন, দারোগা, পুলিশ, ইজারাদার, পত্তনিদারদের অত্যাচারে জর্জরিত এই বাজিকরেরা। বাজিকরের জীবনের যা কিছু, সব বুঝে নিতে হয় তাদের নিজেদেরকেই। প্রতিমুহূর্তে লড়াই করেই তারা নিজেদের অধিকার আদায় করে। তারা আদতে মূল সমাজচ্যুত প্রান্তেবাসী। তাদের শিল্প জীবনও কম ঝুঁকিপূর্ণ নয়। জীবনের ঝুঁকি

নিয়ে তারা সাপখেলা, দড়িবাজি, বাঁশবাজি, ছুরিনিক্ষেপের মতো খেলাগুলি দেখায়। বাজিকরের সংস্কৃতি চর্চায়ও নানা পরিবর্তন আসে। বাজিকরের আগেকার লোকদেখানো মোহিনী খেলাগুলো ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। তাদের খেলা আর আগের মতো লোকে দেখে না। তারা নিজেদের জীবনের নেতিবাচক দিকগুলি লক্ষ্য করে নিজেরা দুঃখ পায়। উঁচু সমাজের মানুষের কাছ থেকে তারা তাদের অজান্তেই একটু সম্মান চেয়েছিল, চেয়েছিল একটু ভালোবাসা। কিন্তু কোনোটিই তারা পায়নি। পরিবর্তে তারা পেয়েছে শুধু অবজ্ঞা, অবহেলা আর অবিচার। তাই সাঁওতাল উপজাতির মানুষের কাছ থেকে যখন আদর ও আন্তরিকতা পেয়েছিল তখন বাজিকরেরা তাদের নিজেদের রাজার মতো মনে করেছিল। সাঁওতালরাও তাদের ভাই বলে সম্বোধন করেছে। বাজিকরদের কাছে এ ডাক বড়ো আদরের। এ ডাকের মর্ম তারা বোঝে। এ ডাক আন্তরিকতায় ভরপুর। বাজিকরেরা সাঁওতালদের চরম দুঃখের সময় তাদের পাশে থেকেছে। সাঁওতালদের উপর অন্যায়ভাবে ঘটে চলা অমানবিক অত্যাচারকে তারা মেনে নেয়নি। বরং তারা প্রতিবাদ করেছে। সাঁওতাল বিদ্রোহে তাদের পাশে থেকে বাজিকররা তাদের নিজেদের জীবনকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে। আসলে সাঁওতালদের কষ্টের সাক্ষী এই বাজিকরেরাও। তারা উভয়েই পরস্পরের উপর নেমে আসা অত্যাচারের সমব্যথী। বাজিকরের আর আগের দেশ নেই। নেই তাদের আগের দুনিয়া। তাদের ভাষাতেও এসেছে পরিবর্তন। নটুয়া বাজিকরদের মানুষ ভুলে গেছে। ভাল্লুক, বাঁদর নাচানো বাজিকরদের মানুষ ভুলে গেছে। কিন্তু বাজিকরের দুর্নামটা কিন্তু রয়েই গেছে। মানুষের কাছে তারা আজও অপাংক্তেয়। তাদের পরিচিতি জোচ্চর বাজিকর নামে। তারা আজও কামচোর বাজিকর। তারা আজও অজাত। তারা জড়িবুটির হাত সাফাইয়ের বাজিকর। গুণতুক করে মানুষকে বশ করে লোকঠকানোর বাজিকর। তাই তারা কখনোই জাতে উঠতে পারে না। এটাই তাদের জীবনের আক্ষেপ। তাই বাদা কিসমতের মতো

গ্রামের মানুষও যেখানে রেশনকার্ড, চিনি, কেরোসিন পায়, বাজিকরেরা সে সুযোগ কোনোদিন পাওয়ার আশা করে না। এ আশা করাটাই যেন তাদের ধৃষ্টতা। নিজেদের জীবনের প্রতি তাদের নিজেদের ভীতির কারণেই তারা সামাজিক বিবর্তনের সেই স্তরে নিজেদের উত্তীর্ণ করে নিয়ে যেতে পারেনি। যেখানে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ তাদের নিজেদের অধিকারে বিবিধ সামাজিক সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত পায় সেখানে বাজিকর শিল্পীদের জীবনের কোনো উন্নতি নেই। বাজিকরদের জীবনসংগ্রামের এই দীর্ঘ অথচ ব্যর্থ লড়াই প্রান্তিকের আরেক ইতিহাসকে চিনিয়ে দেয়। অভিজিৎ সেন সম্ভবত এই দায়িত্বও নিয়েছিলেন তাঁর শিল্প কর্মে। তিনি নিজেই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন,

> রহু চণ্ডাল শুধু যাযাবরদের জীবন সংগ্রামের কাহিনীই নয়। যাযাবরদের এক-দেড়শো বছরেরে ঘোরা ফেরাকে কেন্দ্র করে আমি একটা বিস্তৃত অঞ্চলের ওই সময়ের ইতিহাস, সমাজ, ব্যবসাবাণিজ্য, রাষ্ট্র ইত্যাদি বহু বিষয়কেই টুকরো টুকরো করে তুলে এনেছি।
>
> ১৯৭৩-১৯৭৪ সালে এক বছর তিনচার মাস সময়ের জন্য আমি তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুরের একটি সমবায় ব্যাংকে চাকরি করেছিলাম। সেই সময় বালুরঘাট মহকুমার তপন থানার কয়েকটি গ্রামে এই বাজিকরদের সঙ্গে আমার দেখা হয়। মাঝখানে কয়েক বছর বাদ দিয়ে ১৯৭৬-১৯৭৭ সাল থেকে ফের বাজিকরদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল আমার। বেশ কয়েকবছর এদেরকে কাছ থেকে এবং দূর থেকে দেখার পুঁজি সম্বল করে ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ লেখার কাজ শুরু করি খুব সম্ভবত ১৯৮০ সালের কোনো এক সময়।
>
> বালুরঘাটের তপন থানা হচ্ছে জেলার সব থেকে দরিদ্র অংশ। জমি এখন পর্যন্তপ্রায় সবই এক ফসলি। রুক্ষ কাঁকর মেশানো মাটি। মাটির নীচে জল নেই। পানীয় জলের কুয়োও মাঘ-ফাল্গুনে শুকিয়ে যায়। আদিবাসী এবং তপশীলি প্রধান এই থানার দরিদ্রতম মানুষদের মধ্যে এই বাজিকরেরা পড়ে।

> বাজিকরদের একটি দল সামান্য কিছু পাওয়ার আশায় যখন মুসলমান হওয়ার সংকল্প করে, সে পর্যায়টা আমি ভালোভাবে খেয়াল করেছিলাম। বাজিকরদের থিতু হবার পুরো প্রক্রিয়াটা সেইসময় আমার মাথায় রূপ পেতে শুরু করে।[৯]

৬.৩ *রসিক:*

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *রসিক* উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে ঝুমুর শিল্প। পুরুলিয়ার মানভূম অঞ্চলের মানুষের জীবনের বেঁচে থাকার অন্যতম একটি উপার্জনের মাধ্যম হল ঝুমুর নৃত্য-গীতি। পুরুলিয়ার মতো কাঁকুরে রুক্ষ মাটির হতদরিদ্র, কায়ক্লিষ্ট মানুষগুলির নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, শিরায়-শিরায় প্রবাহিত হয় ঝুমুরের ছন্দ। ‘রসিক’ শব্দটির অর্থ রসের সাধনা করেন যিনি। নাচনি তার শিল্প সহচরী। এ গানের সঙ্গে মিশে আছে রাধাকৃষ্ণের অনুষঙ্গ। রসিক নাচনি এরা পরস্পরের শিল্প সহচর-সহচরী। এরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি এরকম দুই নর-নারী। এই দুই নর-নারীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন এই ঝুমুর। এই ঝুমুরের সুর ও ছন্দের আড়ালে থাকা রসিক– নাচনির নির্মম কঠিন জীবনকে প্রতিবিম্বিত করেছেন সুব্রত মুখোপাধ্যায় তাঁর *রসিক*-এ। *রসিক* উপন্যাসটি সম্পর্কে সমালোচক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার তাই বলেছেন,

> ...শুধু ঝুমুর শিল্পীদের পদাবলী-চর্চা নয়, জীবন রসিকেরই সৃষ্টি একটি ক্লেদাক্ত কুসুম, ঝুমুরের সঙ্গে অধরা স্বপ্ন-ঝুমুরের আখর মিলে-মিশে এক মোহময় সুর সপ্তক।[১০]

মানভূমের লোকায়ত সম্পদ ঝুমুর গাইয়ে নাচিয়ে আদিবাসী জনজাতি যারা প্রথাগত শিক্ষায় সেভাবে শিক্ষিত নন, কিন্তু প্রথা বহির্ভূত শিক্ষায় শিক্ষিত, তাদের মুখে মুখে বাঁধা ঝুমুর গীতিগুলি মৌখিক ধারায় চলছে। অধিকাংশ রচয়িতাই নিরক্ষর অথবা অল্পশিক্ষিত। মানভূম অঞ্চলের মানুষের জীবনে শত অভাব-দারিদ্র্য থাকলেও তাদের মুখের হাসিটি কখনো মলিন হয়ে যায়নি। খাওয়া-পরা অন্যান্য প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপের মতো ঝুমুর নাচগানও তাদের

জীবনের একটি অঙ্গ। দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যহ দুবেলা আহার না জুটলেও ঝুমুরের আখড়ায় তাদের যেতেই হবে। ঝুমুরের ছন্দ হয়তো বা অনেক সময় তাদের জীবনের ক্ষুধা জ্বালা মিটিয়ে দেয়। ঝুমুরের সুর কখনো বা অনেক মানসিক যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে দেয়।

রসিক উপন্যাসে আমরা এরকম একটি নারী চরিত্রকে পেয়েছি যে তার মায়ের কারণে বাধ্য হয়ে জীবনের এক পর্বে এসে পরিণত হয়েছে নাচনিতে। রাঙ্গুডি গ্রামের রসনাবালার মেয়ে বিজুলিবালা। বিজুলির বাবা বৃন্দাবন মাঝি অকালে মারা গেছে। রয়ে গেছে তার বিধবা পরিবার। নিজের পেটের মেয়ে বিজুলি রসনার কাছে রক্তের ডালা থেকে মাংসপিণ্ডই থেকে গেছে। তাকে সে কখনোই সন্তান মনে করতে পারেনি। বরং নিজের গর্ভজাত বিজুলি যেন তার কাছে দলিল করা জমির থেকেও বেশি। জমির থেকেও যেন মায়ের মেয়ের উপর অধিকার ও দাবী অনেক বেশি। রসনা মনে করেছে যেহেতু মেয়েকে সে জন্ম দিয়েছে তাই তার প্রতি ভোগ দখলের অধিকার যথেচ্ছভাবে ফলানো যায়। মেয়ে যেন তার হাতের পুতুল। তাকে যেভাবে খুশি ব্যবহার করা যায়। তার কাছে মেয়ের মনের, শরীরের, এমনকি জীবনেরও কোনো মূল্য নেই। মেয়েকে নিয়ে তাই সে তার ব্যবসা চালায়। মেয়েও মাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে বারবার। মায়ের প্রতি মেয়ের এই আকর্ষণ আসলে তার নাড়ির টান। এটা আর পাঁচটি মেয়ে মায়ের স্বাভাবিক সম্পর্কের মতোই খুব স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু রসনাবালাদের মতো মায়েদের অভাব তাদের স্বভাবকেও নষ্ট করেছে। নিজের পেটের সন্তানের সঙ্গে সে ছলনা করেছে। নিজের ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে সে মাত্র দশ কুড়ি টাকার বিনিময়ে তার পেটের সন্তানকে ভরত সর্দারের মতো এক পুরুষ রাক্ষসের হাতে তুলে দিয়েছে। তবে ভরত সর্দারের কাছ থেকে জঠু সহিসের মাধ্যমে বিজুলি পাণ্ডবকুমারদের মতো অভিজাত পরিবারের নাচনিতে পরিণত হয়েছে। রসনা মনে মনে ভাবে যদি সে সুযোগ পেতো, তবে সে তার মেয়েকে দ্বিতীয়বার বিক্রি করতো। দ্বিতীয়বার

মেয়েকে জবাই করার উপায় বার করতে চেষ্টা করে লোভী রসনাবালা। প্রতিবেশী যমুনা ও বিরজা যাদের মাধ্যমে টাকার লোভ দেখিয়ে মেয়েকে ভুলিয়ে ভরত সর্দারের ঘরে বিক্রি করেছিল তাদের কাছ থেকে বাটরি গ্রামের মাহাতো রসিক পরিবারের অনেক খুটিনাটি তথ্য জেনে নেয় সে। বাপ হারা বিজুলির নাচনি জীবনের প্রবেশের আগে তার মা তাকে বাধ্য করেছিল ভরত সর্দারের রাখনি করতে। ভরতের আগে তাই সে তার মায়েরই শিকার সে।

কিন্তু, এ কী নিতান্ত লোভ নাকি অভাবের স্বভাব আসলে এ নিয়তির কারণ তা'ও লেখক দেখিয়েছেন সুনিপুণভাবে। আসলে দুটোই। পুরুষের নারী লোভ নারীকে ভাবতে শিখিয়েছে নিজকে পণ্য হসেবে। সেই সঙ্গে রয়েছে পুরুষের আগ্রাসী মনোভাব। দুয়েরই শিকার বিজুলীবালা। মায়ের আরামের আশ্রয় তার কাছে তাই নিরাপদ থাকেনি। ভরতদের করালগ্রাসকে তাই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে হয়েছে মনুষ্যসৃষ্ট নিয়তির পাকেচক্রে। এ ঘটনা সুব্রত মুখোপাধায়ের স্বকপোলকল্পিত কোনো বিষয় নয়। এটাই বাস্তব। বাস্তব থেকে উঠে আসা এ এক নিদারুণ চালচিত্র।

রসিক উপন্যাসের বিজুলীর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের এক ঝুমুর শিল্পী নাচনি সিন্ধুবালা দেবীর জীবনের অনেক মিল পাওয়া যায়।[১১] অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম তার। অভাবের তাড়নায় পড়াশুনা করতে পারেনি সে। ছেলেবেলা থেকেই ঝুমুর গাইতে শুরু করা ও দাদুর কাছ থেকে তার এ গান শেখা। আসামের চা বাগানের কুলি পাচার শুরু করেছিল ইংরেজরা। এজন্য তারা দালাল নিযুক্ত করে যারা আড়কাঠি নামে পরিচিত। এই আড়কাঠিরা গরীব ঘরের মেয়েদের ফুসলিয়ে অল্প পরিমাণ টাকার বিনিময়ে তাদের পাচার করতো। কয়েকজন মেয়েকে টাকা দিয়ে সিন্ধুবালাকে মেলা দেখার নাম করে এক জঙ্গলে ছেড়ে রেখে পালিয়ে যায়। তার কপালে উল্কি দেখে তাকে পছন্দ হয়নি আড়কাঠিদের। নির্জন পলাশ বনে

ঘুরতে থাকে সে। সেখান থেকে কয়েকজন লোক তাকে এক জমিদারের কাছে নিয়ে যায়। কয়েক মাস জমিদারের বাড়িতে থেকে তাকে ও তার মা বাবাকে সমাজ থেকে পরিত্যক্ত হতে হয়। সিন্ধুবালা দেবী ঝুমুর গানের তালিম নিতে থাকে জমিদারের বাড়িতে। চেপা মাহাতো নামে একজন ঝুমুর গানের রসিক তার গান শুনে মুগ্ধ হন। সিন্ধুবালাদেবীর মাকে চেপা মাহাতো টাকার লোভ দেখিয়ে জমিদারের কবল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। পরে জমিদার শশীভূষণ সিং মহাশয়ের কাছ থেকে চেপা মাহাতো তাকে অপহরণ করে বিবাহ করে তাকে সামাজিক স্বীকৃতি দেন। চেপা মাহাতো তাকে ঝুমুর নাচ গান শেখাতে থাকে। আমরা বিজুলিবালার কাহিনিতেও বিজুলিকে দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিতে দেখছি। পাড়াতুতো মেয়েদেরকে টাকা খাইয়ে তার মা জমিদার ভরত সর্দারের হাতে তুলে দেয়। বিজুলির পরিচিতি হয় ভরত সর্দারের রাখনি হিসাবে। উপন্যাসের বিজুলিবালার এই রাখনি হওয়া ও বাস্তবের ঝুমুর গাইয়ে সিন্ধুবালাদেবীর জমিদারের গৃহে বাঈজী হয়ে থাকার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। উভয়কেই রসিক পরিবারের দ্বারা অপহৃতা হতে হয়েছে। তবে বাস্তবের সিন্ধুবালা দেবী চেপা মাহাতোর বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদা পেয়েছে, কিন্তু উপন্যাসের বিজুলিবালাকে রসিক পাণ্ডবকুমার ভালোবাসলেও স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি। শেষ অবধি নাচনি বিজুলি পাণ্ডবকুমারের নাচনি হয়েই থেকেছে। নাচনি বিজুলির অবস্থানগত পর্যায়ের কোনো তারতম্য ঘটেনি। পাণ্ডবকুমার তাকে দিতে পারেনি সামাজিক সম্মান। ভাতের হাঁড়ি স্পর্শ করবার অধিকারটুকুও পর্যন্ত বিজুলি পায়নি। পায়নি সিঁথির সিঁদুরের সম্মান। নাচনি বিজুলি সন্তান লাভের অধিকার থেকেও বঞ্চিত। নাচনির সন্তানদের তাদেরই মতো সমাজে কোনো স্থান হবে না। বেঁচে থাকতেই তাদের ভাগ্যে জোটে শুধুই বঞ্চনা আর অবহেলা। আর মৃত্যুর পর তাদের কেউ স্পর্শ অবধি করে না। এমনকি মৃতদেহ সৎকারেরও কোনো ব্যবস্থা নেই। তাদের ফেলে দেওয়া হয় ভাগাড়েতে। অথচ বেঁচে থাকবার সময় তারা রসিকের শিল্প সঙ্গিনী

কখনো কখনো শয্যাসঙ্গিনীও। রসিকের সঙ্গে নৃত্য-গীত পরিবেশন করে দর্শক শ্রোতার মনোরঞ্জন করেন তারা। তখন তাদের গান ও নাচকে কেউ অচ্ছুত ভাবে না। যতক্ষণ রসিকের জীবনে তার প্রয়োজন ততক্ষণই নাচনিদের গুরুত্ব। তারা যেন রসিকের টাকা উৎপাদনের যন্ত্র। শিল্পগত দিক থেকেই সমাজে তাদের এই চাহিদা। কিন্তু জগৎ সংসারে তারা শুধুই ব্রাত্য। তাদের জোটে শুধুই অন্যায় ও অবহেলা। ঝুমুর গানের শিল্পী এই নাচনিরা দর্শক ও শ্রোতার মনে যে সুর ও তালের মূর্ছনা তৈরি করে, তাদের সেই সৃষ্টির আড়ালে রয়েছে শিল্পী জীবনের এই বেদনাদায়ক বাস্তব পরিস্থিতি। *রসিক* উপন্যাসে আমরা দেখেছি, চরম অভাবের তড়নায় অনেক মেয়েরা তার পরিবার ও নিজেকে বাঁচানোর জন্য নাচনি হতে চাইছে। মালতী তার মায়ের মুখে দুমুঠো খাবার তুলে দেওয়ার জন্য তরণীসেনের নাচনি হতে চায়। দুঃখিনী নাচনি নিশারাণী তার জীবনের দুঃখের বারোমাস্যা নিয়ে ঝুমুরের কথা বোনে।

বৈশাখ মাসেতে নবীন বৎসর   প্রচণ্ড ঝড়েতে উড়াইল ঘর
যায় যেন সব দলিয়া
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে ঐ ভাঙাঘরেতে থাকি যেন আঁখি মুদিয়া।
শ্রাবণেতে জল ঝরে অবিরল, ঘর পড়ি যায় ভাঙিয়া ।।
ভাদ্র আশ্বিন শরৎ কাল   গরিবের ঘরে নাই থাকে চাল
ক্ষুধানল উঠে জ্বলিয়া
পূজি অন্নপূর্ণা দেশ অন্ন শূন্যা,   মনে বুঝি দুখ হল অবসান
বাঁচিব এবার খাইয়া
অগ্রহায়ণ মাসেতে ঋণ ফাঁস এসে ধরে যেন গলা চাপিয়া।।
এমন দুর্দিনে বাঁচিব কেমনে, নিশিদিন থাকি বসিয়া...
পৌষ মাসে বহে উত্তরি বায়   শীতে থর থর কাঁপে যেন কায়

ক্ষণে ক্ষণে যায় টলিয়া

খাদ্যহীন হয়ে বস্ত্রহীন হয়ে জীয়ন্তে থাকি যে মরিয়া... [১২]

কথকতার সুরে গানের পংক্তিতে তাদের জীবনের দুঃখ কষ্টের বর্ণনা পাওয়া যায়। নিশারাণীর গানে বৈশাখের বর্ণনা দিয়ে নতুন বছরের শুরু হয়েছে। প্রচণ্ড ঝড়ে ঘর উড়ে সব নষ্ট হয়ে গেল। জ্যৈষ্ঠ মাসে ভাঙা ঘরে চোখ বন্ধ করে বসে থাকে ঝুমুর শিল্পীরা। রসিক কুমার মঞ্চে লাফ দিয়ে ওঠে। মাদল গলায় ঝুলিয়ে তাতে চাপড় মেরে গানের রঙ চড়ায় আর ভাবে বর্ষার এমন দুর্দিনে তারা কীভাবে বেঁচে থাকবে। দিন রাত বসে শুধু সেই চিন্তা করে। আষাঢ় মাসে ঘন ঘন মেঘের ডাক শুনে আর বিদ্যুৎ চমকানি দেখে ভয়ে মন সর্বদা আনচান করে। বছরের অন্যান্য সময়ের মতো ভাদ্র আশ্বিন মাসেও দেখা যায় গরীবের ঘরে চাল থাকে না। ক্ষুধার জ্বালায় পেটে আগুন জ্বলে। সেই সময় তারা দেখে চারিদিকে অন্নের হাহাকার। কার্তিক মাসে ধান ওঠবার কথা ভেবে মনের দুঃখ কিছুটা অবসান হলেও অগ্রহায়ণ মাসে ঋণের বোঝায় যেন গলায় ফাঁস এঁটে ধরে। এই দুর্দিনে ঝুমুর শিল্পীরা তাদের জীবন চালনা করবে কিভাবে! পৌষ মাসে উত্তুরে হাওয়ায় প্রচণ্ড শীতে তারা কাঁপতে থাকে। এভাবে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাদের জীবন বিপর্যস্ত হয় বারেবারে। তাই বছরের বেশিরভাগ সময়েই খাদ্যহীন, বস্ত্রহীন অবস্থায় থাকতে হয়। এ যেন তাদের কাছে কোনোরকমে বেঁচে মরে থাকা। ঝুমুরশিল্পী নিশারানির জীবনের বারোমাস্যা শুনতে শুনতে বিজুলির চোখের জল বাঁধ মানে না। মনে পড়ে তার নিজের জীবনের কথা। এককালে রবীন্দ্রসদনে গান গেয়েছেন এই ঝুমুর শিল্পী নিশারানি। পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডীর এক প্রত্যন্ত গ্রামে তার বাসস্থান। তার দুঃখময় জীবনের দুঃখের বারোমাস্যাই হয়ে ওঠে তার ঝুমুরের আখর। আর এ গান শুধু নাচনি নিশারাণীর ঝুমুর গান নয়, এ গান হয়ে যায় নাচনি কুস্‌মীর জীবনের গান। এ গান নাচনি বিজুলির জীবনের গান। শুধু নাচনি নয় এ গান হয়ে যায়

রসিক পাণ্ডবকুমারের জীবনগাথা আবার কখনো বা রসিক ভীম মাহাতোর জীবনগাথা। এই উপন্যাসে আমরা যেসব ঝুমুর শিল্পীদের পেয়েছি তাদের মধ্যে অনেকে শুধু ঝুমুরের উপর নির্ভর করে থাকেননি। কারণ শুধুমাত্র এই শিল্পের উপর নির্ভর করে তাদের জীবন চলে না। অনেক ঝুমুর শিল্পীরা বিড়ি বাঁধার সঙ্গে যুক্ত। এই উপন্যাসে বিজুলি, মালতীদের মতো মেয়েরা রয়েছে যারা বিড়ি বিক্রি করে, তাদের মায়েরা বিড়ি বাঁধে। মানভূমের এই রুখা শুকা মাটিতে ফসল খুব ভালো না হলেও এই অঞ্চলের অনেক মানুষ চাষবাসের উপর নির্ভরশীল। আবার তরণীসেন জাতিতে তন্তুবায়। তার পূর্বপুরুষের আমল থেকে চলে আসা এই পেশাটি এখনও চলছে। তবে তরণীসেনের মনে সাধ জেগেছে রসিক হওয়ার। তরণীসেন তাদের টিলা কাঁকুরে মেঠো পথে একজন কিশোরকে দুই জোড়ার কাঁড়া নিয়ে যেতে দেখছে। কিশোর ও পশুদের চলার ছন্দে তরণীসেন তার মনে মনে বুনে চলেছে ঝুমুরের সুর ও তাল। ভীম মাহাতো চাষবাসের পাশাপাশি ঝুমুর গাইয়ে। তার ছেলে ধ্রুবকুমার ঝুমুর নৃত্যগীতের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকর্মটিও বজায় রেখেছে। সে আবার মহাজনী কারবারও করে। তাদের এই অভাবের সংসারে কুটুম আসলেও চিন্তার শেষ নেই। তাদের মনে হয় এ যেন তাদের জীবনে এক পাপ। যে মানুষের পেটের ভাত জোটে না, পরনের কাপড় জোটে না, তাদের ঘরে কুটুম আসলে তাদের মনে হয় পাপটি কখন বিদেয় হবে। কুটুমের অবস্থাও খুব একটা ভালো না। মানভূমের রুক্ষ মাটির মতো কুটুমেরও পেট শুকনো থাকে বছরের অধিকাংশ সময়। জীবন মাঝি নিজেদের জীবনের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে একটি মজার গল্প শুনিয়েছে পাণ্ডবকুমারকে। নিজেরা মাংসভাত খাওয়া আর কুটুমকে মাংসভাত খাওয়ানো তাদের জীবনে গল্পের কাহিনি হয়েই থেকে যায়। যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় তারা খাসি, হাঁস কোথা থেকে জোগাড় করবে? একদিন জীবন মাঝি তার মতো এক হতদরিদ্র কুটুমকে মাংসভাত খাওয়ানোর কথা দেয়। কিন্তু সে খাসি বা হাঁসের মাংস

কোথা থেকে পাবে? তাই সে নাকি তার ঘরের কুকুরটিকে জবাই করার জন্য ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যায় বাঁধপাড়ে। কিন্তু জীবন মাঝির বিশ্বাস, সেই কুকুরটি নাকি তার চোখের ভাষা আন্দাজ করেছিল। তাই সেই কুকুরটি নাকি জীবন মাঝির কথায় পাত্তাই দেয়নি। ময়ূর জীবন মাঝির এই কথা শুনে আঁতকে উঠেছিল। মাংসভাত খাওয়ার স্বপ্ন যাদের কাছে চিরকাল অধরাই থেকে যায় তাদের কাছে খাসি, মানুষ, হাঁস, কুকুর সব ধরনের মাংসের স্বাদই একরকম লাগে। পাণ্ডবকুমার এ কাহিনি শুনে নির্বাক হয়ে যায়। ঝুমুর গাইয়েদের জীবনের এই ঘটনা তাদের ঝুমুর গানের বিষয় হতে পারতো। মানভূমের মানুষের জীবনের কত ধরনের অভাব অনটনের বিষয় বর্ণিত হয়েছে সেখানে। কিন্তু জীবন মাঝির এই রীতির বর্ণনা, এই ধরনের কোনো বারোমাস্যা সে ঝুমুর গানেও শোনেনি। রসিক পাণ্ডবকুমার মনে মনে ভেবেছে, যদি ঝুমুর শিল্পীদের এই ধরনের দারিদ্র্যের বিষয় নিয়ে যদি কোনোদিন ঝুমুর গান লেখা হয়, তবে ঝুমুরের শ্রোতারাও এ গান কান পেতে শুনতে পারবে তো? তার মনে হয়েছে, এ তো আদতে ঝুমুর শিল্পীদের নিজেদেরই লজ্জা। ঝুমুর শিল্পী হয়ে একপ্রকার নিজেদের হিংস্র দীনতার ছবিকে ঝুমুরের কলিতে তুলে ধরা আদতে নিজেদের গায়েই নিজেদের থুতু ছোড়া। তাই নিজেদের জীবনের এই দুঃখ কষ্টের ছবি ঝুমুরের বিষয় হয় না। ঝুমুর শিল্পী পাণ্ডবকুমারই ভেবেছে ঝুমুরের বিষয় হিসাবে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ, নাগর-নাগরীর প্রেম-ভালোবাসাও অনেক সুখের। ঝুমুরের বিষয় হিসাবে ঝুমুর শিল্পীদের আটপৌরে বারোমাস্যার বিষয় বড়োজোর বলা যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে জীবন মাঝির জীবনের এই কাহিনি কখনোই নয়। জীবন মাঝির এই রসালো কাহিনিটি আসলে তাদের নিজেদের জীবন সম্পর্কে করা নিজেদেরই ব্যঙ্গ। জীবনভর অভাব লেগেই থাকে তাদের। তবে এই অভাবের মধ্যেও এই দারিদ্র্যকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা না করলে তারা বেঁচে থাকার রসদ পাবে কোথা থেকে?

কুকুরের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে জীবন মাঝি এবার আসল ঘটনাটি পাড়ে। বেয়াই মশাইকে তো সে আর নিরামিষ ভাত দিতে পারে না। তখন সে অনেক ভেবে ধানক্ষেতে গেল লুলহি মাছ বা চ্যাং মাছ পাওয়ার আশায়। ঘরে আছে শুকনো ভাত আর ক্ষেতে লুলহি মাছ। জীবন মাঝি হতাশ হয়। একেই রাত্রিবেলা তার উপর মাঠে চৌকিদার। আর কোনো আশা নেই। জীবন মাঝির বেয়াই নিজের ঘরে খায় মাড় ভাত আর বেয়াইবাড়িতে এসে খেল শুধু শুধু শুকনো ভাত। সে বেয়াইকে কথা দিয়েছিল যে মাংসভাত খাওয়াবে। স্বাভাবিকভাবেই মাংস খাওয়ার লোভে বেয়াইমশায়ের জিভ শান দিচ্ছে। দুঃখে ক্ষোভে জীবন মাঝি হেসে ফেলে জানায়, জীবন মাঝির বেয়াই সামনে থাকা বল্লমকে তার বুকে বিঁধিয়ে দিত সে না চেঁচালে। ময়ূর জীবন মাঝির সমব্যথী। সেও জানে ক্ষুধার জ্বালা। তাই সেও জীবন মাঝির সঙ্গে সুর মিলিয়ে জানায়, মাংসের গায়ে তো আর লেখা থাকে না কোনোটি কুকুরের আর কোনোটি মানুষের মাংস। এই রসিকতার পরই জীবন মাঝির বর্ণনার চিত্রটি পালটে যায় সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কলমে। আলপথের অন্ধকারে জীবন মাঝির ঝুঁকে পড়া চিন্তিত মুখখানি তাদের জীবনের বাস্তব অবস্থাটিকেই জানান দেয়। পাণ্ডবকুমার গুন গুন করে গেয়ে ওঠে, ‘বিহাই আমার খাঁয়ে গেল শুখা ভাত, বাজারে বিকাইছে লুলহি মাছ’।[১৩] যাদের জীবনে দুবেলা শুকনো ভাত জোটে না, তাদের কাছে মাংস ভাত সোনার পাথরবাটি। তাই তাদের কাছে মাংসের স্বাদ উপভোগ করাটাও সোনার পাথরবাটি। তাই কুকুরের মাংস, মানুষের মাংস, খাসির মাংস আর হাঁস-মুরগীর মাংসের স্বাদের কোনো তফাৎ তারা বোঝে না। তাদের বাস্তব জীবনের এই দুঃখ যন্ত্রণার কথা তাই ঝুমুরের বিষয় হয়ে ওঠে না। বরং সেখানে স্থান পায় রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা। তাই বাস্তব জীবন ও শিল্পজীবনকে তাই তারা কখনো একই সুরে বাঁধতে পারে না। এইভাবেই তাদের শিল্প- জীবনের সঙ্গে শিল্পী ও বাস্তবের সংঘাত তৈরি হয় প্রতিনিয়ত।

৬.৪ *আড়কাঠি* :

ভগীরথ মিশ্রের *আড়কাঠি* উপন্যাসের বিষয় হিসাবে এসেছে বাঁকুড়া জেলার গজাশিমুল অঞ্চলের সংস্কৃতি-সংঘের শিল্পীদের জীবনকথা। এই শিল্পীরা আসলে গজাশিমুলের বসু শবর জনজাতি। সহজ সরল এই জনজাতিকে অত্যাচারিত হতে হয়েছে সুযোগসন্ধানী আড়কাঠিদের দ্বারা। এছাড়াও গজাশিমুল অঞ্চলের মানুষের লোকসংস্কৃতিকে অনুসন্ধানের নামে স্বার্থান্বেষী এক শ্রেণির ধূর্ত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মানুষের ফাঁদে পড়ে গজাশিমুলের জনজাতির জীবনের সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়ার এক করুণ আখ্যানকে উপস্থাপন করেছেন ভগীরথ মিশ্র। আমরা *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসে যেমন দেখেছিলাম প্রান্তিক বাজিকরদের উচ্চ সমাজের দ্বারা অত্যাচারিত হওয়াকে। তেমনি দেখেছি কিভাবে উপরতলার মানুষগুলি তাদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটিয়ে নিয়ে নানারকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছে। তাদেরকে কীভাবে বঞ্চিত করেছে ভূমির অধিকার থেকে। আর *আড়কাঠি*তে আমরা দেখতে পাব, কীভাবে একজন শহুরে উচ্চ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক রাজীব গজাশিমুলের মানুষের সরলতা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আপাত দৃষ্টিতে সামান্য কিছু টাকা পাইয়ে দিয়ে তাদের প্রাপ্য প্রচুর অর্থকে নিজের কুক্ষিগত করে আত্মসাৎ করেছে। কীভাবে সারাবছর অনাহারে থাকা খেটে খাওয়া মানুষগুলির লোকসংস্কৃতিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার ও প্রচার করে প্রচুর মুনাফা লাভ করেছে রাজীবের মতো এই মধ্যসত্ত্বভোগীরা। এই ধরনের মধ্যসত্ত্বভোগীরা মানুষের সঙ্গে মুখে মিস্টি ব্যবহার করে। অথচ সুযোগ বুঝে নিজের আখের গুছিয়ে নেয়। লোকশিল্পীদের দিয়ে লোকসংস্কৃতিকে পরিবেশন করিয়ে তাদের পারিশ্রমিকের সিংহভাগ নিজেরা ছিনিয়ে নেয়। এরা পরোপকারী বন্ধুর ছদ্মবেশে তাদের জীবনে সূঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বের হয়। *আড়কাঠি* উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র রাজীব এই ধরনের মধ্যসত্ত্বভোগী ও সুবিধাবাদী মানুষ। অসহায়, নিঃস্ব, রিক্ত মানুষগুলির অর্থ কেড়ে

নিয়েই তারা শান্ত হয় না, বিশ্বাসঘাতক হয়ে কেড়ে নেয় গজাশিমুলের বসু শবর জাতির নারী-পুরুষ তথা শিল্পীদের আত্মসম্মান। লোকশিল্প ও তাদের লোকশিল্পীদের নিয়ে শুরু করে ব্যবসা। মেয়েদের দেহকে বাজারি করে। মেয়েদের অনাবৃত দেহের ছবি বিদেশের পথে পথে বিক্রি করে অধ্যাপক রাজীব। রাজীবের এই ধরনের আন্তর্জাতিক ফাঁদচক্রকে প্রথম পর্বে ধরতে পারেনি গজাশিমুল গ্রামের সরল সোজা মানুষগুলি। আর রাজীবের মতো একজন এত উদার মনের বন্ধু কীভাবে একজন শত্রুতে পরিণত হতে পারে তা তারা ভাবতেই পারে না। আর যখন তারা রাজীবের চক্রান্ত নিজের কানে শোনে তখন তারা তাদের সবটাই খুইয়ে পথের ভিখারী। বিশ্বাসের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। পেশায় অধ্যাপক এই রাজীব যার কাজ শিক্ষার্থীদের পথপ্রদর্শক ও বন্ধু হয়ে তাদের উন্নতি সাধন। তবে তো এক অর্থে সে একজন সমাজ সংস্কারক। কিন্তু আমরা দেখলাম যেখানে রাজীবের উচিত ছিল সংশ্লিষ্ট সমাজের উত্তর প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখা, কিন্তু সে সেই সুরক্ষা তো দিলই না বরং দিয়ে নিজেই হয়ে গেল সমাজের ভক্ষক। ভাবী প্রজন্মের সংহারক। সে গজাশিমুল গ্রামের লোকঐতিহ্য, লোকবিশ্বাস, সংস্কারকে মর্যাদা তো দেয়নি বরং অপমান করেছে। সর্বোপরি সেখানকার নর-নারীর জীবন, তাদের জীবনের নৈতিকতা, মান, মর্যাদা সবকিছু নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে এই রাজীব। তাদের সর্বস্বান্ত করেছে অর্থে ও ইজ্জতে। সেই গ্রামের বসু শবরদের একটি পরম গোপনীয় সংস্কৃতি কৌলিক দেবতা ব্রজরাজের পুজো। সেই সঙ্গে শবর যুবতী মেয়েদের অনাবৃত শরীরে জলকেলি নৃত্য পরিবেশন। গজাশিমুলের বসু শবর জনজাতির মধ্যে এই কৌলিক নৃত্যের অনেক নিয়ম কানুন। গজাশিমুলের বসু শবরদের মধ্যে প্রচলিত আছে নাকি এই গানের ভাষাও দৈব ভাষা। তাদের বিশ্বাস যে এই গানের সুরও নাকি বেঁধেছিলেন স্বয়ং ব্রজরাজ। তাই দেবতার প্রতি সমর্পিত এই নৃত্যকে তারা সকলের কাছ থেকে আড়াল করে। এমনকি নিজেদের জাতির পুরুষরাও সামনে থেকে এই

নৃত্য দেখার অধিকার পান না। খুব নিষ্ঠার সঙ্গে শবরদের মধ্যে পালনীয় এই জলকেলি নৃত্যের এই আড়ালটি খুব গভীর ভাবে দাগ কাটে রাজীবের মনে। আর এই সংস্কৃতিকে পুঁজি করেই সে ফাঁদ পাতে। গজাশিমুলের বসু শবর জাতির সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে মুনাফা লুঠের লোভকে সে কোনোরকমে সংবরণ করতে পারে না। পেশায় অধ্যাপক এই রাজীবের মধ্যেকার লোকসংস্কৃতির পৃষ্টপোষক মনের আড়ালে বেশি করে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক বাজারে মুনাফা আদায়ের লোভী মন। আর রাজীবের নারী ভক্ষক চোখ লালায়িত হয় যুবতী মেয়েদের শরীরের প্রতি। বিশ্ববাজারে লোকসংস্কৃতি প্রচারের নামে যদি সে গজাশিমুল গ্রামের বসু শবরদের মেয়েদের অনাবৃত দেহের নৃত্যের শো ও নৃত্যরতা ছবি যদি বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করে দেয় তাতে সে বিপুল অর্থ উপার্জন করতে পারবে। এই শো এর বাজার চাহিদা অনেক বেশি হবে অন্যান্য লোকসংস্কৃতির থেকে। যুবতী মেয়েদের উদোম শরীরের চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারেও যে বেশিই হবে। লোকসংস্কৃতি প্রচারের নামে সেই সুযোগকে কাজে লাগায় রাজীব। বসু শবরদের মতো গজাশিমুলের এই সরল মানুষগুলিকে ঠকিয়ে তাদের এই কৌলিক সংস্কৃতি জলকেলি নৃত্যের নাম করে আদতে দেহ ব্যবসাই হয়ে ওঠে অধ্যাপক রাজীবের প্রধান কাজ। ধীরে ধীরে আমরা রাজীবকে অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিতে দেখি। মেয়েদের দেহকে পণ্য করে যেন সে নিজেও ধর্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে ও অন্য নারীভক্ষকদের লালায়িত চোখের ভোগের সামগ্রী করে তুলেছে। এভাবে জলকেলি নৃত্য শিল্পীদের অপমান আদতে লোকশিল্পীদেরকেই অপমান। আর লোকশিল্পীদের অপমান করে সে আসলে শিল্পকেই অপমান করেছে। পেশাগত দিক থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাধক হয়ে শিল্পের তথা শিল্পীর গায়ে কিভাবে সে এই কলঙ্ক লেপন করলো? তা আমাদের আশ্চর্য করে বইকি।

লোকশিল্পীদের প্রতি এই অবমাননা আদতে একপ্রকার শিল্পদূষণ। গজাশিমুলের লোকশিল্পীদের সে আর্থিক দিক থেকেও শোষণ করেছে। বাঁকুড়ার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম গজাশিমুল। বন-জঙ্গল, খাল-খুলিয়া, পাহাড়-ডুংরি পেরিয়ে গজাশিমুল গ্রামটির সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানকার সরল সোজা মানুষগুলির কাছে 'কাঁকড়া'[১৪] নামে পরিচিত তথাকথিত ভদ্রসমাজ। এই 'কাঁকড়া'রা তাদের জীবনে উপদ্রব সামিল। গজাশিমুলের গাঁয়ের মানুষ ভয় করে তথাকথিত এই কাঁকড়াদের। তাদের দেখে জোয়ান মদ্দ ছেলেরা গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে। মেয়েরা ঘরের কোণে সিঁধিয়ে থাকে। রাজীবের বাঁকুড়া কলেজের ছাত্র সুনীল। সুনীলের বন্ধু সুচাঁদ। সুচাঁদের সূত্রে সুনীলকেও চেনে গজাশিমুলের কিছু মানুষ। আর সুনীলের সূত্রেই গজাশিমুলের মানুষের কাছে পরিচিত হয় মাস্টার রাজীব। বহু হাঁক-ডাকের পর, অনেক সাহস দেওয়ার পর রাজীবের সামনে এসেছিল গজাশিমুলের অধিবাসী। গজাশিমুলের মানুষের আশ্বস্ত হওয়ার কারণ রাজীবের মাস্টার হিসাবে ছাত্র পড়ানোর পরিচিতি। তবে, এই পরিচিতির পর মাস্টারকে দেখতে ভিড় জমায় গজাশিমুলের মানুষ। গজাশিমুল গ্রামের একটি বড়ো সম্পদ হল তাদের সংস্কৃতি। সেই গ্রামের শিল্পীদের এক গুপ্ত সংস্কৃতি হল জলকেলি নৃত্য। ক্যাথি বার্ডকে লেখা একটি চিঠিতে রাজীব এই বিশেষ নৃত্যটি সম্পর্কে জানিয়েছিল,

> ...এর পুরো ব্যাপারটা খুব বেশি জানা ছিল না আমার। কেবল ওই নাচের উতপত্তি ও ধরন সম্পর্কে জেটুকু জেনেছিলাম, সেটাই জানিয়েছিলাম তোমাকে। ইতিমধ্যে আমি ওই নাচ দেখলাম, মিস বার্ড, আমি স্বচক্ষে দেখলাম! ওই ঝরনাটার ধারে, মউল গাছ দিয়ে ঘেরা জায়গাটিতে ভর-ভরন্ত দুধ-জ্যোৎস্নায়, দীর্ঘ দেড়ঘণ্টা ব্যাপী আমি দেখলাম সেই অপার্থিব নাচ। সে নাচের তাল, মুদ্রা, প্রতি অঙ্গ-বিভঙ্গ, সে গানের সুর... তাকে ভাষা দিয়ে বোঝাই, এমন ক্ষমতা আমার নেই। তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ওই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে অন্তত কিছু সময়ের জন্য এই সৌরমণ্ডলের থেকে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল আমার। [১৫]

এই নৃত্য তাদের শিল্পীদের কাছে অনেক সাধ্যসাধনার ফসল। তাদের বিশ্বাস তাদের এ সংস্কৃতি পাঁচজনের সাক্ষাতে দেখাবার জিনিস নয়। সে নাচের দর্শক ও শ্রোতা শুধুমাত্র কানাইশর জিউ।[১৬] এই ধরনের নৃত্য-সংস্কৃতি গজাশিমুলের মানুষকে তাদের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে আস্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। তারা তাদের এই সংস্কৃতির চর্চা করে নিতান্ত ভালোবাসা ও বিশ্বাস থেকে। অর্থ উপার্জন এর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কস্তো মল্লিক রাজীবকে নিজেদের লোক ভেবে বিশ্বাস করে নিতান্ত সংগোপনে জলকেলি নাচের উৎপত্তির কথা বলেছিল। সে আরও জানায় যে তাদের বসু শবর জাতের মূল বসতি ছিল তামাজোড় গ্রামে। সেই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সুবর্ণরেখা নদী। গ্রামের চারপাশে পাহাড়-ডুংরি, বন। সেই তামাজোড় গ্রামে নাকি জন্ম নিয়েছিলেন স্বয়ং ব্রজরাজ কানাইজী। তার মনোমুগ্ধকর রূপ। তার বাঁশির সুরে যেন ধ্বনিত হত অমৃত। শবরদের মধ্যে এরকম মন ভোলানো রূপ কেউ কখনো দেখেনি। তার রূপ দেখে যুবতী মেয়েরাও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। মেয়েরা সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করতে যায়। কানাইজীর বাঁশির সুর তাদের হৃদয়কে পাগল করে দেয়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল আর বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামে। মেয়েরা সন্ধ্যে হয়ে গেলেও আর ঘরে ফেরে না। এদিকে নির্জন নদী তীরে মুরুব্বিরা তাদের খোঁজ করে। পুরুষের সন্দেহের বিষও ক্রমেই বাড়তে থাকে। সুবর্ণরেখা নদীতীরে তাদের ঘরনিদের খুঁজতে গিয়ে পুরুষেরা তো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। একদা নদীর ধারের ঝাঁকড়া মহুল গাছের মগডালে বসে রয়েছে কানাইজী। আর সেই গাছটির ডালে ঝুলছে মেয়েদের গাত্রবস্ত্র। আর কানাইজী আকুল সুরে বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। আর নদীর এক কোমর জলে গিয়ে মেয়েরা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ দৃশ্য দেখে মুরুব্বিরা সকলে রেগে যায়। জগৎ সংসারে মেয়েদের নামে কুৎসা রটে গেল। মুরুব্বিরা কানাইজিকে মগডাল থেকে নিচে নামিয়ে এনে খুব মারধোর করলো। এমনকি গ্রাম থেকে পর্যন্ত বিতাড়িত করলো। সেই বছর তামাজোড় গ্রামে

নিদারুণ খরা হল। চারিদিকে শুধু রিক্ততা ও শূন্যতা। সবুজ গাছগুলিতে অবধি একটিও পাতা নেই। এরকম সময় কানাইশর জীউ কস্তো মল্লিকের ঠাকুরদার ঠাকুরদাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল বলে লোকে বিশ্বাস করে। তার বক্তব্য ব্রজরাজ কানাই নাকি তাদের জানায় যে তাকে গ্রামের মুরুব্বিরা মিলে মারধোর করেছে বলে সেই কারণে এই খরা। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটাই উপায়। অল্পবয়সী যুবতী মেয়েরা জলকেলি নৃত্য সহযোগে ব্রজরাজের আরাধনা করবে। যুবতীরা এই জলকেলি নৃত্য সহযোগে ব্রজরাজের আরাধনা করলে আবার প্রকৃতিতে শান্তি ফিরে আসবে। প্রকৃতিতে দেখা যাবে সবুজের সমারোহ। আর গজাশিমুল গ্রামের বসু শবরদের মধ্যে খুব আড়ম্বর করে ব্রজরাজের পুজো সহকারে যুবতীদের জলকেলি নৃত্যের পরিবেশনে সে বছর গজাশিমুলের মানুষ আকাশে কালো মেঘের আভাস পেল। গজাশিমুলের রুখা মাটি সেই বছর আকাশ ফাটা বৃষ্টির জলে সিক্ত হলো। গজাশিমুলের মানুষ প্রকৃতিতে যেন প্রাণের পরশ খুঁজে পেল। ধানক্ষেতে ধান, গাছে গাছে অফুরন্ত ফল, মৌচাকে মধু, গাইয়ের বাটে অঢেল দুধ।

রাজীব গজাশিমুলের বসু শবর জনজাতির এই কৌলিক সংস্কৃতির কথা অবাক বিস্ময়ে শুনেছিল কস্তো মল্লিকের কাছ থেকে। কীভাবে এই জনজাতি তাদের হাজারো ঝড় ঝাপটা বাধা বিপত্তির মধ্যেও তাদের পরম ধন এই সংস্কৃতিকে সংগোপনে রক্ষা করে চলেছে তা ভাবতে ভারি অদ্ভুত লাগে রাজীবের। ক্যাথি বার্ডকে সে জানায়,

> আমি এক আশ্চর্য হীরক খনির সন্ধান পেয়েছি। কেবল নাচে-গানেই অভিনব নয়, এই ‘জলকেলি’ নাচের পরতে পরতে লোকায়ত শিল্পের যে নান্দনিক প্রয়োগ এবং পাশাপাশি এর যে দার্শনিক ব্যঞ্জনা, তা এক কথায় অবিশ্বাস্য।[১৭]

তাত্ত্বিক দিক থেকে সে বৃন্দাবনের গোপিনীদের বস্ত্র হরণের কাহিনির সঙ্গে এই সংস্কৃতিকে মিলিয়ে দেয়। এত ভালোবাসা, বিশ্বাস, নিষ্ঠার সঙ্গে পালনীয় গজাশিমুলের

শবরদের এই পরম ঐতিহ্যকে নিয়ে রাজীবের স্বেচ্ছাচারকে মোটেই মেনে নিতে পারেনি এই গজাশিমুলের এই বসু শবর জনজাতির মানুষগুলি। রুক্ষ প্রকৃতি, জঙ্গল, ডুংরির উঁচু নিচু, বন্ধুর ঢেউ খলানো মাটিতে চাষের কাজ করতো এই বসু শবরেরা। তাদের বিনোদনের জগৎ ছিল তাদের পরিবেশিত এই লোকসংস্কৃতি। কিন্তু এই লোকসংস্কৃতিতে তাদের পেট চলতো না। মালভূমির টিলাময় উঁচু নিচু ভূমিতে তাদের চাষের কাজ করতো। এভাবেই তারা তাদের অন্নের সংস্থান করতো। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি চলতে থাকতো তাদের এই কাজ। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বৃষ্টিতেও নিরন্তর তারা কাজ করে চলতো। তীব্র দাবদাহেও দিনভর পশুর মতো অক্লান্ত পরিশ্রমের পরও তারা ঠিক মতো মজুরি পেত না। মালিক তাদের সারাদিন কাজের বিনিময়ে বলদের মলত্যাগের গোবরগুলি তাদের খোরাকি হিসাবে দিত। এই গোময়ের মধ্যে তারা কিছু অজীর্ণ শস্যদানা পেত। আর মালিক তাদের মজুরি থেকে সেই অজীর্ণ শস্য দানার দাম কেটে রাখতো। এই দিন মজুররা নিতান্ত এত কম মজুরিতে কীভাবে যে তাদের সংসার পরিজনদের নিয়ে বেঁচে থাকতো তার ইতিহাস বড়োই ভয়ংকর। তার উপর ছিল গ্রামের আড়কাঠিদের অত্যাচার। আর পরে আমরা দেখলাম রাজীবের মতো ছদ্মবেশী বন্ধুরূপী শত্রুর অত্যাচার। সব মিলে গজাশিমুলের বসু শবর জনজাতির শিল্পীদের বিপর্যস্ত ও সর্বস্বান্ত অবস্থা।

ঘরে বাইরে বসু শবর জাতির এক ভয়ংকর অবস্থা। নিজেদের মতো করে তারা নিজেদের জীবনকে যাপন করছিল। তাতে আধুনিকতার ছোঁয়া হয়তো ছিল না, কিন্তু তার বাইরে যা ছিল সেটা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত। ওটি তাদের নিজস্ব প্রাণের সম্পদ। রাজীব সেই প্রাণের সম্পদে আঘাত হেনেছে। তার সঙ্গে রয়েছে নিজেদের সমাজে আড়কাঠি। নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আড়কাঠিরা যখন ধনে প্রাণে বসু শবর জাতির কাছে আতঙ্কের সেখানে আরেক ভয়ঙ্কর সংযোজন রাজীব। একজন শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে মানুষের যা

প্রত্যাশা করা উচিত তার থেকে অতিরিক্ত কিছু করেনি এই বসু শবর জাতিরা। কিন্তু একজন অধ্যাপকেরও যা করা উচিত ছিল রাজীব সেই সীমা লঙ্ঘন করেছিল নিজের শিক্ষাকে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা না রেখেই। মানুষের কাছ থেকে যা প্রত্যাশার তা তার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। অধ্যাপকের কোনোও লেশই তার শেষ আচরণে পাই না। শিক্ষকের সুযোগ নিয়ে সে বসু শবর জাতির বিশ্বাসকে উপার্জন করেছে। হয়ে উঠেছে বিশ্বাসঘাতক। প্রয়োজনে সেই বিশ্বাসকেই কাজে লাগিয়েছে নিজের ব্যবসায়িক লেনদেন শক্তিশালী করার জন্য। সফল হয়েছে সে। সমাজ তার কাছ থেকে কিছুই পায়নি বরং প্রান্তিক সমাজ থেকে সে লুণ্ঠন করল তাদের গোপন অথচ অন্তরের সংস্কার। যে সংস্কারে লুকিয়ে আছে তাদের নারীদের সম্মান। রাজীবের সেগুলো পণ্য। শত্রুপক্ষকে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ছদ্মবেশী শত্রু ভয়ানক। তাকে চিহ্নিত করা যায় না। ঘোষিত শত্রু অপেক্ষা সে অধিক শক্তিশালী। ঘোষিত শত্রুর অনেক কিছু অজানা থাকে। এই ঘাটতিটা মিটিয়ে ফেলে ছদ্মবেশী শত্রু। আর সেটাকেই সে কাজে লাগায়। রাজীব এই কাজটাই করেছিল প্রান্তেবাসী মানুষদের সঙ্গে। সফলও হয়েছিল সে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে। উপন্যাসের সুচাঁদরা ধরতে পেরেছিল রাজীবকে। এতে যত না সুচাঁদের বুদ্ধি কাজ করেছিল তার চেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল লেখকের ঔচিত্যবোধ। যদিও তা শিল্পের রসকে অক্ষুণ্ণ রেখে। কিন্তু যেখানে সুচাঁদ নেই, অথবা সুচাঁদের ভগীরথ মিশ্র নেই সেখানে বসু শবরদের কী অবস্থা তা আমরা যেকোনো সচেতন নাগরিক মাত্রেই অনুধাবন করতে পারব।

এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে ভগীরথ মিশ্রের বক্তব্য ছিল, সারা পৃথিবীতে সংস্কৃতির স্মাগলিং চলছে। আমাদের দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নিয়ে সংস্কৃতির এই যে বিপণন তার ইতিহাস তা বহুদিনের। এক অধ্যাপক প্রাথমিকভাবে ভালোবেসেই ছৌ নাচকে নিয়ে কাজ কাজ করতে শুরু করে। ক্রমে মাতামাতি করে। তারপর তিনিই আবার অর্থের

লালসায় সেই ঐতিহ্যকে নিয়ে শুরু করে বিপণন। তবে যে মানুষগুলিকে নিয়ে এই বিপণন শুরু হয় সেই মানুষগুলি জানতেই পারে না তাদের এই বিক্রি হওয়া বা পণ্য হওয়ার কথাটি। লোকশিল্পীদের ও লোকসংস্কৃতিকে নিয়ে অধ্যাপকের একধরনের ইচ্ছেপূরণ চলে বহুদিন। তার ছাপ পড়ে এই উপন্যাসে। উপন্যাসে রাজীব নামে এক তরুণ অধ্যাপকও্গজাশিমুল গ্রামের বসু শবর জাতির সংস্কৃতিকে ভালোবেসেই চলতে থাকে তার একধরনের ইচ্ছেপূরনের কাহিনি। উপন্যাসের শেষে বসু শবর জাতির সুচাঁদের মতো ছেলেরা তাদের নিজেদের অবস্থানের কথা জানতে পারে। তবে তারা এমন সময় জানতে পারে যখন তাদের আর কিছু করার নেই। তার সমানভাবে বিক্রিত হয়েছে তাদের অজান্তেই। মেয়েদের ইজ্জতের কোনো মর্যাদা তো সে দেয়নি বরং মেয়েদের দেহকে ব্যবহার করে বাজারী করে লাভের অঙ্ক বাড়িয়েছে। এ তো আসলে বসু শবরদের লোকসংস্কৃতির বিক্রি হওয়ার গল্প নয়- তাদের সংস্কৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার গল্পও বটে। এ একধরনের মূল্যবোধ বিক্রির কাহিনি। রাজীবের মতো এই ধরনের অধ্যাপকেরা আসলে লোকসংস্কৃতি প্রেমী সেজে তাদের অন্তরের সংস্কৃতিকে বিক্রি করেছে। বিকৃত করেছে অভিজাতের স্বাভাবিক মূল্যবোধকেও।

ধনী দেশগুলি তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলিকে তাদের সাংস্কৃতিক উপনিবেশ বানিয়েছিল। পাশাপাশি তারা তাদের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক উপনিবেশও বানিয়েছিল। সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে নানা ধরনের ঔপনিবেশিকতা। প্রধানত দুধরনের ঔপনিবেশিকতা রয়েছে। একটি অর্থনৈতিক ঔপনিবেশিকতা, অন্যটি সাংস্কৃতিক। সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন ধনী দেশগুলি গরিব দেশগুলির সম্পগুলিকে জলের দামে বিক্রি করছে। ঐ দেশের উন্নয়ন করার ছলে সম্পদ লুট করে বিত্তবান দেশগুলি নিম্নবিত্তবান দেশগুলির উপর আগ্রাসন চালাচ্ছে। এভাবে চীন শ্রীলঙ্কাকে শেষ করেছে। নেপালের সম্পদকেও শেষ

করেছে। তবে বাংলাদেশ সাবধান হয়ে গেছে আগে থেকে। এটা এখন আর আগের মতো নেই।

আরেক ধরনের আগ্রাসন হল সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এই ধরনের কলোনিয়ালিজম এখনও চলেছে। ধনী দেশ দুর্বল ও গরিব দেশের মাটির তলায় থাকা পুঁজি লুট করে সেই দেশের সম্পদ লুট করছে। এটিও আসলে এক ধরনের ফ্যাসিসিজম। প্রাচীন দেশগুলির ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, পুরাতাত্ত্বিক মূর্তিগুলি ধনী দেশের পুজিপতিদের র‍্যাকে স্থান পাচ্ছে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গানের সুর সব চুরি হয়ে যাচ্ছে। ঐতিহ্য মণ্ডিত দেশগুলির সাংস্কৃতিক সম্পদকে এইভাবে লুট করে নিচ্ছে একধরনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনপন্থী রাষ্ট্র। এই সবটা নিয়েই তৈরি *আড়কাঠি*।

৬.৫ *কলাবতী কথা* :

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের *কলাবতী কথা* উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে পটশিল্পকে কেন্দ্র করে। যে শিল্পের মূলেই আছে দারিদ্র্য। জীবনকে কোনোরকমভাবে যাপন করার জন্য তাদের সংগ্রামের মধ্যে ঢুকে থাকে এই শিল্প। একেই ধরতে চেয়েছেন ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। তাঁর এই পর্যবেক্ষণ যে অমূলক নয় তা বাস্তবের দিকে তাকালে স্পষ্ট হয়। পটচিত্র বিশেষজ্ঞ ডেভিড জে ম্যাকচ্চন ও সুহৃদকুমার ভৌমিক *Patuas and Patua Art in Bengal* গ্রন্থে লিখেছেন,

> Chitrakar families do not depend entirely upon the income the Patuas earn from icon making and from showing scrolls from door to door The women do their share also going from door to door, selling stationery and other goods including clay toys made at home, which they carry in bamboo baskets. Generally in Bengal a village women

> cannot go publicly to the market or a fair to purchase goods and welcomes the opportunity of buying items of her choice at home. She usually pays in kind i. e. rice instead of money, so does not have to depend on anyone for financial assistance. [১৮]

উপন্যাসেও শিল্পীদের এই সংগ্রাম আছে। এখানে প্রধান চরিত্র কনক। যদিও সে জাত লোকশিল্পী নয়। সে ও তার শাশুড়ি লতু দুজনে মিলে কোনো একটি মেলায় পটশিল্পের পসরা দেখতে পেয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে সেই কাজটি দেখেছিল। মেদিনীপুরের পটশিল্পীদের দেখে খুব উৎসাহ পায় লতু। পটশিল্প সম্পর্কে আগ্রহ জন্মায় কনকের মনেও। কনক পটের গান বাঁধতে পারে। কনকের ইচ্ছা সে একজন পটুয়া শিল্পী হবে। তাই সে নয়াগ্রামের কাছে পিংলায় যায় পটশিল্পের কাজ শিখতে। উপন্যাসে পিংলার নয়াগ্রামের লোকশিল্পী পটুয়া চিত্রশিল্পীদের শিল্পকর্মের কথা বলা হয়েছে। পটুয়া শিল্পের চাহিদা খুব বেশি। এমনকি মেয়েরা ঘরে বসে বসে এই ছবি আঁকার কাজটি বেশি করে। মাটির ঘরের দাওয়ায় পটশিল্পের পসরা সাজিয়ে বসেছে সব। ছবি আঁকার নিয়ম কানুন, তুলির টানের কৌশল, রঙ-প্রস্তুতি একে একে সবই রপ্ত করে নেয় কনক। তার সঙ্গে গান বাঁধে, কথা দেয়, সুর ভাজে। তাই কথকের বর্ণনায় পটুয়া শিল্পীর জীবন ছন্দ ও ছবিময়। আবার এই উপন্যাসেই আমরা পেয়েছি ‘জিওন-ঝরনা’ নামে একটি দল কোনো একটি মেলায় সাঁওতালি ভাষায় মাদল নাচ পরিবেশন করতে এসেছিল। সেই দলের নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে কলাবতী নামে একটি মেয়ের উপর শ্লীলতাহানি করে একটি মদ্যপ যুবক। পেটের দায়ে লোকশিল্প পরিবেশন করতে গিয়ে ধর্ষিতা হতে হয়েছে অনেক মেয়েদের। বাড়ি ছেড়ে দিনের পর দিন বিভিন্ন মেলা ও উৎসবে পারফরমেন্স দেখাতে গিয়ে তারা অনেক ক্ষেত্রেই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। শিল্পীদের সঙ্গে এই নৃশংস অমানবিক আচরণ আদতে শিল্পের প্রতি অমর্যাদা। শিল্পীর প্রতি অসম্মান ও অপমানের নামান্তর। কলাবতীকে সেই বিপদের হাত থেকে উদ্ধার

করে কনক। সে নিজে মেয়ে হয়ে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে ঘটে চলা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। পরে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয়। পটশিল্প আঁকা শেখায় নিজে হাতে করে। যেহেতু কলাবতীর জীবনের এই কলঙ্কের কথা জানলে আদিবাসী কলাবতীর পরিবারে তার কোনো স্থান হবে না, তাই মেয়েটির সম্মান বাঁচাতে কনক তাকে নিজের ছেলে রামুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তার পারিবারিক ও সামাজিক সম্মানকে বাঁচায়। কিন্তু উপন্যাসের শেষ পর্বে এসে আমরা দেখতে পাই এক জাপানি যুবক ও যুবতী আকিও ও মিকির সংস্পর্শে এসে বদলে যায় কলাবতীর জীবন। আকিও ও কলাবতী দুজনেই শারীরিকভাবে একে অপরের প্রতি আসক্ত হয়। স্বামী রামু ও শাশুড়ি কনকের কাছ থেকে কলাবতী তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ তার সন্তানের পিতৃপরিচয়কে গোপন করে যায়। সবাই ভাবে কলাবতীর মেয়ে রামুর সন্তান। কিন্তু ঘটনা আদতে তা নয়। কলাবতীর কন্যা আসলে আকিওর সন্তান। এ সত্যটিকে কলাবতী অপ্রকাশিতই রাখে। লোকসংস্কৃতিকে পুঁজি করে আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থ উপার্জনের ব্যবসায়িক চক্রগুলি গজিয়েছে তার কোনো একটি সংস্থার শিকার হয় কলাবতী। মিকির প্ররোচনা ও জাপানি যুবক আকিওর আকর্ষণের কাছে নিজেকে ঠিক সামলাতে পারে না কলাবতী। তার বিদেশে যাওয়ার লোভও সে ছাড়তে পারে না। বাংলার লোকশিল্প তথা লোকশিল্পীদের ব্যবহার করে তাদের জাপানী সংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন করে নিজেদের মুনাফা বাড়ায় আকিওরা। এরা এই ধরনের সহজ সরল প্রান্তিক মেয়ে কলাবতীরা ব্যবহৃত হয়। আর অন্যদিকে কনকের মতো, রামুর মতো সহজ সরল মানুষগুলি কলাবতীদের বাড়ি ফেরার আশায় কলাবতীর পথ চেয়ে বসে থাকে। এভাবে ঠকতে হয় লোকশিল্পী কনকদের, রামুদের। গ্রামীন সমাজের পৃষ্ঠপোষকতাহীন পটশিল্প সেদিন মুনাফা লোভীদের গ্রাসে শুধুমাত্র পুঁজির উপাদান হয়ে গেছে। কনক বা রামুরা তাই এখানে প্রয়োজনের সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়। ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের এই বুনন যে শুধুমাত্র কল্পনার

জালে নয় তা পটচিত্র বিশেষজ্ঞ স্মরনজিৎ দত্তের লেখায় পাই। তিনি তাঁর *পটচিত্র: পরিচয় ও পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গ* –এ হতাশার সুরেই লিখেছেন,

> পটচিত্রের পৃষ্ঠপোষক এখন গ্রামীণ সমাজ নয়, তা সম্বন্ধে উৎসাহী মূলত শিল্পবোদ্ধা, লোকসংস্কৃতিতে উৎসাহী শহুরে মানুষজন এবং যাদুঘর বা ব্যক্তিগত সংগ্রাহকরা।[১৯]

৬.৬ উপসংহার:

আমার আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে বর্ণিত লোকশিল্পীরা তাদের নিজ নিজ চেহারায়, জাতিগত দিক থেকে, ভাষা ব্যবহারে, বেশভুষায়, চালচিত্রে, শৈল্পিক বৈচিত্র্যে প্রত্যকেই স্বতন্ত্র। কিন্তু সামাজিক দিক থেকে কোথাও যেন তারা একই অবস্থানে। তাদের বর্ণময় জীবনের বিনোদনের আড়ালে আছে তাদের একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতাবোধ, নির্দিষ্ট একটি শিল্পকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার গভীর যন্ত্রণা। শিল্পকে আঁকড়ে ধরে যে মানুষগুলির বেঁচে থাকা সেই শিল্পের প্রতি সম্মান দিয়েই তার সৃষ্টিকর্তা লোকশিল্পীদের যে সম্মান প্রাপ্য তা তারা পায় না। বরং জোটে লাঞ্ছনা, অবহেলা আর অপমান। সে অবহেলা অর্থনৈতিক দিক থেকেও। উপযুক্ত পারিশ্রমিক তারা পায় না। বেওজর[২০] খাটে তারা। কখনো বা আমরা দেখেছি বিনা পারিশ্রমিকে এক শ্রেণির মানুষ তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগায়। আমাদের চোখে পড়বে কখনো তারা উপার্জনহীন অবস্থায় শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে বাধ্য হয়ে অন্য পেশাকে গ্রহণ করে। এই সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে আমার আলোচ্য ভিন্ন ঔপন্যাসিকের ভিন্ন উপন্যাসগুলির উল্লিখিত লোকশিল্পীরা কোথাও যেন একই দুঃখ কষ্টের শিকার। হৃদয়ের বেদনায় তারা যেন একই ব্যথায় ব্যথাতুর।

তথ্যসূত্র

১. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা। *নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছি*। সরকার, গৌরীশংকর (সম্পাদিত, ২০১৩)।*ঐক্য* । সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সংখ্যা। কলকাতা। পৃ.৪১

২. ঝা, শক্তিনাথ (২০০০)।*ঝাকসু*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। পৃ.৩৮

৩. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা(২০০২)। ২ *উপন্যাস সমগ্র* । কলকাতা: দে'জ। পৃ. ২৪৯

৪. পূর্বোক্ত।

৫. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা। *নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছি*। সরকার, গৌরীশংকর (সম্পাদিত, ২০১৩)।*ঐক্য* । সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সংখ্যা। কলকাতা। পৃ.৪২

৬. সেন, অভিজিৎ (২০১০)। *রহু চণ্ডালের হাড়* । কলকাতা: এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং। পৃ. ২৪৭

৭. সেন, অভিজিৎ (২০১০)। *রহু চণ্ডালের হাড়* । কলকাতা: এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং। পৃ. ৯

৮. সেন, অভিজিৎ (২০১০)। *রহু চণ্ডালের হাড়* । কলকাতা: এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং। পৃ. ৮৯

৯. সেন, অভিজিৎ। *বাংলা সাহিত্যের গড়পড়তা লেখকদের পড়বার সময় কোথায়?* শীল, বিকাশ (সম্পাদিত, ২০০৬)। *জনপদপ্রয়াস*। হুগলি। পৃ.২৯

১০.মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার। *সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের 'রসিক': স্বপ্ন –ঝুমুরের সন্ধানে*। ভট্টাচার্য, বীতশোক(সম্পাদিত, ২০০৮)। *বাংলা উপন্যাস সমীক্ষা* । কলকাতা: এবং মুশায়েরা।পৃ.৯৭

১১. রায়, সুভাষ চন্দ্র (২০১৮)। *পুরুলিয়ার ঝুমুর উৎস বিকাশ ও পরিণতি* । কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ৯১, ৯২।

১২. মুখোপাধ্যায়, সুব্রত (২০১৩)। *রসিক* । কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ৫৪৮

১৩. পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮৬

১৪. মিশ্র, ভগীরথ(২০১৯)। *আড়কাঠি*। কলকাতা: দে'জ। পৃ. ২৭

১৫. পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫৩

১৬. একধরনের সম্মান সূচক উপাধি। যেমন- স্বামীজী,শ্যামসুন্দরজীউ।

দ্র: বসু, রাজশেখর(সংকলিত, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ)। *চলন্তিকা*। কলকাতা: এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা.লি। পৃ.২৬৩

১৭. মিশ্র, ভগীরথ(২০১৯)। *আড়কাঠি*। কলকাতা: দে'জ। পৃ. ১৫৪

১৮. J.McCutchion, David, Bhoumik, Suhrid k.(1999). *Patuas and patua Art in Bengal.* Kolkata: Firma KLM. Pg.14

১৯. দত্ত, স্মরজিৎ। *পটচিত্র: পরিচয় ও পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গ*।ভট্টাচার্য, অশোক (সম্পাদিত, ২০০১)। *পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্র*।কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। পৃ.১৬

২০. বে-উজর অর্থাৎ আপত্তিহীন।

দ্র: বসু, রাজশেখর(সংকলিত, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ)। *চলন্তিকা*। কলকাতা: এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা.লি। পৃ.৫৩২

উপসংহার

স্বাধীনতা পরবর্তী নির্বাচিত বাংলা লোকশিল্প নির্ভর উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনায় লোকশিল্পের প্রতিগ্রহণ সার্থকভাবে শিল্পসম্মত হয়েছে কিনা সমগ্র গবেষণায় তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেছি। আলকাপ, ঝুমুর, পটগান, বাজিকরের ভেলকি, ভানুমতির খেলা এই পাঁচটি প্রান্তিক লোকশিল্পগুলিকে কেন্দ্রে রেখে লেখা হয়েছে লিখিত শিল্প উপন্যাস। আলকাপ শিল্পকে নিয়ে লেখা হয়েছে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *মায়ামৃদঙ্গ* । ঝুমুর শিল্পকে উপজীব্য করে সুব্রত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন *রসিক* । পটশিল্পকে কেন্দ্রে রেখে ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় লিখেছেন *কলাবতী কথা* । বাজিকরের ভেলকি বা ভানুমতির খেলাকে ব্যবহার করে অভিজিৎ সেনের *রহু চণ্ডালের হাড়* । শহুরে অধ্যাপক ও লোকসংস্কৃতিপ্রেমী রাজীব কীভাবে ছদ্ম লোকশিল্প ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়ে নিজের সংস্কৃতিকে অপসংস্কৃতিতে পরিণত করে লোকশিল্পীদের পণ্য করেছে তারই কাহিনি ভগীরথ মিশ্রের *আড়কাঠি* উপন্যাস। স্বাধীনতা উত্তর এই পাঁচটি উপন্যাস আমার বক্তব্য বিষয়টির ভিত। লোকশিল্পকে গ্রহণ করে নির্মিত এই উপন্যাসশিল্প আদতে একপ্রকার বাংলা উপন্যাসে লোকশিল্পের নবায়ন। লোকশিল্প মূলত আঞ্চলিক। কিন্তু উপন্যাসে সেই লোকশিল্পের পরিবেশনে তার আবেদন সর্বজনীন হয়ে যায়। লোকশিল্প অনভিজাতের। কিন্তু উপন্যাসে তার পরিবেশনে তা অভিজাতের উপাদান হয়ে ওঠে। উপন্যাসে লোকশিল্পের নবায়নে লোকশিল্পগুলির আবেদন আন্তর্জাতিকতার স্তরে পৌঁছায়।

স্বাধীনতা পরবর্তী নির্বাচিত বাংলা লোকশিল্প নির্ভর উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনার পূর্বসূত্র হিসাবে লোক ও লোকসংস্কৃতির ধারণা, লোকশিল্পের সৃষ্টিকর্তা প্রান্তিক লোকসমাজ, অভিজাত সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির তুলনা এবং লোকশিল্পের নান্দনিক দিক নিয়ে

আলোচনা করেছি। স্বাধীনতা পরবর্তী লোকশিল্প নির্ভর বাংলা উপন্যাস শিল্পের পূর্বসূত্র হিসাবে বাংলা উপন্যাস শিল্পের জন্মলগ্ন, বাংলা উপন্যাসে এলিট শ্রেণি বা অভিজাত মানুষের চরিত্রায়ণের পাশাপাশি প্রান্তিক মানুষের কথা কখন ও কীভাবে এসেছে তার একটি ক্রমপরম্পরা তৈরি করতে চেষ্টা করেছি। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে সেই ধারায় স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা লোকশিল্পনির্ভর উপন্যাস ও আমার নির্বাচিত উপন্যাসগুলির বিস্তারিত ক্ষেত্রটির আলোচনা করেছি।

পারফরমেন্স শিল্পের বৈশিষ্ট্য ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমার নির্বাচিত উপন্যাসে বর্ণিত ভিন্ন ভিন্ন লোকশিল্পগুলি যে আদতে আলাদা আলাদা পারফরমেন্স হয়ে উঠেছে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বিশদে আলোচনা করেছি। আর সেই পারফরমেন্স লোকশিল্পগুলিকে ব্যবহার করে ঔপন্যাসিকেরা তাদের উপন্যাসে মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে সার্থকভাবে পরিবেশন করেছেন। এক্ষেত্রে তারা বাস্তব থেকে লোকশিল্পের উপাদান গ্রহণ করেছেন। আর সেই গ্রহণ বাস্তবের হুবহু অনুসরণ নয়, আবার পাঠক সমাজের বিনোদনের জন্য রোমান্টিক মোহজাল তৈরি করাও নয় বরং তারা যে সহমর্মী তা এখানে স্পষ্ট হয়েছে। তাদের এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য অন্ত্যজ মানুষের শিল্পময় জীবনের জটিল জীবন আবর্তকে দেখানো। তবে, এক্ষেত্রে প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই যথেষ্ট নিরপেক্ষ। সেখানে এসেছে প্রান্তিকের কঠিন জীবন। পারফরমেন্স হিসাবে বাস্তবের এই লোকশিল্প অভিজাতের কলমে যেভাবে পরিবর্তিত হল, সেই পরিবর্তিত চেহারার স্বরূপটি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি। স্বতন্ত্র উপন্যাসের নিজস্ব বয়ানে আখ্যানগত দেহভঙ্গিমায় প্রান্তিক লোকশিল্পীদের লোকশিল্পগত মর্যাদাকে মুনশিয়ানার সঙ্গে পরিবেশন করে উপন্যাসকে সার্থকভাবে পরিবেশন করেছেন স্বতন্ত্র ঔপন্যাসিকগণ। বাস্তব জগৎ থেকে কোনো বিষয়কে গ্রহণ করে ঔপন্যাসিকগণ যখন বিশেষ শিল্প মাধ্যমকে সমৃদ্ধ করেন তখন তা হয়ে যায় সেই গ্রহণের প্রতিগ্রহণ। প্রান্তিকের

লোকশিল্পকে উপন্যাসের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব মৌলিকতায় তার নবায়ন হয়েছে। আর তখনই হয়েছে তা যথার্থ প্রতিগ্রহণ। এ দিক থেকে বিচার করলে আমার আলোচ্য প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই সফল ও সার্থক। ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাসে প্রকরণ, কথন, চরিত্রায়ণ, সময়, আবহ, ফোকালাইজেশন, সংস্থানগত দিকগুলি থেকে ঔপন্যাসিকেরা লোকশিল্প ও লোকশিল্পীদের জীবন্ত করে তুলেছেন তাদের স্বকীয়তায়। তবে ভিন্ন ভিন্ন ঔপন্যাসিক এই লোকশিল্প নির্ভর উপন্যাসে লোকশিল্পীদের জীবন কথা, চরিত্রদের দুঃখ, কষ্ট, অনুভূতি ও মনোবেদনাকে যে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, সেদিক থেকে প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এদিক থেকে উপন্যাসের ভাষা প্রয়োগ, লেখকের নিজস্ব ভাষাশৈলী, চরিত্রদের মুখের সংলাপে, আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে উপন্যাস জীবন্ত রূপ পায়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহারের দিক থেকে ঔপন্যাসিকেরা যথার্থভাবেই লোকশিল্পের মর্ম নিজেরা অনুধাবন করেন ও একইসঙ্গে পাঠকদেরও অনুধাবন করান। আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকশিল্পগুলি সজীব ও প্রাণবন্ত হয়েছে। একারণে তাদের এই ভাষা ব্যবহারে উপন্যাসগুলিও পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে। লোকশিল্পীরাও হয়ে উঠেছেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট শিল্পের যথার্থ শিল্পী। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় মূলত লোকশিল্পের পরিবেশনে নারীরাই অগ্রণী ভূমিকা নেয়। আমার আলোচ্য উপন্যাসে লোকশিল্পের পরিবেশন পুরষের দ্বারা সম্পাদিত হলেও, নারীরাই যেন তার মূল চালক। তারা নিজের পরিবার পরিজনের পেটের অন্ন সংস্থানের জন্যেই কাজে নামে। আর সাংস্কৃতিক দিক থেকে নানা ধরনের সংস্কারের কথা বলে নারী লোকশিল্পীদের উপর চলে নানা ধরনের অত্যাচার। কখনো পুরুষতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, কখনো ভূস্বামী ব্যবস্থার শোষণের শিকার হতে হয় মেয়েদের। চলে নারী পাচার। দারিদ্র্য থেকে রেহাই পেতে সর্বস্বান্ত নিঃস্ব রিক্ত মানুষগুলির

মধ্যে কেউ কেউ তাদের অন্তরকে বাজি রেখে পেটের সন্তানকে রক্তপায়ী নারীমাংস খাদকের ক্ষুধার মাংস হিসাবে তুলে দিতে বাধ্য হয়। নাচনি প্রথার মতো সাংস্কৃতিক প্রথার শিকার হয়ে নাচনি মেয়েদের পরিবার, পরিজন থেকে ব্রাত্য হতে হয়। তারা আর পাঁচটি সাধারণ মেয়ের স্বাভাবিক জীবন পায় না। তারা পায় না স্ত্রীর মর্যাদা। সন্তানের মুখ দেখার অধিকার থেকেও তারা হয় বঞ্চিত। এমনকি মৃত্যুর পরেও তাদের দেহ সৎকারের কোনো ব্যবস্থা নেই। তাদের দেহ ফেলে দেওয়া হয় ভাগাড়ে। এসেছে, আরেক ধরনের লোকশিল্পীদের কথা যারা না-পুরুষ, না-নারী। তারা আদতে সমাজ ব্রাত্য। তারা নিজেরাই নিজেদের কাছে হাসির পাত্র। কারণ, শিল্পের প্রয়োজনে তাদের গুরুত্ব অথচ তার নিজের প্রয়োজনে সে একা। শিল্পীমনের সেই একাকিত্বের যন্ত্রণা অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন সিরাজ। এই লোকশিল্পীরা লিঙ্গগত দিক থেকেও প্রান্তিক। তাদের এই প্রান্তিক জীবনের পিছনে রয়েছে মূলত তাদের অর্থনৈতিক সংকট। আলোচ্য উপন্যাসগুলির প্রান্তিক লোকশিল্পীরা সংখ্যার বিচারে গুরু কিন্তু মর্যাদায় তারা সমাজের তথাকথিত অভিজাতের কাছে লঘু। শিক্ষার আলো থেকে তারা আজও অনেক পিছিয়ে। লিঙ্গগত বৈষম্যে তারা ঘরে বাইরে অসহায়। স্বাধীনতা লাভের পর আমরা বেশ কিছু বছর পার করতে চলেছি। গোটা বিশ্বের নারীরা যখন নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন সেখানে আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের নারী শিল্পীরা সেই স্বাভাবিক অধিকার বা নারী প্রগতি থেকে অনেক দূরে। *রসিক* উপন্যাসে পুরুলিয়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামের প্রান্তিক মেয়ে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির খোঁজে নাচনি হওয়ার স্বপ্ন দেখে। নাচনি প্রথার ভয়ঙ্কর জীবন সম্পর্কে সে অবহিত। নাচনি হতে পারলে অন্তত তার ও তার মায়ের দুবেলা দুমুঠো খাবারের সংস্থান হতে পারে ভেবে তার এই সিদ্ধান্ত। তবু প্রান্তিকের এই কঠিন একঘেয়েমির জটিলতাময় জীবনে তাদের প্রাণের আরাম আত্মার শান্তি তাদের এই শিল্পগুলি। আবার এই লোকশিল্পীদের শিল্পময় জীবনের অনিঃশেষ আনন্দই যে

তাদের গোটা জীবন তা কিন্তু নয়। অন্ন-বস্ত্র, কাম-ক্রোধ মিলিয়ে সে জীবন বড়ো বিচিত্র। একদিকে অর্থনৈতিক সংকট, অশিক্ষা অন্যদিকে আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা তাদের আজও স্বাভাবিক জীবন থেকে ছিটকে দিয়েছে বহুদূরে। জীবনে মুক্ত চিন্তার কণামাত্রও পৌঁছয়নি। তবু জটিলতাহীন সরল জীবনে আজও আরা আন্তরিক। নিখাদ শিল্পী তো বটেই। আবার প্রাণের সংস্কৃতি চর্চায় মত্ত এই মানুষদের জীবন যাপন যতই আন্তরিকতায় ভরপুর হোক না কেন, বাস্তব জীবনে জাত-পাত, অশিক্ষা, অর্থনৈতিক শোষণ, যৌন রাজনীতির টানাপোড়েনের জটিলতায় আরা আবর্তিত। এই প্রথাবদ্ধ ঘেরাটোপ থেকে বেরোতে না পারা তথাকথিত নিরক্ষর মানুষগুলির জীবন প্রকৃতি আদিম ছন্দে ও অকৃত্রিম সুরে লালিত। আমাদের আলোচ্য সেই পাঁচটি উপন্যাস সেই অকৃত্রিম সুরটিকেই তুলে ধরে। দেখায়, প্রান্তিকের লোকজীবনে শিল্প ও মানুষের সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ। কতটা আন্তরিক। বাদ যায়নি অপরিশীলিত সভ্যতার ধারালো মানবজীবনটিও। শিল্পময় আনন্দঘন ওস্তাদ এমনকি, শহুরে বুদ্ধিজীবী অধ্যাপকের কাছেও পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যে নারীরা পণ্যের শিকার। *আড়কাঠি* উপন্যাসে একশ্রেণির ছদ্মবেশী লোকসংস্কৃতিপ্রেমী বুদ্ধিজীবীর নিজের স্বার্থের কারণে ব্যবহৃত ও বিপর্যস্ত হয়েছে লোকশিল্প ও সহজ সরল প্রান্তিক লোকশিল্পীরা। তারা শিল্পকে আত্মসাৎ করে নারী শিল্পীদের পণ্য করে। লোকশিল্পীদের শিল্প ও বাস্তব জীবনের কঠিন টানাপোড়েন প্রান্তিক জীবনে স্বাভাবিক। প্রান্তিক শিল্পী তো তাদেরই একজন। সুতরাং তারাও তো এই জীবনে বন্দী। আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে ঔপন্যাসিকগণ প্রান্তিকের শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে সেই শিল্পী কুলের অদৃশ্য বন্দীদশাকেই তুলে ধরলেন। আমার আলোচ্য প্রত্যেকটি উপন্যাসের প্রাণসূত্র এক। আর এই কারণে আমরা আশ্চর্য হই অনেক বেশি। স্বাধীনোত্তরকালে লেখা এই লোকশিল্পনির্ভর প্রান্তিকের জীবনকে তাঁদের উপন্যাসে প্রতিপাদ্য করেছেন ঔপন্যাসিকগণ। স্বাধীনতার বহু সময়ের ব্যবধানে তাদের কি বা উন্নতি! কেনই বা *মায়ামৃদঙ্গ*

লেখার পর লেখা হয় *রহু চণ্ডালের হাড়!* কেনই বা তার বহু পরে *রসিক* বা *আড়কাঠি* -র মতো উপন্যাস লেখা হয়? লেখা হয় *কলাবতী কথা ?* এ প্রশ্ন আন্তরিক শিল্পী ও জীবন রসিক মাত্রই জানা। সাহিত্য তো কিছুটা সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। খুব সম্ভব এই প্রতিচ্ছবিতেই পাঁচজন বিশিষ্ট লেখকও তাঁদের সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। পাঠকের বহুমাত্রিক চিন্তার ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করেছেন তাঁরা। স্বভাবত পাঠকের মনে তৈরি হয় নানান প্রশ্ন। *মায়ামৃদঙ্গ, রহু চণ্ডালের হাড়, রসিক, আড়কাঠি, কলাবতী কথা –* উপন্যাসে তাই উঠে আসে প্রান্তিকের প্রান্তেবাসী হওয়ার কারণটি কী। অন্ত্যজের পরিশীলিত জীবনচর্যায় শিল্প তথা শৈল্পিক জীবনের টানাপোড়েনের মূলে কে দায়ী– পুরুষ না নারী না কি সমাজ? না কী তাদের অস্তিত্বে সিঁধিয়ে থাকা হেগেমনি? সমাজের জাতিভেদগত কুসংস্কারের আধিপত্যও প্রান্তিকের অন্তেবাসী হওয়ার দায়কে যে এড়িয়ে যেতে পারে না তার নিশ্ছিদ্র দলিল এই উপন্যাসগুলি। নিজেরা অন্ত্যজ হয়েও নিজেদের এই আধিপত্যকে বর্তে যেতেই থাকে। অন্ত্যজের মধ্যেকার তথাকথিত জাতিগত উচ্চমন্যতা বোধও যে কতটা জটিল হতে পারে, শ্রেণি সচেতনতার নানান চেহারা এখানে হাজির হয়েছে। প্রথাগত উপন্যাস শিল্পের মধ্যেও লোকশিল্পকে কেন্দ্র করে প্রান্তিক শিল্পীদের শিল্পময় জীবন চিত্র অঙ্কনে *মায়ামৃদঙ্গ, রহু চণ্ডালের হাড়, রসিক, আড়কাঠি, কলাবতী কথা* উপন্যাসগুলির সার্থকতা এখানেই।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থপঞ্জি

মিশ্র, ভগীরথ (২০১৯)। *আড়কাঠি* । কলকাতা, দে'জ।

মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা (২০১৫)। *কলাবতী কথা*। কলকাতা: আনন্দ।

মুখোপাধ্যায়, সুব্রত (২০১৩)। *রসিক*। কলকাতা: আনন্দ।

সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা (২০১৩)। *উপন্যাস সমগ্র ২*। কলকাতা: দে'জ।

সেন, অভিজিৎ (২০১০)। *রহু চণ্ডালের হাড়*। কলকাতা: জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আচার্য, অনিল ও সাহা অর্ণব(সম্পাদনা, ২০০৯)। *যৌনতা ও বাঙালি* । কলকাতা: অনুষ্টুপ।

আজাদ, হুমায়ুন (১৯৯২)। *নারী* । বাংলাদেশ: আগামী প্রকাশনী।

আল দীন, সেলিম। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

আলী, শওকত (১৯৮৪)। *প্রদোষে প্রাকৃতজন*। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

ইমরান, মাসউদ (সম্পাদিত, ২০১০)। *ক্রিটিক্যাল তত্ত্বচিন্তা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

ইলিয়াস, মহবুব (১৯৯৯)। লোকসাহিত্যে ছড়ানাট্য ও লোকসঙ্গীত, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

ইসলাম, আনিমূল(২০১৬)। *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন* । ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

ইসলাম, রহঃ নুরুল (২০১০)। *আলকাপ*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

করণ, সুধীর কুমার (২০০৪)। *লোকায়তিক*। বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

করণ, সুধীরকুমার (১৩৭১)। *সীমান্ত বাঙ্‌লার লোকযান*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী।

কুণ্ডু, দীনবন্ধু (২০১৯)। *স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাস ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ* । কলকাতা: পূর্ণপ্রতিমা।

খাতুন, শাহিদা (১৯৯৮)। লোকউৎসবে ঐতিহ্যচেতনা। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

গোলদার, তানিয়া (১৪২২ বঙ্গাব্দ)। *লোকনাট্যের নারীশিল্পীরা* । বীরভূম: রাঢ়।

গোস্বামী, অতসী নন্দ (২০১১)। *আলকাপ*। কলকাতা: এবং মুশায়েরা।

ঘোষ, সুবোধ (১৩৫৫)। *ভারতের আদিবাসী*। কলকাতা: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ।

চক্রবর্তী, উদয়কুমার (১৯৯২)। *বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন* । কলকাতা: দে'জ।

চক্রবর্তী, উদয়কুমার (২০১৬)। *বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ* । কলকাতা: দে'জ।

চক্রবর্তী, উদয়কুমার। চক্রবর্তী নীলিমা (২০১৬)। *ভাষাবিজ্ঞান* । কলকাতা: দে'জ।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার (১৯৯৫)। *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*। কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটারস্।

চটোপাধ্যায়, কুন্তল (২০০৩)। *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। কলকাতা: রত্নাবলী।

চট্টোপাধ্যায়, তুষার (১৯৮৫)। *লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান*। কলকাতা: এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ।

চট্টোপাধ্যায়, নরনারায়ণ (১৯৯৯)। *ঝুমুর*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

চট্টোপাধ্যায়, মুনমুন (২০০৪)। *মৈমনসিংহ-গীতিকা: পুনর্বিচার*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

চট্টোপাধ্যায়, সুজিতকুমার (২০১৭)। *লোকসাহিত্যে সমাজচিত্র সংস্কৃতি, রাজনীতি ও নারীজীবন*। কলকাতা: কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী।

চন্দ, বীরেন (সম্পাদিত, ২০০২)। *বিষয়: বাংলা উপন্যাস সময়ের দর্পণে সমাজের প্রতিবিম্ব*। কলকাতা: বইওয়ালা।

চৌধুরী, দুলাল (২০০৪)। *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*। কলকাতা: একাডেমী অফ ফোকলোর।

চ্যাটার্জী, নরনারায়ণ (১৯৯৯)। *ঝুমুর*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

ঝা, শক্তিনাথ (২০১০)। *আলকাপ* । কলকাতা : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ।

ঝা, শক্তিনাথ(২০০০)। *ঝাকসু* । কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।

তরু, মাযহারুল ইসলাম (২০০০)। *ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীত: আলকাপ গান* । ঢাকা: বাংলা একাডেমী ঢাকা।

তরু, মাযহারুল ইসলাম (২০০৩)। *বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসংগীত: আলকাপ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী ঢাকা।

দত্ত, গুরুসদয়(২০০০)। *বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য*। কলকাতা: ছাতিম বুকস।

দত্ত, সম্রাট (২০১০)। *বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

দাশ, দেবশ্রী (২০০৬)। *বাংলার লোকনাট্য : গম্ভীরা ও আলকাপ*। কলকাতা: প্রভা প্রকাশনী।

দাস, অমিতাভ (২০১৪)। *আখ্যানতত্ত্ব*। কলকাতা: ইন্দাস।

দাস, নির্মল (২০০৫)। *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা: দে'জ।

দাস, শকুন্তলা (সম্পাদিত, ২০১৯)। *নারী প্রগতি নানা ভাবনায়*। কলকাতা: এবং মুশায়েরা।

নস্কর, সনৎকুমার (সম্পাদিত, ১৯৯৯)। *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী* [কালকেতু-পালা]। কলকাতা: রত্নাবলী।

নাথ, মৃণাল (১৯৯৯)। *ভাষা ও সমাজ* । কলিকাতা*:* নয়া উদ্যোগ।

নাহার, মীরাতুন (২০০৭)। *অন্তঃস্বর মেয়েদের কথায় মেয়েরা*। কলকাতা: ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন (কলেজ) প্ল্যাটিনাম জুবিলি স্মারক গ্রন্থ (১৯৩২-২০০৭)।

নীলিমা, চক্রবর্তী (২০০৬)। *বাংলা ভাষা ও চমস্কির তত্ত্ব* । কলকাতা: দে'জ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর (২০১৫)। *কবি*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ (১৯৮৮)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* । কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী (২০১২)। *বাংলা উপন্যাসে ওরা*। কলকাতা: প্যাপিরাস।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার (২০০৮)। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ (১৩৬৮)। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*। কলকাতা: নতুন সাহিত্য ভবন।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ (২০০০)। *সতীনাথ ভাদুড়ী*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচরিতা, দাস অরূপকুমার (সম্পাদিত, ২০১২)। *বাংলা ভাষায় নানা বিদ্যাচর্চা*। কলকাতা: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাগচী, যশোধরা (২০১২)। *নারী ও নারীর সমস্যা* । কলকাতা: অনুষ্টুপ।

বিশাই, শঙ্কর (২০০৪)। *বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলবর্তী লোকজীবন ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

বেবেল, আউগুস্ট (১৯৭১)। *নারী অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত* । কলকাতা: ন্যাশানাল বুক এজেন্সি।

বেরা, নলিনী (২০১৭)। *মাটির মৃদঙ্গ*। কলকাতা: দে'জ।

বোভোয়ার, সিমোন দ্য(১৯৪৯)। সেকেণ্ড সেক্স। আজাদ, হুমায়ুন(অনুবাদক,২০১২)। *দ্বিতীয় লিঙ্গ* ।ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পাদিত) (২০০৪)। *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। কলকাতা: দে'জ।

ভট্টাচার্য, অশোক(সম্পাদনা, ২০১৭)। *পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্র*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০৪)। *বাংলার লোকসাহিত্য*। কলকাতা: মুখার্জী অ্যাং কোং. প্রাইভেট লিমিটেড।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০৫)। *বাংলার লোকসংস্কৃতি*। নতুন দিল্লি: ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ(২০০৫)। বাংলার লোক-সংস্কৃতি।কলকাতা: ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট।

ভট্টাচার্য, গৌরীশঙ্কর (২০০০)। *বাংলার লোকনাট্য সমীক্ষা*। কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

ভট্টাচার্য, তপতী (২০০০)।*প্রতীচ্য ভাবনা ও বঙ্গীয় নারী জাগরণ* । কলকাতা: অরুণা প্রিন্টার্স।

ভট্টাচার্য, তপোধীর (১৯৯৯)। *উপন্যাসের প্রতিবেদন*। কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন।

ভট্টাচার্য, তপোধীর (২০১৩)। *টেরি ঈগলটন, তাঁর তত্ত্বজিজ্ঞাসা*। কলকাতা: দে'জ।

ভট্টাচার্য, দেবাশিস (২০১০)। *বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা*। কলকাতা: অক্ষর।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ (২০০০)। *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস* । কলকাতা: জেনারেল।

ভট্টাচার্য, নিমাই (১৯৯৩)। *নাচনী*। কলকাতা: দে'জ।

ভট্টাচার্য, বীতশোক(সম্পাদিত, ২০০৮)। বাংলা উপন্যাস সমীক্ষা । কলকাতা: এবং মুশায়েরা।

ভট্টাচার্য, শ্যামাপ্রসাদ (২০১১)। *কবিতার ভাষা ধ্বনির নন্দনতত্ত্ব* । কলকাতা: ইন্দাস।

ভদ্র, গৌতম, চট্টোপাধ্যায় পার্থ (১৯৯৮)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। কলকাতা: আনন্দ।

ভারতকোষ (তৃতীয় খণ্ড, ১৯৬৪)। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

ভুঁইয়া, ফাল্গুনী (২০১১)। *বাংলার লোকসংস্কৃতি: মনস্তাত্ত্বিক অন্বেষা ও প্রয়োগ*। কলকাতা: সমকালের জিয়নকাঠি।

ভৌমিক, সুহৃদকুমার (২০০৯)। *বঙ্গ-সংস্কৃতিতে আদিবাসী ঐতিহ্য*। কলকাতা: মনফকিরা। সহজিয়া।

মজুমদার, অভিজিৎ (২০১৬)। *শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব* । কলকাতা: দে'জ।

মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার (২০১৮)। *সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ ও রীতি*। কলকাতা: দে'জ।

মজুমদার, মানস (১৯৯৩)। *লোকঐতিহ্যের দর্পণে* । কলকাতা: দে'জ।

মজুমদার, মানস (১৯৯৯)। *লোকসাহিত্য পাঠ* । কলকাতা: দেজ।

মণ্ডল, তুলসীচরণ(২০১৪)। *আলকাপ সম্রাট ঝাকসু* । মুর্শিদাবাদ: মুর্শিদাবাদ সাহিত্য আকাদেমি।

মণ্ডল, মননকুমার (২০১৪)। *আধুনিক বাংলা উপন্যাস: ব্যষ্টি ও সমষ্টি (১৯৪৭-৬৭)*। কলকাতা: এবং মুশায়েরা।

মাজী, বিপ্লব। *ইকোফেমিনিজম, নারীবাদ ও তৃতীয় দুনিয়ার প্রান্তিক নারী* । কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স।

মিত্র, সনৎকুমার (২০০০)। *বাংলা গ্রামীণ লোকনাটক*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

মিত্র, সনৎকুমার (২০০১)। *বাঙলা লোকভাষা বিজ্ঞান*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ।

মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ (১৪১৪)। *বাংলার লোক-উৎসব ও লোকশিল্প* । কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

মুখার্জী, আদিত্য (২০০৫)। *বাংলার লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: অমর ভারতী।

মুখার্জী, কাবেরী এবং মুখোপাধ্যায়, গৌতম (২০২০)। *নারীবাদ ও রাজনীতি চর্চা* । কলকাতা: সেতু প্রকাশনী।

মুখোপাধ্যায়, তরুণ (সম্পাদিত, ১৪২২)। *সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ: স্মরণে, চিন্তনে*। কলকাতা: মেইন্সট্রীম পাবলিকেশন।

মুখোপাধ্যায়, তরুণ (সম্পাদিত, ১৪২২)। *সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ: স্মরণে, চিন্তনে*। কলকাতা: মেইনস্ট্রীম পাবলিকেশন।

মুখোপাধ্যায়, তরুণ কুমার। বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচরিতা (সম্পাদিত, ২০১১)। *সাহিত্যতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব, শৈলীতত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষায় নানা বিদ্যাচর্চা*। কলকাতা: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার (২০১৮)। *সাহিত্য-বিচার: তত্ত্ব ও প্রয়োগ*। কলকাতা: দে'জ।

রায়, অলোক (সম্পাদিত, ১৯৬৭)। *সাহিত্যকোষ: কথাসাহিত্য*। কলকাতা: সাহিত্যলোক।

রায়, কামিনী কুমার (১৯৬৮)। *লৌকিক শব্দকোষ*। কলকাতা: ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্।

রায়, দেবেশ (১৯৯৪)। *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*। কলকাতা: প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড।

রায়, সুভাষ চন্দ্র (২০১৮)। *পুরুলিয়ার ঝুমুর : উৎস বিকাশ ও পরিণতি*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

শ, রামেশ্বর (১৪০৩)। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

শূর, চিরঞ্জীব (সংকলিত, ২০১৭)। *উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বাংলা সাহিত্য* । কলকাতা: আলোচনাচক্র।

শূর, চিরঞ্জীব (সংকলিত, ২০১৭)। *মনন বিশ্ব পরিচয়*। কলকাতা: আলোচনাচক্র।

সমাদ্দার, ভাস্বতী (১৯৯৪)। *বাংলা উপন্যাসের পালাবদল (১৯৬৬-১৯৭৮)*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

সরকার, পবিত্র (১৪০৫ বঙ্গাব্দ)। *ভাষা দেশ কাল* । কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।

সরকার, পবিত্র (২০০৩)। *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি* । কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন।

সরকার, পবিত্র (২০১৩)। *চম্‌স্কি ব্যাকরণ ও বাংলা বানান* । কলকাতা: পুনশ্চ।

সরকার, পবিত্র (২০১৮)। *ভাষামনন* । কলকাতা: পুনশ্চ।

সরকার, পবিত্র (২০২১)। *গবেষণা ও গবেষণা-পদ্ধতির সহজ পাঠ*। কলকাতা: স্পার্ক।

সরকার, প্রণব (সম্পাদিত, ২০১৯)। *গোষ্ঠী সমাজ সম্প্রদায় ২*, বইমেলা সংখ্যা। কলকাতা: স্বদেশচর্চা লোক।

সিংহ, শান্তি (১৯৯৭)। *লোকসঙ্গীত সংগ্রহ*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত একাডেমী, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সেন মজুমদার, জহর (২০১০)। *উপন্যাস সময় সমাজ সংকট*। কলকাতা: বুকস স্পেস।

সেন, নবেন্দু (সম্পাদিত, ২০০৯)। *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা*। কলকাতা: রত্নাবলী।

সেন, নবেন্দু (সম্পাদিত, ২০১২)। *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা* । কলকাতা: রত্নাবলী।

সেনগুপ্ত, পল্লব (২০০২)। *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

হালদার, গোপাল (১৯৯৩)। *ভারতের ভাষা*। কলকাতা: মনীষা।

হিমেল, লায়লা ফেরদৌস (২০১৮)। *ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য আলকাপে সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রয়োগশৈলী*। ঢাকা: আজকাল।

হোসেন, আবু ইসহাক (২০১৮)। *বাংলা লোকগান। প্রথম খণ্ড*। ঢাকা: শোভা প্রকাশ।

সহায়ক বাংলা অভিধান

আকাদেমি বানান উপসমিতি (সম্পাদিত, ২০০৮)।*আকাদেমি বানান অভিধান*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন(সংকলিত, ১৯৮৬)। *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকুমার (সম্পাদিত, ১৯৭৮)। *পৌরাণিকা* । কলকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ(১৩৪০-১৩৫৩ বঙ্গাব্দ)। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি।

বসু, রাজশেখর(সংকলিত, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ)। *চলন্তিকা*। কলকাতা: এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা.লি।

রায়, যোগেশচন্দ্র (সংকলিত, ১৩২০-২২ বঙ্গাব্দ)। *বাঙ্গালা শব্দকোষ* । কলকাতা: ভূর্জপত্র।

সরকার, সুধীরচন্দ্র (সংকলিত, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ)। *পৌরাণিক অভিধান* । কলকাতা: এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা: লি:।

হক, কাজী রফিকুল(সম্পাদনা, ২০০৪)। *বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দি উর্দু শব্দের অভিধান* । ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

সহায়ক ইংরেজি অভিধান

Siddiqui, Zillur Rahman (2002). *Bangla Academy English-Bangla Dictionary*. Dhaka: Bangla Academy Dhaka,

Stevenson, Angus and Waite, Maurice (2011). *Concise Oxford English Dictionary*, New Delhi.

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি

Bandyopadhyay, Sibaji (Edited, 2004). *Thematology Ltierary Studies in India*. Kolkata: Department of Comparative Literature, Jadavpur University.

Chakraborty Dasgupta, Subha (Edited, 2004). *Literary Studies in India: Genology*. Kolkata: Department of Comparative Literature, Jadavpur University.

Chanda, Ipsita (Edited, 2004). *Literary Studies in India Literary Historiography*. Kolkata: Department of Comparative Literature, Jadavpur University.

Chatterjee, Sunitikumar (1985). *The Origin and Development of the Bengali Language*. New Delhi: Rupa.

Cutchion, David J. Mc. Bhoumik, Suhrid K. (1999). *Patuas and Patua Art in Bengal.* India: Firma KLM.

Gramsci, Antonio (1996). *Selections from the Prison Notebook*. Madras.

Hoare, Quintin and Smith, Nowell Geoffrey (Edited and translated, 1971). *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. New York: International Publishers.

Holub, Robert C (1984). *Reception Theory: A Critical Introduction*. London and New York: Methuen & Co. Ltd.

http://www.theatrewala.net/shankha/49-2016-02-10-12-30-10/269-2015-02-22-08-43-20

Itagi, N. H. Singh, Shailendra Kumar (Edited, 2002). *Linguistic Landscapingin India with particular reference to the new States*. Mysore, Central Institute of Indian Languages and Mahatma Gandhi International Hindi University.

Mukhopadhyay, Tirtha Prasad (Edited, 2013).*Rupkatha Journal* (Vol. V) 'What is Performance Studies?'. India.

Spivey, Virgmia B. *"Performance Art : An Introduction",* www.smarthistory.com

Stanzel F, K (1988). *A theory of Narrative*, trans. C. Goedsche, Cambridge, New York & Melbourne: Cambridge University Press.

Thoms, William J. *Letters To The ATHENEUM(1846)*. Miller, Stephen (2021). *The Notes and Queries Folklore Column 1849-1947*. UK: Cambridge Scholars Publishing.

Toolan, M (Edited, 1990). *The Stylistics of Fiction: A Literary-Linguistic Approach*, London and New York: Routledge.

Williams, Raymond(1960). *Culture and Society 1780-1950.* New York:Anchor Books.

Williams, Raymond(1976). *Keywords A Vocabulary of Culture and Society*. New York: Oxford University Press.

সহায়ক পত্র-পত্রিকাপঞ্জি

চক্রবর্তী, সুধীর(সম্পাদিত, ২০০৫)। *ধ্রুবপদ। প্রসঙ্গ নারীবিশ্ব।* কৃষ্ণনগর।

চটোপাধ্যায়, দেবব্রত (সম্পাদিত, ২০১৩)। *পরিকথা*। প্রসঙ্গ: বিশ্বসাহিত্য। কলকাতা।

দত্ত, হর্ষ (সম্পাদিত, ২০১৬, ২২ ডিসেম্বর)। *দেশ*। কলকাতা।

দাশ, অনির্বাণ (সম্পাদিত ,২০০৫)। *আলোচনা চক্র*। লিঙ্গতত্ত্ব সংখ্যা। কলকাতা।

পুরকাইত, উত্তম *(সম্পাদিত, ২০১৫)। উজাগর। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা।* হাওড়া।

বারিক, ভাগ্যধর (সম্পাদিত, ১৪২৩)। *সাগরবেলা*। ২৯ বর্ষ, পৌষ সংখ্যা। সাগরদ্বীপ।

ভট্টাচার্য, উৎপল (সম্পাদিত, ২০১৭)। *কবিতীর্থ। রোলাঁ বার্ত।* কলকাতা।

মণ্ডল, ইসলাম নাজিবুল (সম্পাদিত, ২০১৪)। *সমকালের জিয়নকাঠি*। জানুয়ারি-জুন, যুগ্ম সংখ্যা; জীবন মণ্ডল হাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

মণ্ডল, ইসলাম নাজিবুল (সম্পাদিত, ২০১৫)। *সমকালের জিয়নকাঠি*। জুলাই-ডিসেম্বর, যুগ্ম সংখ্যা। কলকাতা।

মন্ডল, ইসলাম নাজিবুল (সম্পাদিত, ২০১৩)। *সমকালের জিয়নকাঠি*। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বিশেষ সংখ্যা। কলকাতা।

মল্লিক, অমরনাথ (সম্পাদিত, ২০০৯)। *কলকাতা পুরশ্রী*। নবপর্যায়, নবম বর্ষ। কলকাতা।

রায়, সৌরভ (সম্পাদিত, ২০১৬)। *হিজল*। আলিপুরদুয়ার।

রায়চৌধুরী, শিশির (সম্পাদিত, ১৪২৪)। *শ্রীময়ী*। উৎসব সংখ্যা। কলকাতা।

রায়চৌধুরী, শিশির (সম্পাদিত, ১৪২৪)। *শ্রীময়ী*। নববর্ষ সংখ্যা ১৪২৪। কলকাতা।

শীল, বিকাশ (সম্পাদিত, ২০০৬)। *জনপদপ্রয়াস।* অভিজিৎ সেন সংখ্যা। হুগলি।

সরকার, গৌরীশংকর (সম্পাদিত, ২০১৩)। *ঐক্য*। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সংখ্যা। কলকাতা।

সরকার, পবিত্র (সম্পাদিত, ১৯৯৮)। *বহুবচন*। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। কলকাতা।

সরকার, প্রণব (সম্পাদিত, ২০০৭)। *স্বদেশচর্চা লোক*। শরৎ সংখ্যা। কলকাতা।

সরকার, প্রণব (সম্পাদিত, ২০১৯)। *স্বদেশচর্চা লোক*। শরৎ সংখ্যা। হাওড়া।

সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত, *১৪০৯)*। *এবং মুশায়েরা*। গল্প ও গল্পকার বিশেষ সংখ্যা। কলকাতা।

সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত, *১৪১৭)*। *এবং মুশায়েরা।* গুণময় মান্না সংখ্যা। কলকাতা।